

বৈশাখ, ১৩৩৫

ওরে নেশাখোর মন—

—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

ওরে নেশাখোর মন,
খেয়ালের খোশে আখের খোয়ালি......
হ'লিনাক' সচেতন !
কাহারে খুঁজিয়া বেড়ালি আঁধারে হিমে-ভিজা মাঠেমাঠে,
আলেয়ার আলো কে সে দেখা দিয়ে নিবে গেছে দূর বাটে ?
কোন্ কুহকিনী মায়া
জাগর-নয়নে স্বপন বুনেছে
নিদালীর আব্‌ছায়া ?
না-জানি কাহার লাগি'
আশা-পথ চাহি' কাটাইলি কত
ঘুম-হারা রাতি জাগি' !
সে যে আসিল না এলো চুলে তার স্নিগ্ধ সুরভি বহি' !
স্বপন-ভুলালী স্বপনের মাঝে অ-ধরা সে গেল রহি !
মরীচিকা ছায়া-প্রিয়া
নিঝুম দুপুরে ঘুঙুর বাজায়ে
উথলিল শুধু হিয়া !

আকাশের সীমা-শেষে
অস্ত রবির আবীর জ্যোতির
ঢেউ লাগে যবে এসে,
অথবা মেঘের পালকের 'পরে চাঁদের আলোক ঝরে,
স্বপন-বুলানো হাওয়া বয় যবে নিদ্রিত নদী-চরে'
তুই অপলক আঁখি
শুধু চেয়ে চেয়ে কোন্ কামনার
আনমনা মেলি আঁখি' ?

কী ভাসে মানস-পটে
যবে দূর গামী তুলে পুষ্কর
শাঙন-গগন-তটে ?
বুকের বাসনা পাখা মেলি উড়ে উধাও বকের মত ;
কোন্ অলকার অন্তঃপুরিকা বিরহিনী ব্যথা হত
ডাকিল সে ইসারায় ?
কাহার লাগিয়া হারাইলি দিন
বিফল সে দুরাশায় ?

কাহারে খুঁজিয়া ওরে,
বাউলের মতো বেড়ালি বিফলে
কী যেন নেশার ঘোরে ?
শরতের ঝরা শেফালি কি তার সুরভিত নিঃশ্বাসে ?
সে কি কেঁদে যায় পউষ নিশায় শিশিরের ভিজা-ঘাসে।
সাঁঝের আকাশে কিরে,
স্খলিত তাহার রঙীন দুকুল
দুলে তিমিরের তীরে ?

তাহার নয়ন-দিঠি
মৌন মেদুর মায়া-নীলিমায়
তোরে কি লিখেছে চিঠি ?
ফুল ফোটে কি রে চুমু-খাওয়া তার অধরের কুঙ্কুমে ?
সে কি রে স্বপন ফেরি কোরে ফিরে আধো-জাগা আধো-ঘুমে ?
না-জানি কী যাদুকরী......
মোহন মায়ার আলো-ছায়া দিয়ে
রেখেছে মুগ্ধ করি' !

ঝরা-পালকের মত
কালের পাখার ঝরিছে পালক—
—দিন গুলি অনাহত !
আজি পশ্চিমে চলিয়াছে রবি উঠেছিল যাহা পূবে,
কাজের বেলা সে বাজে গেছে যবে অকাজেতে রলি ডুবে।
তবু ওরে মোর মন,
নেশার খেয়াল কাটিল না তোর......?
হলিমাক' সচেতন !

——:•:——

চালিয়াৎ

—শ্রীসুমিত্রা রায়

নিজের নিরালা ঘরটিতে বসিয়া মাধবী স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

বৈশাখের বেলা—আটটা বাজিয়া গিয়াছে। দম্‌কা হাওয়ার মতই ছুটিয়া আসিয়া মণ্টু বলিল,—তোমার চিঠি আছে ছোড়দি, নাও—

মাধবী সরোষে ঝঙ্কার দিল—

আস্তে আস্‌তে পারিস্‌নে হতভাগা ছেলে, যেন পৃথিবী জয় করে আস্‌চেন!

—বল্লেই হলো কিনা, জানো আমার কতো কাজ,—এক্ষুণি ছোট পিসীমার সঙ্গে ভবানীপুর যেতে হ'বে, তারপর—

যা' এখন ভাগ,—আর সর্দ্দারি করতে হবেনা, ভারি তো কাজ ওর।

এলো খোঁপাটি খুলিয়া ক্যাম্থারাইডিনের শিশি হইতে আঁজল্‌-ভরা তেল মাথায় লইয়া মাধবী চুলের গোছা আঙ্গুল দিয়া বিস্রস্ত করিতেছিল।

মণ্টু চিঠিখানি ছোড়দির কোলের উপর ছুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাধবী অনুমানে বুঝিল কমলা লিখিয়াছে। ইচ্ছা হইল এখুনি খুলিয়া পড়ে। কিন্তু তেলে নোংরা হইবে বলিয়া তখনকার মত টেবিলের উপরই চাপা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দেখিল টেবিলের উপরে চিঠি নাই। অনেক খুঁজিয়া এবং সবাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান হইল না। মাধবী যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইল।

মনে মনে ভাবিল—এ মণ্টুরই কাজ, আসুক আগে দস্যু ছেলে, দেখে নেবো ওকে।

মোটের উপর বহুকাজের লোকটি তখন ভবানীপুরে পিসীমার সঙ্গে চলিয়া গিয়েছে—তখনকার মত দেখিয়া লইবার কোন উপায়ই রাখিয়া যায় নাই।

সারাটি দিন মাধবীর উৎকণ্ঠায় কাটিল।

বিকালে মণ্টু ফিরিয়া আসিতেই সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

—ভালো চাওতো চিঠি ফিরিয়ে দাও, এ তোমারই কাজ, নইলে আস্তো রাখবো না বলছি—

—তুমি বললেই হবে কিনা,—আমি কিছু জানিনে। না হয় জিগ্‌গেস করোনা ছোট পিসীকে, আমি নিলে তো!—

মণ্টু সুবোধ ছেলে নয়,—ছোট পিসীমাকে সাক্ষী করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া লইল।

সাক্ষীটিও সায় দিলেন—ও নেয়নি মাধবী, নইলে আমায় বলতো বৈ কি!

মাধবী নিস্ফল আক্রোশেই নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

অগত্যা কি ভাবিয়া একখানা পোষ্ট্‌কার্ড লইয়া লিখিতে বসিল—কমলি, তোর চিঠি পেলাম। সবটা না পড়তেই উত্তর দিচ্ছি। কারণ তুই যা দলিল লিখেছিস, তা পড়তে গেলে এখন পূরো একটি ঘণ্টা লাগবে। পরে চারটি পয়সা খরচ করে খামে বিস্তারিত জবাব দেবো। আর কাল যদি দেখা হয় তবে তো নিজের মুখেই সব শুনবি।

আমরা কাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাচ্ছি—আমি,

ছোট পিসীমা, হিরণদা, আরো দু'একজন হয়তো। তুই নিশ্চয়ই যাবি, বেশ মজা হবে তা'হলে—অনু ও মালতীকে সঙ্গে নেয়ে আসিস। তোর ছোড়দাকে বললেই হবে। যদি রাজী না হয় তবে আমার কথা না হয় জানাস্—তাতেও যদি সুবিধে না হয় তবে এ চিঠিটা দেখাবি। যেমন করেই হোক আসা চাইই কিন্তু। অনেক কথা আছে—বুঝ্লি ?

ইতি, তোরই মাধবী।

পুঃ।—ছাখ্ মণ্টুটা এমন দুষ্টু হয়েছে যে ওকে নিয়ে আর পারা যায় না। ছোট পিসীমাই আরো ওকে মাথায় তুলেছে। কাল ওর গুণের কথা শুনিস্ সব।

মাধবী তখনই চিঠিটা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বসন্ত বাড়ীর ছোট একটি চাকর। ছুটিবেলা চা তৈরী ও পরিবেষণ করা তার কাজ। চিঠি লইয়া যাইতেই গেটের সম্মুখে মণ্টুর সঙ্গে দেখা।

মণ্টু জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাস্রে বসন্ত ?

—ছোটদিদিমণির চিঠি ডাকে দিতে—

—কই দেখি—

মণ্টু কাছে গিয়া চিঠিটা হাতে তুলিয়া লইল,—কোন মতে সবটা পড়িলও।

বলিল—তুই একটু দাঁড়া বসন্ত, বড়দি'র কাছে লিখেছে কিনা—একটা ভালো ফুটবল কিনে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমিও একটু লিখে দেবো,—বুঝলি ?

মণ্টু ছুটিয়া বাবার অফিস ঘরে গিয়া ঢুকিল—তিনি তখন ঘরে ছিলেন না।

তারপর কলমে কালি লইয়া মাধবী যে সব জায়গায় 'কাল' লিখিয়াছিল মণ্টু তাহা ভালো করিয়া কাটিয়া খুব পরিষ্কার ও সুন্দর করিয়া লিখিয়া দিল 'পণ্ড'।

ফিরিয়া গিয়া বসন্তের কাছে বলিল—খবরদার, ছোড়দির কাছে একথা বলিসনে যেন। নইলে বড়দিকে ও আবার মানা করে লিখে দেবে—বুঝলি ? মনে থাকে যেন।

বসন্ত চিঠি হাতে লইয়া বলিল—আচ্ছা।—

মণ্টু মুহূর্ত্তে অন্যদিকে উধাও হইয়া গেল—মনে মনে বলিল—দেখাচ্ছি ছোড়দির মজাটা,—সুরমাদির কাছে আমার গুণের কথা বলা বার কচ্ছি।

সন্ধ্যার পর ছোট পিসীমাকে মাধবী বলিল—দেখো, ছোট পিসী, কাল মণ্টুকে নিয়ে যেতে পারবে না কিন্তু। যা দুষ্টু হয়েছে। কমলা কাল ওর ছোট বোনদের নিয়ে যাবে—ও তাদের জ্বালাতন করে মারবে। ও গেলে আমি কক্ষণো যাবো না বলে দিচ্ছি।

মণ্টু খুব কাছেই বসিয়াছিল—গম্ভীর ভাবেই বলিল—তুমি বললেই হবে কিনা—না হয় তুমি নাই গেলে, ভারি তো বয়ে যাবে আমাদের। হিরণদাকে আমি কখন থেকে বলে রেখেছি।

—সেই তো তোকে বাড়িয়ে তুলেছে—রাতদিন যত সব দুষ্টুবুদ্ধি—তোর মূলে তো ঐ হিরণদা—বুড়ো ছেলে—এখনো সখ যায় না।

—হ্যাঁ, এখন লাগো হিরণদার সঙ্গে,—ও আগে শুনুক—কেমন যাওয়া হয় দেখা যাবে।

ছোট পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—মণ্টু, দিদির সঙ্গে অমন করে লাগতে নেই। এখন কি আর ছেলেমানুষি করতে আছে ?—কত বড় হয়েছো।

—আমি বুঝি আগে লাগতে যাই—ও, আমার সঙ্গে আসে কেন ?—লাগ্বোই তো। চিঠি হারিয়েছে, বেশ হয়েছে। ওর বইগুলোও একদিন সব লুকিয়ে রাখ্বো। ভারি না একটা হ্যাংলা মেয়ে, মা কিছু বলেন না দেখে—

মাধবী এবার রূঢ়স্বরেই বলিল—ঐ শোনো, ছোট পিসী, আমি না বলেছি তখন, ঐ হতভাগাই চিঠি নিয়েছে। দে' শিগ্গীর আমার চিঠি, নইলে বাবাকে বলে আজ মজাটা দেখাবো' খন।

ছোট পিসীমা এবার গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি চিঠি নিয়েছো মণ্টু ?

—ও আমায় ওসব কথা বল্‌বে কেন ? আমি তো ভাল ভাবেই চিঠি দিতে গিয়েছিলাম। ও আমায় বল্‌লে কি শুনবে ?—বল্লে, হতভাগা ছেলে, ভাগ্‌—। লুকিয়েছি, বেশ করেছি, কর্ব্বোই তো।—দেখো ছোট পিসী, সেদিন আমার বইয়ের আলমারীতে, বাবার কাছে পয়সা চেয়ে নিয়ে 'চকোলেট' এনে রেখেছিলাম—ঐ রাক্ষুসী মেয়েটা গিয়ে সব খেয়ে ফেলেছে। আমি নিজে দেখেছি—ও বলে, আমি নাকি ওর কলম নিয়েছি। সব মিছে কথা জান্‌লে ?

—লক্ষিটি, চিঠিটা এখন দিয়ে দাও।

—নিক্‌না গিয়ে,—ওর ঘরেই ছোটকাকার ফটোর আড়ালেই তো রয়েছে।

যেন কত বড় হারানিধি—মাধবীর মুখে হাসিও ফুটিল। কিন্তু ছোট ভাইয়ের সুমুখে দুর্ব্বলতাও দেখাইতে পারে না, শাসাইল—বাবা, ফিরে আসুন আগে, দেখাবো তোমায় মজাটা।—লক্ষীছাড়া ছেলে কোথাকার।

মাধবী চিঠি খুলিল।

একবার চোখ বুলাইয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিল,—ওমা, সেকি, এত কম্‌লির চিঠি নয়—এযে সুরমা লিখেছে। ধাঃ, কেন কমলাকে ওসব কথা লিখতে গেলাম। যাক্‌ ভারি মজা হবে কাল। ও তো হেসেই খুন হবে।

মাধবী নিজের মনেই হাসিয়া উঠিল।

সুরমা অনেক কথাই লিখিয়াছে।

মাধবী পড়িতে বসিল।

ভাই মাধু—অনেকদিন তোকে চিঠি লিখিনি—নানা হাঙ্গামায় আর ঘটে ওঠে না। তুইও তো ভাই লিখতে পারতিস।

এই তো সেদিন ছাড়াছাড়ি, এর ভেতরেই সব ভুলে গেছিস ? তারপর তো দিন পড়েই আছে, তখন যদি মনে না রাখিস তবু একটা সান্ত্বনা হবে। নতুন মোহে তখন তো সময়ই পাবি না—কি বলিস ?

তোকে আজ একটা মজার কথা বল্‌বো। আমার এক খুড়তুতো দেওরের সঙ্গে কমলার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। যদি হয়—হয়তো খুব সম্ভব হবেই,—এই আস্‌চে আষাঢ় শ্রাবণেই—

কম্‌লি তো আমায় একবারেই ভুলে গেছে। আমি কিন্তু ওর সম্বন্ধে মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছি। ওকে দেখা হলে বলিস। নির্ম্মল ঠাকুরপো নিজে থেকেই আমায় জিগে্‌গেস করেছিলেন। হ'লে কিন্তু বেশ মজা হবে ভাই। আর তুইও যদি আসতে পারিস্‌—আমার আরো একটি ঠাকুরপোও আছে, বুঝলি ? বেশ মানাবে। যদি মর্জ্জি হয় জানাস্‌—ফটো পাঠাবো, না হয় সশরীরেই—

সু-বাবু এখানে নেই—একটু বিশ্রি লাগে বৈকি ! তার কথা পরে জানাবো—আর জানাবোই বা কি ? পরের মুখে কি আর ঝাল খাওয়া চলে কখনো—গেলে জ্বালাটাই করে বেশি।

তোকে আরো একটা নতুন খবর দিচ্ছি—খবরদার কাউকে বলিস্‌ নে যেন, আমার দিব্যি। আমার কোলে একটি খোকা-অতিথি আস্‌ছে—বুঝ্‌লি ?

কেমন আছিস্‌ ? রীতিমত কলেজে যাস্‌ তো ? চালিয়াৎ ছেলেটির খবর কি ? আমার কথা কিছু বলে ? সব জানাবি—ইতি তোর সুরমা।

সেই রাত্রেই মাধবী কলম ও প্যাড লইয়া বসিল।—লিখিল—সুরু, তোর চিঠি পেলাম। আজই কমলাকে একটু আগে চিঠি দিয়েছি। কাল দেখাও হবে,—হলে সব বলবো। ভারি মজা লাগছে ভাই শুনে।

তোর 'সু-বাবু' তো নেই—কোথায় গেছেন ? লঙ্কায় নাকি ? তিনিই যখন নেই তখন আর হাঙ্গামা কিসের ? না, রাতদিন কাঁদিস্‌, সময় পাস্‌নে।

তোর খোকা-অতিথির কথা শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। সন্দেশ খাওয়াতে হবে কিন্তু। হাসি পাচ্ছে ভাই যে তুই সেদিনকার একরত্তি মেয়ে আবার মা ও হবি। ভাবতে গেলে ভারি বিশ্রি লাগে। সত্যি, পুরুষগুলো বেশ আছে—ওসব বালাই নেই।

কম্‌লির সঙ্গে তোর ঠাকুরপোর বিয়ে হয়ে গেলে, তোর তো মজাই হবে—কিন্তু আমি ব্যাচারীই একা পড়বো। কমলির কাছে কাল মিষ্টি মুখ না করে নিয়ে ছাড়ছিনে।

তোর সে ঠাকুরপোকে আমার কথা জানাস্—বলিস, এ জন্ম যেন শুধু তপস্যাই করেন,—তারপর দেখা যাবে। সবাই কম্‌লি কিনা—বুঝলি তো ?

তোর চালিয়াৎ ছেলেটা এখানেই আছে—দু'একদিনের ভেতরে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াতে যাবে। একা একা ভারি বিশ্রি লাগবে ভাই—তাড়াতাড়ি এলেই ভালো—যা মস্ত ছুটি।

লোকটা যা দুষ্টু—মাঝে মাঝেই বলে—সুরমা বাবুর খবর কি ?—তাকে লিখে দিও, তার দেওয়া গোলাপটি আজও আমার কাছে যত্নেই আছে,—দেখেছিস্ কি অসভ্য—আরো বলে যে—আজই না হয় শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন তো গোলাপীই ছিলো। পরে জানাবো সব।—ইতি তোর মাধবী।

পরদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে কমলার সঙ্গে দেখা হইল না।

হিরণদা কৃত্রিম রোষ করিয়া বলিল—মিছিমিছিই এতটা কষ্ট করলাম মাধবী,—তা' তোমার আর কি বল্‌বো। এমনই বন্ধু যে বন্ধুর অনুরোধটাও রাখতে পারে না—যা-ও।

সন্ধ্যার অনেক আগেই মাধবীরা ফিরিয়া আসিল। মাধবীর খুবই অভিমান হইল কমলার উপর। কত কল্পনাই ঠিক করিয়াছিল, সব মাটি হইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল কাছে পাইলে কমলাকে খুব শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দেয়।

দুইদিন পর কমলার চিঠি আসিল।

সে অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছে,—ছাখ্ মাধবী, তুই যে আমাদের এমন করে অপ্রস্তুত কর্ব্বি সে কথা একটুও ভাবিনি। কত কষ্ট করেই না তোর কথা মত গেলাম কিন্তু কিছুই হ'ল না—শুধু রোদ ভোগই করলাম। ছোড়দা তো তোর উপর বড্ড চটে গেছে। দেখা হলে সে নাকি শক্ত দু'কথা শুনিয়ে দেবে। আর আমিও এর শোধ নিতে তোদের বাড়ী একদিন যাবো ; দেখে নিস্ তখন। তোর একটা কথাও আর কোনদিন শুনছি না সেটা মনে রাখিস্।

ইতি—তোর কম্‌লি।

অবশেষে মন্টুই সব কথা প্রকাশ করিয়া দিল।

হিরণ মাধবীকে খেপাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। ছোট পিসীমাও হাসিয়া আকুল হইলেন।

ব্যর্থ রোষে মাধবী মনে মনে মন্টুর শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। ঠিক করিল সেও একদিন এর প্রতিফল দিবে।

দিন তিনেক পরে কমলার সঙ্গে দেখা হইল। মাধবী তার গুণধর ভাইয়ের কীর্ত্তির কথা একে একে সমস্তই বলিল।

কমলা শুনিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না—মুখে শুধু বলিল—বাপ্‌রে বাপ্ কি ডান্‌পিটে ছেলে।

তারপর সুরু হইল সুরমার কথা। কমলার মুখ লজ্জায় রাঙা হইল। কিন্তু মাধবী তাহাকে সহজে ছাড়িল না। নানারূপে বিব্রত করিয়া সন্দেশের টাকা আদায় করিবার প্রতিশ্রুতি লইল।

পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিদায়ের সময় ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—তা' যাক্ ভাই, তোরা তো সবাই একে একে চল্‌লি, আমাকেই দেখছি এখন একা একা কলেজ করতে হবে।

কমলা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—সে জন্য আক্ষেপ করতে হবে না গো, এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না।

তিন মাস পরে।

শ্রাবণের একটা শুভদিনে কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। বহুদিন পরে সুরমার সঙ্গে দেখা হইবে ভাবিয়া মাধবীর আনন্দই হইল সব চেয়ে বেশী।

সেদিন মাধবী চিঠি পাইল কমলার।

সে লিখিয়াছে—ভাই মাধু, কমলা নামে যে মেয়েটা আমাদের সঙ্গে পড়তো, আস্‌চে সোমবার তার বিয়ে। তোর আসা চাইই। 'হি-বাবু'কেও বলিস্, তাকেও আসতে হ'বে।—সেই মেয়েটার অনুরোধ,—তিনি যেন নিশ্চয়ই আসেন। কমলা ব'লে কি জানিস্—বলে, সত্যি, ভাই ঠিক আনন্দ নয়, কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা—বুকটা যেন থেকে থেকে দুরু দুরু করে উঠচে।—হি-বাবু'কে বলতে ভুলিস্ নে যেন—ইতি তোর কম্‌লি।

'হি-বাবু মানে হিরণ্ময় রায়। সুরমার 'চালিয়াৎ ছেলে' কমলার 'হি-বাবু' আর মাধবীর হিরণদা।

মাধবীর পিতৃ-বন্ধুর ছেলে। পিতৃবিয়োগের পর তাহাদের আশ্রয়েই মানুষ হইয়া আসিয়াছে। সেও বহুদিনকার কথা।

মাধবী হঠাৎ আসিয়া বলিল—কমলার বিয়ে হিরণদা, এই আস্‌চে সোমবার। তোমায় যেতে হবে কিন্তু।

মণ্টু বলিল—ছোট পিসীমা তো যাবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো ছোড়দি।

—যাস্, দেখি কে তোকে নেয়।

—আচ্ছা, দেখ্‌বো—গাড়ী থেকে আমায় নামাতে পারলে তো!

হিরণ বলিল—আমার সময় হবে না—'ইনষ্টিটিউটে' আমাদের সেদিন 'সোসাল' আছে।

—সে হবে না, তোমায় যেতেই হবে—কমলি বার বার করে লিখেছে।

—বেশ, যাবো—নেমন্তন্ন যখন সহজে ছাড়তে নেই—কি বলিস মণ্টু।

হিরণ্ময়ের চেহারার ভিতরে প্রতিভা ছিল। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে সেইটাই ছিল তাহার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ।

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করিয়া দিত।

—আজ তোমাদের কলেজ নেই মাধবী?

—আছে, যাবো না।

—মেয়েগুলো এমন হোপ্‌লেস্—ওদের কিচ্ছু হ'বে না, কক্ষণো না।

ছোট পিসীমা বলিলেন—চাকরী করতে হবে না তাই।

—কলেজে সবে ঢুকেছে কি না, তাও তো সেকেণ্ড ইয়ার, কিই বা এমন পড়া!

—হ্যাঁ, নিজেও তো ভারি সাধু, উনি যা পড়েন—

—ভুলে যেয়ো না মাধবী, আমি তোমাদের মত কলেজে পড়ি না, ইউনিভারসিটিতে—বুঝলে? যার যা শোভা পায়,—তাও তো বি, এ তে ইকনমিকস্ অনার্স ছিলো—

—আচ্ছা, আর বলতে হবে না থাক্—ভারি তো বিদ্যে, সব জানা আছে।

মণ্টু বলিল—আমি কি শুধু শুধুই ছোড়দিকে বলি—মেয়েটা অম্নিই—বল্লাম—কক্ষনো ও পাশ দিতে পার্ব্বে না।

ছোট পিসীমা নীরবেই হাসিলেন।

সেদিন সকাল বেলা।

মাধবী নিজের ঘরে বসিয়া 'লজিকের' পাতা উল্টাইতেছিল।

হিরণ হাতে একখানা চিঠি লইয়া আসিয়া বলিল—মাধবী, একটা মজার কথা আছে। আমি-পিসীমাই

বিয়ে করছি জানো? দেশ থেকে মামা চিঠি দিয়েছেন্। অনেক টাকা দেবে। আমার বিলেত যাওয়াটা নিতান্তই হ'লো দেখ্‌চি। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম্, এ, ডিগ্রি পাওয়ার চাইতে অক্সফোর্ডের 'ব্যাচেলর' পাওয়ার ঢের, ঢের নাম।

—কই, দেখি তোমার চিঠি!

হিরণ্ময়ের হাতের চিঠিখানা লইয়া মাধবী পড়িল।

কথাটা মিথ্যা একটুও নয়, মামা সত্যিই লিখিয়াছে, এখন হিরণ্ময়ের মত হইলেই হয়।

মাধবী হটাৎ বলিল—এখন তুমি যাও হিরণদা, আমার অনেক পড়া আছে।

—হ্যাঁ, ভারিতো পড়া!

একটা গানের সুর গুন্ গুন্ করিতে করিতে হিরণ্ময় চলিয়া গেল।

বিনয়বাবু মাধবীর বাবা।

বলিলেন—এ বিয়ে তুমি সত্যিই করতে চাও হিরণ?

নীরবে ঘাড় নাড়িয়া হিরণ জানাইল—হ্যাঁ।

—বেশ, তা'হলে মামাকে জানাও, আমিও লিখে দিচ্ছি।

কিছুদিনের ভেতরেই সমস্ত সুস্থির হইয়া গেল।

হিরণ বিবাহ করিয়াই বিলাতে যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তারও আয়োজন চলিতে লাগিল।

সেদিনটির বেশী বাকী ছিল না।

একদিন মাধবী জিজ্ঞাসা করিল—

—তোমার বুঝি খুব ফূর্ত্তী মনে হচ্ছে, না হিরণদা?

—হ্যাঁ, হচ্ছে বই কি একটু,—কিন্তু ভয়ও করচে, যদি বিধবা হই—বউটি যদি মরে যায়,—অতগুলো টাকা শ্বশুরের বেহাত্ই নষ্ট হবে তা'হলে।

—সত্যি সত্যিই কি তুমি বিলেত যাবে।

—তা' না হলে এ বিয়েই বা কিসের? ঐ তো আশা, নইলে কি হবে এদেশে থেকে—কি লাভ?—Life would not be worth living without ambition—সে কথা তোমরা বুঝবে না।

বিবাহে মাধবীরা সকলেই গিয়াছিল। তারপরই ফিরিয়া আসিয়া হিরণ্ময় একদিন সাহেব সাজিয়া আউট্রাম ঘাট হইতে জাহাজে উঠিল। অন্ততঃ বৎসর দুই তাহাকে বিলেতে থাকিতেই হইবে।

সেই দিনই রাত জাগিয়া মাধবী, কমলা ও সুরমাকে চিঠি দিল।

কমলাকে লিখিল—আজ আরও একটা মজার খবর তোমায় দিচ্ছি। তোমার 'হি-বাবুর' বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের টাকায় তিনি এখন বিলেতে চল্লেন। আমরা বিয়েতে গিয়েছিলাম। ওর মামাই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দেখতেও তেমন ভাল নয় বরং কালো।

তুই একদিন বল্‌ছিলি—'হি-বাবু' ছেলেটি বেশ।—সত্যিই ভাই, বেশ। আমি যেন অগ্নি বেশই হতে পারি,—তা' যাক্ সে কথা।

কেমন লাগছে তোর ওখানে? নির্ম্মল বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয় না তো? সব খবর দিস্।

বড্ড একা একা ঠেক্‌চে। কলেজ করতে একটুও ভালো লাগে না। মন্টুটাও আজকাল এমন শান্ত শিষ্ট হয়েছে যে আমার সঙ্গে একটুও লাগতে আসে না। ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারলেও দিনগুলো একরকম হৈ চৈ করে কাটতো। ছোট পিসীমা, শ্বশুরবাড়ী চলে গেছেন। আর কি লিখবো—আজ আসি।—ইতি তোর মাধু।

তারপর সুরমাকে লিখিল—

ভাই সুরু, কমলির চিঠিতেই সব খবর পাবি। তোর

সেই চালিয়াৎ ছেলেটি যাবার দিনে তোর দেওয়া সেই গোলাপ ফুলটাকে এতদিনে ফেলে দিয়ে গেছে। বলেছে শুধু,—শুকিয়ে একেবারে কালো হয়ে গেছে—আর রাখা চলে না। আমায় বলেছে—এ খবরটা তোমার বন্ধুকে জানিও।

তোর খোকার খবর কি? এলে জানাস্, ভুলিস নে যেন। ইতি তোর মাধু।

মন্টু আসিয়া মাঝে মাঝেই বলিত—ছোড়দি, সিনেমায় চলো না ভাই?

—কে নিয়ে যাবে?

—সত্যি, হিরণদাটা গিয়ে ভারি বিশ্রি হয়েছে। আর আমি নিজেও তো নিয়ে যেতে পারি। এখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি—স্কুলেও সবাই সিনিয়র ষ্টুডেন্ট বলে জানে—হেডমাষ্টার নিজে ইংরেজী পড়াতে আসেন—জানিস্। কিন্তু মা বাবা যে কি রকম—তবু শোনেন না,—বলেন—না, বড্ড ছেলে মানুষ।

দিন কয়েকপরে মাধবী দুই বন্ধুরই চিঠি পাইল। ওরা লিখিয়াছে—তোর চিঠি পেয়ে খুব কষ্ট পেলাম। ও যে কি রকম মানুষ বোঝাই দায়। অনেকদিনই ভেবেছি তোকে জানাবো। পাছে তুই কষ্ট পাস তাইতে আর হয় নি। ঐ চালিয়াৎ ছেলেটির ছাপ আমাদের মনেও কম ছায়া ছড়ায় নি। কতদিন তোরই সামনে অকারণে নিশ্বাসও বেরিয়ে গেছে—হয়তো তুই লক্ষ্য করিস নি তখন।

কিন্তু তোর কথা ভিন্ন। এমন যে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্য কথাটাও কি সে কোনদিন বুঝতে পারে নি—হ্যাঁরে মাধু, লোকটা চালিয়াৎই বটে। কিন্তু নিজে তুই ভুলতে চেষ্টা করিস। একদিন পারবি সে আশা রাখি। মনে করিস আমাদের তিনজনের জীবনেই হঠাৎ সে ধূমকেতুর মতো একদিন এসেছিল, আবার হঠাৎই সরে গেছে। আজ তাই নিজেদের কথাও তোকে না জানিয়ে পারলাম না। মনে কিছু করিস্‌নে ভাই। খোকাকে কোলে পেয়ে অনেক নতুন জিনিষ বুঝতে পেরেছি—তুইও একদিন বুঝতে পার্বি, সেই প্রার্থনাই আজ শুধু করি। ইতি—তোরই, কমলি ও সুরমা।

তারপর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এর ভেতরে মাত্র দুইখানি চিঠি মাধবী হিরণের কাছ থেকে পাইয়াছে। তাও খুব সংক্ষিপ্ত। একদিকে ছবি, আর একদিকে ইংরাজীতে লেখা কয়েকটা লাইন।

মাধবী কোনটারই জবাব দেয় নাই।

একদিন হিরণ্ময় কৌতুক করিয়া মাধবীকে একটা কথা বলিয়াছিল—পরে সেটাই কিন্তু সত্য হইল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিনয়বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন—একটা দুঃসংবাদ—হিরণের বউটি আজ দুদিন হ'ল মারা গেছে।

সকলেই আক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু মাধবী শুনিয়া গোপনে অনেকক্ষণ কাঁদিলও।

হিরণের কাছেও সংবাদ গিয়াছিল।

মাসের পর মাস কাটিয়া আরো এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ডিগ্রীই হিরণ্ময় পাইয়াছিল।

তাহার ইচ্ছা ছিল—সমস্ত ইউরোপটা ঘুরিয়া তারপর দেশে ফিরিবে।

কিন্তু একদিন চিঠি আসিল অন্যরূপ।

বিনয়বাবু লিখিলেন—হিরণ, আসচে বৈশাখের ভেতরেই তুমি ফিরে আসবে। জ্যৈষ্ঠমাসে মাধবীর বিয়ে, খুব ভালো একটি ছেলে পাওয়া গেছে—প্রফেসর। তুমি শিগ্‌গীর রওনা হয়ে আস্‌বে। না এলে খুব কষ্ট হবে।

ইতি—

হিরণ সেই সপ্তাহেই স্বদেশে যাত্রা করিল।

বৈশাখের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

মাধবী নিজের ঘরে বসিয়া একখানা বিদেশী নভেল পড়িতেছিল।

হিরণ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে আজ দুই দিন। এর ভেতরে তেমন সময় হয় নি,—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা শোনা করিতেই কাটিয়া গিয়াছে।

হিরণ ধীরেই মাধবীর ঘরে ঢুকিল।

মাধবী সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এসো হিরণদা, বসো,—তুমি কিন্তু বেশ ফর্সা হয়ে এসেছো এই দু'বছরে। বিলাতের গল্প কিন্তু শোনাতে হবে তোমায়—নইলে ছাড়চিনে—বুঝলে?

—সে পরে হবে মাধবী। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমার একটা কথা আছে—সত্যিই তুমি বিয়ে করছো? নিজে থেকেই কি?

মাধবীর মুখখানি একটু রাঙা হইল। কিন্তু তারপরই হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—হ্যাঁ, হিরণদা, করছি, জানোতো—

Life would not be worth living without love.

—হ্যাঁ, মাধবী, আজ সেটা মানি।

—কিন্তু হিরণদা, আরও অনেক আগেই সেটা মানা উচিৎ ছিল, কি বলো?

—কি আর বলবো—ইকনমকিসের বই ও কথাটা লেখা ছিল না—থাকলে তখনই মানতাম হয়তো।

সেই দিন মাধবী তার দুই বন্ধুকে চিঠি দিল,—তোদের একটা নতুন খবর দিচ্ছি, খুব শিগ্গীর আমার বিয়ে—ঠিক সময়েই নেমন্তন্ন চিঠি পাবি। আফশোষ করিস নে যেন। মজার কথা এই—যে তোদের হি-বাবু ও চালিয়াৎ ছেলেটা নেমন্তন্নের লোভে একমাস আগে থেকেই এসে বসে রয়েছে। —নতুন খবর আর কিছু নেই—এই হয়তো শেষ। ইতি তোদের মাধবী।

—:•:—

সোণার কাঠি রূপোর কাঠি

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাগরের নীচে পাতালপুরী।

আগে ছিল রাজকন্যার বাপ মায়ের। তাঁরা আজ প্রাণ হারিয়ে পাষাণ মূর্ত্তি হোয়ে পড়ে আছেন—ঠিক যে যেখানে ছিলেন এবং যেমনটী ছিলেন।

সাতশো রাক্ষসী আজ মহা-আনন্দে সেখানে থাকে ঘুমোয় লম্ফঝম্ফ করে। কি যে খায় হাওয়া কিম্বা আর কিছু সে কথা আমাদের 'ঠাকুমা' বোলে দেন নি।—সেখানে সপ্তশত-একতম প্রাণী বোলতে রাজকন্যা আর কারও কথা জানি না—অন্ততঃ যতদিন না রাজপুত্রের নাটকীয় প্রবেশ ঘটছে,—কাজেই আন্দাজ করাটাও সম্ভব নয়।

কিছু না হোলেও রাজকন্যা বেচারীর নিজের জন্যও তো ছুপিস্ রুটী এবং খানিকটা স্যুপ্ কিম্বা চপ্ কাট্‌লেট চাই, তাও না জুটলে নিদেন পক্ষে একমুঠো দাদখানি চালের পোলাও—

কিন্তু এটা আমাদের অনাবশ্যক এবং অর্থহীন কৌতূহল, কেন না—

গল্প জিনিষটা গল্প, ইতিহাস নয়, খবরের কাগজও নয় বাস্তব এবং সত্যের আভাষ নাই বা রইল!

রাজকন্যা থাকেন আর থাকে সাতশো রাক্ষসী।

রাক্ষসী বলতে গেলে শুধু যে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বোঝায় তা নাও হোতে পারে আর হোলেও কিছু যায় আসে না।

ইতিহাসে না লিখলেও অন্ততঃ একজন রাক্ষসী যে ছিল সেইখানে—যে স্ত্রীলোক নয়—পুরুষ এবং বাংলার আবাল-বৃদ্ধ লেখকদের মতো ষোড়শী সুন্দরী যুবতীর রূপ এবং মোহে দিশেহারাও হোতো তার প্রমাণ রয়েছেন রাজকন্যা নিজে।

নইলে বুড়ো এবং বালক—রাজকন্যার দেশের সবাই মরল, রাক্ষসীরা শুধু দয়া করল একমাত্র তাঁকেই?

সাধে কি রবীন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত সবাই স্পষ্ট লিখে গেছেন—সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্রই!

যক্ষরক্ষের দল যখন নৃত্য করতে ছোটে বাইরে, ছেকল এঁটে যায় রাজকন্যার ঘরের দোরে,—বিলিতি বর্ম্মিংহাম থেকে আমদানী করা তেরো লিভার তালাও বন্ধ করে রাখে,—শুধু তাতেই বিশ্বাস করে না—যাবার আগে রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে যেতেও ভোলে না।

সোণার কাঠিটা কিন্তু মাথার ধারেই পড়ে থাকে।

তা নইলে যে গল্প চলে না!

রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন—নির্ব্বান্ধব একলা।

তাঁকে জাগাবার জন্যে চাই—একটী রোমাণ্টিক রাজপুত্র।

তা, রাজপুত্রও এলেন।—ঠিক আশ্‌মান থেকেই যে তা নয়!

পৃথিবীর মধ্যেই হয়তো তাঁর দেশ, এবং তাঁর দেশের নামও কিছু নেই! আমরা চিরকাল থেকে শুনে আসছি তাঁর কথা—এক যে রাজা, তাঁর ছেলে রাজপুত্র, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন কোটালপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে। ওর বেশী জানতে চাওয়াটাও অনাবশ্যক, কেন না গল্পের মধ্যে তার সম্বন্ধ নেই কোথাও এক তিলও।

অতএব রাজপুত্র এসেছেন

এবং রাজকন্যারও ঘুম ভাঙ্‌ল।

তারপর সাতশো রাক্ষসীর মৃত্যু।

এবং রাজপুত্র রাজকন্যার মিলন।

গল্পসৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই এই চিরন্তন রীতি চলে আস্‌ছে।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের মারফৎ গোটা দুই কথা আরও পরিষ্কার করে আলোচনা করতে চাই।

প্রথম হচ্ছে—রূপকথার নায়িকা আমাদের রাজকন্যা, তাঁর রূপ যৌবন এবং বয়স এর কোন ঠিক ঠিকানা আছে কি না।

রাজকন্যা হোলেই তাঁকে সুন্দরী এবং রূপবতী হোতে হবে,—এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। রাজার মেয়ে কালো কুৎসিৎ হোতেই পারে না। অন্ততঃ শতকরা নিরেনব্বইটার বেলা একথা খাটে।

রূপ কথার প্রত্যেক গল্পটাই আমার এই মন্তব্যের প্রমাণ দেবে।

ইতিহাসের কেউ নেই বোলে যদি আপত্তি করেন, তাহলে বর্ত্তমান যুগের নথি পত্র থেকেও নজির দিতে পারি।

কিন্তু একটা কথা,—রূপকথার নায়িকা মাত্রই রাজকন্যা, একথাটাতে সন্দেহ করবেন না অনুগ্রহ করে।—তা রাজার মেয়েই তিনি হোন কিম্বা এক কাণা কড়িও তাঁর বাপের নাই থাকুক!

সত্যিকার রাজা ভারতবাসী যখন কেউ নেই, অথচ সনাতন যুগধর্ম্মের কল্যাণে আমাদের লুপ্ত গৌরব কাহিনীর বড়াই করতে আমরা যখন কসুর করি না, জোর গলাতেই চেঁচিয়ে বলি আমরা আর্য্য-সন্তান, আমরা প্রতাপ শিবাজী রাম দশরথের বংশ, আমাদের দেশে বন্দুক, কামান্ এরোপ্লেন সবই ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন আমাদের ধমনীতে এবং শিরায় রাজরক্ত বইছে এখনো সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যের নায়িকা, বস্তীর মেয়েই হোক অথবা ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের কন্যাই হোক—সবাই রাজকন্যা, রূপে গুণে এবং আভিজাত্যের গর্ব্বে!

শুনতে কটুহোলেও ব্যাপারটা সত্যি!

চরিত্রহীনের—কিরণময়ীকে দেখুন, সাবিত্রীকে দেখুন, সরোজিনীকে দেখুন। একটু উনিশ বিশ থাকতে পারে—কিন্তু সেটুকু বাদ দিলে—সবাই সমান। পল্লীসমাজের রমা বিধবা—কিন্তু রূপ এবং যৌবনের অঙ্ক তার শূন্য ছিল না। দত্তা বিজয়া, অরক্ষণীয়া জ্ঞানদা, শ্রীকান্তের পিয়ারী বাইজী, একাদশী বৈরাগীর মেয়ে গৌরী, দেবদাসের বাল্যসখী পার্ব্বতী, কেউ বাদ যায় না!

রাজকন্যারা আজকাল বস্তীর মাঝে, কিম্বা বেশ্যাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করবার ফলে কেহ কেহ দু একটা কুৎসিৎ রোগ অর্জ্জন করে ফেলেছেন, না হয় দারিদ্র্যের অজুহাতে সাবান এবং ফুলেল তেল মাখতে পান নি,—কিন্তু ছাই-এর আড়ালে সূর্য্যকান্ত মণির জৌলুষ মোটেই ঢাকা পড়ে না।

রূপের পরিমাপজ্ঞাপক তুলাদণ্ড আজও বার হয় নি। কালের গতিকে আদর্শেরও ইতর বিশেষ হচ্ছে। আগে যেমন 'আগুল্‌ফ লম্বিত কেশদাম'—রূপবতীর একটা পরিচয় ছিল,—আজকাল ক্রমশ:ই বিলাতী সভ্যতার ফলে এসে পড়ছে বব্ এবং ক্রপ্—পুরুষালি ঢঙের ছোটো চুল! এমনি অনেক বিষয়েই।

রঙ কালো হলেও আসে যায় না।

অন্ততঃ যৌবনের উচ্ছলতাটুকুও তো সে পেতে পারে! রূপ চিন্‌তে পারলে ওর ভেতরই খুঁজে নেওয়া যায়। যেমন প্রেমেন লিখেছেন—"কালো কুশ্রী মেয়েটা। মা তার চাকরাণী।…কিন্তু সে যে কিশোরী, তার বুকেও যে অনাদি নারীর অসীম উন্মুখ রহস্য।……তার কালো চোখে আছে যে অনন্ত রাত্রির অপরূপ স্বপ্ন, তার মুঞ্জরিত কৈশোরের গতি ভঙ্গীতে নিখিল সৃষ্টির আনন্দ-ছন্দ—

—জীবনের ফাল্গুন এল একদিন চুপে চুপে তার আগোছাল হৃদয়-বাসরে, তার কালো বুকে কৌতুকময়ী অভিসারিকার মত। তারপর চারদিকে ফুলের আগুন লাগিয়ে দিলে—হেসে, না বলে কয়ে, অকস্মাৎ।......

—কালো মেয়ে তার ভাঙা ঘরের মেঝেয়, ছিন্ন বিছানায় শুয়ে জান্‌লা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে ভাব্‌ছিল, কোন জন্মজন্মান্তর ঐ নক্ষত্র পুঞ্জের কোন নামহীন তারকায় সে তার "চির-দয়িত"কে পাবে—নিশ্চয় পাবে। যুগ যুগান্তর যদি অপেক্ষা করতে হয় তাতেও দুঃখ নেই। একদিন সে ওই বুকের ওপর মাথা রেখে বল্‌তে পারবে তুমি আমার তুমি শুধু আমার......সে দিন থাকবে না, সে-দিন সে এমন ঝির মেয়েও থাক্‌বে না।"

এই যৌবনের ছাপটুকুও নায়িকা মাত্রেরই বংশগত অধিকার।

রাজকন্যারও তাই ছিল।

রাক্ষসীর মায়ায় হয়তো বা তেষট্টি বছর ধরে সে ঐ দ্বিতীয় মানবহীন পাতালপুরীতে ঘুমিয়ে এবং জেগে দিন কাটাচ্ছিল রাজপুত্রের পথ চেয়ে,—তবু যৌবন তার পেরিয়ে যায় নি একথাটাও ঠিক।

বাংলাদেশে গৌরীদানের ফলে যেমন নায়িকাকে যৌবনের কোঠায় ফেলা যায় না বলে—বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দকে বিধবা কোরেও বছর কয়েক অপেক্ষা করিয়েছিলেন, দেবী চৌধুরাণীকে দশ বছর ডাকাতের মাঝখানে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়ে এনেছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে বর্ত্তমান যুগেও তেমনি বিধবা কোরে ঘুমন্ত যৌবনের শিয়রে সোণার কাঠি ছোঁয়াতে হয়, না হয় টাকাকড়ির অনটন কিম্বা নতুন আলোক পাওয়ার মোহ এমনি কিছু কারণ দেখিয়ে বিবাহের বয়সটা নবছর থেকে আঠার'র ওপারে গিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হয়। আঠার বছরের অবিবাহিত যুবতী অথবা বালবিধবা না পেলে, সধবা মেয়ের স্বামীকে করি বাতে পঙ্গু কিম্বা লম্পট অথবা মেয়েটাকেই করি বারাঙ্গনা!

তাহোলে, গল্প এবং রূপকথার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই বা থাকতে পারে না।—কিন্তু তবু গল্প জিনিষটা বাস্তব নয়।

গল্পের প্রত্যেক ঘটনাটী এমন হওয়া চাই যা ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না।

এইখানটাই বাস্তব এবং ইতিহাসের সঙ্গে গল্পের বিশিষ্ট।

দেবদাস বোম্বাই হাঁসপাতাল থেকে বার হোয়ে হুগলীর টিকিট কিনে সারাদিন সারারাত জ্বরে বেহুঁস হোয়ে থেকে পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী করে আরও দুদিন ঢিকোতে ঢিকোতে গিয়ে রাত্রি বারোটার সময় হাতীপোতার জমিদারবাবুর বাটীর সম্মুখে বাঁধান অশ্বত্থতলায় পৌঁছেছিল—এবং পার্ব্বতীও জীবন্ত শেষ অবস্থা না দেখতে পাক মরার পরও অন্ততঃ দেখতে পেয়েছিল,—এইখানেই গল্পের সৌন্দর্য্য।—দেবদাসের পক্ষে ঠিক জমিদার বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত এসে পৌঁছতে পারাটা তর্কের খাতিরে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি দেবদাসের জীবন নিয়ে ইতিহাস লিখতে বস্‌তেন তা হলে জানতে পারতুম—ঠিক অতটা তিনি আসেননি, হয়তো সাত আট ক্রোশ বাকী ছিল, এবং পার্ব্বতীও কোনও খবর জানতে পায় নি।

অনেক যাত্রায় এবং থিয়েটারে দেখেছি কাপালিক অথবা জল্লাদ কোনও লোককে হয়তো কাটতে যাচ্ছে—'এই কাট্‌লুম', 'ভগবানের নাম স্মরণ কর' এমনি বলে কয়ে দুপাঁচমিনিট খাঁড়াটা উঁচু করেই সময় দিয়ে বদান্যতা দেখান হোল, অমনি পেছন থেকে মা চণ্ডী কিম্বা তাঁরই প্রেরিত শিষ্য যে কেহ এসে খাঁড়াটা ধরে ফেললে—আর কাটা হল না।

চোর ডাকাতের পিস্তলের গুলি ডিটেক্‌টিভের ঠিক কাণের পাশ দিয়েই যায় মাথায় কখনো লাগে না।

অসহায় পেয়ে কোনও ললনার সতীত্বহরণের জুলুম চলছে—আটদশ জনে মিলে ঘরের ভেতর বন্ধ করে কেবল হুঙ্কার ছাড়ছে আত্মসমর্পণ কর নইলে প্রাণে মার্‌লুম—এমনি অন্ততঃ দশমিনিট ধস্তাধস্তির পর হঠাৎ বার থেকে

পুলিশ ইত্যাদি একশলোক এসে পড়ল মেয়েটাও রক্ষা পেলে—অ-হত অ-ক্ষত!

সূর্য্যমুখীর পুনরাগমনের পর কুন্দনন্দিনীর খোঁজ পড়ল যখন সে বিষ খেয়ে ফেলেছে—আর উদ্ধারের উপায় নেই। একটু আগে খবর পেলে—আবার নানান সমস্যা জাগ্‌ত তার চেয়ে—এখানে মরেও কুন্দ অমর হয়ে রইল—কবি এবং পাঠকের চোখের তারায়।

সীতাদেবী আগুণে ঝাঁপ দিয়েও বেঁচে রইলেন। আমদের Physicsএর অধ্যাপকদের এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাবে।—বিজ্ঞানের যুগে এ ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয় বিশ্বাস করি। তাই বলে এরকম অগ্নিপরীক্ষা করে যদি আজকাল শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর চেলারা শুদ্ধি চালাতে চেষ্টা করেন,—সে এক অভিনব ব্যাপার হয়ে উঠবে।

অমৃত বসুর খাসদখল,—এই ধরণের একটা সবচেয়ে খাসা গল্পের নিদর্শন। মোক্ষদা বিধবা হয়ে, প্রিয়তম ভূতপূর্ব্ব স্বামীর মুখ রক্ষা এবং মনের ইচ্ছা পালন করবার জন্যই শুধু, তাঁর মৃত্যুর পরে কবিবর মোহিতকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছেন,—তাঁর দ্বিতীয়-পতি-গ্রহণের সংবাদে তাঁর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করে রাশি রাশি পত্র এসেছে,—কত লোক যৌতুক পাঠিয়েছেন,—এমন কি সাক্ষী-সাবুদ রেখে বিবাহের মন্ত্রতন্ত্র পর্য্যন্ত পাঠ করা হেয়ে গেছে—রেজিষ্টারের আসার মাত্র অপেক্ষা—ঠিক এমনি সময় লোকেন বাবুর প্রেতাত্মা নয় তিনি, নিজে সশরীরে হাজির হলেন। কি দুর্দ্দৈব! গোটাকতদিন একটা ছাইমাখা ভণ্ড-ভিখারীর সঙ্গে লোকেন বাবুর মতো সুপণ্ডিত উকিল প্রবরের এতদিনের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দেশানুরাগ সকলই কি উৎসন্ন গিয়েছে। সমাজ সংস্কারের একজন প্রধান নেতা হয়েও, উন্নতিশীলা সুশিক্ষিতা মহিলা তাঁর ভূতপূর্ব্ব [অর্থাৎ ভূত (?) হবার পূর্ব্বেকার] স্ত্রীর বিধবা বিবাহ বন্ধ করবার জন্যই—ঠিক রেজিষ্টারীটা হবার আগেই ফিরে এলেন!—আর একদিন অথবা একটা ঘণ্টা দেরীতে আসলে তাঁর কি মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যেত'? একদিন আগে কিম্বা একদিন পরে এলে কিন্তু গল্প হোত না, ভাই।

-

মুদ্রাদোষই বলুন আর যাই বলুন, আমাদের দেশের অনেকগুলি নামজাদা লেখক যে সব বই লিখেছেন, তার মধ্যে, তাঁরা ধর্ম্ম যাজকের মত উপদেশ দিতে আসেন,—ধর্ম্ম পুণ্য এবং সত্য শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করেই পাপ এবং অধর্ম্ম প্রথম প্রথম জগতে একটু আধটু উন্নতি লাভ করলেও পরিণামে শান্তি না পেয়ে পরিত্রাণ লাভ করে না।—এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন,—চিত্তসংযম অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না এ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল!

সাহিত্যের বাহিরে মাটীর জগতের সঙ্গে আমাদেরও একটু আধটু পরিচয় আছে তার ফলে বলতে পারি—ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রিত পথে জীবনধারা চলে না কোথাও একটী দিনের জন্যও। চুরি করে শেষ জীবন পর্য্যন্ত মহা শান্তিতে কাটিয়ে গেছে, এমন লোকের দৃষ্টান্ত আমরা জানি। আবার মনে প্রাণে কখনও কারও অনিষ্ট চিন্তা পর্য্যন্ত করেন নি এমন সাধু লোক সারাজীবন ধরে একটার পর একটা কালের নিষ্ঠুর কশাঘাত সয়েছেন তারও প্রমাণ বিরল নয়। একটা খুনী মোকদ্দমার কথা জানি, আসামী বলে যে ভদ্রলোক ধরা পড়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসী কাঠে প্রাণ হারালেন, ফাঁসী হোয়ে যাবার পর জানাগেল, সে ভদ্রলোক খুনের ব্যাপারে বিন্দু বিসর্গ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না,—আর আদত যে খুন করেছে লোকে জানতে পেরেও তার বিরুদ্ধে একটা আঙুল পর্য্যন্ত তুলিতে পারে নি আদালতের শ্রবণ-যোগ্য যুক্তি সাপেক্ষ প্রমাণের অভাবে।

রাজকন্যার রূপকথার মতো যে জিনিষ যত আজগুবি ব্যাপার নিয়ে লেখা হবে—সেইটাই সব চেয়ে ভালো গল্পের আদর্শ হবে—এই খাঁটি "আজগুবি কথাটা" বলবার জন্যই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। আশা করি আপনারা সবাই আমার কথার সত্যতা প্রণিধান করবেন।

বুকের বিষ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

[ঘরের আঙ্গিনা। কাত্যায়ণী ও বিজয়া।
কাত্যায়ণী চরকায় সুতা কাটিতেছেন।
বিজয়া পাশে বসিয়া পাঁজ
বানাইতেছে।]

বিজয়া। হাঁ মা, ভোরের বেলার স্বপন সত্যি হয়, নয়?

কাত্যায়ণী। হয়, কেন, কি স্বপন দেখেছিস?

বি। তোমার কাছে বল্লে সব নষ্ট হবে না তো, বড় ভাল স্বপন মা।

কাত্যা। না মা, বল্লে কিছু হ'বে না—কি দেখেছিস্ বল্।

বি। আমি স্বপন দেখেছি তিনি এসেছেন। ঠিক যেমনটী ছিলেন তেমনি। এসে বাইরে থেকে আমায় ডাকছেন—আমি ঘুমিয়ে পড়ে রয়েছি। কিছুতেই ঘুম ভাঙছে না। তারপর ঘুম ভেঙে উঠেও মনে হ'ল তিনি বাইরে থেকে ডাক্‌ছেন। আমি ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বাইরে গেলুম। গিয়ে বুঝলুম স্বপন দেখেছি।

[মাথা নত করিল।]

কাত্যা। (বিজয়াকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলেন।)—অভাগী মা আমার! কি দুঃখ দিতেই তোকে এনেছিলুম আমি। এ সাত বছর বাছার আমার অন্ন ধ্যান নেই, ভজনা নেই, স্বপ্ন নেই। আর সে শত্রু এমন লক্ষ্মী বউয়ের পানে ফিরেও চাইলে না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস।) আহা, তা' তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বউ—তোর স্বপন যেন সত্যি হয়। সে যেন ফিরে আসে।

বি। মা, আজ না মাঘী পূর্ণিমা?

কাত্যা। হাঁ, মা, আজ মাঘী পূর্ণিমা। সাত বছর আগে এই দিনেই তোর আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে গেছে।

বি। আজ আমার সে কথা মনে হচ্ছে না মা। আমার মন বলছে আজ ঠিক তিনি আসবেন। এই মাঘী পূর্ণিমার দিনেই যে মা তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাই তারক, সে বল্লে, ঐ দেখ্ তোর বর। আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম, তিনিও দেখে একটু হাসলেন। তারপর আমি এই ছুট্। ছুটতে ছুটতে আধক্রোশ রাস্তা ডিঙিয়ে একেবারে মামার বাড়ী গিয়ে হাজির।

কাত্যা। হাঁ সে তো শুনেছি। তার পরের বৈশাখে তোর বিয়ে হ'লো—তখন তুই ডাগর মেয়ে, দশ বছর পেরিয়ে গেছে। আর তার চার বছর পর বাছা আমার বিরাগী হ'য়ে গেল, আর এল না।

বি। আজ আস্‌বেন মা—ঠিক আস্‌বেন। (কাত্যায়ণী অশ্রু বিসর্জ্জন করিল) তুমি বিশ্বাস করছো না মা, তিনি ঠিক আসবেন।

[সম্মুখের দরজা খুলিয়া গঙ্গারাম প্রবেশ করিল ও
দাওয়ায় বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।
বিজয়া ও গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।]

গঙ্গা। জ্যাঠাইমা, সে জমী ক'খানা কি করবে ঠিক করলে? সে তো আর রাখা যায় না। দেওয়ানের লোক তো আমায় রোজ তাগাদা দিচ্ছে, বলে, অবীরা বিধবার নামে সম্পত্তি লিখবে না।

কাত্যা। কেন বাবা! সে কি কথা, সাতকাল দেখছি মেয়ে মানুষের নামে সম্পত্তি রয়েছে—এ আবার কি নতুন কথা—

গজা। আমি তো সে কথা ব'লে ব'লে মুখে ব্যথা করে ফেল্লাম; দেওয়ান ব্যাটার কাছে তো দিন রাতই শাস্ত্র আওড়াচ্ছি। কিন্তু সে বেটা বলে যে সে সব আমি জানিনা, মেয়ে মানুষের কাছে খাজনা আদায় হয় না, মেয়ে ছেলের নামে আমি তালুক রাখবো না।

কাত্যা। তা ছাড়া মেয়ে মানুষের নামে তো নয় সম্পত্তি, মালিক তো এখনও আমার নবীনই,—সে নয় দেশে নাই, তাই ব'লে কি—

গজা। তা সে বেটা বুঝবে না। দেওয়ান বলে, সাত বৎসর যে লোকের খবর নেই সে নিশ্চয় মরে গেছে।

[কাত্যায়নী ও বিজয়া শিহরিয়া উঠিলেন।]

কাত্যা। ষাট্! ষাট্!

গজা। না হয়, ধরই না, সে পলাতক, দেশে নেই। খাজনার দায়ী হবে কে? কিছুতেই সে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না জ্যেঠাইমা। কি করবো বল।

কাত্যা। তা' আমি বাবা মেয়ে মানুষ, আমি কি জানি, যা' ভাল হয় তুমি বল।

গজা। ভাল যা'তে হ'বে সে তো তোমরা বুঝবে না জ্যেঠাইমা। তোমরা ভাববে বুঝি আমি জমীগুলো তোমাদের কাছে ঠকিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে জমীগুলো আমার নামে লিখিয়ে নেওয়া।

কাত্যা। ওমা, সে আবার কি কথা! বাছা আমার ফিরে এসে কি তবে পথে বসবে?

গজা। ওই তো জ্যেঠাইমা, তুমি কেবল ভুল বুঝছো, আমি কি তোমার জমী নিতে চাচ্ছি না নিচ্ছি। আমার নামে লিখিয়ে নেওয়া কেবল জমীটা রক্ষার জন্য, তা ছাড়া ও তো তোমাদেরই রইলো—আর নবীন যদি ফিরে আসে তার নামে ফের করে দেওয়া যাবে—

কাত্যা। না বাবা সে সবে আমি নেই। আমার শ্বশুরের সম্পত্তি, রক্ষে ক'রতে না পারি, যাবে, কিন্তু হাতে তুলে সেটা আমি বিলিয়ে দেব না, তা' এতে যা হয় হোক।

গজা। তবে যাক্ সম্পত্তিটুকু। পৈত্রিক বিষয়টা আমাদের, আমি রক্ষে করতে চাইলাম—তা তোমাদের রুচলো না—যাক্।

কাত্যা। যায় যাক্।

[কাত্যায়ণী চরকা লইয়া উঠিয়া গেলেন। বিজয়া বসিয়া রহিল।]

গজা। বউমা, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি তোমার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে একটু ব'লো। এ সম্পত্তি দেওয়ান তোমাদের নামে কিছুতেই রাখবে না। মাঝখান থেকে তালুকটুকু খোয়াবে।—এই সোজা কথাটা জেঠাইমা কিছুতেই বুঝছেন না। আমাকে তাঁর কেন যে এত অবিশ্বাস তা' বুঝতে পারি না।.........

তা ছাড়া, যদি বা তোমার শাশুড়ী সম্পত্তি এমনি ক'রে নষ্ট ক'রতে যান তোমার তা' দেওয়া উচিৎ নয়। বিষয় তো তাঁর নয়, তোমার। তুমি যদি দেওয়ানকে বল যে আমার নামে সম্পত্তি লিখে দিতে তোমার আপত্তি নেই, তা' হলে তোমার শাশুড়ী মাথা কুটেও কিছু ক'রতে পারবেন না। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ।

আর বিবেচনা কর আমাকে অবিশ্বাস করবার তোমাদের হেতুটা কি? তোমাদের বিষয়ের দেখাশোনা, সে তো এ সাত বৎসর আমিই করছি। কত করে-কর্মে মাথার ঘাম পায় ফেলে তবে টাকাটা ঘরে উঠেছে। এত ক'রে খেটেখুটে তোমাদের সব দেখাশুনা ক'রছি তার ফল কি এই?

আর ধর যদি আমি ঠকিয়েই নিই তোমাদের। ধর-ই না হয়। তবু তো আমি নিলাম, তোমার স্বামীর আপন খুড়তুত ভাই। একটা অপর লোক—হয় তো বা কোন

স্লেচ্ছ সম্পত্তি খাবে—তার চেয়ে এতো তবু ভাল—তোমাদের আপনার লোকে খাবে।—দেখ বউমা, ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ। ওসব বুড়ো মানুষদের কথায় কান দিও না। সেকেলে মানুষ ওরা কিই বা জানেন। আর দেখ, আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না—অবিশ্বাসের কাজ আমি ক'রেছি কিছু কোনও দিন? ভেবে দেখ। আমি যাব এখনই দেওয়ানের কাছারীতে। আমি তাকে আজকের মত ব'লে ক'য়ে রাখবো। আর বলবোই বা কি—এই ব'লেই রাখবো যে আমার নামে সম্পত্তি লেখা হ'তে তোমার কোনও আপত্তি নেই। তাতে দুদিনকার মত আটক থাকবে। তারপর, তোমার যদি সে মত নাই হয় দেওয়ানীর লোক এলে তার কাছে যা মনে হয় ব'লো। এখন যাচ্ছি, সন্ধ্যে নাগাদ্ যা' হয় একটা ভেবে ঠিক ক'রে রেখো। [প্রস্থান]

বিজয়া। কি পাপ এই বিষয়টুকু। এই নিয়ে রোজ কান ঝালাপালা হ'চ্ছে! প্রিয়তম, সর্ব্বস্ব আমার, তুমি গিয়েছ, কিন্তু আমার গলায় এ কি বোঝা ঝুলিয়ে রেখে গেলে?

কান্ত। দেখ্ ছোট বউ, খবরদার ও বুড়ো'র কথা কানে তুলবি নে। ও শয়তানের সেরা। এমনি ক'রে তোর সম্পত্তিটুকু ফাঁকি দেবে। এমনি ক'রে আমার দু'খানা জমি বের ক'রে নিয়েছে। শেষে টের পেয়ে আমি শক্ত হ'য়ে বসলাম। তাই আর নিতে পারলে না।

বি। তা আমি এসব কিছু জানিনে দিদি। মা যা' করেন তাই হ'বে।

কান্ত। সে কথা বল্লে চলবে কেন? সম্পত্তি তো এখন মায়ের নয়, এখন তুমিই তার মালিক। তুমি যা' ক'রবে তাই হ'বে। তুমি অমন ক'রে আলগা দিও না। তা' হ'লে শেষে পস্তাতে হ'বে।

বি। (স্বগত) মাগো, এদের প্রাণে কি দয়া মায়া নেই! এরা বার বার আমাকে এই কথাটাই বোঝাতে চায় যে আমি বিধবা। ভগবান, তাই কি? তাই যদি হয় তবু বেঁচে আছি আমি? আমি কি এত বড় পাপিষ্ঠা। (প্রকাশ্যে) তা' দিদি আমি একা মানুষ, বিষয় দিয়ে কি ক'রবো। যা' হয় হোক না।

কান্ত। ওমা সে কি? তুমি একা বল্লেই হ'ল। তোমার পেটের ছেলে নেই বটে, কিন্তু আমার পাঁচু—সে তো ধর তোমারই ছেলে। আমি তোমাকেই দিয়েছি সে ছেলে, তারদিকে চাইবে না একবার?—আমি বলি এক কাজ কর—বড় ঠাকুর যেমন চেপে ধ'রেছেন, ওকে সামলাতে পারবে না তুমি, তার চেয়ে তুমি না হয় দেওয়ানকে বলে ও বিষয়টুকু পাঁচুর নামে লিখে দাও। তা'হলে তোমার ও বিষয় রক্ষা হ'বে, বুড়োও জব্দ হ'বে।

বি। (স্বগত) উঃ, সেই কথা!

ক। তাই কর বুঝলে? বুড়ো যখন দেওয়ানের লোক নিয়ে আসবে, তখন তাকে ব'লো এই কথা। কেমন?

বি। আচ্ছা দেখবো।

ক। দেখবো নয়, এই ক'রো, নইলে দেখো তোমার সব যাবে।

বি। (বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা দিদি আচ্ছা।

ক। তবে এই কথা রইলো কেমন। যাই এখন পাঁচুর আবার পাঠশালা থেকে ফেরবার বেলা হ'ল।

[প্রস্থান]

বি। (উঠিয়া) জালালে—দিন রাত এরা তিন সরিকে মিলে ঐ বিষয়টুকুর জন্য আমায় জালিয়ে মারছে। ও আপদ বিদায় হয় না? আমার সর্ব্বস্ব যদি জন্মের মতই গিয়ে থাকে, তবে ওই ছাই পাঁশ ঘেঁটে আমার কি হ'বে? নাঃ, মা যাই বলুন, দেওয়ানের লোক এলে আমি আজই ও পাপ বিলিয়ে দেব।

প্রিয়তম, হৃদয়সর্ব্বস্ব, তুমি গিয়েছ আর আমার বিষয় নিয়ে কি দরকার! সব যা'ক। নিঃস্ব হ'য়ে ভিখারিণী হ'য়ে যাই, তাই তো চাই। তুমি কোথায় না জানি কত

কষ্ট পাচ্ছে—আর আমি এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে আছি— এ আর সহ্য হয় না। এরা ভাবছে আমায় ঠকিয়ে

নিচ্ছে—আমি যে আমার সব বিলিয়ে দেবার জন্যই ছটফট করছি তা'তো এরা জানে না।

(গান)

আমার সকল সুখের ভাণ্ডারী
জীবন খেয়ার কাণ্ডারী
এসো ফিরে এসো।
ভাঙা বুকে রঙিন আশা,
আজও শোনায় তোমার বাণী ;—
ফাগুন রাতের আকুল হাওয়া,
তোমার পরশ দেয় গো আনি।
আমার হৃদয় তলের শতদল
ফোটার ব্যথায় টলমল
ওগো হৃদয়-রবি জীবন-ভরা
পরশখানি নিয়ে এসো।

[ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল]

—ক্রমশঃ—

—ঃ প্রতিযোগিতা ঃ—

ছোট গল্পের জন্য

প্রথম পুরস্কার—২০৲ দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫৲

সম্পাদকের নিকট আষাঢ়ের ভেতরে পৌঁছানো চাই।

কুগ্রহ—

—শ্রীবিমল সেন

কলেজে যাওয়া আসা সবে সুরু।

অর্থাৎ ম্যাটিকুলেশনের সুদীর্ঘ গণ্ডিটা সেই বছরই পেরিয়ে স্কুলে-পড়া বদনামটা ঘুচিয়েছি।

বয়সটাও তেমন কিছু নয় কিন্তু মনে হোত অনেক বেশি, যেন হটাৎই একদিন অনেকটা এগিয়ে গেছি।

অবশ্য সাধারণতঃ যে বয়সে পাশ দেবার কথা, অতটা কমও আবার নয়,—গোঁফের রেখাও বেশ পড়েছে, এবং ভালোই চোখে পড়ে।

মোটের ওপর ভারিক্কি চালেই চলি। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ দুষ্টুমি করতুম, সম্প্রতি একেবারেই বন্ধ। বরং দৈবাৎ যদি দেখা হয়, গম্ভীর ভাবেই বলি,—কি হে, কেমন পড়া শোনা করছো তোমরা? একটু লক্ষ্য ওদিকে রেখো, নইলে যে রকম দিনকাল দেখছি......ইত্যাদি।

ফিব্বি ফিট্‌ফাট হয়ে ট্রামে চড়ে কলেজে যেতুম,—হাতে বাঁধানো মোটা খাতা, পকেটে গিল্‌টি-করা ক্লিপ লাগানো কলম। নিজের বাহাদুরী নিজের মনেই করতুম—হ্যাঁ, যে সে লোক এখন নই.........

পথে, ঘাটে, ট্রামে, কিংবা গোলদিঘীতে বেড়াতে যেতুম—গড়ের মাঠে আর নয়।......এম্নি রোজই।

যদি কারো সঙ্গে কোনদিন নতুন আলাপ হয়ে যেতো—গম্ভীর ভাবেই বলতুম—আজ্ঞে, এই ফোর্থ ইয়ার......

থাকতুম ভবানীপুরে।

এমনি সময়ে—জীবনটা যখন সব দিক্ দিয়েই সবে রঙীণ হয়ে উঠেছে, ভবানীপুরের ছোট একটা পার্কে একদিন বেড়াতে যাই।

রাস্তা দিয়ে চল্‌বার সময় একথাটি কখনোই ভুলতে পারতুম না যে আমার এখন নেহাতই একটা কদর হয়েছে—কলেজে পড়ি।

দৈবাৎ কোন পথিক যদি কোন কারণে আমার পানে চেয়েছে, অম্নিই ভেবে নিয়েছি—লোকটি আমার ভেতরে এমন একটা কিছু লক্ষ্য করেছে যা' বাস্তবিকই দেখবার মতো।

ছোট ছায়া-শীতল নিরিবিলি পার্কটি।

আশে পাশে চারিদিকে বহু ভদ্রলোকের বাড়ী,—ছোট, বড়, নানান রকম। পার্কে প্রবেশ করতে সহজেই চোখে পড়লো একটা ধারে ভ্রমণ-রতা একটী মেয়েকে। পরণে ফিরোজা রংয়ের শাড়ী। পিঠের ওপর দিয়ে নেমে-যাওয়া আঁচলের প্রান্তটি খোলা-হাওয়ায় মুক্তি-উল্লাসে ছটফট্ করছে—বেশ লোভনীয়।

কেন, ঠিক জানিনে কিন্তু তখন এম্নিই ছিলো মনের একটা দুর্ব্বলতা—হয় তো বা বয়সেরই দোষ।

জীবনটা যখন একটা নতুন খুসীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; নিজের মূল্যটাও যখন অনেকখানিই বাড়িয়ে নিয়েছি,—তখন কখনও যদি কোন কচি বয়সের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো হঠাৎ, এম্নি একটা ধারণাই মনটাকে বিহ্বল করে তুলতো—যে আমায় দেখে সে মুগ্ধ না হয়েই পারে না।—ভালো লাগতে হবেই—একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস।

সে জন্য যুক্তিও যে কিছু না ছিলো তা' নয়,—নিজের মনেই প্রশ্ন করতুম—কেন লাগবে না, শুনি? আমার লাগে আর তাদের লাগবে না?—সে হতেই পারে না।

অজ্ঞাতসারেই যেন পা' দুটো আমায় ঐদিক পানেই টেনে নিয়ে চল্‌লো—খুবই কাছে।

ভালো করে দেখলুম মেয়েটির পানে আড় চোখে চেয়ে।—হ্যাঁ সুন্দরীই বটে—অমন রূপ আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হ'ল না। বয়সটাও বেশী নয়—কতই

বা হবে।—বড় জোর এই আঠারো। সঙ্গে দেখলুম পাঁচ,ছ' বছরের একটি ফ্রক পরা বেবিও আছে।

বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে আমিও চলা সুরু করলুম। মিনিট কয়েক কেটেও গেলো,—কিন্তু আশ্চর্য্য! মেয়েটি একটিবারও আমার পানে ফিরে চাইলে না।

অগত্যা নিকটে একটা জায়গায় সবুজ কোমল ঘাসের উপর গিয়ে বসলুম। কিন্তু নির্ব্বিকার হয়েই রইলুম না;—আমার বিস্মিত প্রশংসমান দৃষ্টিটুকু বারবারই তার পানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

হটাৎ এক সময়ে চম্‌কে উঠলুম—তার বড় চোখের চাউনিটুকু আমারই ওপর কখন এসে গেছে,—চোখেও চোখ পড়লো......কেমন আপনা থেকেই।

কিন্তু ঐ টুকুই শেষ নয়, তারপর আরও একবার। বুক যেন দশহাত ফুলে উঠলো—ব্যাস্, আর ভাবনা কি? খুব জানি, এ হতে হবেই—

সাহস আরও বেড়ে চলে—আবারও চাইলুম। কিন্তু এবার যেন কেমন বিশ্রি বোধ হলো—ওর মুখে চোখে কিসের একটা বিরক্তি ভাব।

দেখলুম, মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছেই একটা তরু-লতা ঘেরা কাঠের বেদীতে গিয়ে বসলো।

ওখানটায় বসেছিলো,—কালোপানা বছর চব্বিশ পঁচিশের একটি যুবক। মাঝে মাঝে সে আমার দিকেও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হান্‌ছিলো। আমার কিন্তু তখন বুঝতে একটুও দেরী হয়নি যে, সেও আমারই মতো সৌন্দর্য্যের জনৈক নীরব উপাসক। এবং আমিও যে তার একজন জুড়ি তা' তাকে আমার পানে কয়েকবার তাকাবার পরই চোখের ইসারায় বুঝিয়ে দিতে কসুর করিনি।

মেয়েটি কিন্তু বসেই তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো সুতরাং বুঝতে দেরী হ'লনা যে লোকটি ওর পরিচিত। হয়তো সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

অতঃপর বসে থাকাটা আর সমীচীন মনে করতে পারলুম না।

পার্কের এক কোণে সবুজ রং করা একটা কাঠের আবরণের নীচে বেদীটি। প্রায় চারটা দিকই ঘন লতায় ছেয়ে গেছে—বেশ একটা কুঞ্জের মত।

মোট কথা বেশ নিরিবিলি এবং ছায়াচ্ছন্ন। তার ওপর সন্ধ্যার ধূসরতায় তখন অন্ধকার বেশ। সামনের দিক দিয়ে না গেলে বোঝবার জোই নেই যে কুঞ্জটি নির্জ্জন নয়।

উঠে বাড়ী ফিরছি, এমনিই একটা ভাব দেখিয়ে অগত্যা রওনা দিলুম। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। গেট অবধি গিয়ে তাদের চোখ এড়িয়ে পার্কের অন্য পথটা ধরলুম। তার পরে বরাবর তাদের একেবারে পেছনেই।

ব্যবধান বোধ হয় পাঁচ ছয় হাত!

খুব সন্তর্পনে বসে পড়লুম।

সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে সবে,—তাকে জব্দ কর্‌বার জন্য হেথা হোথা গ্যাসের আলোগুলো প্রাণ খুলে হাসছিলো। সেই চমকটুকু কুঞ্জের ওপরও এসে পড়েছে—লতাপাতার ফাঁকে চোখেও সব পড়ে, বেশ স্পষ্টই! একটা রহস্য জানবার জন্য কি অখণ্ড মনযোগ আমার।

এতক্ষণ যাকে নিজের জুড়ি ভেবে, যার দিকে বারে বারে চেয়ে বেশ একটু ফূর্ত্তি মনে হচ্ছিল—সেই কালো লোকটার সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখে আমার সারা অন্তর বিষিয়ে উঠলো। দেখেও মনে হ'ল,—লোকটার চোখের দৃষ্টি ভালো তো নয়ই—বরং যারপর নাই কুরুচি ভরা।

তারা দুজনে অনর্গল বকেই যাচ্ছে ওদের কথার যেন শেষ নেই। অন্ধকারও যত ঘন হয়ে আসতে

লাগল, তাদের কথার ফোয়ারা যেন ততই বেশি করে ছুটতে লাগল। প্রথমটা তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনি—হটাৎ একটা কথা শুনতে পেয়ে আমি একেবারে উৎকর্ণ হয়ে তাদের কথা গুলো যেন গিলতে লাগলুম। হটাৎ দেখি,—লোকটা একবার চারদিক দেখে নিয়ে মেয়েটির হাত ধরলে। তারপর বলতে লাগলো—চল দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়া যাক, লতা !......তোমাকে আমার পেতেই হবে,—সব সময়ের জন্যে। এম্নি করে ছেড়ে থাকা দিনকে দিনই যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চল, পালিয়ে যাই—দূরে, যেখানে হয়—

সর্ব্বনাশ ! লোকটা বলে কি ? চেয়ে দেখলুম মেয়েটি ভারি লজ্জা পেলো। আরও ভাল করে দেখলুম, তার সিঁথিতে সিন্দুর নেই ; মাথায় কাপড় তো নেই-ই ! বুঝলুম—এ ব্যাপার সুবিধের নয়।

মেয়েটি মাথা নুয়েই বল্‌ল—তা' কি করে সম্ভব হয় ?

—কেন সম্ভব হবে না ? সম্ভব করে তুলতেই হবে। সারা দিন ধরে হাজার রকমের কথা আমার বুকে জমা হয়ে থাকে—অথচ তার কিছুই তোমাকে জানাবার যখন সুযোগ পাইনা—মন যে কেমন করতে থাকে তখন তা কি তুমি বোঝোনা লতা,......আজকে না হয় এখানে এমন সুযোগ জুটে গেছে ! কিন্তু এটুকুই কি সব,......লক্ষীটি, বল তুমি যাবে আমার সঙ্গে !

মেয়েটি কিছুই বল্‌লে না।

দু'জনের মনই পরস্পরকে কাছে পাবার জন্যে, দুটো কথা কইবার জন্যে কেমন করে টানতে থাকে তা তো তুমি জানোই !......তুমি অমত কোরোনা লতা,—বেশ সব সময়েই এক সঙ্গে,—চোখের সামনে—কোন ব্যথা নেই, হাহাকার নেই—নিরিবিলি......সে কী সুখের জীবনই না হবে !

মেয়েটি, দেখলুম, বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো ;—হবারই কথা ! ওরা শিক্ষিত সভ্য সমাজের লোক,—কোথাকার বুনো হাভাতে একটা লোক এসে বলছে কিনা—চলো বেরিয়ে যাই !......একি কাণ্ড ?......মেয়েটার যে বিয়ে হয়নি, সে তো দেখেই বুঝতে পারা যায়। হয়তো কোন ক্রমে এদের সঙ্গে ছোক্‌রা আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। তার পর, এদের বাড়ীর সান্ধ্য টি-পার্টির ও একজন সভ্য হয়ে বসেছে। শেষে সচরাচর যা' হয়ে থাকে তাই অর্থাৎ লভ্‌ কিংবা লোভ। সবই বুঝতে পাচ্ছি। লোকটা যে ভদ্র সমাজের নয় তা' ঠিকই, নইলে, শিক্ষিতা তরুণী মেয়ের কাছে এমন হীন প্রস্তাবও কেউ করে ?—ছোঃ !

মেয়েটা বল্‌লে—মা, বাবা, বাড়ী-ঘর ছেড়ে এমন করে চলে যাওয়াটা যে ভারি বিশ্রী দেখাবে !

—কিন্তু বিশ্রী দেখাবে না। এমন তো কতই হয়ে থাকে।

মেয়েটা বল্‌লে—আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমি আজই এর জবাব তোমাকে দিতে পারব না।

বটে ! এসব কথা আবার ভেবেও দেখতে হবে ? আচ্ছা মেয়ে তো ! ও আবার শিক্ষিতা !—কক্ষনো না। ঘৃণায় দুটো রূঢ় কথাও শুনিয়ে দিলে না ? দেখ্‌ছি, যেমন দেবা, তেমনি দেবী।

লোকটা তার হাত ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, সেই ভালো। কিন্তু, তা' ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই সেটা বুঝো।......আর, কাল ও এখানে আসা চাই !......চলো, যাওয়া যাক এখন, এই তো দেখো লতা, ইচ্ছে করচে, এখানেই সারারাত দুজনে বসে থাকি কিন্তু তা' হয় কই !

দুজনে উঠে দাঁড়ালো আমি ও গোপনে বেরোলুম। গেটের বাইরে আসতেই চোখে পড়লো মেয়েটা নিকটেই—একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকলো। আর সেই লোকটা চললো অন্য দিকে।......অর্থাৎ ওরা এক বাড়ীর লোক নিশ্চয়ই নয়।

চট্‌করে ঐ পাশ দিয়ে ঘুরে, আমি তার সামনেই একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। এবং সে যখন কাছে এলো—একবারে পাশে, অমনি অন্ধকারে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—স-ব ধরিয়ে দেবো কিন্তু সাব্‌ধান, সব্‌ শুনেছি।

বলেই ছুটে একেবারে বাড়ীতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। মনে হল লোকটাকে কী জব্দটাই না করেছি!

সেদিন সারারাত ঘুম হয় নি।

ছিঃ, কি বিশ্রী—মেয়েটা কি একটুও বুঝতে পারলে না যে কত বড় একটা হীন কাজ সে করতে চলেছে! এমন কুৎসিত ব্যাপারকেও আবার ভেবে দেখতে হবে,—হয়তো বা শেষে মতও দেবে—কে জানে! ওদের অত বড় বাড়ী, বাপও হয় তো নামজাদা বিশিষ্ট ভদ্রলোক কেউ;—এমন পরিবারে কি কলঙ্কের দাগই না পড়বে।

সে কথা কি মেয়েটি একটি বারও ভাব্‌বে না?

সবাই যে বলে দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়, সে খুবই সত্যি।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার সেই পার্কে গিয়ে হাজির। সেই কোণটার দিকে নজর পড়তেই বুঝলুম কুঞ্জটি নির্জ্জন নয়—এবং তার অধিকারীও খুব সম্ভব তারাই।

অতএব কালবিলম্ব না করে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে বসলুম।

অনুমান মিথ্যা নয়।

কিন্তু গিয়েই যা দেখলুম তাতে আমার সমস্তটা শরীর রাগে রি রি করতে লাগলো। ইচ্ছে হল এখুনি ছুটে গিয়ে লোকটার মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দিই।

মেয়েটাকে দুটো হাতে বেঁধে বুনোটা বসে আছে। মেয়েটার মাথাও তার বুকের ওপর—চোখ দুটোও আবেশে ঢুলু ঢুলু......যেন আহ্লাদে আট খানা,—সোহাগে গলে পড়েছে!

ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে গদ গদ স্বরে লোকটা বলতে লাগলো,—আমি জানি,—তোমার এতে অমত্‌ হবে না! তোমার মনের সন্ধানও তো আমি রাখি!

মেয়েটা কিছুই বলে না—বরং দুটি চোখ আরও স্তিমিত করে ফেললে। রাগে জলে গেলুম—ন্যাঃ কি ন্যাকা!—

ভারি আনন্দ হচ্ছে—না? রোসো তোম্‌রা—

মেয়েটা জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বললে, বুঝতে পারলুম না। লোকটা কিন্তু আহ্লাদে একেবারে গলে পড়লো। বল্‌লে—সত্যি বলছো?......আচ্ছা, কেন এমন হয়? কেন এমন—

বল্‌তে বল্‌তেই সে তার মুখটা তুলে ধরে সত্যি করেই একটা চুমু খেলে।

আমি তো লজ্জায় মরে গেলুম। আরে ছি, ছি, এদের কি একটু হায়াও থাকতে নেই? ভেবেছে কি?—একটা পাবলিক পার্ক, চারদিকে লোক জন—এম্নি সন্ধ্যে বেলায়—ধ্যেৎ। ইচ্ছে হল, সব লোকজন জড়ো করে ওদের বুঝিয়ে দি'—যে মশাই, এটা আমাদের বাংলা দেশের একটি পার্ক, হাইড্‌পার্ক নয়।

লোকটা বল্‌লে—তা'হলে এই—সামনের শুক্র বারেই বেরিয়ে পড়া যাক, কি বলো? আমার আর দেরি সইছে না একটুও—

মেয়েটা বল্‌লে—কিন্তু কোথায় যেতে চাও?

—আপাততঃ চলো মধুপুরে পরেশের ওখানেই যাওয়া যাক।

—না, তা'তে আমার বড় লজ্জা করবে।

—কেন, লজ্জার কি হয়েছে? সে আমারই তো বন্ধু—তাকে আমি বেশ জানি, বরং খুসী হবে। না হলে'ও তাকে আমি ঠিক করে নিতে পার্কো—কি বলো?

মেয়েটা আর কিছু বল্লে না।

—এতদিন এই সোজা ব্যবস্থাটা কেন মনে পড়েনি, তাই শুধু ভাবি। মিছি মিছি দু'জনেই শুধু জলে জলে মরেছি। আমাদের কি দরকার ছিল, এমনি বাঁধনের মধ্যে থাকবার?

একটু থেমে বল্লে—তা' তাই ঠিক রইলো। তুমি তৈরি হয়ে থেকো, আমি দুপুর বেলা ট্যাক্সি নিয়ে যাবো। তোমার বাবা তো সে সময়ে কোর্টেই থাকেন—তুমি চুপি চুপি বেরিয়ে এসো! কেমন?

মেয়েটা হটাৎ ফিক করে হেসে ফেলে বল্লে—সে কিন্তু, এক আচ্ছা মজা হবে!

লোকটাও একটু হেসে, মনে মনে সেদিনকার 'আচ্ছা মজা' উপলব্ধি করতে লাগল।

কিছু ক্ষণ পরেই তারা পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম—বসে থেকে আর কি হবে।

বাইরে এসে মেয়েটা বল্লে—কাল চা খেতে আসবে তো?

—নিশ্চয়ই!—

আজও লোকটা ডান দিকের রাস্তা ধরলে আর মেয়েটা তার বাড়ীর পথেই।

আমি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম এখন কি করি! এরা তো সবই ঠিক করে ফেলেছে, মায় দিন ক্ষণ পর্য্যন্ত! এম্‌নিই হয়ে থাকে বটে, কত নভেলে পড়েছি, কতবার শুনেছি, এমনি করেই হীন চরিত্র লম্পটেরা সরলপ্রাণা মেয়ে গুলকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একেবারে পাঁকের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষিত আধুনিক পরিবারের মেয়ে—নিজেও লেখা পড়া নিশ্চয়ই শিখেছে।—তবুও যে এমন নির্ব্বোধিতার পরিচয় দেবে আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু নিজে যখন দেখেছি, সমস্ত শুনেওছি, তখন মেয়েটার এত বড় অন্যায় থেকে উদ্ধার করা উচিত নয় কি?

হটাৎ মাথায় একটা বুদ্ধিও এসে গেলো। মেয়েটার বাড়ীর নিকটে গিয়ে তার নম্বরটা ভাল করে দেখে রাখলুম। গেটের গায়ে লেখা—B. K. Bose, Bar-at-law—মনে মনে দু'চার বার আউড়ে নিলুম। হাঁ, ভুল হবে না। তার পর বাড়ীতে এসেই লিখতে বসলুম—একটু দেরীও আর নয়।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার সহিত আমার কোনরূপ পরিচয় অবশ্য নাই। কিন্তু আজ একটি বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এবং আশাকরি, ইহাতে আপনি যথেষ্টই উপকৃত হইবেন।

আপনার বাড়ীতে লতা নামে একটি মেয়ে আছে। জানিনা সে আপনার কে! আপনাদের বাড়ীতে আর একটি শ্যামবর্ণ যুবক, তাহার নাম আমি জানি না, প্রায়ই চা' খাইতে যাইয়া থাকে—আপনাদের সহিত উহার বিশেষ জানাশোনাও আছে বলিয়া মনে করি। কিন্তু আপনি হয় ত সংবাদ রাখেন না যে আপনার ঐ লতা আর এই যুবকটির মধ্যে একটা হীন আকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং শুনিয়া হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন—তাহারা গোপনে দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছে—যাহাকে বলে গৃহত্যাগ। স্থির হইয়াছে মধুপুরে পরেশ নামক কোনও এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া আপাততঃ উঠিবেন। আগামী শুক্রবারে দিন ধার্য্য করা হইয়াছে—দুপুর বেলায়।

ক্ষমা করুন, চোখের উপর দেখিলাম, স্বকর্ণে শুনিলাম, এতবড় একটা লজ্জাকর ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বলিয়াই আপনাকে সংবাদ না দিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার অনুরোধ, আপনি উপযুক্তরূপে

অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি সত্য কি না।

ইতি……………

লেখা হয়ে গেলে মিঃ বি, কে, বোসের ঠিকানায় তাকে ছেড়ে দিয়ে এলুম। মনটা বড় খুসি হয়ে উঠল—একটা 'ইনোসেন্ট' মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করতে পার্কো এই আশায়।

পরদিন সন্ধ্যার পর সমস্ত পার্কটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও তাদের আর দেখা পেলুম না,—বুঝলুম ওষুধ ধরেছে তা'হলে। বসে বসে কল্পনা করতে লাগলুম—যা'ক, এর জন্যে লতার কাছে আমার কিছু কৃতজ্ঞতা পাওনা হয়ে রইলো। যদি সে সময় আসে, একদিন আমার সঙ্গে আলাপ হওয়াটাও অসম্ভব নয়—হয়ত হবেই। তখন কি সে আমার কাছে একটুও কৃতজ্ঞ হবে না? কি ভুল সে করতে বসেছিল—আর আমিই তাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছি। হয় তো বা এমনও হতে পারে—মিঃ বোস পুরস্কার স্বরূপ আমার হাতেই………………সত্যি, কি সুন্দর ঐ মেয়েটি।

মনটা একটু খারাপও হল। হয় তো ওরা আমার চিঠিটা দৃঢ় বিশ্বাস করে লতাকে কটু, অপ্রিয় কথা কিছু বলেছেন। হয় তো বা সে এখন তার ঘরে বসে ফুলে ফুলে কাঁদছে। আহা,—কিন্তু—তবুও ভেবে দেখো,—এতো তোমার ভালোর জন্যই করেছি লতা।

আরও দু' তিন দিন কেটে গেল, কিন্তু তাদের আর দেখা পেলুম না।

পরদিনই শুক্রবার—একটু উৎকণ্ঠাও হল—কি জানি কি হয়?—মিঃ বোস যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন—এমনও তো হতে পারে।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এসেই একটা চিঠি পেলুম। অপরিচিত হাতের লেখা। খুলতেই চোখে পড়লো নীচে B. K. Bose এর নাম। তখনই পড়া সুরু করলুম—

মহাশয়, আপনার পত্র পাইলাম। সত্যই যে এমনি একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি নাই। লতা আমার একটি আত্মীয়া। তাহার এহেন হীন প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছি।

আপনার পত্র পাইয়াই আমি অনুসন্ধান করি, এবং তাহারই ফলে আপনার কথাই সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। কতবড় বন্ধুর কাজ যে আপনি করিলেন তাহা এই সামান্য পত্রে আর কি জানাইব! তাহার জন্য চিরদিন ঋণী হইয়া থাকিলাম—জানিবেন।

আমার এই অনুসন্ধানের কথা এখনও তাহাদের জানিতে দেই নাই। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ব্যতীত, আরও দুই চারিটি কথার জন্য আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; যদি আজ সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাড়ীতে একবার আসিতে পারেন তবে বড়ই বাধিত হইব। কিংবা আপনার ওখানেও না হয় আমি নিজে গিয়া দেখা করিতে পারি। ইতি—

পড়া তো হোল, এখন কি করি—ভাবনাতেই পড়লুম। উপকার করে থাকি, কি যা-ই করে থাকি, এমন করে

নাম ধাম ওদের জানতে দেওয়াটা মোটেই ভাল হয়নি। কি জানি, উপকার করা সত্ত্বেও যদি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কিছু অপমান করে ছেড়ে দেয়। লোকচরিত্র—সবই যে সম্ভব। ······আবার পরক্ষণেই মনে মনে একটা মধুর কল্পনা করেও আশান্বিত হয়ে উঠলুম। হয়তো এই সূত্রে তাদের সঙ্গে পরিচয় হবে। লতাও হয়তো নিজের এই ভুলটা বুঝতে পেরে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করলেও করতে পারে—কে জানে। মিঃ বোসের এখানে আসার চাইতে আমার যাওয়াটাই বরং ভালো—

অতএব, সন্ধ্যে যখন হল, সেজে-গুজে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশ মস্ত একটা গেট—দ্বারোয়ান কিছুক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখে ফিরে এসে মস্ত সেলাম ঠুকে বললে—ভিতর্ যাইয়ে হুজুর, সা'ব ভিতর মে বৈঠে হেঁ।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে, দুরু দুরু বুকে পর্দ্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই আমার পা'দুটো মাটির সঙ্গে একেবারে গেঁথে গেলো। সভয়ে চেয়ে দেখলুম, ঘরে সাহেব-সুবো কেউ নেই, সব মিছে কথা। চেয়ার আলো করে বসে আছে সেই বুনো লোকটা, আর তার পাশে আর একটি যুবক—হয় তো মাসতুতো ভাই কেউ।

ভয়ানক ভড়কে গেলুম—আর এক পা'ও এগোতে সাহস হ'ল না।

আমার জুড়িটি কিন্তু আমাকে দেখেই চিনতে পারলে। বললে—আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?···আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে মশাই—আপনি পার্কে বেড়াতে যান?

সেই মুহূর্ত্তে বুঝতে বাকী রইলো না—ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। হাত পা' যেন নিসাড় হয়ে গেল, অবশ্য ভয়ে নয়, অপমান টপমানেরই আশঙ্কায়! তবুও সাহসে বুক বেঁধে কোনরূপে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললুম—হাঁ—পার্কে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই বটে।

—ও, তাহ'লে সেখানেই দেখে থাকব হয়তো।

আহা! চিনতেই পারলেন না যেন!—দেখে, থাকবো! কি ন্যাকা!—

দেখুন, মিঃ বোস হঠাৎ একটু বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভারটা তিনি আমার উপরই দিয়েছেন।

বলেই সে বিশ্রী হেসে পাশের যুবকটির দিকে তাকাল। আমি তখন ঘামতে সুরু ক'রেছি।

লোকটা বললে—আপনি যা' আবিষ্কার করেছেন, তা' বাস্তবিকই অদ্ভুত। মিঃ বোস বলে গেছেন যে,—সেটা তাঁকে জানিয়ে দিয়ে আপনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তাও অতি চমৎকার। আর, এতে তাঁর যে উপকারটা হ'ল, তার জন্যে তিনি আপনার কাছে চিরদিন ঋণী থাকবেন।

আমি চুপ।

—এবার আমারও দু'একটি কথা বলবার আছে।

বলেই তারা দুজনে দাঁত বার করে হাসতে সুরু করলে। লোকটা হটাৎ বললে—কি করা হয়? কোন্ ইস্কুলে পড়?

'আপনি' থেকে 'তুমি,'—তারপরই, হয় তো 'তুই'—অবশেষে দ্বারোয়ানকে দিয়েই একেবারে 'নিকাল' দেবার হুকুম।···হায় অদৃষ্ট। তবু ভ্রূকুটি করে বললুম—তা' জেনে আপনার লাভ?

—আচ্ছা, না বললে,—কিন্তু তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পারছি না! হাঁ, হে, কি ভেবেছিলে বলনা শুনি? আমি একজন বাইরের লোক, এখানে আলাপ আছে, চা' খেতে আসি, তারপর এ বাড়ীর মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ছি—কেমন এই না?

আবার সেই হাসি!

লজ্জায়,ভয়ে আমার অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লুম—আপনার সঙ্গে কথা কইবার আমার সময় নেই। মিঃ বোস থাকলে, তাঁর সামনেই সব বোঝাপড়া করা যেতো। মাপ করুন, আমাকে এখন উঠতে হবে।

তারা দুজনেই হা হা করে উঠল – একই সঙ্গে।

লোকটা বল্লে—আরে, ওঠ কেন ভাই? মিষ্টার বোস যে তোমাকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে, যাতে ছেড়ে না দিই সেই কথাই বলে গেছেন! তাঁকে বাধিত করে যাবে না—সে কি?

অন্ত লোকটার দিকে ফিরে বল্লে—যাও তো হে ললিত, ভিতরে সংবাদটা দিয়ে এসো!

সুতরাং, এখনও বেশ কিছু বাকি আছে!

সেই লোকটা ভিতরে চলে যেতেই বুনোটা বিশ্রী হেসে বল্লে—সেদিন পার্কে আমাদের চোখ এড়াবার জন্যে গেট পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে আমাদের পেছনে গুড়ি মেরে বসে সব শুনতে লাগলে। আমরাও ভাবলুম—একটা মজা করা যাক। কিন্তু তুমি ছোকড়া যে এত বড় নির্ব্বোধ তা' জানতুম না। তোমার জন্যে আমার কষ্টই হচ্ছে।......যাক্, এ ক'দিন বেশ একটু মজা করা গেল—কি বলো?

সেই লোকটা অর্থাৎ ললিত একটু পরেই ফিরে এল। এবং দেখলুম, ঠিক তার পেছনেই একেবারে স্বয়ং লতা। তার দুই হাতে দুটো ডিসে নানা রকমের খাবার। চাপা ঠোঁটের ভিতরে হাসি যেন ফেটে বেরোতে চায়। এতক্ষণ ও আড়ালে থেকে শুনে বোধ হয় হাসছিলো—তাই চোখ দুটোও লাল।

সে ঘরে আসতেই বুনোটা আবার বিকট শব্দে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে লতাও ডিস দুটো হাতে করে হাসতে হাসতে একেবারে যেন লুটিয়ে যাবারই জোগাড় করলে।

আমার কানদুটি অনেকক্ষণ লাল হয়ে ছিল। অবশেষে ঘামতেও সুরু করলুম। বুঝলুম, আজ সহজে নিস্তার নেই।

লতা অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে ডিস দুটো আমার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সেই বুনোটাকে বল্লে—নাও, তোমার বন্ধুকে খেতে বল—ওঁর ভারি লজ্জা হয়েছে!

—বিলক্ষণ, আরম্ভ করে দাও ভাই, সহধর্ম্মিণীর হুকুম। ঠেলতে পার্ব্বে না কিন্তু।

একি নির্ম্মম পরিহাস! আমার কলেজে পড়ার গর্ব্ব, আমার 'পোজিসন' 'প্রেষ্টিজ' সব ভুলে গেলুম। উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরেই বললুম—যথেষ্ট হয়েছে; আমাকে দয়া করে যেতে দিন।

—আহা, আহা, সে কি কথা হে! উনি এনে দিলেন, আর তুমি না খেয়েই চলে যেতে চাইছো—ছিঃ! যাঁর জন্যে তোমার এত ভাবনা, তার প্রতি তোমার এই আচরণ?

চোখে জল প্রায় এসে পড়েছিলো।

কোন মতে বল্লুম—মাপ করুন, ছেড়ে দিন আমাকে।

বুনো বল্লে—এখন বুঝলে তো ইনি আমার কে? এ বাড়ীতে আমার শুধু চা খেতে আসবার অধীকারই নয়, আরও অনেক কিছু। বিশ্বাস না হয় তো, বল, আরও প্রমান দিয়ে দি'। বন্ধুটিও সাক্ষী থাকবেন!

বলেই সে লতার দিকে হাত বাড়ালে; আমি মাথা নীচু করে প্রায় চোখ বুজে বসে রইলুম। মিহি সুর কানে এল—যাও, তোমাকে আর প্রমান দিতে হবে না!

তার পর সেই মিহি সুরটা আরও যেন একটু এগিয়ে এল—আপনি লজ্জা করবেন না......এ একটা আস্ত পাগল—বুঝলেন—আপনি একটু মিষ্টি মুখ করুন।

এবার আর বসে থাকা সত্যি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কোন মতে মরিয়া হয়ে দরজার দিকে যেই ছুটতে যাবো,

বুনোটা খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেল্‌লে,—বল্‌লে—আর একটি কথা আছে, বোসো—

বলেই হতভাগা লোকটা করলে কি, আমার মুখটা তুলে ধরে লতার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগলে—নাও, এখন মনের সাধ মিটিয়ে সোজা চোখে তুলে যত পারো দ্যাখো,—আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, সেদিন পার্কে বসে যেমন অসভ্য ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে বিশ্রী ভাবে চাইছিলে—তেমন করে খবরদার আর কখনো কারো পানে করোনা। তুমি লেখা পড়া শিখ্‌ছো, ভদ্র ঘরের মেয়ের দিকে কি ভাবে চাইতে হয় তা' জানো না। যখন দেখতে হয়, সোজা তাকাবে। অমন করে কাজিল ছেলের মত আর কখনো চেও না! বুঝ্‌লে ?—

হায়রে,—চোখে সত্যি সত্যিই জল গড়িয়ে পড়লো। ছোট লোকটা বিশ্রি হি হি করে হেসে বল্‌লে—ওঃ,—'হাউ ফানি' !—

—আচ্ছা, এখন যেতে পারো,—তোমাকে আমার এইটুকু উপদেশ দেবার ছিল।

কোনমতে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে ওদের সেই অট্টহাসি! ঐ আহ্লাদি মেয়েটাও খিল্ খিল্ করতে লাগলো! রাস্তায় এসে মনে হ'ল যেন বাঁচলুম—আমার নাকের সামনে এতক্ষণ বুঝি বাতাস ছিলনা একটুও।

চোখে জল বেরিয়েছিলো, দুঃখে নয়,—রাগে,—তাড়াতাড়ি মুছে নিলুম। কি অসভ্য ঐ মেয়েটা যে—না ছাই দেখতে!—মাথায় কাপড় দিলেই পারে—ঢং করে আবার সীঁথিতেও সিঁদুর দেওয়া হয় না,—ওদের 'ফ্যানের' নিকুচি করেছে।

তীর্থ-পথ—

—যোহান্ বোয়ার

গাছপালাহীন বাগানখানির মধ্যে, একর ষ্ট্রীটের ক্রিশ্চিয়ানার সুপ্রাচীন প্রসূতি ভবনটী দৃশ্য গৌরবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। বাড়ীটী কিন্তু বহুকালের,—দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের; অতীত দিনে কত অসংখ্য নরনারী সুখে-দুঃখে ইহারই কোলে আশ্রয় লইয়াছে; সুতরাং, ইহার অতীত ইতিহাস জানিতে পারিলে বহু বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ হইত, সন্দেহ নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের সে এক রবিবার। অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বামীস্ত্রীতে প্রবেশদ্বারের মরিচা-পড়া ঘণ্টায় টান দিলেন। দ্বার খুলিল; শূন্য উদ্যান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রৌদ্রালোকে কাদা ও বরফ বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া এই চিকিৎসালয়ের মতই, অপ্রীতিকর একটা ভাবের সৃষ্টি করিতেছে।

একখানা কোদাল হাতে লইয়া দ্বারী নবাগতদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা অধ্যাপকের সন্ধান চাহিলে বামদিকের দ্বার নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এই সময়টা তিনি সেখানে প্রায়ই অধ্যক্ষের সহিত ব্যস্ত থাকেন। স্ত্রীকে উঠানেই রাখিয়া পুরুষটী দ্রুতপদে অধ্যক্ষের কক্ষের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া গেলেন, এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, অধ্যাপক অধ্যক্ষের সহিত কোথায় বাহির হইয়াছেন।

কিন্তু দ্বারী অদূরের একটা রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, তিনি ওইখানে আছেন।

আগন্তুকটী দ্রুত সেইদিকে চলিলেন।

কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি! বলিলেন, নির্ব্বোধ! এইমাত্র অধ্যাপক ছাত্রদের নিয়ে ওয়ার্ড পরিদর্শন করতে গেলেন।

দ্বারী কহিল, তবে তাঁর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন না হয়।

ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অগত্যা সেই উদ্দেশ্যেই চলিয়া গেলেন। স্ত্রী প্রাঙ্গণের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন—প্রতীক্ষায়।

বহুক্ষণ গেল। মহিলাটি অস্থিরভাবেই পদচারণা করিতে লাগিলেন। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সময় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।

বয়স চল্লিশের উপর, সন্তানের মুখ দেখিবার কোন আশাই তাঁহার আর নাই। সে জন্য এই প্রসূতি-ভবনেরই একটী ছেলেকে লইয়া পোষ্যপুত্ররূপে পালন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে এই কাজের ভার অধ্যাপককে দেওয়া হইয়াছিল। কাজটী কিন্তু অনায়াস-সাধ্য হয় নাই। কেন না ছেলেটী হৃষ্টপুষ্ট হওয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ তাহার জননীও স্বাস্থ্য-সম্পন্না হওয়া উচিত, তৃতীয়তঃ, তহাদের সর্ত্তে সম্পূর্ণ সম্মতিও বাঞ্ছনীয়। এমনি একটী শিশুর সন্ধানে বৎসরাধিক কাটিয়াছে। তারপর কাল অধ্যাপক সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তু পাওয়া গিয়াছে।

ছোট ছেলেটী জানালার ধারেই নিদ্রিত—কে জানে সে কেমন! অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সহিত দেখা হইবে, এবং সঙ্গেও হয় তো যাইবে। কিন্তু, মানসিক একটা খুঁত থাকাও কিছু বিচিত্র নয়! সত্যই কি সে নিজের ছেলেটীর মত হইবে? যে সুকুমার শিশু প্রথম মুহূর্ত্তেই এমনি করিয়া মনপ্রাণ অধিকার করিয়া লইল, তাহাকে লইয়া হয় ত ভবিষ্যতে অনেক কিছুই......

যে দ্বার পথ দিয়া স্বামী অদৃশ্য হইয়া গেছেন, সেইদিকে চাহিয়া রৌদ্রালোকে তিনি অস্থিরভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। সূর্য্য উপরে উঠিতেছিল, বাতাসও তাতল। রোদে দিবার জন্য মাদুর ও কম্বল বাহির হইয়াছে। নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক অট্টালিকার গাত্র ভেদ করিয়া সমস্তক্ষণ একটা ঝাঝালো গন্ধ,—যেন কালো জানালাগুলির ওধারেই রহস্যের কি একটা সন্ধান লইয়া বেড়ায়।

দ্বিতলের একটা কক্ষে তীব্র চীৎকারও শোনা গেল—তারপর, আরও একবার—আরও—

দ্বারী একখণ্ড বরফ লইয়া চূর্ণ করিতেছিল। তাহার নিকট গিয়া মহিলাটী জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কার চীৎকার?

দ্বারী মৃদু হাসিয়া কহিল, কি করে বল্‌ব বলুন, কার চীৎকার। বলা সহজ নয়—রাতদিন সমস্তক্ষণ এখানে এমনই চীৎকার চলে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহার স্বামী বাহিরে আসিলেন, সংবাদ দিলেন—অধ্যাপক নিজের ঘরে—অপেক্ষা করিতেছেন।

কিছুকালের মত প্রাঙ্গণটি জন-বিরল হইল। দ্বারীও অদৃশ্য হইয়াছিল, তার কোদালখানা দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দেওয়া রহিয়াছে; ছাদের নালি দিয়া জলের একটা ধারা এবং তাহারই প্রান্তে বসিয়া শুকজাতীয় একটি পাখী সূর্য্যের দিকে ঠোঁট তুলিয়া গান ধরিয়াছে।

জামার আস্তিন গুটাইয়া ধাত্রী বিজ্ঞানের একটী ছাত্রী দ্বারীকে ডাকিতে উঠান দিয়া আসিতেছিল,—ছুটিতেই চোখে পড়িল, দ্বারের নিকটেই দ্বারীর ধূসর মাথাটি।

—কি হয়েছে?

সে ব্যক্তি অনেকটা বিরক্ত হইয়াই প্রশ্ন করিল। তাহার দুটি গালই তখন ভর্ত্তি।

মেয়েটী থামিল, কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল,—দশ নম্বরে ডাক্তার তোমায় খুঁজ্‌ছেন।

—ভালো...কিন্তু, একটু খাবার সময়ও কি পাব না? কি চান তিনি?—

একটী মৃতদেহ নীচে নিয়ে যেতে হ'বে।

বেশ, এখুনি যাচ্ছি।

বারী আর একবার দ্বারের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ধূসর-কেশ অধ্যাপক তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থী দুই জনের সঙ্গে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া—কথাবার্ত্তা সুরু করিয়াছিলেন তখন।

অধ্যাপক মুহূর্ত্ত-খানিক পরে আসিয়া বলিলেন, আপনি এখুনিই দেখতে চান, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধান হয়েই চলতে হ'বে। আমি আশাকরি, আপনার এ ইচ্ছে নয়, যে আপনি কে তা' ছেলেটীর মা জানতে পারে।

উভয়ে কহিলেন,—হাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—

মহিলাটী বলিলেন, যখন ওঁকে নিজের বলে নিয়েছি, তখন আমি মন-প্রাণ দিয়ে তাকে একান্ত আপনার করেই পেতে চাই। ওর মা'ও হয়তো ওকে দেখতে চাইবে আর তা'তে ছেলেটীই বিব্রত হ'বে,—দুই মায়ের স্নেহের দৌরাত্ম্যে! তা' ছাড়া তাঁর আত্মীয়স্বজন থাকাও আশ্চর্য্য নয়। তারা হয়তো......না, ধন্যবাদ আপনাকে! এ'রকম হ'লে চলবে না।

অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—সে কথা থাক,এখন একটু অভিনয় করতে হ'বে।...দেখবেন, ছোট গোলাপের মত ছেলেটীকে পেয়ে ভুলে যাবেন না সব।

মহিলাটী অধ্যাপকের সঙ্গে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হটাৎ তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—এই শিশুর জননীর পরিচয় তো আমি এখনও পাইনি—কে-সে?

অধ্যাপক আরও দুই পদ অগ্রসর হইলেন; তারপর থামিয়া, নিম্ন কণ্ঠেই উত্তর দিলেন—আজও সে তার নাম বলতে স্বীকৃতা হয়নি, এমন কি, কোত্থেকে এসেচে তাও নয়। আমরা তাকে 'সাতচল্লিশ নম্বর' বলেই ডাকি।

—আপনি স্থির জানেন, এতে তার সম্পূর্ণ অনুমতি আছে? অধ্যাপক দৃঢ় বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—এ শ্রেণীর নারী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অল্প নয়। যদি ভুল না বুঝে থাকি তো—সেই বোধ করি এ'দের মধ্যে সকলের চেয়ে হতভাগিনী—

অধ্যাপক পুনরায় অগ্রসর হইলেন। স্বল্পালোকিত একটা দীর্ঘ প্রবেশ পথের সংখ্যাচিহ্নিত অনেকগুলি কক্ষদ্বার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তারপর সহসাই এক সময়ে অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন, আপাততঃ আমরা এই খানেই প্রবেশ করতে পারি—চলুন।

তাঁহার সঙ্গী দুজনই প্রথমে প্রবেশ করিলেন। ঘরের মধ্যে ক্ষীণ অথচ মধুর একটা গন্ধ।—দুই সারি শয্যার উপর সবই রুগ্না নারী। তিনটী শিশু একযোগে চীৎকার সুরু করিয়াছে; বিব্রত মাতা তাহাদের শান্ত করিতে ব্যস্ত। জন কয়েক নারী উপবিষ্টা; কেহ কেহ শিশুদের খেলা দিতেছে। দ্বারের সন্নিকটে একটী সুসজ্জিতা মেয়ে শয্যার বাহিরেই পড়িয়া!—ইহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল।

অধ্যাপক দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তোমার ছেলেটা কই?

মেয়েটীর মুখখানি বেশ প্রশস্ত কিন্তু হরিতাভ। মৃদু হাসিয়া, শান্ত ভাবেই উত্তর দিল,—ও! তিন দিন হ'ল সে নেই!

—ও! এখন বুঝতে পারচি! তোমার কাছে খুব সুখের বিষয়, তা' নয়?

মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া কহিল, হ্যাঁ, এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারতো না।

—ইতি পূর্ব্বে, আরও তিনটী পুত্রের মুখ দেখেছিলে—কেমন?

মেয়েটী অধ্যাপকের সঙ্গিনী নবাগতা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; যেন এ প্রশ্ন তিনিই করিয়াছেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ, আরও তিনটী।

মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহিলাটী শুধাইলেন, তুমি কি কাজ করো কোথাও?

—না, আমি বই বাঁধি।

তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। এবং মেয়েটীও বাহু শিথান করিয়া অতঃপর শুইয়া পড়িল।

সকলের দৃষ্টি কিন্তু এই অপরিচিত দু'জনের উপরে; শ্রদ্ধাও ঈর্ষা মিশ্রিত দৃষ্টিতে সবাই তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে। আরো একটী শয্যাপ্রান্তে আসিয়া অধ্যাপক থামিলেন। কহিলেন,—ব্যাপার বিশেষ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এঁর বেলায়। এঁর বয়স এখন চল্লিশ; এবং এই প্রথম ইনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়া তখন নিদ্রিতা; মহিলাটী নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তাই নাকি? —তা হো'ক্, ইনি বিবাহিতা নিশ্চয়,—?

অধ্যাপক ঘাড় নাড়িলেন; বলিলেন, না, বিবাহ এর হয়নি।

বলিয়াই কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, এই প্রৌঢ়ার জারজ সন্তানের কাহিনী শুনিয়া মহিলাটী নিতান্ত আহত হইয়াছেন। তাঁহার হাত ধরিয়া, তাহাকে অপর দিকে লইয়া যাইতে যাইতে অধ্যাপক কহিলেন,—চলে আসুন, আরও আশ্চর্য্য জিনিষ দেখবেন।

বিকৃত মুখ, বিশীর্ণ একটী মেয়ে শয্যায় পড়িয়া অনবরত হাসিতেছে। আপনার ক্ষুদ্র শিশুটী তাহার দুইটি হাতের বেষ্টনে বক্ষলগ্ন। অধ্যাপককে দেখিয়াই সে অনর্গল কথা বার্ত্তা সুরু করিয়া দিল। তাহার অশ্রু-সজল বিশাল চক্ষু দুটীর মধ্যে কি এক অদ্ভুত আনন্দের বার্ত্তা সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক কহিলেন, এর অভাব শুধু মনেরই নয়; জন্মবধি এর হাঁটু দুটী বুকের সঙ্গে এক হয়ে আছে।—তবুও সে মা, পুত্রের জননী! আপনারা অন্দরে বসে সুচারু রূপে গৃহকাজ করে যান, আর ঘরের বাহিরে এই খ্রীষ্টান সমাজে এমন অনেক কিছু ঘটতে থাকে, যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

মহিলাটীকে দেখিয়া মনে হইল, এখনই তিনি চেতনা হারাইবেন; স্বামীর হাতের উপর দেহ-নির্ভর করিয়া বলিলেন,—না, না, এ অসম্ভব।

তাঁহার ভাবনা যেন ওই একটী।

অধ্যাপক আর একবার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, চলে আসুন। এইবার আপনাকে একটী মনোহর জিনিষ দেখাব।—কিন্তু, ও যে ঘুমুচ্চে!

বাতায়নের নিকট একটী শয্যা—তাহারই পার্শ্বে গিয়া তিন জনে দাঁড়াইলেন। মহিলাটী ভাবিলেন, হয় তো এই সেই জননী. একেই তাঁর প্রয়োজন, এর সঙ্গেই তাহাদের কথাবার্ত্তা হইবে হয় তো। ভাবিতে গিয়া উত্তেজনায় তাঁর বুকের ভিতর প্রবল কাঁপুনিই যেন সুরু হয়।

জানালার কাঁচগুলি তখন বন্ধ, তাহারই ওদিক হইতে রক্তবর্ণের একটা আভা আসিয়া উপাধানের উপর পড়িয়াছে—এবং তারই উপর এক স্বাস্থ্য সম্পন্না যুবতীর ঘুমন্ত মুখ। ঘন কালো মুক্ত কেশের রাশ বালিশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—কেশ-ভারাবনত মাথাটী নামিয়া আসিয়াছে, বাহু-শিয়রে শায়িত সুপ্তশিশুটীর কাছে। হয় তো ছেলেটীকে আদর করিতে করিতে করিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিজের অজ্ঞাতেই। নিশীথের

শ্লথ-বাস অনেকটা স্রস্ত।—তাহারই ফাঁকে সুগঠিত শুভ্র গ্রীবা ও পীযূষাবনম্র স্তন-চূড়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, মেয়েটীর বয়স চব্বিশ কিম্বা পঁচিশ। মুখখানি বেশ সুন্দর,—একটু মাংসলও বটে। কিন্তু শ্রান্তিময় একটা ভাবে ভরা!

একটা দুর্ব্বোধ্য মনোভাব লইয়া মহিলাটী শিশুর প্রতি চাহিলেন। হ্যাঁ,—ঐ নিদ্রিত খোকাটী এখন তাহারই—। মাথাটী দেহের অন্যান্য অংশের চেয়ে পরিমাণে কিছু বড়,—পাতলা চুলগুলি সুচারুতা ও স্বাস্থ্যেরই পরিচয় দেয়। সুপুষ্ট কচি হাতটী মায়ের বুকের উপর বিন্যস্ত। ঠোঁট দুটী যেন ঘুমের মধ্যেও কিছু একটা চুষিতেছিল, এমনই মনে হয়। দুটী গাল বলের মতই গোলাকার। যেন একটী সদ্যঃ-স্ফুট-রক্ত-গোলাপ,—বুকের উপর তুলিয়া আদর করিতে ইচ্ছে হয় -চুমাও—

ওই শিশু তাঁহারই হইবে; এখন সে আপনার প্রকৃত জননীর পাশে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন! যে পোষাকে তার ছোট দেহটী আবৃত—তাহা একান্তই দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক—স্থানে স্থানেও তালি যুক্ত। সহায়হীন শিশুদের জন্য চিকিৎসালয়ের সনাতন ব্যবস্থা—পরিষ্কারও নয়, পরিচ্ছন্নও নয়। মহিলাটীর ইচ্ছা হইল, এখনই তিনি উহাকে লইয়া গিয়া, ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেন তারপর ভাল নতুন পোষাকও পরাইয়া, এই মুহূর্ত্তেই যেন তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান।

এতক্ষণে চোখ পড়িল মায়ের উপর; আপনার সন্তানকে পাশে লইয়া সুখ-নিদ্রায় যে মগ্ন—জানেও না, তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারই মত আর এক নারী তাহার আত্মজকে ছিনাইয়া লইবার আয়োজন উদ্যোগ করিতেছে! ক্ষণকালের মত, মেয়েটীর জন্য তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির একটী ক্ষীণ ধারা বহিয়া গেল। ইহাদের দুটীকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে এতটুকু লজ্জারও কি কিছু নাই?

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই। তখনই তিনি সনাতন যুক্তির প্রভাবে আপনাকে সংযত করিয়া লইলেন। ওই মেয়েটী সমস্ত জীবনব্যাপী লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই হয়তো স্বেচ্ছায় আপনার সন্তান ত্যাগ করিবে। যে মেয়েটী বই বাঁধে, ঠিক তাহারই মত, এও কিছুদিন পরে ইহাকে সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিবে। তবে যে নারী তাহার শিশুকে সন্তান স্নেহে চিরজীবন পালন করিবে, তাহাকে অর্পণ করিতে দোষ কি? সে মনে করুক, তাহার সন্তান এখনই মরিয়া গেছে!

হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েটীর চোখ উন্মিলীত হইল এবং নিমিষের জন্য এই দুই নারী পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই মহিলাটী মুখ ফিরাইয়া অন্য একদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অধ্যাপক প্রথমত, প্রফুল্ল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন; যাক্, ঘুমটুকু বেশ হয়েছে তো? বাচ্চাটী কেমন?

কথা না বলিয়া মেয়েটী ঘাড় ফিরাইয়া লয়; শিশুও কান্না জুড়িয়া দেয়। মাথা নীচু করিয়া মেয়েটী তাহাকে শান্ত করিতে থাকে। চোখে মুখে রক্তিমাভাও খেলিয়া যায়।

মহিলাটী চলিয়া যাইতেই মেয়েটী অনেকক্ষণ ধরিয়া জানালার দিকে তাকাইয়া দেখে মনে হয়, ছেলেটীকে কে যেন কাড়িয়া লইতেছে!

প্রাঙ্গণে আসিয়া মহিলাটী বলিলেন, মেয়েটীকে সকল কথা খুলে বলা আবশ্যক।

অধ্যাপক কহিলেন, অন্যান্য বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। প্রথমতঃ বিবেচনা করবার সময় তাঁকে দেওয়া হবে; আর বল-প্রয়োগ বা ভয় দেখানো কোনো মতেই উচিত হ'বে না।

প্রাচীন প্রবেশ পথটী অতিক্রম করিতে করিতে, ওই হতভাগিনী মেয়েটীর সম্বন্ধেই বা কি ব্যবস্থা করিতে পারা যায়—সকলে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

—ক্রমশঃ

সোহাগ—

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

সকালবেলাতেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মনটাও ভিজা ভিজা।

সতেরো বছরের অনেক কথাই মনে পড়ে—তারও আগেকার অনেকগুলো দিন!—আজ স্বপ্ন বলেই যেন মনে হয়।

সেদিন কিন্তু জগৎটাই ছিল আর এক রকম।

বড় ছেলেটার বিবাহ দিয়াছি।

ফুট্‌ফুটে খর্‌খরে বৌটা ঘুরে ফিরে বেড়ায়। মনে কোন অশান্তি নাই,—

ভাবনাও নয়।

ছোট ছেলেটা তখনো কলেজে পড়ে।

একমাত্র মেয়ে সুবালার বিবাহ দিয়াছিলাম,—একটী ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা ছেলের সঙ্গে।

নিজেরও স্বচ্ছন্দ সংসার—অভাব-অভিযোগ তেমন কিছুই নাই।

তখনকার সবই ছিল সবুজ—

গাছের পাতা—জল—আকাশ—আর যৌবনের স্বপ্ন।

কিন্তু সতেরো বছরের মাধুরী যেন আর একজন।

আজ মুখের সে হাসিটী নাই। সদাই গম্ভীর—মেজাজটাও কেমন খিটখিটে।

কিন্তু দোষও তো দেওয়া যায় না।

যৌবনের প্রারম্ভে সংসার ভালো করিয়া চিনিবার আগেই স্বামীটী মারা গেল।

সেই থেকে আজ এই এতোদিন নিয়ত সংসারেরই খাটুনি। একটু বিশ্রামেরও অবসর হয় না।

তা' ছাড়া আর একটী প্রাণী এ সংসারের একজন হইয়া সমানভাবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চলে।

সে রিক্তা—সুবালারই মেয়ে।

এই ছোট নামটীর অন্তরালে তার বিষাদময় অতীত ইতিহাসের ব্যাথারই ছাপ কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল বৈকি।

জন্মিয়াই মাকে হারায়। বাপও সেই থেকে আবার নিরুদ্দেশ,—আমেরিকায় না কোথায় চাকুরী লইয়া এদেশের সম্পর্ক মুছিয়া হয় তো বা চিরকালের জন্যই চলিয়া গিয়াছে।

অগত্যা মাধুরীর কাঁধেই তার ভার পড়িয়াছিল।

কিন্তু রিক্তা প্রতিদান দিল তাহার কপালের সিঁদুর কাড়িয়া লইয়া।—ঐ শিশু-মেয়েটি যেন একটা অভিশাপ।

সেই থেকে মাধুরীও মেয়েটাকে বরদাস্ত করিতে পারিত না।

অথচ ফেলিয়া দেওয়া যায় না—মমতা হয়।

এমনি দুঃখে কষ্টে দিনের পর দিন—

শেষকালে বুকের ক্ষুধাটাই বড় হইয়া জয় করিল মনের বিরাগকে।

আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইয়া রিক্তাকে উপলক্ষ্য করিয়া মাধুরীরও দিন কাটে।

একদিন শিশু-মেয়ে কিশোরী হয়—তারপর একদিন যৌবন আসিয়াও হানা দেয়।

তিনটী মাত্র প্রাণী—

অথচ যেন কেহ কাহাকে চিনি না—এমনিই।

মাধুরীর সঙ্গে রিক্তার বনে না—এক মুহূর্ত্তও।

মাধুরী যত স্নেহ দেখাইতে চায় রিক্তা ততই উগ্র হইয়া উঠে।

অগত্যা মাধুরীও চুপ করিয়া থাকে না। কান্নাকাটি করে। বকুনিও দেয়।

রিক্তা প্রত্যুত্তর দেয়, কিন্তু শুধু কথায় নয়, মারামারি করিয়া।

দুজনের এই বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া আমারও রাগ হয়।

একবার সতেরো বছরের পুরাণো পাঁজীটা খুলিয়া দেখি। কিন্তু রিক্তার জন্মনক্ষত্রে কিংবা রাশিতে অশুভ কিছুই চোখে পড়ে না।

কোথায় যে কি গোল বাধিয়াছে কোন মীমাংসাই বুঝি নাই।

যেন অলক্ষিতে অন্তরালে কোন একটা স্ক্রু ঢিলা হইয়া গিয়াছে। আমাদের তিন জনের মন তিনটী মুখে টান দেয়, কে যে কার উপলক্ষ্য সেইটাই বোঝা মুস্কিল।

রিক্তা সুবোধ মেয়েটীর মত একপাশে পড়িয়া থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই সাপের মত ফণা ধরিতে চায়—আঁচড় খামচিও দেয়—যেন ছোবল।

বেতালা ঝঙ্কারের মত মিশ্র গর্জ্জনটী সারাদিন বাড়ী-খানিকে মুখর করিয়া রাখে।

সেদিনও সকাল হইতেই কিন্তু সুরু—!

রিক্তা রাগ করিয়া মাধুরীর বাক্সের চাবীটা আঁচল থেকে খুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। রাগের কারণটা যে কি তা জানি না। মাধুরী আসিয়া আমার কাছে নালিশ করিলে আমিও তিরস্কারই করিলাম।

মাধুরী রিক্তার মামী, মা নয়।

এই নিষ্ঠুর ইতিহাসটা তাহাকে বারংবার মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন এমন কিছু ছিল না। কিন্তু রিক্তা মাধুরীর মনের এই দুর্ব্বলতাটুকু ভালো করিয়াই জানিত। মাধুরীকে মর্ম্মান্তিক আহত করিবার এমন ব্রহ্মাস্ত্র তাহার আর দুটী ছিল না।

আমাদের তিরস্কারের প্রতিবাদ না করিয়া, অথচ এতটুকু মর্ম্মাহত হইয়াছে এমন ভাবও না দেখাইয়া আমাদের আমাদের দুজনকেই অগ্রাহ্য করিয়া সে চলিয়া গেল।

আধঘন্টার মধ্যেই দেখিলাম বিছানার ফর্সা চাদরটীতে কাঠ কয়লা দিয়া চার লাইন এক কবিতা লিখিয়া জানাই-তেছে—মার চেয়ে যে ভালোবাসে বেশী সে মা নয় ডাইনী।

ইহার পর হইতে মাধুরী আর ঝগড়া করিতে আসে না। রিক্তার ভালো মন্দ সকল সম্পর্ক হইতেই সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়। রাগ করিয়া নয়—অভিমানে।

এক মাসের অতি অসহায়—অতি দুর্ব্বল শিশুটী যখন বুকে উঠিয়া নিঃসন্তানা রমণীর অন্তরের রিক্ততা পূর্ণ করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও হয়তো বা সে অহঙ্কার ভরে শুধু আপনার দাবীটাই জানাইয়াছিল, অনুগ্রহ বা ভিক্ষা চায় নাই মোটেই। অফুরন্ত মাতৃহৃদয়ের অমিয় সুধার বিনিময়ে, সমস্ত অস্বীকার করিয়া, সতেরো বছরের শেষে আজ রিক্তা তাহাকে যে ব্যথা দিল তাহার বেদনায় আর জীবন ধারণের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট রহিল না।

ঘর ছাড়িয়া রিক্তা হাস্নাহানার ঝোপটার নীচে গিয়া বসিল।

ভাত লইয়া খাইবার জন্য সাধাসাধি কিন্তু কিছুতেই আসিবে না।

নিজেই হাত ধরিয়া ডাকিয়া আনিতে গেলাম। দেখি সেখানেই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কোন খেয়ালই যেন ওর নাই—একটু ভয়ও কি ওর করে না?

এমনিই জঙ্গল—সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবে না।

জাগাইয়া ঘরে ডাকিয়া আনিলাম। এবং তাহার পরদিনই বাগানের ফুলগাছগুলি সব কাটিয়া ফেলিলাম। কতদিন মাধুরী ওখানটায় সাপ দেখিয়াছিল,—কি জানি হাস্নাহানার তীব্র গন্ধে অসম্ভাবনা কিছুই নাই—বিপদ ঘটাবেই হয় তো—কি সৃষ্টিছাড়া মেয়ে!

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি।

গান কিংবা বাজনা শুনিলেই রিক্তার পাগলামিটা কিছু বাড়ে।

সুতরাং, গানের সরঞ্জামাদি সবই লুকাইয়া রাখিতাম।

গানের আদরতো নিজেরও এই সতের রকম কিছু ছিলনা বলিলেই হয়। তার আগে ওস্তাদ বলিয়া একটু নাম রটিয়াছিল।

তারপর চর্চা ছাড়িয়া দিয়াছি—অভ্যাসও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মাধুরী বলিল—দেখেছ বাবা, আজকের রকমটা ?

হুঁকার নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া তাহার দিকে কৌতূহলী নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

—এটা জেনো বাবা, ওকে নিয়ে তোমায় অনেক ভুগতে হবে। তুমিই যখন আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় টেনে তুলছো, —সেও ভাবছে......বেশতো !

—কার কথা বলছ বৌমা ?—রিক্তার ? কেন ?—আজ আবার ও কি করল ?

—করবে আবার কি ? আমার মাথা আর মুণ্ডু !.. ... ওদিকে সতের বছর পার হোয়ে গেল, কত কোরে বলি বিয়ে দাও তাহলে যদি ছেলেমানুষীটা একটু কমে।......তা শুনছোতো না কারুর কথা কিছু।......

—সতের বছর হলে হবে কি বৌমা। তুমিই তো জানো, আমার চেয়ে বেশী, এখনো ছেলে-মানুষী গেল না। নিজের বাড়ীতেই চোখে চোখে রাখি,—তবু জোর করে দুটো খাওয়াতেও পারি—যা' হয় পরের বাড়ী গেলে, অপরেতো আর ওর মর্জিকে কেউ আব্দারের চোখে দেখবে না!—হয়তো বুঝবেই না। আহার নিদ্রা কোনো কিছুরই হুঁস নেই—সারাটা অন্যমনস্ক—যেন একটা আস্ত পাগল। [illegible] অমনি করেই থাকে—

—হাঁ, পাগল না আর কিছু, সব সয়তানী। একটা কথা বললে তেলে বেগুনে জলে ওঠে। সর্ব্বদাই যেন ফোঁস ফোঁস করছে। আপন মনে যতটুকু একলা থাকে আমরা নিশ্চিন্ত—কিন্তু আজকের কাণ্ডখানা শুনেছ ?

—কি হয়েছে ?

—সকাল থেকে বতক্ষণ ধরে খুঁজি হয়েছে—পুকুর পাড়ে গিয়ে গানের বইখানা হাতে করে বসেছিল।—শেষকালে অপঘাতী একটা কিছু করে বসবে—

—তারপর......

—তাই বলছিলাম, পাগল ও নয়। হয় সয়তানী না হয় ভূতে পেয়েছে।......সহজ মানুষ কখনো খুঁজি মাথায় করে কবিতা পড়ে না—

মাধুরী নালিশ করিয়া রিক্তার সম্বন্ধে আমাকে যখন কিছুতেই সচেতন করিয়া তুলিতে পারিল না আপন মনেই গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমি যে সত্যই সচেতন হই নাই তাহা নহে।

রিক্তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনা যথেষ্টই আমাকে বিচলিত করিত।

আমারো কেমন একটা মাঝে মাঝে মনে ভয় জাগিত রিক্তাকে হয়তো বা ভূতেই পাইয়াছে।

অতি ছোট বেলা থেকেই তাহার স্বভাব একই রকম—একটু [illegible] ছাড়া ধরণের।

আজ কথাটা নূতন করিয়া মনে হওয়াতে একবার—[illegible] ডাকিয়া পাঠাইলাম।

মাধুরী পিতার কাছে [illegible] করিল, রিক্তার স্বভাব যদি [illegible] বুকের রক্ত দিয়া পূজা দিবে।

ওঝা আসিল [illegible] দিন ভোরের বেলা।

রিক্তাতো [illegible] দেখিয়াই [illegible] অস্থির—

বলিল—আমাকে কি তোমরা সঙ্ পেয়েছো নাকি ? চলে যাও এখান থেকে বলছি।

কেষ্টোর ওঝা ওস্তাদি কায়দায় দুতিনটে ফুট্‌ফাট্ মন্তর পড়িয়া বলিল—অত রাগ করছ কেন গা ? তুমি কে বলতো সত্যি করে ? কোথাকার পেত্নী ? থাকোই বা কোথায় ? বাঁশবাগানে না অশ্বত্থের ডালে ? আমি শ্যামকান্ত ওঝার শিষ্য কেষ্টোর ওঝা ! ভালোয় ভালোয় বলচি সরে যাও। কি বল—ঝাঁটা মুখে দিয়ে সরবে, না শিল নিয়ে ?

রিক্তা অতর্কিতে ওঝার হাতের সম্মার্জ্জনী কাড়িয়া লইয়া, তাহাকেই তিন চার ঘা সপাঙ্ সপাঙ্ করিয়া বসাইয়া দিল।

ওঝা সামলাইয়া লইয়া আবার মন্ত্র পড়িতে থাকে।

রিক্তা ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতের কনুই-এর কাছে এমন কামড়াইয়া দিল এবার সে রীতিমতই বুঝিয়া গেল, ভূতেই যদি তাহাকে পাইয়া থাকে তাহাকে নামানো কোনো ওঝার কর্ম্ম নয়—ওঝার বড় যদি কেহ থাকে দরকার তাহাকেই।

কিছুই হইল না।

পাড়ার লোকে বলিল,—হাকিম ডাকো ! ভূতে পাওয়া নয়, মাথার বিকৃতি হয়েছে—

হাকিম এবং কবিরাজও হার মানিলেন।

শেষে এখানকার সবচেয়ে বিচক্ষণ ডাক্তার মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকেই ডাকাইয়া আনিলাম।

তিনিও প্রথমে মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য ঔষধ দিতেছিলেন।

কিন্তু ঔষধ খাবে কে ?—রিক্তার বাধ্য বলিয়া খ্যাতি যে কোন দিনই নাই।

ঔষধের শিশি দেখিলেই ভাঙিয়া ফেলিত।—মহেন্দ্র ডাক্তার বাড়ী আসিতেই একদিন তো এমনি এক ঔষধের শিশি লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল,—যে ভদ্রলোকের কপাল কাটিয়া খানিক রক্ত বার হইয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র ডাক্তার রাগ করিলেন না।

তাঁর কেমন রোখ চাপিয়া বসিল। আমায় বলিলেন, "দেখুন ঘোষাল মশায় ! আমি আপনার নাতনীকে যেমন করেই হোক রোগমুক্ত করব। তবে যতদিন না প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারি, কিছু সময় হয়তো লাগবে। আমি নিজের ইচ্ছামত এসে দেখে ব্যবস্থা করে যাব।—কি বলেন ?

অতঃপর মহেন্দ্র ডাক্তার নিয়মিত আসিতে লাগিলেন।—কিন্তু আর কোন ঔষধই ব্যবহার করিতে দেন না। যেন আমাদেরই কোন বন্ধু বা আত্মীয়, বেড়াতে আসেন শুধু, আমাদের সঙ্গে কথা কয়ে আলাপ করে তার পর চলে যান।

অবসর মত রিক্তার উপসর্গগুলি ভালো ভাবেই তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘোষাল মহাশয় ! বলতে পারেন কতদিন থেকে ওর এরকম মেজাজটা খারাপ হয়ে উঠেছে ?

আমি বলিলাম—ছেলেবেলা থেকেই এই রকম।… তবে ক্রমশঃই যেন বেশী বলে মনে হচ্ছে। তা'ছাড়া কোন লোক কাছে না থাকলে ওকে দেখবেন ওরকম শান্ত স্থির মেয়ে আর হয় না। অথচ কেউ কথা কইতে গেলেই যত গোল—ওরিই যেন ক্ষেপে উঠে !

—ওর বাপ মা কারও কখনও এরকম কোন পাগলামি রোগ হয়েছিল ?

—না !

—বাপ এখন কোথায় ?

—জানিনা

—ওর মা, প্রসবের কতদিন পরে মারা যান ?

—রিক্তা তখন—মাসখানেকের শিশু—

—মারা যান কি রোগে ?

—প্রসব করবার পরই—পড়ে গিয়েছিলো—সেই থেকে

ধনুষ্টঙ্কারের মত ফিট্ হতে থাকে—একমাস ভুগে হটাৎ একদিন হার্ট ফেল।

—তার আগে তাঁর কোনও শক্ত ব্যারাম কিছু ছিল ?

—না, সাধারণতঃ তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালোই ছিল!

—কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

—অন্তঃসত্বা অবস্থায় একদিন, একটা ব্যাপার ঘটেছিল, সত্যি সাপে কামড়েছিল কি না জানি না,—তবে সুবালা বললে কি যেন তার পায়ে দাঁত বসিয়ে গেছে অন্ধকারে—যন্ত্রণায় তো মেয়ে আমার অস্থির হয়ে পড়লো। আমি সে সময় ওদের বাড়ীতেই ছিলাম। পায়ে সত্যিই দেখলাম দুটী দাঁতের দাগ। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাকলাম। তিনি তো সে যায়গাটা চারফালি করে চিরে পোটাসিয়ম পারম্যাঙ্গানেট ঘষে দিয়ে দিলেন। তারপর অ্যান্টিভেনাম ইন্‌জেক্‌সানও—দিন দুই তিন জ্বালা যন্ত্রনা ভোগবার পর সে যাত্রা তো বেঁচে গেল। কিন্তু সেই থেকেই কি রকম—রোজই সাপের ভয় দেখতো। ঘুমিয়েও থেকে থেকে মাঝে মাঝে আঁতকে উঠ্‌ত যেন একটা সাপ তার গায়ের ওপর উঠে বসেছে। এমন অনেক দিনই শুনেছি।—

—আমার কি মনে হচ্ছে শুনবেন ?······মায়ের মনের সর্পভীতি থেকেই মেয়ের এই রোগ। ভ্রূণ অবস্থাতেই মায়ের এবং বাপের স্বভাবের বিশেষত্ব সবখানিই সন্তানে গিয়ে বর্ত্তায়। মায়ের মনের সর্প ভীতি হ'তেই সাপের প্রকৃতিও রিক্তাকে আচ্ছন্ন করেছে। এরকম যে হতে পারে তার থিওরিটাই এতোদিন পড়েছিলাম, আজ চাক্ষুষ দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি! যাই হোক—সমস্যাটা এবার অনেকটা সোজা হয়ে আসছে। দেখবেন, সাপের স্বভাবের সত্যিকার যাকিছু বিশেষত্ব ওর প্রকৃতিতে তার অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে।—সাপের মতই সে যেন ভয় পেলেই ক্ষেপে উঠে ছোবল মারতে আসে। তাকে উত্তেজিত না করলে সে কাউকে কিছু বলবেনা।—তাছাড়া আর একটা জিনিষ, —সেদিন আপনার কাছে হাস্‌নাহেনা ঝোপের ধারে ঘুমিয়ে পড়া সাপের গর্ত্তের কাছে গিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারা—এ সব কথা শুনেছি। ফুলের গন্ধে রিক্তার অত্যধিক আকর্ষণের প্রমাণও অনেক পেয়েছি!—তাছাড়া গান এবং বাজনার দিকেও তার মোহ রয়েছে যথেষ্ট!—আপনারা একটা কাজ ভুল করেছেন এতো দিন। সাপের ভয় দূর করবার জন্য ফুল বাগান তুলে দিয়েছিলেন, গান এবং বাঁশী শুনলে রিক্তাকে চঞ্চল হতে দেখে ওসব পাট বাড়ী থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন,—আমার মনে হয় এর জন্যেই রোগও ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌ছে এর প্রমাণটাও আজ থেকে আমি নিজে যাচাই করে দেখ্‌ব।

মহেন্দ্র ডাক্তার নিজে বাঁশী বাজাতে পারতেন মন্দ নয়—এককালে অভ্যাসও ছিল বেশ।

সেইদিনই একটা বাঁশী নিয়ে এসে, বাজালেন।

কিন্তু আশ্চর্য্য,—রিক্তার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। একেবারে ডাক্তারের কাছটীতে আসিয়া এত দিনকার সমস্ত বিরাগ ভুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।—যেন আত্মহারা—ওর মত শান্ত, স্থির আর বুঝি কেউ নাই।

মহেন্দ্রবাবু বাঁশীটী রিক্তার হাতে দিয়া বলিলেন,—তুমি বাজাবে মা ? দেখো না পারো কি না।—

রিক্তা যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছে এমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল।

—এম্নিই দিনের পর দিন—

ডাক্তারের শিক্ষাতেই দুতিনটা গৎও আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

দেখিলাম গানের সুরের বিভিন্ন পর্দ্দা বুঝিবার মত অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে এমনটী সচরাচর দেখা যায় না। রিক্তা এখন কাকাবাবু বলিতে যেন অজ্ঞান।

ডাক্তার রোজই নিয়মিত আসিয়া গান শিখাইতে লাগিলেন।

ছয় মাসের মধ্যেই রিক্তাকে আলাদা মানুষ বলিয়া মনে হইল।

সর্ব্বদাই প্রফুল্ল মুখ। যে কোন কাজেই পূর্ণ উৎসাহে মনোযোগ দেয়—একটু ক্ষোভ ও নাই।

এহেন পরিবর্ত্তনে আমার চেয়েও হয়তো মাধুরীর আনন্দটাই বেশী হইয়াছিল।

জননী না হইলেও সে যে রিক্তার মায়ের মতই।

মাধুরীরও মনে হইল—যেন তার আর কোন দুঃখ নাই জীবনে।

ডাক্তারের পরামর্শে আবার নূতন করিয়া ফুল বাগান রচনা করিতে মন দিলাম।

ডাক্তারকে কি বলিয়া পুরস্কৃত করিব জানি না। তাঁকে একদিন বলিলাম আপনার উপকার তো টাকা দিয়া শোধ দিতে পারিব না!—আমরা চিরজীবন ঋণী রহিলাম।

ডাক্তার উত্তরে বলিলেন,—আমার নিজেরও কম উপকার বা আনন্দ হয় নাই। নূতন অভিজ্ঞতা লাভটা তুচ্ছ নয় ঘোষাল মহাশয়! আপনাদের সংস্পর্শে না এলে তো আমার এই শিক্ষাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

রিক্তার পুনর্জীবনের দিন তার চির-বিষাদ-মাখা নামটাও পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম রাখিলাম—তৃপ্তি।



—অর্ব্বাচীন?

—শ্রীশরৎচন্দ্র বিশ্বাস

গত ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় 'অর্ব্বাচীন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে সহযোগী 'প্রবাসী' তাহার চৈত্র সংখ্যায় 'কষ্টি পাথরে' উক্ত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত! গুপ্ত মহাশয়ের আলোচনার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিতেও কসুর করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অমন যুক্তিতর্কহীন অসার প্রবন্ধ আজিও বাংলা মাসিক পত্রিকায় স্থান পায়!—তাহার উপরে আবার উদ্ধৃত! হায় রে লজ্জা!

গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধটীর অমন অদ্ভুত শিরোনামাটি নির্ব্বাচন করিয়াছেন কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া? যে সকল তরুণ পূজারী ও পূজারিণী তাঁহাদের অপূর্ব্ব পূজা সম্ভার লইয়া আজ বাণী-মন্দিরের প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া অমন অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবার অধিকার তিনি পাইলেন কোথা হইতে? তর্ক বিচারে বসিয়া সহসা 'বা'-'তা' বলিয়া গালাগালি দেওয়াটা যে একেবারেই ভদ্রতা-বিরুদ্ধ সে কথাটাও কি আজকাল বয়স্ক-শিশুদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিয়া গুপ্ত মহাশয় তরুণ সাহিত্যসেবী ও লেখিকাদের লক্ষ্য করিয়া যে অশিষ্ট বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ সমালোচকের স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া মনোযোগ সহকারে তাঁহার ঐ প্রবন্ধটি আগাগোড়া পাঠ করিয়া বিচারে বসিলে তাঁহাকেও কি ঐ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না?

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন,—"সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে অতিভোজ ও গণতন্ত্র যুগের বিভীষিকা আসিয়া

মাঝিরা একতালে দাঁড় টানিয়া আসরে আমরা চলিয়া আসিতেছিলাম। ফরাসী একাডেমির মত কোনও কড়া পাহারা সিংহদ্বারে অথবা দেউড়িতে ছিল না ; ভিক্টোরীয় যুগের সুরুচি ও শুচিতা আমাদের কলাভবন-প্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত করে নাই ; অথচ আমরা আমাদের দেশের সমাজের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারের তর্জনী হেলনে যে পথ ধরিয়া আসিতেছিলাম, সে পথের দাবী তরুণ প্রবীণ সকলেই স্বীকার করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শব্দ শিল্পী, চিত্রশিল্পী, পাঠক, দর্শক, গায়ক, শ্রোতা সকলেই সেই পথে সুন্দরের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শাসনের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও বিদ্রোহের লক্ষণ সূচিত হয় নাই। আজিকার এই আধুনিক বস্তুতন্ত্রতার দুঃশাসন, সভামধ্যে কমলাদেবীর বস্ত্রহরণ করিতেছে দেখিয়া, প্রবীণ সমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।"

অধোবদন না হইয়া লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকাদের মত প্রবীনগণের বদনমণ্ডল হয়তো অবগুণ্ঠনে আবৃত করাই উচিত ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে আমাদের সমাজের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার-শাসনের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও বিদ্রোহের লক্ষণ সূচিত হয় নাই, গুপ্ত মহাশয় এ অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিলেন কোথা হইতে? বাংলা ভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে তো ইহার অসত্যতা বেশ স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল বন্যা সংস্কার-শাসনের গণ্ডী ভাঙিয়া আমাদের সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে যে তুমুল আন্দোলন যুগে যুগে তুলিয়াছে, তাহার অনেক কিছুই তো আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে চিরস্থায়ী সম্পদরূপেই রহিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও মুকুন্দ রাম বা ভারতচন্দ্রের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু বিদ্যাসাগরী যুগের ভাব ও ভাষা যে বঙ্কিমী যুগে এক প্রকার অচল হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা তো আর বেশী দিনের কথা নহে। আবার বঙ্কিমী যুগের একাধিপত্য রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহে বিনষ্ট হইয়াছে। আজ হয়তো আবার নতুন অভিযান সুরু হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া আসল অভ্যতার কাহারুরী লইয়া মাসিক পত্রিকায় তিন চার পৃষ্ঠা জুড়িয়া প্রবন্ধ ছাপাইবার কি প্রয়োজন ছিল ?

সমাজ-শাসন যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে, সংস্কারের মোহে যেখানে মানুষের স্বভাবের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, স্থবিরের উপদেশ যেখানে মহামানবতার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, প্রাণবান্ লেখকের স্বাধীনচিন্তায় আঘাত তো সেখানে লাগিবেই। তাই রঘুনাথ শিরোমণির শাস্ত্র-শাসন বঙ্কিম চন্দ্রের কুন্দনন্দিনীকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে নাই, রবীন্দ্রনাথের নষ্ট-নীড়ে নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক চেতনাটুকু মরে নাই, শরৎচন্দ্রের চন্দ্র নাথও শেষে সরযূকে লইয়াই সংসার পাতিয়াছিল। আর 'অতি আধুনিক' বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, এবং যাহাদের উপরেই গুপ্ত মহাশয়ের আক্রোশের ঝাঁঝটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই শৈলজা, প্রেমেন, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, সৌরীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখায় ঐ মতামত গুলির পোষকতা ছাড়া হয়তো আরও একটা জিনিস আছে, যাহা আমাদের এই দারিদ্র্যনিপীড়িত দুর্ব্বল পঙ্গু জীবনকে এক উচ্চতর মহৎ জীবনের অভ্যুদয়ে ইঙ্গিত করে। শৈলজার অতসীর প্রায় সবগুলি গল্প এবং "শশীপণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী" প্রেমেনের "ভবিষ্যতের ভার" অচিন্ত্যের "দুইবার রাজা" সৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের "ভবিষ্যত" প্রভৃতি গল্পে ঐ শেষোক্ত ইঙ্গিতই বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত লেখকগণ ছাড়া আরও এমন অনেক তরুণ লেখক লেখিকা আজকাল লিখিতেছেন যাহাদের লেখার মধ্যে আমাদের এই পরপদানত দীন, হীন চিরদুর্ব্বল দারিদ্র্যপীড়িত পঙ্গু জীবনের বিরুদ্ধে একটা আসন্ন বিদ্রোহের পরিষ্কার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে। অথচ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ইঁহাদের কণ্ঠ হইতে নূতন কোনও বাণী উদ্গীরিত হইতেছে কি না বহু আয়াসেও তাহা ধরা যায় না।' কিন্তু এই না ধরিতে পারার অপরাধ কাহার? যে লেখে তাহার, না, যে না ধরিতে পারে তাহার?

গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ইঁহারা (অর্থাৎ তরুণ

সাহিত্য-সেবীরা) আধুনিক সমাজ হিসাবে বস্তুতান্ত্রিক ; আজ তাঁদের বস্তুতন্ত্রতা নরনারীর যৌবন-ঘটিত মালমসলা লইয়া একটা কিছু গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত। ব্যাপারটা অত্যন্ত আধুনিক ; এই শ্রেণীর লেখক-লেখিকা আপনাদিগকে রিয়ালিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছেন না, বরং একটু গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।'

গুপ্ত মহাশয় দেখিতেছি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিতে পারেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ! কিন্তু কোন্ তরুণ সাহিত্যিক নিরিবিলি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কানে কানে ঐ কয়টা কথা চুপি চুপি বলিয়া আসিল? সত্যকারের সাহিত্যিক মাত্রেই সুন্দরের উপাসক এবং তাঁহাদের সাহিত্যও সৌন্দর্যের উপাসনা-গান। অথচ সত্য হইলেই কিছু সুন্দর হয় না এবং সুন্দর হইলেই কিছু সত্য হয় না। কিন্তু এমন একটা যায়গা আছে যেখানে সত্যও যাহা, সুন্দরও তাহাই এবং সেখানেই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। তরুণ সাহিত্যিকেরা ইহা জানে ; এবং আরও একটা কথা ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানে যে, কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য লইয়া কাব্য রচনা চলিতে পারে কিন্তু বস্তুতন্ত্রতাকে বাদ দিয়া গল্প বা উপন্যাস রচনা চলিতে পারে না, অথচ সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে আবার সকল রচনাই ব্যর্থ হইয়া যায়। 'যৌবন-ঘটিত মালমসলা' বলিয়া গুপ্ত মহাশয় কি বুঝাইতে চান? নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, প্রেম, বিরহ, মিলন প্রভৃতি তো বহুদিন হইতেই কাব্যে ও গল্পে স্থান পাইয়া আসিতেছে এবং যৌবনের ঐ বিশেষ ভাবটীকে বাদ দিয়া জগতের কোনও উচ্চদরের কাব্য বা উপন্যাস সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তো—কখনো শুনা যায় নাই! বোধোদয় বা ইসপ্‌স্ ফেব্‌লে ও জিনিষটা নাই বটে এবং কোনও দেশের দর্শন শাস্ত্র বা জ্যোতিষ গ্রন্থও উহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্য ও উপন্যাস হইতেও কি উহা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে?

গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন,—"এডওয়ার্ডীয় ও জর্জ্জীয় যুগে ইংরাজ সাহিত্যিক নূতন নূতন ভাব তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন ; কবি নূতন ছন্দে, রূপদক্ষ শিল্পী নূতনরেখা বিন্যাসে সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তবুও বিদ্রোহের সুরে কোনও নূতন বাণী শ্রুত হইল না। আমি গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার অবস্থার কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সাহিত্যে চুম্বন-আলিঙ্গনের ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু এমনভাবে ছিল যে, কোনও আইডিয়ালিষ্ট তাহাতে ব্যথিত হইতেন না।" এই যুক্তিবিহীন কথাগুলাই কি সত্য বলিয়া মানিতে হইবে? অন্য প্রমান উদ্ধারের প্রয়োজন নাই, লেখক মহাশয়ের নিজের কথা হইতেই তো ইহার অসত্যতা প্রমাণ করা যায়। ইংরাজ সাহিত্যিকেরা যখন নতুন নতুন ভাবতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন তখন বিদ্রোহের সুরে কোনও নতুন যুগের বাণী শ্রুত হইল না কেমন করিয়া? ভাবের নবত্বই তো নতুন যুগের বিদ্রোহ-বাণী। ভাবই তো আসল ; বাণী বা ভাষা তো শুধু তাহার বাহিকা মাত্র। গুপ্ত মহাশয় বিদ্বান লোক ; কারণ, যে ভাবে তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে 'রুষিয়া, জার্ম্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, ইটালি, ইংলণ্ড একেবারে হুড়মুড় করিয়া' আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইব্‌সেন্, ষ্ট্রীণ্ডবর্গ, ব্রিয়ো, বার্ণার্ডশ', ফ্রয়েড, অয়কেন্, এমন কি ইণ্টারন্যাশনাল জর্ণাল অব এথিক্‌স্ ও মার্কিন লেখিকাকে পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন তাহাতে উহা আর অস্বীকার করিবার এতটুকুও অবকাশ তিনি রাখেন নাই। কিন্তু এত সত্বেও চুম্বন ও আলিঙ্গন সম্বন্ধে যে উক্তি তিনি করিয়াছেন তাহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রমাণিত হইয়াছে ছাড়া আর কিছুই হয় নাই।

'এখন যাহাদের বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স, তাহাদের মধ্যে খুব কম ছেলে-মেয়ে কাশীদাশ কৃত্তিবাসের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত।'—ইহা গুপ্ত মহাশয়ের মিথ্যা-দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নহে, যেমন অনুরূপা দেবী একদিন বলিয়াছিলেন, আজকালকার ছেলে-মেয়েরা সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

বর্ত্তমান গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও মিথ্যা। "কাঁচা প্রেম, বিরহ, বুকভাঙ্গা, স্বামীর অবহেলা, মৃত্যুমুখে পতন অথবা অবৈধ মিলনাকাঙ্ক্ষার হা-হুতাশ" এই সাহিত্যই তরুণের নয়। তাঁহারা এমন জিনিস গল্প-সাহিত্যে দান করিয়াছেন যাহা বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের কয়টা গল্প গুপ্ত মহাশয় পড়িয়াছেন ? রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়াও এমন অনেক নবীন লেখকের নামোল্লেখ করা যায়, যাহাদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইলে গুপ্ত মহাশয়ের বাস্তবিকই কিছু উপকার হইবে। শৈলজানন্দ, ৺গোকুল নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রভৃতির এমন অনেক রচনা আছে যাহা যথার্থই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গুপ্ত মহাশয় সে গুলি পড়িয়াছেন কি ? তবে "বিশু ডাকাতের" মতো কেবল মাত্র "খাঁটি ডাকাতের কাহিনী" আমাদের সাহিত্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের নিকট কিন্তু হতাশ হইতে হইবে। তাঁহার আশা যেখানে পূর্ণ হইতে পারে আমি সে সন্ধান তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি। গুপ্ত মহাশয় দিন কতক সময় করিয়া বটতলায় ঘুরুণ। "চিঠিতে খুন" "সয়তানী দরিয়া বিবি" প্রভৃতি খান কয়েক খুব ভালো ভালো খুন-জখম, গুমখুন ও ডাকাতীর কাহিনী লেখা পুস্তক প্রচুর সেখানে প্রকাশিত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় একবার পড়িলে জীবনে আর কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

সর্ব্বশেষে আমি কেবল মাত্র একটি কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। তরুণ সাহিত্যিকদের কাহারো কাহারো লেখায় কোন না কোন দোষ ত্রুটি যে নাই এমন কথা বলা চলে না। অনেকের লেখায় ন্যাকামী ভাবের আধিক্য বা অন্য ত্রুটিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাই বলিয়া দু এক জনের অক্ষমতার নিদর্শন লইয়া সমস্ত তরুণ সাহিত্যিকদের বিচারে বসিলে মুড়ি মিছরির একদর করা হয়। যাহার যে যে লেখায় দোষ ত্রুটি আছে তাহার সেই সেই লেখার দোষ ত্রুটি লইয়া আলোচনা চলুক তাহাতে কাহারো কিছু আপত্তি করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের মতো তথাকথিত সমালোচকগণ যদি শুধুই গালাগালি করিবার জন্য কলম ধরেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই বাংলা সাহিত্যের যথার্থই দুর্দ্দিন আসিয়াছে বলিতে হইবে।

——:০:——

আলো ও ছায়া।

—শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য্য

রাস্তায় হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছি,—হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। বোধকরি সেকেণ্ড ক্লাসে এক সঙ্গে পড়িয়াছি।

নামটা? হাঁ মনে পড়িয়াছে—হরিহর।

হরিহর বলিল—চিনতে পার?

উত্তর দিলাম—না পারবার কারণ তো নেই বন্ধু! তোমারই মতন যখন পায়ে হেঁটে চলেছি, মোটরে উঠিনি,—তখন—

বন্ধু হাসিলেন।

নিকটেই তাহার বাড়ী, কাজেই এককাপ চা'য়ের নিমন্ত্রণটা নিতান্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

যে মেয়েটী চা আনিয়া দিল, সে হরিহরের ছোট বোন্—সুধা! নয় দশ বছরের ফুট ফুটে মেয়েটি। বড় বড় টানা দুটি চোখ, একরাশ চুলের বাহার ও ছোট খাট হাল্কা গড়নটা দেখিয়া হঠাৎ একটি ব্যথার স্মৃতি মনের ভিতর দাগ কাটিয়া গেল। গত বৎসর ঠিক এই সময়েই এমনি একটি বোনই আমি হারাইয়াছি!......

বিদায় লইবার অনেক আগেই সুধা আমার সহিত রীতিমত ভাব করিয়া ফেলিল। 'আবার কবে আসিব' এবং কবে তাহাকে বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া যাইব,'—তাহার উত্তরটাও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িল না।—

কিন্তু শীঘ্রই বিদেশে কর্ম্মখালির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়াতে, একশিশি লজঞ্জুস্ ও একটী জরির ফিতা দেওয়া ছাড়া তাহার আর কোন আবদারই রাখিতে পারি নাই।

পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে।

সুধার স্মৃতি মন হইতে একরকম মুছিয়াই গিয়াছিল বোধ হয়।

হঠাৎ অফিসের কাজে একবার কলিকাতায় আসিতে হইল।

তিন দিনের ছুটী! কাজ সারিতেই দুইদিন গেল।

তৃতীয়দিন একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।

পথেই হরিহরের বাড়ী,—চোখে পড়াতে সুধার কথা মনে পড়িয়া গেল।—

হাস্যচপল চঞ্চল হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বোনটী......

দুয়ারে কড়া নাড়িয়া ডাকিলাম—হরিহর, হরিহর, আছো?

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটী রুদ্ধ জানলার কবাট খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়িল—পাঁচ বছর আগেকার সেই শিশু-সরল কমনীয় লাবণ্যমাখা ফুটফুটে মুখখানি! পরিবর্ত্তনের ভিতর শুধু দেখিলাম—পাতাকাটা চুলের সিঁথির মাঝখানে সিঁদুরের সরু রেখাটী জল্ জল্ করিতেছে।

পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত ডাকিলাম এই যে সুধা! কিন্তু হঠাৎ একি হইল?

দেখিলাম—ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণা ও ভর্ৎসনা এই চারিটী অনুভূতি তাহার সেই সুন্দর দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া, তাহা নিতান্ত ম্লান ও শ্রীহীন করিয়া দিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে জানলাটীও সে সশব্দে রুদ্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়েই একটী অপরিচিত ছেলে দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চান্ মশাই?

সটান রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম। কি ভুলই না করিয়াছি!

হরিহরের সহিত আর দেখা করি নাই!

পরিহাসে পরিণয়—

—শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার

—সত্যি ভাই, এমন মজার তামাসা হবে যে কি ব'লব! আমি বরং পড়ছি তুমি শোন।—

মার্কিন যুবকটি তাহার বন্ধুকে নিম্নোক্ত পত্রখানি পড়িয়া শুনাইল—

প্রিয় মহোদয়া,

'মর্ণিংকল' পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়াছি। অপরিচিত হইয়াও আমি আপনাকে যে এই পত্র লিখিতেছি সেজন্য ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিজে একজন শিক্ষক—দশ বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছি। এজন্য আমার কোন দিনই বিরক্তি আসে নাই।—তবে আমার একক-জীবনের নিরানন্দ নিঃসঙ্গতা দূর করিবার জন্য আমি একটী সুধীরা, স্নেহপ্রাণা শিক্ষিতা সঙ্গিনী খুঁজিতেছি। আমার মাসিক উপার্জ্জন দুইশত টাকা—এরূপ লোককে জীবনের সঙ্গীরূপে মনোনীত করিতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে? আমি দেখিতে খুব যে সুন্দর তা নই। উচ্চতায় আমি ৫ফুট ১০ইঞ্চি,—বয়স ছত্রিশ বৎসর। জীবনে কখনও কোন নেশার বশীভূত হই নাই। আমার সঠিক পরিচয় আপনাকে প্রদান করিলাম। আশা করি শীঘ্র পত্রোত্তরে আপনি সম্মতি বা অসম্মতি জানাইয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বশংবদ—
এগবার্ট সামার্স্,
রুবি ক্রীক; নিভাডা।

—দেখো—বন্ধু, এ পত্র পেয়ে তাকে আসতেই হবে।—হ্যাঁ এইবার ঠিকানাটা—

অতঃপর, সেই যুবকটি 'মর্ণিংকলের' বিজ্ঞাপন-স্তম্ভটী খুলিল। সেখানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটীও ছিল—

'যদি কাহারও শিশুর জন্য কোন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন থাকে তবে আমি সে কার্য্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। অথবা কোন সচ্চরিত্র যুবক বিবাহেচ্ছুক থাকিলে আমি তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতেও সম্মত আছি।—আমি ফরাসী ভাষা ভাল করিয়া জানি, সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণা,—ইংরাজী ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ভদ্রবংশ-জাতা। এইটুকুই আমার যোগ্যতা। ঠিকানা—ই, আর, —মর্ণিংকল। স্যান্ ফ্রন্‌সিস্‌কো।

যুবক খামের ওপর ঠিকানাটী লিখিয়া চিঠি বন্ধ করিল। —কানই পত্র খানি পাবে; পরন্তু নিশ্চয়ই এর জবাব লিখে পাঠাবে।—

দুই বন্ধুতে এই মধুর পরিহাসের অপূর্ব্ব কৌতুকে প্রাণ ভরিয়া হাসিল। তাহার পর পত্রখানি ডাকযোগে পাঠাইয়া দিল।

যথাসময়ে উত্তরও আসিল—

প্রিয় মিষ্টার সামার্স্—

আপনার পত্রের লিখন ভঙ্গীতে আমি বিস্মিত হ'য়েছি! এরূপ পত্রের তিনটী অর্থ হ'তে পারে: অপমান; বিদ্রূপ, অথবা প্রকৃত সত্য। যদি প্রথম অর্থই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে একটী ভদ্রমহিলা চাকুরী বা বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে ব'লে, তার প্রতি এরূপ জঘন্য অপমানসূচক পত্র ব্যবহার ক'রতে পারে এমন নীচ লোক জগতে আছে—এ কথা বিশ্বাস কর'তেও প্রবৃত্তি হয় না। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ অভিপ্রেত হয় তবে আমি বলতে বাধ্য যে উপহাসটী চমৎকারই হ'য়েছে আমার অবস্থারই উপযুক্ত। তবে

যদি এ পত্র সত্যভাবেই লেখা হ'য়ে থাকে তবে এ খুব নূতন কথাই বটে; কেবল একজন পুরুষ একটী মেয়েকে না দেখেই তাকে বিবাহ করতে রাজি! আমার নিজের রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে—আমি খুব গৌরীও ই কালোও নই—চুল আমার সোনালী রঙ্গের, চোখের তারা কালোই। আমি মাঝারী রকমের লম্বা, দোহারা গড়ন। বয়স দেখায় কুড়ির মত লোকে বলে তার চেয়েও কম নাকি আসল কথা কুড়ির কিছু বেশী। আর বিশেষ কিছু লেখ্‌বার নেই।—

বশংবদ, ই, আর—

যুবকদ্বয় এই উত্তর পাইয়া বিশেষ একটু বিস্মিতই হইয়া পড়িল।—তরুণী যে তাহাদের পত্রখানিকে এমন ভাবে বুঝিয়া ফেলিবে আশা করে নাই। সুতরাং, তাহারা একটু ফাঁপরেই পড়িয়া গেল।—অতঃপর এ কৌতুকের জেরটানা চলে কি না! যাহাই হউক, অনেক বিবেচনার পর দুইজনে মাথা ঘামাইয়া তরুণীর পত্রের এক উপযুক্ত প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইল।

কুমারী ই, আর ও মিঃ এগবার্ট সামার্‌স্‌ এর মধ্যে যে পত্র বিনিময় চলিয়াছিল, তাহার সবগুলি এখানে প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কেবল যুবকদ্বয়ের শেষ পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই, অপূর্ব্ব পত্র বিনিময়ের উপসংহারটুকু বোঝা যাইবে।

মিঃ এগবর্টের শেষ পত্র এইরূপ—

বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমি ডিপোয় গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ—সে জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। মোটকথা আপনি যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই সে আপনাকে ডাক গাড়িতে সকল সংবাদ দিবে। ডাকগাড়ির চালককে বলিয়া রাখিবেন,—সে আপনাকে 'রুবি ক্রীকে' নামাইয়া দিবে,—সেখান হইতে আমার বাড়ী দশ মিনিটের রাস্তা। আমি আপনার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিব। অন্যান্য বিষয় সাক্ষাতেই স্থির হইবে।

অন্যান্য বিষয়—আর কিছুই নহে, বিবাহের আয়োজন। এ বিবাহ যে সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে কুমারী পূর্ব্ব হইতেই স্থির নিশ্চয় ছিলেন।

এ স্থলে কুমারীর একটু পূর্ব্ব পরিচয় আবশ্যক।

কুমারীর সম্পূর্ণ নাম—ইষ্টার রেমণ্ড। যখন সংবাদ-পত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বহুদিন ধরিয়া তিনি সহরের নানাস্থানে কোন ভদ্র পরিবারে একটী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল মনোরথ হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে সংবাদ পত্রের আশ্রয় লইতে হয়।

তিন দিন তাঁহার বিজ্ঞাপনের কোন উত্তরই আসিল না।

চতুর্থ দিন তিনি ভাবিলেন—আজ যদি কোন উত্তর না আসে তবে আর কোন আশা নাই। এইটুকুই শেষ আশা—বলিয়াই কুমারী টেবিলের উপর তাহার টাকার ব্যাগটি ঝাড়িলেন। মাত্র কয়েকটী মুদ্রা তখন সম্বল।

—এই কয়টী ফুরাইলেই সব আশাও ফুরাইবে।—কুমারী দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটু পরে তাঁহার এক প্রতিবাসী সহসা আসিয়া একখানি নীলবর্ণের খাম দিয়া গেল। আশার দীপ্তিতে কুমারীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াই উঠিল

পত্র পড়িয়া কিন্তু কুমারী একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। আশার কিরণ রেখা যেন নিরাশার নিবিড় তিমিরে বিলীন হইয়া গেল—মুখেও বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিল। কুমারী আবার পত্রখানি পড়িলেন—তাহার পরও একেবার—

কিন্তু অতল চিন্তাসাগরেই তাঁহার মন নিমগ্ন হইয়া রহিল।

পত্র লেখক যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা একান্তই বিদ্রূপাত্মক। কুমারী প্রথম ভাবিলেন—লোকটি নিশ্চয়ই বিকৃত মস্তিষ্ক। কিন্তু এই পত্রের কি কোন উত্তর দিবেন

—না স্বর্ণার সহিত একেবারে উপেক্ষা করিবেন! তাঁহাকে উপদেশ দিবারও কেহই ছিল না। শেষ তিনি ভাবিলেন—উত্তর দিতে ক্ষতি কি? লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন—ইতিমধ্যে অন্যত্র চাকরীরও চেষ্টাও চলিবে।

এক সপ্তাহ গত হইল—তাহার পর আর এক সপ্তাহও—কুমারীর হাতে আর কিছুই নাই—তিনি তাঁহার পরলোকগতা স্নেহময়ী জননীর প্রদত্ত অলঙ্কার দুই একখানি, বিক্রয় করিয়া আপনাকে অনাহারের কবল হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে কিন্তু অজানিত লেখকের সহিত তাঁহার অনেক পত্র বিনিময়ও চলিল। তাঁহার মন আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বিষাদের দোলায় দুলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন কুমারী তাঁহার জিনিষ পত্র ও পোষাক পরিচ্ছদগুলি সুন্দরভাবে ট্রাঙ্কে গুছাইয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পরদিনই তিনি নিভাডার, 'রুবি ক্রীকের' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বেশ ভূষার মধ্যে সেদিন যেন একটু বেশী পারিপাট্য লক্ষিত হইল।

বিজ্ঞাপন সাহায্যে বিবাহের বিষয় কুমারী সংবাদপত্রে ও পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন—কিন্তু এরূপ ঘটনা যে তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিবে এ কথা তাঁহার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না। তাঁহার চিত্ত অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া—কোন স্থিরতাই নাই কোথায় পরিণাম।

গাড়িতে বসিয়া যতই তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার মন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগত্যা নিজের মনকে এই বলিয়াই প্রবোধ দিলেন ইহা ভিন্ন তাঁহার উপবাসের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। তিনি উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে নিরত হন নাই।—হইয়াছেন নিষ্ঠুর অদৃষ্টের তাড়নায়। নিমজ্জনোন্মুখ হতভাগ্যের সম্মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তিনি ইহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার অন্য গতি কি ছিল?

শেষে তিনি যে ডিপোতে অবতরণ করিলেন তাহা একটী পল্লীগ্রাম মাত্র। সেখানকার লোকজনের আচার ব্যবহারও কিছুমাত্র মার্জ্জিত নয় ডাক গাড়ির সম্বন্ধে লোক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেই—পরস্পরের মধ্যে অভদ্র-ভাবে নানা রকম কাণাকাণি করিতে লাগিল। কুমারী সঙ্কোচে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

দুইটী যুবক পথে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিল। একজন অপরকে বলিল—ঐ যদি সেই মেয়ে না হয় তো আমি কি ব'লেছি।—

অপরটি বলিল—কি বোকা! মাথা একেবারে ভরা যেন ছাই! আহা! ওর সঙ্গে এরূপ তামাসা করা করা উচিত নয়।

—ডিক, বাঁদরামি ক'রোনা। একেবারে যে দয়া উথলে উঠলো দেখছি— এই বলিয়া প্রথম যুবক দ্বিতীয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া একটী হোটেলে গিয়া উঠিল। সেই হোটেলের সম্মুখেই ছয় ঘোড়ার ডাক গাড়ি খানি আরোহীদিগকে লইবার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল।

চালক ভদ্রভাবে ইষ্টারকে উঠাইয়া, আপনার বসিবার স্থানের পশ্চাতেই তাহার স্থান করিয়া দিল। ডাকগাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে পূর্ব্বোক্ত যুবকদ্বয়ও একখানি বগীতে চড়িয়া দ্রুতবেগে অনুসরণ করিল।

কুমারী চালককে বলিলেন তিনি 'রুবি ক্রীকে' নামিবেন। চালক কিন্তু এ কথায় বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—'রুবি ক্রীক'! আপনি দেখছি কখনও এ রাস্তায় আসেন নি? সেখানে তো কোন লোকজনই থাকে না।

কুমারী চঞ্চল চিত্তে উত্তর করিলেন—সেখানে আমার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করিবেন।

চালক আর কোন কথা বলিল না।

কয়েক মাইল যাইবার পর ডাকগাড়ি একটী তৃণগুল্ম পরিবেষ্টিত নির্জ্জন প্রান্তরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল।

চালক বলিল—ক্লবি ক্রীক্। কই, কেহই তো এখানে নাই!

কুমারী অপরকে নিজের দুর্ভাবনা জানিতে দিতে চাহিলেন না। বলিলেন—তা হোক। তাহার পর নিঃশব্দেই তিনি নামিয়া পড়িলেন। ডাকগাড়ি খানিও নিজের উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যার নিবিড় যবনিকা ধরণীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দিবসের কর্ম্মকোলাহল যেন তন্দ্রানীরব। কুমারী ব্যাগহস্তে কম্পিত বক্ষে সেই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিনি ভাবিলেন, কোন কারণে ঠিক সময়ে এগবার্ট পৌঁছিতে পারেন নাই। এখনই তিনি আসিবেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু এগবার্টের কোন নিদর্শনই দেখা গেল না। তরুণীর মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইল। হয়তো কোনও দুষ্টের প্রতারণায় তিনি প্রতারিত হইয়াছেন! তবু তিনি শেষ সাহসে বুক বাঁধিলেন।

এমন সময় দূরে গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। কুমারী লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্ম ময়দানের এক সঙ্কীর্ণ রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। তারপর দ্রুতপদে সেই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইলেন। দুই দিকে নিবিড় তরু শ্রেণী—চারি দিকে তৃণ গুল্ম—কিন্তু কুমারী থামিলেন না। অবশেষে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন পত্রে যে স্কুল গৃহের উল্লেখ ছিল সেই স্কুল গৃহখানিই তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। নিকটেই একটী ক্ষুদ্র কুটীর—আর সেই কুটীরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান।

কুমারী কোন কথা না ভাবিয়া সেই বাগান পার হইয়া একেবারে কুটীরের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দরজা খোলা—ঘরের ভিতরে একটী আলো জ্বলিতেছে।

সেই আলোর নিকটে বসিয়া একটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ নিবিষ্টমনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। কুমারী কোন কথা বলিলেন না—নির্ব্বাক নিস্তব্ধভাবে সেই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আলোর উপরে একটী কালো ছায়া পড়িতে দেখিয়া গৃহস্বামী পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিলেই দুয়ারের কাছে সেই রমণী মূর্ত্তি তাঁহার চোখে পড়িল, তাড়াতাড়ি চেয়ার সরাইয়া তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আপনি কে? আমার কাছে কিছু চান?

কুমারী একেবারে নির্ব্বাক! এই তাঁহার সম্ভাষণ! ঘৃণায় ও ক্রোধে তাঁহার হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় স্বরে বলিলেন—

আমিই ইষ্টার রেমণ্ড্। পুরুষটি বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন তরুণী অবজ্ঞা সূচক দৃঢ়তার সহিত পুনরায় বলিলেন—আমি ভেবে ছিলুম আপনি আমার আসা প্রতীক্ষা করছিলেন।

পুরুষ শান্ত স্বরে উত্তর করিলেন—আপনি ভুল করেছেন। আপনি আমাকে আর একজন ভাবছেন। আপনি কাকে খুঁজছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কুমারী বলিলেন—মিষ্টার এগ্‌বার্ট সানার্স্। কেমন, আপনিই সেই লোক কি না?

পুরুষ চমকিয়া উঠিলেন। হাঁ আমিই এগ্‌বার্ট সামারস্। কিন্তু দেখছি একটা বিষম ভুল হয়েছে। আপনি আমার কাছে কি চান?

কুমারীর ইহা অসহ্য হইল। অনাথা নারীর হৃদয় লইয়া এ কী নিষ্ঠুর কৌতুক! তরুণী দীপ্ত স্বরে বলিলেন—

—আপনার কাছে আমি কি চাই—বটে? আপনারই অনুরোধ আমি অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে এসেছিলুম—কিন্তু সে যাই হোক্ আমি আপনাকে এখন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করছি, কারণ এমন নীচ প্রতারকের সঙ্গে আমি কোনই সম্পর্ক রাখতে চাই না। এই নিন্ আপনার চিঠি—আমার চিঠিগুলি ফিরিয়ে দিন—আমি এখনি এস্থান

পরিত্যাগ করতে চাই। এমন কদর্য্য স্থানে আমি বেশীক্ষণ থাকতেও চাই না। এই বলিয়া তিনি ব্যাগ হইতে সুন্দর সিল্কের সুতায় বাঁধা এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া ধরিলেন।

গৃহস্বামী রমণীর তীব্র তিরস্কারে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন—অ্যাঁ চিঠি, চিঠি? আপনি পাগলের মত কি বকছেন!

কুমারী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সেই চিঠির তাড়া ঘরের মধ্যে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া, গৃহস্বামীর দিকে এমন্ তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে গৃহস্বামী তাহাতে একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তরুণীটি দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গৃহস্বামী কিছুক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল রমণীকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। শেষে তিনি ক্ষুন্নমনে আপনার চেয়ারে ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহার মনে হইল যেন তিনি একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন।

শেষে ভাবিলেন—রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদ। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সেই অপূর্ব্ব তরুণীটির দীপ্ত কণ্ঠস্বর ও তীব্র ঘৃণার ভ্রূকুটিভঙ্গী—ক্রমাগতই প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

তিনি স্মৃতি-সাগর-মন্থন করিয়া এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কই, তিনি জীবনে কাহারও সহিত তো কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তথাপি রমণী তাঁহাকে নীচ প্রতারক বলিয়া গেলেন! তিনি এ রহস্যের কোন কুল কিনারা পাইলেন না।

চিঠির তাড়া মেঝেতেই পড়িয়াছিল—গৃহস্বামী সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। হঠাৎ সে কথা মনে পড়িতেই সেই চিঠির তাড়া কুড়াইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িতে গেলেন। চিঠিতে তাঁহার নিজেরই নাম দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়ের প্রথম তরঙ্গ বহিয়া গেলে—তিনি পত্রগুলিকে তারিখ অনুসারে গুছাইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। তখন তাঁহার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে শিরোনামায় লিখিত "ই, আর," ও তাঁহার ভৎসনা-কারিণীটী—একই রমণী।

তিনি নিশ্চল ভাবে বসিয়া বারম্বার সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। নব নব চিন্তার স্রোত তাঁহার মনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। গৃহের আলো নিষ্প্রভ হইয়া শেষে নির্ব্বাপিত হইল। রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর ভাবে গৃহের ভিতর ঘনাইয়া আসিল—চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ।

সহসা তিনি ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া দরজার বাহিরে আসিলেন। সে তরুণী কোথায় গেল? ডাকগাড়ী তো কাল সকালের পূর্ব্বে ফিরিবে না। মাদুরার ডিপোও তো এখান হ'তে দশ মাইল দূর! এই নিশীথ রাত্রে সে একাকিনী নিরাশ্রয়! চিঠি হ'তে যাহা জানিলাম—আহা! আমার মত তাহারও তো সংসারে আর কেউ নেই!

কি কঠোর জীবন সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়া সেই রমণী যে শেষ আশ্রয় স্বরূপ এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—গৃহস্বামী তাহা বেশ বুঝিলেন। কিন্তু কে সেই নীচ প্রতারক যে নারীর হৃদয় লইয়া এ নিষ্ঠুর রহস্যের অভিনয় করিল—সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

কুমারী ইষ্টার দলিতা ফণিণীর ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া চলিতে লাগিলেন। সদর রাস্তায় হঠাৎ আসিয়া দেখিলেন—সেখানে একখানি বগি গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে আরোহী ছিল কিনা দেখিতে পাইলেন না কারণ গাড়ীটি তখন আচ্ছাদনে ঢাকা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষান্তরালে আত্ম গোপন করিয়া তৃণ-গুল্ম অতিক্রম করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিলেন—শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘাসের উপরে বসিয়া পড়িলেন।

চারিদিক জঙ্গল—কোথাও কোন শাড়া-শব্দ নাই।

মাথার উপরে অসীম আকাশে অগণিত নক্ষত্র-মাপালী। কুমারী একটী তরু-তলে বসিয়া মুদিত চক্ষে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই ক্রোধে ও অপমানে তাঁহার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল—নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কি কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে! যে দিন জননী তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেই দিন হইতে সংসার সমুদ্রের অকুল পাথারে পড়িয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে! দীর্ঘ দুই বৎসর কাল প্রাণপণ যত্নে ধর্ম্মপথে থাকিয়া তিনি একটী চাকুরী করিতেছিলেন—হটাৎ ভগবান তাঁহাকে সেই চাকরীটুকু হইতেও বঞ্চিত করিলেন। তাহার পর নূতন চাকরীর জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু কোথাও একটা চাকরীও জুটিল না। শেষে অগত্যা তাঁহাকে এই অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল! সেই ব্যাপারের আবার এই শোচনীয় পরিণাম!

যখন তিনি আকুল হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন বৃক্ষান্তরাল হইতে চাপা গলায় মনুষ্যের গলার আওয়াজ শুনা গেল। তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া শুনিলেন—

—না, বন্ধু, তামাসাটী বড় বেশী দূর গড়িয়ে পড়লো। এগ্‌বার্ট সামার্‌স্‌এর আর এতে ক্ষতি কি! কিন্তু সে কুমারীর কথা একবার ভাব দেখি; সে কি ক'রে ফিরে যাবে!

—তাতে আমাদের তো ভারি মাথা ব্যথা। তুমি তো একটা আস্ত গোমূর্খ দেখছি। এখন এস তাড়াতাড়ি স'রে পড়া যাক্।

—মেয়েটীর যদি কোন বিপদ হয়—

—হ্যাঁ, হ'ল আর কি! সে এতক্ষণ ডিপোয় পৌছল ব'লে। আমরা যদি একটু তাড়াতাড়ি ফিরি তা হ'লে চাই কি তাকে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিতে পারি।

—তবে শীঘ্রি চল—আর দেরি ক'রো না।

তার একটু পরেই কুমারী শুনিলেন রাস্তার উপর গাড়ির চাকা ঘর্ঘর শব্দে ছুটিয়া চলিল। ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—এই সব লোকেরা তাঁরই সম্বন্ধে কেন আলোচনা করিতেছে! যদি রাস্তায় তাঁহাকে দেখিতে না পায় তবে কি ইহারা আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিবে? খুব সম্ভব আসিবে।

কুমারী সে স্থান হইতে উঠিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু নির্ঝর ঝরিতে লাগিল। তিনি চলিতে গিয়া দেখেন তাঁহার শরীরের সকল শক্তি যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল—তিনি মাটীতে লুটাইয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন তাহার পরে তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল।

কতক্ষণ এ ভাবে কাটিল কুমারী তাহা কিছুই জানেন না। চেতনা ফিরিলে শুনিলেন—নিকটে মৃদুস্বর ধ্বনিত হইতেছে—আহা! অমন ক'রে তুমি কেঁদনা। আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে ডিপোয় পৌছে দেব।

কুমারী বুঝিলেন কোন অপরিচিত পুরুষ তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া। তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

—কে এখনই আমার কাছ হ'তে দূর হও

—সত্যি বলছি এমন জানলে আমি কখনও সেই সব নীচ জঘন্য পত্র লিখতুম না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সঙ্গে আসুন—এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

—তোমার এ কথার অর্থ কি? তুমি যদি এগবার্ট সামার্‌স্ না হও, তবে তুমি কে?

—আমি ডিক্ মেডোস্।

কুমারীর মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের ন্যায় আলোক চমকিয়া গেল। তিনি সিংহিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—

—তুমিই সেই সব পত্র লিখেছিলে—অথচ তুমি এগবার্ট নও। নীচ প্রতারক—এই দণ্ডেই আমাকে আমার পত্রগুলি ফিরাইয়াই দাও?

যুবক লজ্জানত মস্তকে নিজের কোটের পকেট হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া কুমারীর হস্তে অর্পণ করিল।

ঠিক সেই সময়ে অন্ধকারে পশ্চাৎ হইতে একটী দৃঢ়-হস্ত বজ্রমুষ্টিতে যুবকের গলা টিপিয়া ধরিল। এবং তাহাকে নিমেষের মধ্যে সশব্দে ভূতলে ফেলিয়া দিল।

—আজ তোকে কিছু বলব না। এরূপ পশুর ন্যায় ব্যবহারের ফল আর এক দিন আমার হাতে পাবি। এখন, এই মুহূর্ত্তেই এখান হ'তে দূর হ। দূর হ'—নীচ কুক্কুর এখান হ'তে এখনই দূর হ'।

যুবক নির্ব্বাক ভাবে লজ্জানত শিরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কুমারী তখন সংজ্ঞাহীনা। এগবার্ট সামারস্ তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া আপন দৃঢ় বাহু যুগলে ধারণ করিয়া আপনার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে তিনি কুমারীকে ধীরে ধীরে শয্যায় শায়িত করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এগবার্ট সারারাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে কুমারীর শুশ্রূষা করিলেন।

কুমারীকে প্রান্তর হইতে উঠাইয়া আনিবার সময় এগবার্ট ডিক দত্ত সেই সকল পত্র পাঠে তাঁহার অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন। কুমারী সরল শিশুর ন্যায় সংসার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা—সংসারের শত নির্য্যাতনেও সংসারের সাধুতায় অসীম বিশ্বাস পরায়ণ! তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রমণীর সরলতার প্রতিবিম্ব ঘুমন্ত মুখের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

সুন্দর বাসন্তী উষায় উদ্যানের তরু-শাখায় শত বিহঙ্গের কলকূজন ধ্বনিত হইয়া উঠিল—প্রভাতারুণের কনককান্তি উদয়াচলের শিরে রক্তিম শোভায় ফুটিয়া উঠিল—স্নিগ্ধ সমীরণ পুষ্প-গন্ধে আমোদিত হইয়া গৃহের মধ্যে আনন্দের পসরা বহন করিয়া আনিল।—কুমারী আঁখি মেলিলেন। এগবার্ট আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে—উভয়ের নয়নে-নয়নে মিলন হইল।

কুমারী ইষ্টার, এগ্‌বার্টের প্রিয়তমা পত্নী হইয়াছেন। সরলতার পুরস্কার স্বরূপ প্রজাপতি আশ্রয়হীনা লতিকাকে মহৎ তরুর বেষ্টনে জড়াইয়া দিলেন। এগ্‌বার্টের শূন্যগৃহ এখন আনন্দ সুখে পূর্ণ হইয়াছে।

তাঁহাদের বাড়ীতে একটী অতিথিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ইনি তাঁহাদের একান্ত অনুরক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আপনারা এ অতিথির নাম জানিতে চান? ইঁহার নাম 'ডিক মেডোস'।

——:০:——

আড়ি

—শ্রীঅরিন্দম বসু

ভুল শুধু মানুষেরই হয় না।

স্বয়ং যে বিধাতা, তাঁরও—নইলে জয়ন্তী ছেলেই হইত।

সেদিনের অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। শৈশবটা প্রবাসেই কাটিয়াছিল। গ্রামে যখন আসি, আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়,—এক দিন ঐ আমতলায়

নিঝুম, নিদ্রালু বাড়ী। বৈশাখের খর রোদে বাতাস অবধি তাতল হইয়া উঠিয়াছে। পুকুরের ধারে ছোট ঝাপ্‌ড়া সিঁদুরে আম গাছটার নীচে বসিয়াছিলাম—একান্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়াই নয়,—হাতে কাজও ছিল।

চৈৎ সংক্রান্তির গাজনের মেলায় কেনা যে ছুরিটা, একটু আগেই ধার দিয়াছি, তারই গুণ যাচাই করা—অর্থাৎ ঝড়ে-পড়া সঞ্চিত কাঁচা আমগুলির একটিও অখণ্ড অবস্থায় অবশিষ্ট না রাখা,—শুনিয়াছিলাম ওতে ধারও নাকি বাড়ে।

হটাৎ দেখি সেই মেয়েটি,—সেই কিন্তু প্রথম।

আশ্চর্য্য! আসিয়াই শুধায়—তোমার নাম কি, সে দিন তোমাদের আসতে দেখেছি,—কতদিন থাকবে তোমরা?

বয়সে আমার ছোট কিন্তু ভাব-ভঙ্গীতে কিইনা পাকা গিন্নী একটি।—যেন এই কথাটা জানিবার জন্যই হটাৎ ছুটিয়া আসিয়াছে,—আর কিছু নয়।

একটু ক্ষোভই হয়, তবুও বলি—আমার নাম অজয়,—আর কিছু জানিনে।

মেয়েটি নিজের মনেই আওড়ায়—অজয়, অজয়,—ও তোমার মা বুঝি তা'হলে তোমায় অজু বলে ডাকেন—না, খোকা।

পিসীমা অবশ্য মাঝে মাঝে খোকাও বলিতেন। মা ডাকেন অজু—শুধু তাই নয়, আরও অনেক কিছু,—যখন যা' খুসী—সোণা, মাণিক, মণি, কখনও আবার সখ করিয়া খোকন ও।

কিন্তু এ মেয়েটার কাছে এত কথা বলা চলে না! শুধু জানাই—না, মা আমায় অজয় বলেন।

মেয়েটি হাসে, চারু-চোখের কালো মণি দুটি নাচাইয়া বলে,—আমার নাম কি শুনবে? সবাই ডাকে জেন্তী, মা রাগিলে বলেন পোড়ারমুখী,—কিন্তু সত্যি করে তা' নয় আসলে নাম হ'ল জয়ন্তী।

নির্ব্বাক হইয়াই শুনি—মেয়েটা যেন কি রকম,—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কিনা, ভালো করে কথা কইতেও জানে না। ও না আসিলেই ভাল হইত যেন।

সিঁদুরে আম গাছটার কাঁচা আমগুলির গায়ে লাল আভা লাগিয়াছে—একদিন চোখে ধরা পড়ে খুবই হটাৎ। যেন কালই সন্ধ্যায় পশ্চিম-পারের অস্ত-রবি আবির মাখাইয়া গেছে।

জয়ন্তী বলে—ঐ যে দুটো খেজুর গাছ, ঐ যে ইঁদারা দেখ্ছো?—ঐ যোথা,—আমাদের বাড়ী যাবে?—না থাক্। আচ্ছা তুমি গাছে চড়তে জানো?—সাঁতার কাটতে,—ঐ ইঁদারা থেকে জল তুলতে?—

ওকে বলি—না,—এখন উঠি, মা পড়তে বলেছিল; উঠে পালিয়ে এসেছি, দেখলে পরে বকুনি দেবে,—যাই।

জয়ন্তী খিল্ খিল্ করিয়া হাসে,—যেন এর চেয়ে মজার কথা আর কিছু নাই। ভাঙ্গুনি পারের চঞ্চল স্রোতের কল শব্দটি যেন ওর কণ্ঠে। হাসি থামাইয়া বলে—হাঁ, যাও মায়ের আদুরে ছেলে বুঝি তুমি? কি বই পড়—শিশুশিক্ষা?

তারপর একটি বছরও ঘুরিয়া যায়। জয়ন্তীর সঙ্গে একটি দিনের জন্যও বনিবনা হয় না—আশ্চর্য্য!

দু'টি বেলা মাষ্টার পড়াইতে আসেন,—কোনদিন জয়ন্তী আসিয়া নালিশ জানায়—মাষ্টার মশাই, কাল পারুলের সঙ্গে অজয় ঝগড়া করেছে, জানেন? পারুলের মা আপনার কাছে বলতে বলেছে। পশু'দিন বড় পিসীমারও শিবপূজো হয় নি। আমাদের বাগানের সবগুলা ফুলই তুলে নষ্ট করে দিয়ে এসেছে। সবাই বল্ছিলো যে ভারি দুষ্টু ছেলে,—শাসানো দরকার।

যেন চৈত্র-সন্ধ্যার দমকা হাওয়া একটা—তেম্নিই ছুটিয়া যায়।

কথা সবখানিই সত্যিই নয় এবং নালিশও কেউ জানান নি। সব ওর বানানো। একরত্তি মেয়ে,—স্বভাবই অম্নি—গায় পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসা—আমি যেন ওর দুই চোক্ষের বিষ।

মাঝখান থেকে সাজাই শুধু হয়। মাষ্টার মশাইটিও যেমন,—তার কাছে আমার কথার চেয়ে ঐ কচিমুখের প্রমাণই যেন বেশী।

অনেক সময় নিস্ফল আক্রোশেই গুম হইয়া থাকি। ইচ্ছা হয়, একদিন ঐ মিথ্যুক মেয়েটাকে শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিই,—যদি সম্ভব হয় দু'টা ঘা'ও—

চেষ্টাও করিয়াছি, কিন্তু আমার কথা শুনিলেই যেন ও হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে—তারপর বলে,—ছিঁচকাঁদুনে ছেলেটা!

কতদিন বই লুকাইয়া রাখিয়া মজা দেখিয়াছে। শুধু শুধুই চোখে জল আনিয়া মায়ের কাছে গিয়াও আমার নামে কত কাঁদুনি গাহিয়াছে।

ফলে কথা শুনিতে হইয়াছে আমাকেই।

ও যে পরের মেয়ে। আমার কথাটাই শুধু মিথ্যা, আর ও মেয়েটা যেন সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু জানে না।

মুস্কিল হইত,—ওদের বাড়ী গিয়াও অভিযোগ জানাইতে পারিতাম না—বড় ঐ দুষ্টু মেয়েটা নয়,—আমি নিজে। অভিমানই পাইয়া বসে বেশী,—ইচ্ছাটা সঙ্গোপনেই চাপা রাখি।

এম্নিই দিন যায়।

কিন্তু জয়ন্তীর দুষ্টুমি কমে না,—বাড়েই। বয়সটা যেন দিনদিনই ওর কমিয়া চলিয়াছে।—যেমন, বলে, মেয়ের নাম নৃসিংহ দাদা,—ও যেন তাই।

আমিও এড়াইয়া চলিতে চাই। কেন না জানা কথা সে গায়ে পড়িয়াই ঝগড়া করিবে,—আর যত দোষ সবই এই নন্দঘোষ,—অদ্ভুত।

সব কথা তেমন মনে নাই। একদিন কিন্তু বিস্ময় ঠেকে। মনে হয় জয়ন্তী যেন হটাৎই অনেকটা বড় হইয়াছে,—গম্ভীরও হয়তো।

দুরন্তও তেমন আর নয়;—দৌরাত্মও কিছু করে না। আগে বরং দেখা হইলেই কিছু না কিছু বলিত;—এখন নীরবই থাকে।

এক একসময় কিন্তু ইচ্ছা হয় ডাকিয়া দুটো কথা বলি। ক্ষতিই বা কিসের?—নিজে ও তো ভালোই জানে, সত্যিই কোনদিন অন্যায় কিছু বলিয়াছিকিইা!

হটাৎ দেখাও হয় একদিন,—সেই সিঁদুরে আমগাছটার নীচেই। ডাকিয়া বলি—আমার সঙ্গে আর কথা কইবেনা বুঝি জয়ন্তি,—কি করেছি আমি তোমার?

জয়ন্তী থমকিয়া জবাব দেয়—কেন কি দরকার, শুনি? —আমি মামা বাড়ী যাচ্ছি—জানো? পড়াশোনাও আমার সেখানেই চলবে।......আমিতো তোমার কিছু করিনি, মিছি মিছিই শুধু রাগ করো। এখন তো অনেকটা বড়ও হয়েছো।

জয়ন্তী একমুহূর্ত্ত কি যেন ভাবে,—তারপরই ঝঙ্কার দিয়া চলিয়া যায়,—মায়ের আদুরে ছেলেই তো তুমি।

অবাক হইয়াই চলিয়া আসি,—যেন মনে করিবার মত কিছু নাই,—খুবই জানা কথা, এম্নিই হবে।

কিন্তু জানা কথা যা' নয়, পরে আবার তা'ই শুনিতে হয়। সন্ধ্যা বেলায় খেলার মাঠ থেকে যখন ফিরিয়া আসি মায়ের কাছে ভৎর্সনা শুনিলাম।

বল্লেন—তুই জয়ন্তীর সঙ্গে লাগতে যাস্—এত যে মানা করি, তা'তেও খেয়াল হয় না। ওর পিসীমা নিজে এসেই বলে গেলেন, তুই নাকি ওকে যা' মুখে আসে বলেছিস,—মারতেও নাকি গিয়েছিলি? জয়ন্তী এখন ডাগর হয়েছে,—কেন যাস্ ওর সঙ্গে—ছিঃ!

আমার মুখে কিন্তু কথা ফোটে না। ঐ তো এক ফোঁটা মেয়ে, এত ফন্দীও ওর মনে,—এত কথাও বানাইয়া বলিতে পারে। প্রথম পরিচয় থেকেই যেন শত্রু কেউ।

আদুরে ছেলে আমি নই,—আদুরী ঐ হিংসুটী মেয়েটা—পিসীমার আহ্লাদিও হয়তো। দয়া, মায়া বলিয়া কিছু কি জানে না? একটুও না?

নিঃশব্দেই সরিয়া যাই—ভাবি, প্রতিবাদ করিয়া কিই বা ফল,—থাক্।

দিনের পর দিন, তার পর মাস—এমনি করিয়া একদিন বছরও ঘুরিয়া আসে।

ছুটিতে আবারও দেশে ফিরিয়া আসি আনন্দে, উদ্বেগে, আহ্লাদে।

কতদিনের অদেখা মায়ের স্নেহস্নিগ্ধ চোখ,—অকরুণ হাসি-ফুট মুখে সোহাগের দুটী কথা,—দুটী হাতের নিবিড় স্পর্শ ;—শান্তির নীড় সেই ক্রোড়,—ওতে যেন কত যাদু, কত মোহ—শিশুর স্বপ্ন,—নন্দনের পারিজাত।

কিন্তু কতকাল! মনে হয় মায়ের জগৎ ছাড়িয়া যেন কত যুগ দূরে সরিয়া আছি।

চকিতে আর একজনের কথাও মনের কোণে আসিয়া উঁকি মারে—সেই সৃষ্টি ছাড়া মেয়েটা, জয়ন্তী।

আজো কি সে তেমনই! একটু পরিবর্তনও কি হয়নি! —হয়তো হইয়াছে। কল্পনাই শুধু নয়—সত্যি, সত্যি।

আমার শৈশবের লীলাভূমি ঐ ছোট ছায়া-শ্যামল গ্রাম খানি। ওর বাতাসটুকুও যেন আমার কত চেনা,—কত আপনার—যেন মা, বোন, বন্ধুর মতই কেউ।

একদিন দেখা হয় হটাৎ-ই। যেমন দেখা হয় রাস্তায় দুই অচেনা পথিকের।

পরিবর্তনও চোখে পড়ে—কিন্তু সে দেহেরই শুধু। মনের খবর ওর অন্তর্য্যামীই জানেন—

বালিকা নয়, পরিপূর্ণা কিশোরী। অনাগত যৌবন নিয়তই যেন হাত ছানি দিয়া ডাকিতেছে—তারই ইঙ্গিত চোখে মুখে সুস্পষ্ট। সেদিনকার এক ফোঁটা সেই মেয়েটা!—আজ সৃষ্টির উন্মুখ আনন্দ যেন ওর সারাদেহে মায়া ছড়িয়ে গেছে—অকস্মাৎ।

একটু কিন্তু অপ্রতিভও হয় না। মার সঙ্গে আপন মনে অনর্গল বকিয়া চলে। ও যেন মেয়ে হয়ে জন্মায়নি। ওর বয়স যেন উটন্ত যৌবনের সীমায় নয়। একটি সুকুমার ছেলেও যেন ওর সামনে দাঁড়াইয়া নাই! আমার উপর মুহূর্তের জন্ত ওর দৃষ্টি ঘুরিয়া গেল না—আশ্চর্য্য।

ভাবি,—শুধু দেহেরই শোভা। অন্তরালে হয়তো অতি কুশ্রী ছোট্ট একটা মন—আর কিছু নয়। যেমন সূর্য্যের রঙ-ফলানো পূর্ণিমার চাঁদ,—যেমন রোদের স্পর্শ-রঙা মাকাল ফল।

মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়া আবারও একদিন যাইতে হয়। বুকের এক কোণে ব্যথা জমাট বাঁধে—নীল আকাশের গায়ে খণ্ড কালো মেঘ যেন। প্রভাতের আলোতে যেমন বরফ গলে, বাষ্প ওঠে।—স্বচ্ছ জলও গড়ায়—মুক্তা বিন্দু। দুটী চোখ সাহসাই সজল হয়, গলাও রুদ্ধ হইয়া আসে—আপনা থেকেই।

কিন্তু মুহূর্ত্তেই অন্য রকম—

উঠানের একপ্রান্তে সেই মেয়েটা, জয়ন্তী। পিসীমার শিবপূজার ফুল তুলিতেই আসিয়াছে হয়তো; চোখেও পড়ে, কিন্তু দৃষ্টিখানি কি ঝাপ্‌সা—শীতের শিশিরই যেন ছড়াইয়া আছে সমস্ত মুখটাতে। দুটী চোখই মুছিয়া ফেলি, দৃষ্টিও স্পষ্ট হয়। প্রভাতের অম্লান সোণার আলো—মুখভরা অফুরন্ত হাসিই যেন।

জয়ন্তী মুহূর্ত্তে সরিয়া যায়। তার মুখের ঐ চঞ্চল হাসির চমক মনে যেন কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। শুধু শ্লেষ নয়—উপহাসও নয়—অপমান।

আর একটা দিনও যদি থাকিতে পারিতাম—ঐ নিষ্ঠুর মেয়েটাকে,—পরের বেদনায় মুখ টিপিয়া যে হাসে...... তাকে, তাকে.....

নিন্দাকে ভয় করি না,—অপবাদকেও নয়।

তারপর আরও দুটী বছর কাটিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি। মার খুব অসুখ। শিয়রে বসিয়া থাকি, রাত দিন—বিরাম নাই।

একমাত্র এই মা; সংসারে আর কোন বন্ধনই ছিল না। শক্ত অসুখও কিছু নয়—কিন্তু মনে আশঙ্কার অন্ত থাকে না। বাবা মারা যান, যখন খুব ছোট। তার কয়েক বৎসর পরে প্রবাস ছাড়িয়া দেশে আসিতে হয়। সেও ত বহুদিন, যেন এক যুগ।

স্নেহ প্রবল বলিয়াই অশুভ তাকে আতঙ্কিত করিয়া চলে—খুবই স্বাভাবিক। তাই যেন ভয়ের অন্ত থাকেনা—মাও যদি.........

ভাবিতেও বাধে, সারা দেহ মনেই শিহরিয়া ওঠি, হটাৎ। অন্ধকার হয়তো পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে,—শিরার রক্তও বুঝি মুহূর্তে নিশ্চল হইয়া যায়।

জয়ন্তী মেয়েটী অদ্ভুত। রোজই কিন্তু আসে, মায়ের কাছে নীরবে বসিয়া থাকে, কুশল প্রশ্নও শুধায়। যখন যতটুকু প্রয়োজন—অযাচিতও অনেক সময়—

সেবা শুশ্রূষা সবই করে। কোথাও ত্রুটী বুঝিতে দেয় না।

শুধু আমার কাছেই যেন মূক—নিষ্ঠুর মনে মনে ভাবি ওর মনটাই বুঝি মস্ত ছলনা।

দুই বৎসরের পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য হয়—মুগ্ধও হই।

মা ডাকিয়া বলেন, আর কতক্ষণ এমন চুপ করে বসে থাকবি অজু, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়গে যা'। জয়ন্তী ত রয়েইছে এখন।

ঐ মেয়েটীর পানে চাহিয়াও কিছু বুঝিবার উপায় নাই। আমার অস্তিত্বটুকু যেন ভুলিয়াই থাকে। কোনদিনই যেন সে চেনে না আমাকে।

অগত্যা নীরবেই বাহির হইয়া যাই।

সামনেই উঠানের এক প্রান্তে ফুলের ছোট বাগানটী; ছোট ছোট অনেকগুলি ঝাড়,—নানা রকম। তারই ধারে গিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়ি—অসহায়, অবশ সারা দেহখানি।

সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসরছায়া দিগ্বিদিক ছাইয়া গেছে। সবুজ কচি পাতার ফাঁকে শুভ্র যুঁথী চোখ মিলিয়া চায়—রজনীগন্ধাও আকুল হয়। পুর্ণিমার পর একদিনই মাত্র গেছে—দূরে অস্পষ্ট গ্রামান্ত রেখার উপর দিয়া চাঁদের প্রথম প্রকাশটুকুও চোখে পড়ে—যেন নবোদিত সূর্য্য।

এই সেদিনও যাকে কিশোরী দেখিয়া গেছি—মনে শুধু বিস্ময়ই খেলে, আজ সেই জয়ন্তী অপরূপ ললিতা তন্বী। আশ্চর্য্য ওর রূপ। যৌবন যেন ফাগুনের আগুনই শুধু—সারা দেহখানিও যেন প্রদীপ্ত প্রদীপের শিখা একটি।

কোন খেয়ালই নাই, জ্যোছ্‌নাকে ঈর্ষা করিয়া অভিমানী সন্ধ্যা কখন সঙ্গোপনে সরিয়া গেছে।

হটাৎ কার কণ্ঠস্বর—মায়ের মত না, ছোট কাকারও নয়,—হয়তো আর কারো,—যেন, যেন—

চকিত হইয়াই পেছনে তাকাই—জ্যোছনার চেয়েও স্পষ্ট ঐ রূপ,—একটি নিমেষই খুব বেশী—তার চেয়ে আর কিছু নয়। হয়তো আমায় ডাকিয়া দিতে আসিয়াছে। কাছে গিয়া শুধাই—

—কেন, মা ডাকছেন ?

— না তিনি ঘুমুচ্ছেন।

রহস্যই মনে হয়,—তবে ?

অতি আলগোছে দুটি ঠোঁটের ভিতর দিয়া ঐ একটা কথাই কখন অস্পষ্ট হইয়া ফোটে।

বলে,- হ্যাঁ, তোমার ছুটি কতদিন ?

বিস্ময়ও বাড়িয়া চলে—শুধু জানাই—তিনমাস।

—মায়ের শরীর ভেঙ্গে গেছে, দেখ্‌ছো ? একজনের সব সময়েই কাছে থাকা চাই এখন। তোমার ছোটকাকাও পারেন না, তার সংসার আছে। কলেজ খুলে গেলে তুমিও নিশ্চয়ই চলে যাবে, কেমন ?

—হাঁ, সে তো যেতেই হবে—আর কিই বা উপায় আছে।

—না থাকলেও করতে হবে তোমায়। তোমার বয়স কত হ'ল জানো ?

—এই কুড়ি।

—বেশ তো, এখন বিয়ে করো না কেন ?—মায়েরও অসুবিধে হবে না। তুমিও নিশ্চিন্তে যেতে পার্ব্বে—কি বলো ?

কি আর বলি,—ওর কথা যেন হেঁয়ালিই শুধু,—হয়তো বা পরিহাস।

বছর পাঁচেক আগেকার কথাই মনে পড়ে—এও যেন ওর দুষ্টুমিরই একটা অঙ্গ।

তবুও চমকে উঠি। চোখের পানেও চোখ তুলিয়া চাই,—কিছুই মনে হয় না,—বেশ স্বচ্ছ—কোন ছলনাই নয়।

একটু পরেই আবার কানে আসিয়া বাজে।

—মাকে আমি বলেছি, রাজীও হয়েছেন। তুমি অমত করো না যেন, বুঝলে?

এইতো কথা কিন্তু ওতেই যেন কত মোহ।

একটা কথা শুনিবারও অপেক্ষা রাখে না—তাড়াতাড়িই চলিয়া যায়।

সারা মনেই বিস্ময় ঠেকে। আমার উপর যেন ওর কত জোর,—এ যেন ওর আদেশ।

আকাশ পাতালই ভাবিতে থাকি—কেন? কেন?—কি ওর লাভ?……আমার মায়ের চিন্তায় ওর চোখে কি ঘুম নাই? শুধু শুধুই এত দয়া?—না, না, না।

শুধু ছল।

একদিন কিন্তু রকম-ফের দাঁড়ায়—

বিয়ের কথা ছিল আমার—কিন্তু হয় জয়ন্তীর—বেশ ফুটফুটে বর, লেখা পড়াও জানে বেশ।—

আমার কলেজ খুলিতে অল্প দিন বাকী। মার অসুখ অনেকটা সারিয়াছে।—একদিন যাত্রারও আয়োজন সুরু হয়—তারপরই একদিন……

জয়ন্তীর বিয়ের পরদিন ওর সঙ্গে শেষ দেখা—কিন্তু কথা কিছু হয় নাই—বলিবার ছিলওনা কিছু।

তবে একবার ওর পানে চাহিয়া হাসি পাইয়াছিল—ইচ্ছা ছিল ওকে শুধু একবার বলিয়া আসি—একেই বলে অদৃষ্টের লিখন।

দিন গুলি এক ঘেয়ে। মাস যদি বা কাটে বছর যেন কোন মতেই ঘুরিতে চায় না।

পরীক্ষা দিয়াছিলাম—পাশও করিয়াছি—বেশ ভালই। মার চিঠি আসে—শিগ্‌গিরই দেশে ফিরিতে হইবে। অনুমান করাও বিশেষ কঠিন কিছু নয়—কেন?

নিজের দিক দিয়া ইচ্ছা তেমন নাই—বরং না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া আপত্তিও করা চলে না।

একদিন সুটকেশ গোছাইয়া রওনা দিই—

তরু-ছায়ার স্নেহ-ছাওয়া সেই শৈশবের লীলা-নিকেতন—তারই নিবিড় আকর্ষণটুকু কোন দিনই যেন তুচ্ছ নয়।

মা বায়না ধরেন—এই মাসেই কি বলিস অজু—তোর ছোট কাকাকে পাঠিয়ে দেবো—অনেক খোঁজই তো আছে—তুই অমত করবিনে বল্?

—আস্তেই বলি,—না মা, কর্ব্বো না কিন্তু একটা কথা, নইলে হয়তো হবে না আর।

—মা ব্যস্ত হইয়াই শুধায়—কি কথা শুনি?

—আমি কালো মেয়ে বিয়ে করতে চাই—খুব কালোতেও আপত্তি নেই, বুঝলে?

মা, অবাক হন—দুটি চোখেও বিস্ময় খেলে—যেন আমি দুষ্টুমি কর্‌ছি—হয়তো বা পাগলই।

মা কিন্তু সত্যি করেই তাই ভাবেন—বলেন—কি বলছিস্ অজু। ও সব ছেলেমি রাখ্—দিন দিনই কি ছোট হচ্ছিস্ তুই—

স্পষ্ট করে তো বটেই—অনেকটা জোরেও বলি—

—না, মা, ভুল ভেবোনা—সত্যিই আমি বল্‌ছি,—নইলে বিয়ে আমার হ'বে না—কোনদিনই না।

সেদিনকার মত ঐখানেই ইতি পড়ে।

অবশেষে কিন্তু আমার বায়নাটাই টিকে। বিবাহ সুস্থির হইয়া যায়—দিন ক্ষণ অবধি।

জয়ন্তী শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। একদিন হটাৎই দেখা; বলে, তুমি নাকি একটা কালো-মেয়েকে বিয়ে

করছো? কেন?—মায়ের এতদিনকার আশা, কল্পনা, সব ভেঙ্গে দেবে।—তুমি কি ভাবো তিনি খুব খুসী হবেন।

শ্লেষের সুরেই জবাব দিই—একটা কথা তোমরা সবাই ভুলে যাও দেখি—কালো মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বো আমি'—মা নয়। সে বউ পেয়ে নিজে আমি যদি খুসীহই তবে কার কি ক্ষতি,—আর নিজেও আমি এমন কিছু ফর্সা নই।

সহসা যেন একটা স্পষ্ট ইঙ্গিতও দুটি ঠোঁটের সীমায় আসিয়া পড়ে—মুহূর্ত্তের অবসর লইয়াই আবার বলি—খুব সুন্দরী হলেই খুসী হওয়া চলেনা,—সেজন্য প্রয়োজন অন্য কিছু,—পলাশের গন্ধ কেউ পায় না, দেখ্‌তেই শুধু—যেমন পাকা ডুমুর, যেমন তিন রঙ্গা পটের ছবি—চোখই শুধু ধাধিয়া দেয়।

জয়ন্তী হাসে—কেমন চাপা হাসি—বলে, বেশ, কালো মেয়েই না হয় বিয়ে করো। কিন্তু একটা কথা, অভিনয় কিছু করোনা তার সঙ্গে—বাড়াবাড়িও কিছু নয়। ফর্সা মেয়ের কথা ভেবোনা কোন দিন, ভুলেও নয় বুঝলে?

বিবাহ হইয়া—যায়।

কাজলা মেয়ে—কিন্তু নামটি বেশ—পদ্মা।

মাঝে মাঝে জয়ন্তী আসে—ঐ রূপ-দেমাকী মেয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করি না আর, পদ্মাই যেন ওর অন্তরঙ্গ সখী কেউ—যেন কতকালের চেনা। তাই আসে—অনর্গল গল্পও করে।

ওর বেশের বাহার, চলিবার ভঙ্গিমা—কথা বলিবার ঢং ---সবই যেন সৃষ্টি ছাড়া—যেন একটা সং-ই শুধু।

পদ্মা বলে—তুমি জয়ন্তির সঙ্গে কথা কও না কেন? আমার সঙ্গে কিন্তু ভারি ভাব হয়ে গেছে,—এমন মেয়ে হয় না—দুদিনেই যেন কত আপনার—

—দরকার হয় না পদ্মা, তাই, নইলে কই এই কি—

পদ্মা একটু থামিয়া বলে—একটা কথা বলব?—

কালো কিন্তু মিষ্টি ওর মুখের কথাটি—যেন কচি মেয়ের সরল আব্‌দার—

বলি—কি পদ্মা?

—আচ্ছা বলনা—ওর পাশে আমায় খুব বিশ্রী দেখায়—না? সত্যি, খুব সুন্দর কিন্তু দেখতে—অমনটি দেখিনি।

—হাঁা সুন্দর—কিন্তু তুমিই বা বিশ্রী হবে কেন?—যে অপরাজীতা নীল,—তার পানে কি চোখ বাঁধা পরে না। আমার চোখে যে তুমিই বেশী সুন্দর পদ্মা।

—পদ্মাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লই—কি যেন ও বলিতে চায়—ঠোঁটের স্পর্শেই ওর ঠোঁটের কথাও হারাইয়া যায়।

দিন কাটে—এমনি রোজই।

মাস ছয়েক পরে কাশীতে আসিয়াছি—হটাৎ। সঙ্গে আসিয়াছেন পিসীমা।

পিসীমা তীর্থযাত্রী,—একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠান—তাঁর সঙ্গে যইবার সঙ্গী কেউ নাই,—অতএব আমাকেই যাইতে হইবে—নিরুপায়।

ইচ্ছা ছিলনা মোটেই—মা ও পদ্মাকে ছেড়ে কাছাকাছি কোথাও গেলেও বিশ্রী লাগতো—

মনের কোথায় আনচান করে—কোথায় যেন মস্ত অভাব

প্রতি সন্ধ্যায় মন্দির হইতে ফিরিয়া জন-বিরল একটা ঘাটে বসিয়া থাকি। সম্মুখের গঙ্গার অস্পষ্ট জল; ওর কল শব্দটুকুইই শুধু শোনা যায়—যেন আহ্লাদি মেয়ের খিল্‌খিল হাসি, যেন কচি হাতের আত্মহারা হাত তালি।

থাকিয়া থাকিয়া পদ্মার কথাও মনে হয়! আঁধার ঘরে সে হয়তো এখন বাতি দিয়া গেছে কিংবা মার কাছে বসিয়া তাদের গ্রামের কথাই সুরু করিয়াছে।

আশ্চর্য্য এই মা! পদ্মা যেন ওঁর নিজের মেয়ে। বলেন, ও আমার সংসারের লক্ষ্মী। এমন মেয়ে আর হয় না।

কতদিন নিজের কাণেই শুনিয়াছি,—ওর মাথায়, চিবুকে হাত রাখিয়া কত আশীষ কামনা,—স্নেহার্ত্তকণ্ঠে কত সোহাগের কথা—কত রকম!—তুমি চিরসুখী হও মা, অজু আমার বেঁচে থাকুক,—দীর্ঘজীবি হোক্।

এক এক সময় মার উপরও অভিমান হইত। পদ্মার নামেই একবারে আত্মহারা। শুধু ওর সুখের জন্যই যেন আমার বেঁচে থাকা,—আর কিছু নয়। আমার যেন কেউই আর নাই!

অপরূপ এই গঙ্গার ঘাট। ছাড়িয়া যাইতেও যেন মন সরে না—পদ্মাকে কাছে পাইলেও হয়তো নয়।

অনেক রাতেই চাঁদ ওঠে। আকাশের কালিমা মুছিয়া যায়,—সন্ধ্যার তারাও নিস্প্রভ হয়,—গঙ্গার জল সুস্পষ্ট হইয়াই আবার নাচিয়া চলে,—আলোর অনন্ত ঝিলিমিলি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন হাজার মাণিক উছলায়।

এমনিই দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা আসে। পদ্মার বিরহও যেন অনেকটা মন্দা হইয়াছে। ওর কাচা-হাতে লেখা কাচা-মনের চিঠিও পাই—প্রায়ই। ওতেই যেন তৃপ্তি! প্রবাসের ব্যথা তেমন করিয়া বাজে না। তবুও পিসীমাকে বলি—আর কতদিন থাকবে পিসিমা, এবার চলো যাই।

পিসীমার চাপা-হাসির অর্থও বুঝি,—বলেন—বেশ তো, তাই চল্।

সেদিনও অনেক রাত।

গঙ্গার ঘাটেই বসিয়া ছিলাম। চাঁদও উঠিয়াছে—কমনীয় জ্যোছনা।

হটাৎ দেখি দূর-আকাশে হটাৎ ই একটা উজ্জ্বল তারা খসিয়া পড়ে—অনেক দূরে, যেখানে আমার স্বপ্ন-ছাওয়া ছোট গ্রামখানি, মায়ের অতল স্নেহ-ভরা হৃদয়,—পদ্মার প্রিয় আলিঙ্গন,—আর,—আর……

বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের প্রতি দোলাটি—গভীর, বিরাট। ঐ প্লাবিত জ্যোছ্না, প্রভাতের রোদই যেন, মহূর্ত্তেই কখন উগ্র হইয়া গেছে। গঙ্গার তরঙ্গিত জল—যেন জল নয়, ফেণায়মান মদ।—ওতে যেন শুধু মত্ততাই।

দূরে অদৃশ্য সন্ন্যাসীর ভজনের সুরটিও কখন অস্পষ্ট হইয়া থামিয়া গেছে।—কি নিঝুম,—উদাস এই পুণ্য তীর্থ-স্থান! ধীরে ধীরেই উঠিয়া দাঁড়াই।

উৎকণ্ঠায় সারা রাত কাটিয়া যায়—একটা দুঃস্বপ্নই যেন বিনিদ্র চোখের সামনে প্রতিক্ষা করিয়া আছে।

পরদিন পিসীমা বলেন—তোর কি অসুখ করেছে অজু—এত করে বলি ঠাণ্ডা লাগাস্‌নে—তবুও তো শুনবিনে সে কথা। যাওয়ার সময় একটা অনর্থ বাঁধিয়ে বস্‌বি দেখছি—মায়ের ছেলে, ভালোয় ভালোয় মায়ের কাছে গেলেই বাঁচি এখন।

পিসীমাকে বলি—না, পিসীমা. কাল রাতে ঘুম হয় নি একটুও—যা' গরম।

পিসীমা বলেন—চল্, দু'এক দিনের ভেতরেই চলে যাই, আর কাজ নেই থেকে।

—তাই চলো না হয়।

সেইদিনই পদ্মার চিঠি পাই—আকারণেই বুকটা দুরু দুরু করে—যেন ওর ভেতরে কত বড় একটা অভিশাপ।

গঙ্গার ঘাটে কিসের সে ইঙ্গিত? কিসের এ উৎকণ্ঠা? বিনা কারণেই কি?……

চিঠিটা খুলিয়া পড়াই সুরু করি। আগে মনে হইত—পদ্মার চিঠি কি ছোট—ওতে যেন সাধ মেটে না, তাহা যদি অশেষ হইত। অনুযোগ করিয়া তখন লিখিয়াছি—তুমি বড় কৃপণ, অতটুকু চিঠি দাও কেন পদ্মা?

আজ শেষটা দেখিতে পারিলেই বাঁচি—ওর অত ছোট চিঠিও যেন অফুরন্ত।

হটাৎ চোখে পড়িল—জয়ন্তীর কথা—

লিখিয়াছে—জয়ন্তীর খুব অসুখ, একটা কথা তোমায় বলছি, যদি শোনো তবে খুব ভালো হয়।

ওকে আমি প্রায়ই দেখতে যাই, মা'ও যান। বলে,—দ্যাখ্ পদ্মা, আমি আর বাঁচবোনা চোখের সাম্নে যেন সব অন্ধকার। একবার অজয়দাকে যদি লিখে দিস, একটিবার আসতে শুধু, তবে দেখা হোত, তার কাছে ক্ষমাও চাইতুম।

আমার উপর হয়তো রাগ করেছে কথাও কইবেনা। তবুও আসতে লিখিস্। যদি আসে, বলবো, সে জয়ন্তী মরে গেছে, তাকে তুমি ভুলে যেও অজয়দা।

আরও অনেক কথা ও বলেছিল, নাই শুনলে— হয়তো প্রলাপ। আসতে হবে কিন্তু। নইলে আমি রাগ কর্ব্বো, কথাও কইব না কোনদিন, মনে থাকে যেন।'

পদ্মার চিঠি এত আদর আমার কাছে কোনদিনই পায় নাই একবার, দুইবার, তিনবার—কতবারই যে পড়িলাম। আমার চোখে আজ যেন হটাৎ-ই এক নতুন জগৎ, নতুন বিস্ময়!

জয়ন্তীর অসুখ,—যদি না বাঁচে—মিথ্যা কথা কখনই নয়—সে বাঁচিবে, তাকে বাঁচিতেই হইবে—যে পদ্ম প্রভাতে ফুটিল, প্রভাতেই তাহা ঝরিয়া পড়িবে—কেন? কেন?

কাশী ছাড়িয়া পরদিনই রওনা হই,—আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

প্রথমেই মার সঙ্গে দেখা। একটু অধীর হইয়াই জিজ্ঞাসা করি—জয়ন্তীর নাকি খুব অসুখ—কি হয়েছে? মা বলেন—হ্যাঁ অসুখ,—মাঝখানটার খুব শক্তও হয়েছিল, আজ দুদিন একটু ভালো আছে—কাল পদ্মা গিয়েছিল, আমার যাওয়া হয়নি।

শুনিয়া যেন আশ্বস্তই হই অনেকটা—যেন জয়ন্তী আমার কত আপনার কেউ—যেমন আপনার এই মা,—যেমন ঐ পদ্মা

মাও অনেক কথা শুধান—সংক্ষেপেই জবাব দেই।

একটু পরেই পদ্মার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হয়,—বলি—তোমার চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে এলাম পদ্মা। জয়ন্তী আর কিছু কি বলেছে?

বুকের কাছটীতে সরিয়া আসিয়া পদ্মা জানায়—না, গো, আর কিছুই নয়—এসেই শুধু জয়ন্তী কথা, আমি যেন কেউ নই।

আমি বুঝি তাই বল্‌ছি তোমার জন্যই তো এলাম; নইলে যে তুমি কথা কইবে না মনে নেই?

মুহূর্ত্তে ওর চুলে ঢাকা মুখখানির উপর নিজের মুখখানিও সরাইয়া নিই,—মুহূর্ত্তের জন্য কচি ঠোঁটের কথাও যেন রুদ্ধ থাকে। তারপর প্রথমেই বলে,—তুমি ভারি দুষ্টু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

মিষ্টি মুখের ঐ ঝঙ্কারটিও যেন কত মিষ্টি। শুধু বলি—তবে কালই আবার চলে যাবো। কাশীবাসই তো হবে, সে তো ভালোই।

এবার দুটি নরম হাতের আল্‌গা বাঁধুনি—যেন ঘন বেল-ফুলের মালা একটি

নিজে থেকেই সুরু করে—হ্যাঁ ছেড়ে দিলে তো! তুমি কিন্তু বিকেলে একবার যেয়ো, জয়ন্তী খুব খুসী হবে—না? সেদিন ওর কথা শুনে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছিলো। তারপর একদিনও কিন্তু বলেনি আর, আমিও কিছু বলিনি। অমন মেয়ে কিন্তু হয়না, আমায় খুব ভালবাসে। একদিন না গেলেই কত কথা শোনায়, সত্যি তুমি যেয়ো বিকেলে যাবে তো?

দু'হাতে চিবুকটি তুলিয়া বলি—হ্যাঁ' গো যাবো।

জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করিতে যাই বিকালে।—পদ্মা বলিল ওকে বলে—দিও সন্ধ্যেবেলায় মার সঙ্গে আমি যাবো।

খুব সন্তর্পণেই ওর ঘরে গিয়া ঢুকি; জয়ন্তী তখন ঘুমাইয়াই ছিল হয়তো।

চোখে পড়ে ক্ষীণ দেহখানি—পাংশু মুখের শ্রীটিও একটি বছর আগেকার কথাই মনে হয়—কত পরিবর্ত্তন,—হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় পদ্মের পাপড়ি যেন ঝড়িয়া গেছে। অকস্মাৎ ঐ শীর্ণ ঠোঁট দুটি—সেদিন কি অপরূপই না

দেখিয়াছি,—টিয়ার ঠোঁট যেমন লাল—আঙ্গুর যেমন কোমল।—আল্‌তারই আভা যেন।

ফিরিয়া যাইতেছি, ওরই কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া বাজে—কে, পদ্মা ?

—না, আমি অজয়।

—কে, কে, তুমি !

সহসাই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসে—তারপরই সুরু করে—কেন, কি চাও ?

—তোমাকেই দেখতে এসেছি জয়ন্তি—পদ্মার চিঠিতে

মুখের কথাও শেষ হইতে পারে না।

মুহূর্ত্তে বলে—না, না, মিছে কথা,—তুমি যাও, বেশ আছি আমি।

তারপরই কেমন হাঁপাইতে থাকে।—উত্তেজনায় যেন নিসাড় হইয়া যায়—মুহূর্তে লুটাইয়া পড়ে—হটাৎ।

ফিরিয়া যাই…ভাবি,—এত বড় অসুখেও ঐ মেয়েটা মরে নাই কেন ?—হয়তো ভালোই হইত।

সন্ধ্যার পর পদ্মা মার সঙ্গে চলিয়া যায়।—ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু বলে—জয়ন্তী ওর সঙ্গে কথা কয় নাই। ও নিজেও অভিমান করিয়া থাকে,—আর যায় না।

মার কাছে একদিন শুনি,—জয়ন্তীর স্বামীটা নাকি অমানুষ—এত যে শক্ত অসুখ, একদিন নাকি দেখা করিতেও আসে নাই কোন চিঠিও দেয় না।

বিয়ের রাতে আমার কিন্তু দেখিয়া ভালোই লাগিয়াছিল।—ভিতরের সত্য মিথ্যা কিছুই জানি না। তবে অসম্ভব কিছু নয়।—আবারও দিন কাটে

পদ্মার অতল বুকের কলরোলে আমার সমস্ত ক্ষোভেই দূর হইয়া যায়।—জীবন যেন গানের ছন্দে ভরা—অপরূপ।

একদিন জয়ন্তী হটাৎ-ই আসিয়া দেখা দেয়।—তারপরই দেখি, পদ্মার সঙ্গে তার কখন মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

পদ্মার গলা ধরিয়া কথা ক'য়—আদর ক'রে আবদারও জানায়—যেন পদ্মা আমার বউ নয়—জয়ন্তীর।

আমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি ঘোচেনা,—আমি যেন ওর কাছে অ-চেনা পর-পুরুষ কেউ।

আশ্চর্য্য !

ঘরে বাইরে

নববর্ষে আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকা এবং সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। তাঁহাদেরই সহানুভূতিতে ধূপছায়ায় দ্বিতীয় বৎসর সুরু হইল—আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহা স্মরণ করি।

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Work
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

ডেনিস মউনির

গোল্ড লিফ নং ১ ব্রাণ্ডি

বিশ বৎসরের পুরাতনের গারাণ্টি



রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে

ও

সুস্থ দেহ সবল করিতে অদ্বিতীয়!!!

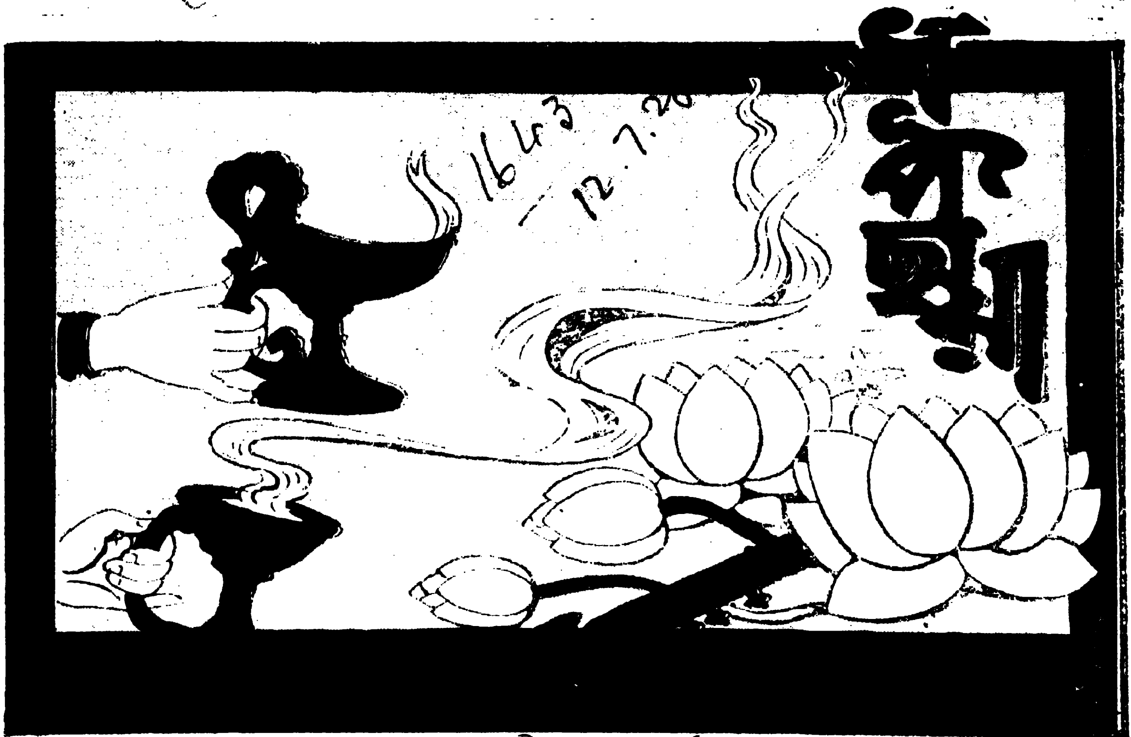
প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীতে

ডেনিসমউনি

পরীক্ষিত ও সমাদৃত।

সোল এজেন্টস—এন্, সি, সাহা এণ্ড কোং

কলিকাতা ও মাদ্রাজ।



সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি।

প্রতি সংখ্যা ।• আনা। বার্ষিক ৩৸• আনা।


আমার কেশরঞ্জন তেল ফুরিয়ে গেলে আর কোন কাজে মন লাগে না
কলিকাতা

প্রগতি

সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

আগামী আষাঢ়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে

এ-বৎসর প্রগতিতে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম

শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীপ্রভু গুহঠাকুরতা	নজরুল ইসলাম
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী
জসীম্‌উদ্দীন	শ্রীযুবনাশ্ব	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীবুদ্ধদেব বসু	শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত	শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

চৈত্র ও বৈশাখ প্রতি সংখ্যায় নজরুল ইসলামের একটি করিয়া নূতন গজল গান স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈশাখ সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

"প্রবাসী"

ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে—

প্রগতিতে কখনো কোনো অনুৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয় নাই

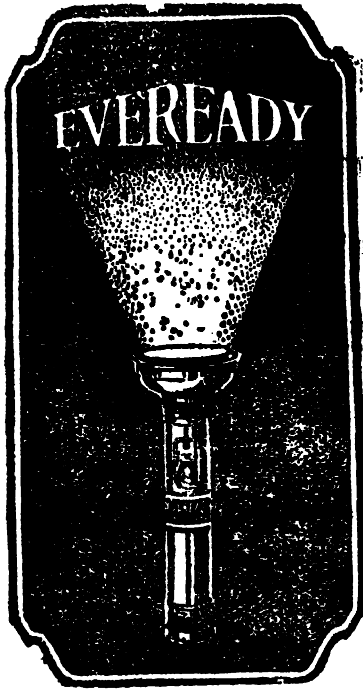
নব-বৎসরের বার্ষিক মূল্য (তিন টাকা ছয় আনা)

২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে প্রেরিতব্য।

বিজ্ঞান জগতে নুতন আবিষ্কার

১৫০০ ফুট আমেরিকান এভার রেডিফোকাসিং

সার্চ্চ লাইট, মুল্য ১৫৲।



আপনি কি আমেরিকান "এভার রেডি" সার্চ্চ লাইট দেখিয়াছেন? ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি অন্ধকারে চোর, ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর হাত হইতে বাঁচিতে চান, এভার রেডি লাইট আপনার বন্ধুর কাজ করিবে। স্থইস টিপিলে উজ্জ্বল আলো চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া বহুদূর দেখা যাইবে, যখন ইচ্ছা জ্বালাইতে পারিবেন। মুল্য ৮০০ ফুট ১০৲; ৪০০ ফুট ৮৲; ৩০০ ফুট ৬৲; ষ্টাণ্ডার্ড টাইপ মুল্য ৪৲ টাকা হইতে ৯৲। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়। অর্ডারের সহিত ২৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।

মহামায়া এজেন্সি

৮৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষিত

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন ও সরেশ সন্দেশ পাইবার এক মাত্র স্থান।

ও আমিষ খাবারের জন্য মডেল ক্যাবিন

শ্রীমানি মার্কেট, সিমলা, কলিকাতা।

ধুপছায়ার বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৩০৲ টাকা	সাধারণ কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,, ...	৩০৲ টাকা	,, ,, সিকি ,, ...	৫৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,, ...	১৬৲ টাকা	সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,, ...	১০৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,, ...	৩০৲ টাকা	,, ,, সিকি ,, ...	৬৲ টাকা
,, ,, [illegible] ,,	১৮৲ টাকা	টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখ পৃষ্ঠা	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,, ...	৫০৲ টাকা	আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	১৬৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,, ...	১৫৲ টাকা		

কার্য্যাধ্যক্ষ—ধুপছায়া।



শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

[illegible]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

ধূপছায়ার নিয়মাবলী

মূল্য—

ধূপছায়ার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵ ও যাণ্মাষিক ১৸৹, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। নমুনার মূল্যও ।৹ আনা। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ধূপছায়ার বৎসর গণনা করা হয়। মূল্যাদি কার্য্যাধক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইতে অনেক অসুবিধা সুতরাং আগে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে, আমাদের ও গ্রাহকদের সকলেরই সুবিধা।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা—

ধূপছায়া প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোন মাসের কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাক বিভাগের উত্তরসহ সেই মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে আমাদের নিকট অপ্রাপ্তি সংবাদ পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর—

রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রচনা—

সকল রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা গল্প কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনও উত্তর দিতে অসমর্থ। ফেরৎ রচনাদি লেখকদিগের নিকট পৌছান সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জ্জিন বাদ দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া পরিষ্কার অক্ষরে রচনা না পাঠাইলে প্রকাশিত না হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

বিজ্ঞাপন—

কোনও মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। বিজ্ঞাপন বন্ধ কারবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ লইবেন। ব্লক কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই, যদিও ব্লক যাহাতে না ভাঙ্গে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

কার্য্যালয়ঃ—
১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



সাহিত্যে আধুনিকতা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা আপনাদের কাছে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, সে প্রবন্ধের আলোচনা দশ, পনেরো মিনিটের মধ্যে করা অসম্ভব। যে প্রবন্ধ পড়তে লাগে এক ঘণ্টা তা' লিখতে লাগে অন্তত দশ ঘণ্টা। এবং তা লিপিবদ্ধ করবার পূর্ব্বে বক্তব্য কথা মনে গুছিয়ে নিতেও কিছু সময় লাগে।

সুতরাং এ জাতীয় প্রবন্ধের দু'কথায় সম্যক আলোচনা করা যায় না, সমালোচনাও করা যায় না।

শৈলেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, সাহিত্য শব্দ তিনি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে Darwin এর Origin of species, Mill এর Utilitarianism, রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতিও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দর্শন, বিজ্ঞান, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রও কখনো কখনো সাহিত্য পদবাচ্য হয়। আমারও বিশ্বাস তাই। তাঁর একথা সম্পূর্ণ সত্য যে সাহিত্য এ সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। ফলে তাঁর প্রবন্ধে তিনি নানারূপ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আলঙ্কারিক সমস্যার বিচার করেছেন। প্রবন্ধ লিখতে গেলেই আমরা এ সকল সমস্যার অবতারণা করতে বাধ্য। অর্থাৎ আমরা চাই আর না চাই, আমাদের প্রবন্ধের অন্তরে কিছু না কিছু দর্শন, বিজ্ঞান থাকতে বাধ্য। অমুকের লেখা আমার ভালো লাগে অথবা লাগে না, এমন কথা বলায় সে লেখা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। বলা হয় শুধু বক্তার অহৈতুকি

কয়েকদিন আগে রামমোহন লাইব্রেরীতে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা বসে। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। সভাতে শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা একটি অতি-দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্য যে কিছুই নয়, কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের সংযোগে অসুন্দর ভাষার দৌরাত্ম্য মাত্র,—এবং এই সাহিত্যের বিষয় বস্তু অশ্লীল তো বটেই, সমাজের পক্ষেও নাকি অসম্ভব রকমের অকল্যাণ-কর। সেদিন লাহা মহাশয় এমন ধরণের অনেক কিছুই বলেছিলেন—তাঁহার বলার মধ্যে, যুক্তি যতখানিই থাক্—কবিত্ব ছিল প্রচুর, নাটকীয় হাব ভাবও কম কিছু নয়; সর্ব্বোপরি ছিল—মনের ঝাঁজ ও ঈর্ষা।

সাহিত্যে আধুনিকতার বিষয় বলতে গিয়ে তিনি অন্ততঃ দশ বারোটি বিষয়ের অবতারণা করেন—কিন্তু সব গুলিই অপ্রাসঙ্গিক ও নিতান্তই অহেতুক। তাঁর সব চেয়ে বড় কথা আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকগণ বঙ্গ-বাণীর কমল-বনে পচা নর্দ্দমা কাটছেন,—সুসাহিত্য কি তাঁরা তা' জানেন না—সেরূপ শক্তিও তাঁদের নেই—ইত্যাদি।

সভায় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—যথা, ডাঃ কালিদাস নাগ, শ্রীমোহিত লাল মজুমদার, কবি নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি।

লাহা মহাশয়ের ঘণ্টা-ব্যাপী প্রবন্ধ-পাঠের পর,—সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

সম্প্রতি, তাঁর নিকট হতে সেই আলোচনাটি পরিবর্দ্ধিত প্রবন্ধ আকারে পাওয়া 'ধূপছায়ায়' প্রকাশিত হ'ল।—সম্পাদক।

প্রীতি অথবা বিরক্তির কথা। কিন্তু কেন ভালো লাগে অথবা কেন ভালো লাগে না, তা' বলতে গেলেই আমাদের নানারূপ যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। এবং সে সব যুক্তি আমরা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করি, তার নাম হয় দার্শনিক সত্য, নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য। শৈলেন্দ্রবাবু সে কারণ নানা সমস্যা তুলেছেন, যার হাতে হাতে মীমাংসা করা অসম্ভব। কারণ উক্ত সমস্যা গুলির প্রত্যেকটিই মনকে নাড়া দিয়ে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক করে। সুতরাং এ সব সমস্যার, আগে মনে আলোচনা না করে মুখে আলোচনা করতে সাহস হয় না।

(২)

আমার ধারণা যে তাঁর প্রধান বক্তব্য কথা এই Art for art কথাটা নিরর্থক। শুধু তাই নয়, উক্ত বুলির দোহাই দিয়ে অনেক আর্টের উপাদানকে অবজ্ঞা করেন।

আমার ধারণা শৈলেন্দ্রবাবু যে তর্ক তুলেছেন, সে হচ্ছে আর্টের Form এবং Content এর মূল্য নিয়ে ইউরোপের মামুলি তর্ক।

যখন একদল লোক Form এর উপর বেশি ঝোঁক দেন তখন আর একদল লোক Content এর উপর বেশি ঝোঁক দিতে বাধ্য। সুতরাং সে অবস্থায় Content পক্ষীয়দের সঙ্গে Form পক্ষীয়দের বিবাদ উপস্থিত হয়।

আমার বিশ্বাস Form ও Content নিরপেক্ষ নয়, Content ও Form নিরপেক্ষ নয়। আর্ট বস্তুটি কি তা আমরা ঠিক বলতে না পারি, একথা ভরসা করে বলা যায়, সেই সাহিত্য, সেই চিত্র, সেই সঙ্গীত আর্ট পদবাচ্য যার অন্তরে এবং অন্তরে Form এবং Content মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে সেরূপ স্থলে Formকে Content এর মূর্ত্তিও বলতে পারি আর Contentকেও form এর আধার মাত্র বলতে পারি। এরকম কথা বলায়, ও দুয়ের নিত্য সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়, তার বেশি আর কিছু বলা হয় না। কারণ উপাদানের মাহাত্ম্য থেকেই যে রূপের মাহাত্ম্য উদ্ভূত হয়, এমন কথা বললে, তা' যে সত্য নয়, তার তারও প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা একতাল মাটি নিয়ে শিবও গড়তে পারি, বানরও গড়তে পারি;—কারণ উভয় মূর্ত্তিরই উপাদান এক।

আমার বিশ্বাস Art for art যখন আর্টের একমাত্র মূল মন্ত্র হয়, তখন কথাটা সত্য কিন্তু উক্ত মন্ত্রকে জীবনের মূল মন্ত্র হিসাবে গ্রাহ্য করলেই তা' হয়ে পড়ে অসত্য। যেমন জড়-জগতের সত্য গুলি Science এর দিক থেকে দেখলে পূরো সত্য—কিন্তু সে গুলি মানব জীবনের মূল সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করলেই আমরা ভুল করি। তবে এই কারণে Science যে immoral নয়, তা' প্রমান করতে ইউরোপের একটি বড় বৈজ্ঞানিক Heuri Poincare কে অনেক বাগ্ বিস্তার করতে হয়েছে।

(৩)

Form এবং content এর মধ্যে কোনটি ছোট কোনটি বড়, সে তর্ক তখনই ওঠে যখন কোনও সাহিত্য, সামাজিক লোকের নীতিজ্ঞান অথবা রুচি জ্ঞানকে আঘাত করে। তখন সামাজিক মনের এই বিরুদ্ধতার উত্তরে Art for art এর দোহাই দেওয়া চলে না।

চলে না যে তার প্রমাণ লোকে তখন সুন্দরের দোহাই না দিয়ে সত্যের দোহাই দেয়। ভাবান্তরে কোন সাহিত্যকে অশিব বলবামাত্র প্রতিপক্ষ Art এর দোহাই না দিয়ে Science এর দোহাই দেয়।

এতে এইমাত্র প্রমাণ হয় সত্য, শিবসুন্দরের ভিতর একটা যোগাযোগ আছে। এর কারণও তিনটির কোনরূপ বাহ্য সত্ত্বা নেই, তিনটিই মানুষের মনের জিনিস্ আর মানুষের মন মূলতঃ এক।

এখন প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে অনেকে সুরুচির সঙ্গে সুনীতি গুলিয়ে ফেলেন। ও উভয় যে এক নয় তা' যাঁর ধ্রুবোপাখ্যানের সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

সুনীতি প্রধানত জীবনের কথা ও সুরুচি সাহিত্যের।

নীতি জিনিষটে একমাত্র স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ঘটিত নয়, তার এলাকা সমস্ত ব্যবহারিক জীবন। কিন্তু সুরুচি কথাটার অর্থ অত ব্যাপক নয়। রুচি কথাটার অর্থ অনেকের কাছে একমাত্র মানুষের যৌন-সম্পর্কের Expression গত। এমন লেখাও আছে, যা' নীতি-পূর্ণ অথচ ঘোর অশ্লীল, অপর পক্ষে এমন লেখাও আছে যা' শ্লীল অথচ যার নীতি ভয়াবহ।

সাহিত্যে শ্লীলতার কথা বহু পুরাতন এবং যুগভেদে, দেশভেদে ও কথার অর্থও বিভিন্ন।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে—অশ্লীলতা একটি ভাষার দোষমাত্র, ভাবের নয়।

অপর পক্ষে যে ফরাসী সাহিত্য ফরাসী জাতির কাছে কুরুচিপূর্ণ বলে মনে হয় না, কিন্তু ইংরাজদের মতে তা' অশ্লীল। Anatole France এর লেখার ইংরেজী অনুবাদ আছে; কিন্তু তার প্রতি কথা যে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অথচ ফরাসীরা সাহিত্য সম্বন্ধে নিজেদের সুরুচির বড়াই করেন। এ বিষয়ে তাঁদের taste নাকি অতি সুকুমার।

(৪)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে নীতির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কাম মানুষের একমাত্র রিপু নয়। সুতরাং নীতিবীরকে অন্যান্য রিপুর উপরও জয়ী হতে হয়। সাহিত্যে কুরুচিও আমরা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির নির্লজ্জ প্রকাশেও দেখাতে পারি। যে লেখায় এ সকল মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে সব রচনাও পাঠকের মনে জুগুপ্সার উদ্রেক করে। সম্ভবতঃ ফরাসী জাত এই শ্রেণীর কুরুচিকেই জঘন্য মনে করে। কারণ এ সকল রিপুর দৌরাত্ম্যও অসামাজিক।

যদিচ দেশভেদে, কালভেদে সমাজের রুচির ভেদ ঘটে, তবুও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রতি দেশে প্রতিযুগে প্রতি সমাজের একটি বিশেষ সামাজিক রুচি থাকে এবং যে সাহিত্য সেই সামাজিক রুচিভ্রষ্ট সে সাহিত্যের অন্তরে যদি কোন অসাধারণ সৌন্দর্য্য কিম্বা মহত্ব না থাকে, তা'হলে তা' হীন বলেই গণ্য হবে।

আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে সাহিত্য সৃষ্টিরও কতকগুলি limitation আছে। গোড়ার কথা অর্থাৎ ভাষার কথাই ধরা যাক্।

আমরা যে শ্রেণীর লেখক হইনে কেন, আমরা সকলেই ব্যাকরণের বাঁধা নিয়ম অনুসারে লিখতে বাধ্য।

আমাদের মধ্যে যিনি যতই ইংরাজী ভাবের ভাবুক হন না কেন, আমাদের কারও I is লেখবার অধিকার নেই। ওকথা লিখে Intensity of feeling এর দোহাই দিলে আমরা হাস্যাস্পদ হব।

সামাজিক ভাষার মত, সামাজিক রুচিও আমরা নিরাপদে লঙ্ঘন করতে পারিনে। যদি না আমাদের প্রতিভার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য থাকে যে কলমের এক ঘায়ে আমরা নবরুচির সৃষ্টি করিতে পারি। এহেন প্রতিভার সাক্ষাৎ কদাচিৎ দুই একজনের মধ্যে মেলে।

সুতরাং আমাদের মত সাধারণ সাহিত্যিকদের পক্ষে এ বিষয়ে সংযম অভ্যাস করাই ভাল। কারণ সংযমের ভিতরেও শক্তির বিকাশ হয়। উভয় কুলের বন্ধনের মধ্যেও নদী খরস্রোতে প্রবাহিত হয়।

(৫)

তবে একটা কথা বলা আবশ্যক। যদি সত্যসত্যই তরুণ সাহিত্যের রুচির সঙ্গে সামাজিক রুচির বিরোধ ঘটে থাকে ত তার মূলের সন্ধান করতে হবে আমাদের সামাজিক মনে। আমাদের নতুন শিক্ষা এবং নতুন অবস্থার ফলে যে আমাদের মনের অনেক বদল হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের মন অইল ক্লথ নয় যে আমাদের মনের উপর দিয়ে নব-শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সব জলের মত গড়িয়ে যাবে, তার ফলে আমাদের মন একটুও ভিজবেনা। ফলে সে সকল আচার-রীতির সঙ্গে অনেকের মানসিক সংঘর্ষ হতে বাধ্য।

মনোজগতে revolution ও reaction দুইয়ের মূলই সামাজিক মনে নিহিত। কারণ উভয়ই বর্তমানের প্রতি অসন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নীতি ও রুচির যদি নতুন ধারণা আর সম্ভবতঃ বিরুদ্ধ ধারণা যদি আমাদের হয়ে থাকে, ত তার কারণ খুঁজতে হবে সামাজিক মনে। অবশ্য নব সাহিত্য বহুলোকে সৃষ্টি করছেন। আর যদি এই হয় যে দুটি একটি লেখাই অনভ্যস্ত রুচির পরিচয় দিচ্ছেন তা'হলে তার জন্য সাহিত্যকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাহলে একথা বলতে বাধ্য হব যে সমাজ ও সাহিত্য যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাদের একটুও নড়চড় হয়নি। আর এক কথা—সাহিত্যের রকমফেরে যে সমাজের হাত বদল হবে এ আশাও আমি করিনে, এ ভয়ও আমি পাইনে। কেননা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজের উপর অতি সামান্য। তা' যদি না হ'ত ত সুনীতিপূর্ণ সাহিত্য পড়ে পড়ে সামাজিক লোক সব এতদিনে দেবতা হয়ে উঠত। পৃথিবীতে নীতিশিক্ষার কেতাব কিছু কম নয়, আর আমরা অন্ততঃ বাল্যকালে সকলেই তা' পড়তে বাধ্য হই।

'সদা সত্য কথা কহিয়ো' একথা কে না শুনেছেন? অথচ উক্ত শিক্ষার বলে দুনিয়ার লোক যে সত্যবাদী হয়ে ওঠেনি, ব্যবহারিক জীবনে তার নিত্য পরিচয় পাওয়া যায়। সৎ-সাহিত্যের প্রভাব যখন এত কম তখন অসৎ-সাহিত্যের শক্তি কি প্রলয়ঙ্করী হবার কথা?

জীবনটা শুধু মুখের কথা নয়।

(৬)

সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ বক্তা সে প্রশ্নও তুলেছেন। বলা বাহুল্য সে একটা মহা দার্শনিক প্রশ্ন এবং দু'কথায় এর উত্তর দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আমার পক্ষে ত নয়ই। তবে সত্য কোনক্ষেত্রে সরস হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে,—যে সত্য আমরা নিজে আবিষ্কার করি এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—সেই ব্যক্তিগত সত্যই সাহিত্যের উপাদান। কারণ সে ক্ষেত্রে কোন বাহ্য-সত্যই মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে সেই সত্যের উপলব্ধির ফলে ব্যক্তি বিশেষের অন্তরাত্মার অপূর্ব্ব অনুভূতি।

আজকের এ সভায় আমরা-ফ্রয়েড দর্শণের নাম বহুবার শুনেছি। উক্ত দর্শণের অথবা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না, হতে পারে শুধু psycho-analysis এর উপাদান, যদি না কোনও ব্যক্তি-বিশেষ ফ্রয়েড আবিষ্কৃত কোনও সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন এবং তার ফলে তাঁর অন্তরাত্মা বিচলিত হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্ Freud যাকে বলে Aedipus Complex বল্লেন সে Complex এর নাম তিনি গ্রীক নাটক থেকে সংগ্রহ করেছেন। উক্ত নাট্যকার Freud পড়েন নি কারণ তিনি ফ্রয়েডের জন্মের অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এবং শুনতে পাই যে উক্ত নাটক কাব্য হিসেবে একখানি মহা নাটক। এ ট্রাজেডি বিশ্ব মানবের এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে কারণ উক্ত নাটকের দর্শক ও পাঠকরা ওর প্রসাদে pity and terror অনুভব করেন। বলা বাহুল্য যে নাটককার যদি উক্ত ঘটনায় নিজে pity এবং terror অনুভব না করতেন তা হলে ও মনোভাব তিনি অপরের মনে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। ধরুন অপর কোন ব্যক্তি একই ব্যাপারকে যদি মজার বিষয় মনে করতেন এবং তিনি যদি বড় সাহিত্যিক হতেন তাহলে উক্ত ঘটনা অবলম্বন করে হয়ত অপূর্ব্ব প্রহসন রচনা করতে পারতেন। বাহিরের সত্য যে সাহিত্যের উপাদান নয় তার একমাত্র কারণ সাহিত্যে লোকে বাহ্যসত্য প্রকাশ করে না—করে শুধু মানুষের অন্তরের সত্য। সেই কারণেই বৈজ্ঞানিক সত্য যতক্ষণ Universal থাকে Concrete না হয় ততক্ষণ তা সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না। এই সূত্রে আপনাদের কাছে আর একটি কথা নিবেদন করতে চাই। শৈলেন্দ্র বাবু realism এবং তার গুরু Zolar উল্লেখ

করেছেন। Zola যদি যথার্থ সাহিত্য রচনা করে থাকেন তাহলে তাঁর রচিত সাহিত্য, সমাজের report নয়—পুলিশ রিপোর্টও নয়, বৈজ্ঞানিক রিপোর্টও নয়। সাহিত্যিক ও রিপোর্টার সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের লোক। ফ্রান্সের আধুনিক সমালোচকদের লেখায় পড়েছি যে Zolaর realismএর সঙ্গে ফরাসী-সমাজের realityর কোনই সম্বন্ধ ছিল না—যে সমাজের তিনি বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কারও কল্পনায় পৃথিবী স্বর্গ হয়ে ওঠে—কারও কল্পনায় নরক। Zolaর কল্পনা নারকীয়। তাঁর রচিত সাহিত্যও একরকম romantic সাহিত্য অর্থাৎ তাও পূর্ণমাত্রায় subjective এ কথা যদি সত্য হয় ত এই প্রমাণ হয় যে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক realismএর কোনও সম্বন্ধ নেই।

(৭)

যখন Zolaর কথা পাড়া গিয়াছে, তখন তাঁর বিষয়ে আর একটি সমালোচকের মত উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। বিচিত্রায় পড়লুম যে Roman Rolland শ্রীমান্ অন্নদাশঙ্কর রায় নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে বলেছেন যে Zolaর নভেল অতি উঁচুদরের সাহিত্য। এখন Roman Rolland নাম সকলেই শুনেছেন আর তিনি যে দুর্নীতি ও কুরুচির পক্ষপাতী এ কথা তাঁর অতি বড় শত্রু বলবেন না। অপর পক্ষে Zolaর নভেল—যে কদর্য্যতায় পরিপূর্ণ এবং তিনি যে প্রধানত বিভৎস রসেরই রসিক সে বিষয়েও সন্দেহ নেই তবে Roman Rolland তাঁকে এত বড় সার্টিফিকেট দিলেন কেন? এর কারণ স্পষ্ট, Roman Rolland নিজে লোকহিতৈষী এবং তাঁর ধারণা যে লোক-হিতব্রতেই Zola লেখনি ধারণ করেছিলেন। ফলে Roman Rollandএর মতে Zolaর কদর্য্যতা তার মহৎ কার্য্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। End justifies means—এও হচ্ছে ইউরোপের ধর্ম্মযাজকদের একটি সনাতন মত। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরাও বলেছেন যে লোকের মনে বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্তই বিভৎস রসের অবতারণা করা সঙ্গত। ক্ষেমেন্দ্র ও Roman Rolland উভয়েই পরম ধার্ম্মিক, একজন ঘোর বৌদ্ধ অপরটি ঘোর humanitarian। এর থেকে দেখা যাচ্ছে লোকের নীতিবুদ্ধি যখন প্রফুল্লিত হয় তখন সে সুরুচির কোনও তোয়াক্কা রাখে না—বরং সুরুচিকেই দুর্নীতি মনে করে। সাহিত্যের হিসেব কিন্তু স্বতন্ত্র। এই সব কারণে আমাদের সমালোচনার সাহিত্য রচয়িতাদের যে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই। কারণ আলঙ্কারিকদিগের বিধি নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কেউ সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি। কোন বাহ্য নিয়মের দ্বারা সাহিত্য শাসিত হতে পারে না, কারণ যে যথার্থ সাহিত্যিক সে নিজের মনের দ্বারাই শাসিত। সাহিত্যের ছোট বড়র প্রভেদ হয় শুধু সাহিত্যিকদের মনের ছোট বড়র প্রভেদে।

কিন্তু আর এক হিসাবে এরূপ আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। শৈলেন্দ্রবাবু বলেছেন যে সাহিত্য সমালোচনা করতে বসলে আমরা যে সকল কথার ব্যবহার করি যথা, রসসৃষ্টি ইত্যাদি, সে সকল কথার অর্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই। একথা সম্পূর্ণ সত্য। আর এ সকল কথার অর্থ স্পষ্টতর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের অর্থের বিষয় আলোচনা করা। এইরূপ আলোচনার ফলে আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হবে—এবং এ সকল শব্দের অন্তরে বহুলোকের অনুভূতির ও চিন্তার পলি পড়বে। কথা একই থাকবে—কিন্তু তার মর্ম্ম প্রস্ফুটিত হবে।

বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে emotion যে জাগানো যায় একথায় আমি বিশ্বাস করিনে, কারণ intelligence এবং emotion যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত মনোবৃত্তি এরূপ আমার ধারণা নয়—আর intelligence এর যে মস্তিষ্কে ও emotion এর হৃদয়ে এবং Will এর মেরুদণ্ডে বসতি এ কেন রূপ কথায়—বিশ্বাস করা অসম্ভব। সুতরাং বুদ্ধির চর্চ্চা করলে যে আমাদের জাতির হৃদরোগ হবে এ ভয়

আমি পাই নে। সাহিত্যের চর্চ্চা যখন বাঙালী দেশের পক্ষে মঙ্গল। আশা করি এ আলোচনাও সুনীতি করবেই—তখন সাহিত্যের রূপ গুণের আলোচনাও ও সুরুচিভ্রষ্ট হবে না। আর বলা বাহুল্য যে সমালোচনারও করতে হবে। এবং এ আলোচনা যত বেশি হয় ততই সুনীতি ও সুরুচি দুইই আছে।

কেহ আসিয়াছে—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কেহ আসিয়াছে চকিত চপল বন-হরিণীর মত,
গুণ্ঠনহীন দু'খানি নয়ন কুণ্ঠায় অবনত!
দেহে যৌবনভার,
এনেছে অতল গাঢ় রহস্য কালো অমাবশ্যার!
মদিরেক্ষণা কেহ আনিয়াছে রাঙা মদিরার ফেনা,
কবরীকলাপে যূথিকামুকুল গুঁজেছে করবী হেনা।
স্ফুরিত তড়িৎ কেহ আসিয়াছে দেহ-তট বন্ধুর,
পয়োধরে আর অধরে এনেছে মধুরতা মৃত্যুর!
মমতামাখানো চোখে
মিলনহীনার মিনতি এনেছে স্নিগ্ধ সন্ধ্যালোকে!
ভ্রূকুটিভূষণ আনিয়াছে কেহ, চরণে চঞ্চলতা,
স্ফুরণ এনেছে লোচনকোণায়, বচনে অস্ফুটতা!
কেহ এসে বসি' দূরে
সিঁথির সীমায় বাঁকা বিদ্যুৎ আঁকে রাঙা সিন্দুরে।
কেহ অকলুষা আকাশের ঊষা এসেছে নম্র অতি,
সুন্দরী কেহ সন্ধ্যা তারকা, কেহ বা অরুন্ধতী!
তবু ভাবি বসে' তাই—
আমার আহ্বানে সকলে এসেছে, তুমি শুধু আস নাই।

বুকের বিষ—

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

[জয়কালী চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিল]

জয়কালী। এই যে বউঠাকরুণ, এবার পালাবে কোথায়?

[দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল]

বিজয়া। [চমকাইয়া উঠিয়া] ওঃ, দূর হও তুমি—

জয়কালী। আচ্ছা, আমাকে তুমি একেবারে দেখতে পার না কেন বল দিকিন। আমি তোমার কি করেছি?

বিজয়া। কি করেছ জান না? যাক, সে কথায় কাজ নেই—দূর হও।—

জয়কালী। না, আমি আজ দূর হব না। আজ আমি মরিয়া হয়েছি। আজ তোমার কাছে একটা জবাব চাই, তারপর এস্পার ওস্পার যা হয় হবে। দেখ, আমি তোমার দেওর। দাদাও তোমার ভাসুর। একই সম্পর্ক। অথচ দাদা তোমার সম্পত্তি ঠকিয়ে নিচ্ছেন, তাও তুমি নির্ব্বিকারে সহ্য করছো। আর আমি—

বিজয়া। তুমি চাও সে বিষয়? নেও, এক্ষুনি নিয়ে বিদায় হও, ও কালামুখ আমায় আর দেখিও না।

জয়কালী। ছি, আমাকে এত ছোট মনে করছো তুমি? ছার বিষয়; তোমার বিষয় তুমি আমায় দেও না দেও তোমার ইচ্ছা, কিন্তু আমি চাই তোমাকে—আর কিছু চাই নে। আর আমি যদি তোমাকে পাই তবে দেখে নেব কে তোমাকে তোমার বিষয়ে বঞ্চিত করে।

বিজয়া। ঠাকুরপো! ফের কথা কইবে তো—

জয়কালী। চেঁচাবে—? চেঁচিও না! আমি তোমার উপর কোনও অত্যাচার ক'রব না, তোমার গা-ও ছোঁব না। কিন্তু আজ আমার কথা তোমায় শুনতে হ'বে। আমি তোমাকে ভালবাসি—আমি পাগল হ'য়ে গেছি তোমার জন্য। তুমি কেন আমায় ভাল বাসবে না?

বিজয়া। (কানে হাত দিয়ে) এ সব কথা অশ্রাব্য—তুমি পালাও শীগ্‌গির—

জয়কালী। তুমি আমায় ভাল তো বাসতে! যখন তুমি এ বাড়ী এলে তখন আমার চেয়ে প্রিয় তোমার কেউ ছিল না, মেজদা'ও নয়। আমার সঙ্গেই তখন তোমার ছিল সব হাসি খেলা, সব গোপন কথা। সারাদিন আমরা খেলা ধুলায় কাটিয়েছি—অর্দ্ধেক রাত তো আমার সঙ্গেই গল্পে কেটেছে তোমার।

বিজয়া। ঘাট হয়েছে। হাজার বার ঘাট হয়েছে। ছেলে বয়সে তোমাকে বন্ধু ভেবে যে আদর করেছি সে আমার অপরাধ হয়েছে—এখন আমায় ক্ষমা দেও।

জয়কালী। কিন্তু আমার ফোটফোট যৌবনের মুখে তুমি যে আমায় সেই নেশায় ফেলে তুলে দিলে— আমি সেই থেকে পাগল হয়ে রয়েছি তোমার জন্য। এখন গাছে চড়িয়ে মই টেনে নিলে চলবে কেন?

বিজয়া। ঠাকুরপো। পায়ে পড়ি তোমার, দয়া কর আমাকে। আমার মত দুঃখীকে দেখে দয়া হয় না তোমার?

জয়কালী। দয়া কি বলবো বউঠাকরুণ, তোমার দশা দেখে আমার বুক ফেটে যায়। আমি বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তোমার জন্য বসে রয়েছি আর তুমি তৃষিত হয়ে ছুটেছ মরীচিকার দিকে। কিসের জন্য? মেজদা তোমাকে

কোনও দিন ভাল বাসতো না—তার ভালবাসা কোনও দিন পাবে না—তবে আমাকে তুমি কেন—

বিজয়া। জয়কালী, চুপ কর—দূর হও—নইলে এক্ষুনি আমি চীৎকার ক'রে লোক জড় করবো।

জয়কালী। না, তা তুমি ক'রবে না। কেন না তুমি জান যে যদি সত্যি লোক জড় হয় তবে তারা তোমাকেই দোষী করবে। এ বাড়ীতে তোমার চেয়ে আমার বন্ধু ঢের বেশী।

বিজয়া। কিন্তু আমার বন্ধু সেই সতী যিনি স্বামীর নিন্দা শুনে দেহ ত্যাগ করেছিলেন—তোমার মত পাপিষ্ঠকে—

জয়কালী। তা ছাড়া বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি আর ভদ্রতা রক্ষা করবো না তা'ও বলে রাখছি। আমি যদি সত্যি জোর করি তবে তোমার কি সাধ্য আছে আমাকে এড়াবার? সেই তোমাকে আমার হাতে পড়তেই হ'বে, মাঝখান থেকে তোমার কলঙ্কটা ঢাক পিটিয়ে রটে যাবে। তুমি যত চেঁচাবে তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে আমি বলবো তুমি আমায় জড়িয়ে ধরেছ। সবাই আমার কথাই বিশ্বাস করবে নিশ্চয় জেনো।

[বিজয়া ভীত হইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। জয়কালী দুয়ার আগলাইয়া দাঁড়াইল।]

জয়। মিছে ছটফট ক'রে [illegible] বৌঠাকরুণ। তার চেয়ে স্থির হয়ে বুঝে দেখ। এখনও তোমার ভরা যৌবন—সমস্ত জীবনটাকে [illegible] দিকে, তার চেয়ে—

বিজয়া—উঃ, ওরে পাপিষ্ঠ, চুপ কর্ চুপ কর্। তোর জিভ যে খসে পড়বে। মা ভগবতী কি এত পাপ শুধু দাঁড়িয়ে দেখবেন?

জয়কালী। আমি হলপ করে বলছি, তিনি দাঁড়িয়েই দেখবেন, আমার কিছু হবে না। দেখই না পরখ করে। এই আমি তোমায় জড়িয়ে ধরছি, দেখ, তাতেও আমার কিছু হবে না।

[জয়কালী অগ্রসর হইতেই বিজয়া ছুটিয়া পলাইতে গেল—হাতে যাহা পাইল তাহাই ছুঁড়িয়া জয়কালীকে মারিতে লাগিল। হঠাৎ নেপথ্যে পাঁচুকে দেখা গেল।]

জয়কালী। মর্ আবাগের বেটা। ছোঁড়াটা এই সময়েই এসে পড়লো।

[জয়কালী পলায়ন করিল]

বিজয়া। কোথায় তুমি প্রিয়তম? বটবৃক্ষের আশ্রিতা-লতা আজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—মাটীর পোকা আজ তাকে অনায়াসে দলিত করছে। তুমি নাই, তাই আমার কিছুই নাই। সম্মান নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, শক্তি নাই। যারা তোমার মুখের দিকে চাইলে ভয়ে পালিয়ে যেত তারা অনায়াসে এসে আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিচ্ছে, আমায় অপমান করছে। আমার জীবনের দেবতা, হৃদয়ের অধীশ্বর নারীত্বের আশ্রয়—এসো ফিরে এসো—অনাথিনীকে আশ্রয় দাও। [পাঁচুর প্রবেশ] আয় বাবা আয়, বাছা আমার, মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে তোর।

পাঁচু। মা শুনেছ? এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী এয়েছেন বাজারে—সমস্ত লোক ঝুঁকে চলেছে তাঁকে দেখতে। এই রইলো পাততাড়ি আমি চললাম।

বিজয়া। [পাঁচুকে ধরিয়া] কোথা যাবি রে সর্ব্বনেশে? সন্ন্যাসীদের কাছে যাসনে খবরদার, ওরা ছেলে ধরা!

পাঁচু। না মা, সে তেমন নয়, সে ভারী ভাল লোক। আর কি চমৎকার গান গায়—আমার সঙ্গে কত কথা কইলে?

বিজয়া। কি সর্ব্বনাশ! তুই গিয়েছিলি তার কাছে? এমন দস্যি ছেলে আছে? যাক্, আর যাস নে।

পাঁচু। আমি যে বলে এসেছি যাব। পাঠশালে যাবার সময় আমি গিয়ে ছলুম, দুটো কথা বলতেই দেখি গুরুমশায় আসছেন, অমনি ছুটে গেলুম পাঠশালে। আমায় ছেড়ে দাও মা, আমি যাই।

বিজয়া। অ্যা, পোড়াকপালে, মিন্সে বুঝি ছোঁড়াটাকে গুণ করেছে। তুই যাসনে, বস্।

পাঁচু। জান মা, আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। বল্লুম, ঠাকুর আমার মার কান্না থামিয়ে দিতে পার? তা' সন্ন্যাসী বল্লে, কে তোর মা? আমি তোমার কথা বল্লুম। সে বল্লে, কই, তার তো ছেলে হয় নি। আশ্চর্য্য, মা, সন্ন্যাসী সব জানে।

বিজয়া! অ্যাঁ! তারপর? তারপর কি বল্লে?

পাঁচু। আমি যখন সব বুঝিয়ে বল্লাম তখন সন্ন্যাসী বল্লে তোর মা হিংসুটে তাই কাঁদে। তার সোয়ামী আনন্দে আছে, তা' তার সয় না, তাই কাঁদে। আমি বল্লাম, মিছে কথা, আমার মা হিংসুটে নয়। তা ছাড়া কাকাবাবুও সুখে নেই।

বিজয়া। তাতে কি বল্লেন তিনি?

পাঁচু। তিনি বল্লেন, সে পরমানন্দে আছে। আমি বল্লাম, তিনি হয়তো বেঁচেই নেই। তিনি হেসে বল্লেন, 'বেঁচে আছে সে। সুখে আছে।'

বিজয়া। জয় জগদম্বা। মা গো, বল দাও আমায়। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, সুখে থাকেন, তবে যেন আমার মনে একটুও দুঃখ না হয়। আমি না তাঁকে পাই—তিনি সুখে থাকুন। হাঁ, তারপর—

পাঁচু। তারপর, গুরুমশায়কে দেখেই তো আমি ছুট—যাই এখন, গিয়ে আরও সব কথা জিজ্ঞাসা করবো।

বিজয়া। না, না, তুই যাসনে, বস্।

পাঁচু। না, আমি যাই—

[ছুটিয়া প্রস্থান [

বিজয়া। ও পাঁচু যাসনে যাসনে,—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন]

[কাত্যায়নী প্রবেশ করিলেন। বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া কাত্যায়নীর পিছু পিছু তার ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বসিল।]

বিজয়া। মা গো, এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী এসেছে, চল না দেখে আসি।

কাত্যা। কোথায় যাবি মা। কত সন্ন্যাসী তো এলো, গেল. কত লোকের কাছে ছুটে গেলাম, কেউতো কিছু করতে পারলে না।

বিজয়া। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী মা—পাঁচু গিয়েছিল তার কাছে, তিনি আমার কথা সব বলে দিয়েছেন—

কাত্যা। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া—স্বগতঃ] হায় মা, অভাগীকে আর মিছে আশা দিয়ে ক' জ্বালাবে? [প্রকাশ্যে] আচ্ছা যাও, যাবো'খন, এখন নাওয়া-খাওয়া হ'ক—ও আমার পোড়াকপাল, আজ যে পূর্ণিমার উপোষ—

বিজয়া। মা, সন্ন্যাসী পাঁচুকে ব'লেছেন উনি বেঁচে আছেন, ভাল আছেন।

কাত্যা। অ্যাঁ কি বলিস? কোথায় সে সন্ন্যাসী?

বিজয়া। পাঁচু বল্লে পাঠশালার পথে—বোধ হয় বাজারে।

কাত্যা। ও মা সেখানে কেমন ক'রে যাব? তা বউমা তুমি থাক, আমি যাই—

বিজয়া। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকেও নিয়ে চল।

কাত্যা। কেমন করে যাবি তুই বল্। বাড়ীতে একটা বেটাছেলে নেই। তা ছাড়া সওয়ারী—

বিজয়া। আমি হেঁটেই যাব মা—চল।

কাত্যা। না, সে কি হয়? তোর ভাসুরের মাথা হেঁট হ'বে। তা ছাড়া একা কেমন করে যাবি। আচ্ছা দেখি জয়কালী আছে না কি?

বিজয়া। না মা থাক্, তাকে ডেকো না।

কাত্যা। কেন কি হয়েছে? সে বোধ হয় কাছেই আছে, তাকে নিয়ে গেলে কোনও কথা হবে না।

বিজয়া। না থাক, আমি যাব না, তুমিই যাও।

কাত্যা। অবাক করলে তুমি বউমা। আমি বরাবর দেখে আসছি জয়কালীকে তুমি দুচক্ষে দেখতে পার না।

অমন সোনার ছেলে সে, আমাদের বলতে অজ্ঞান। না ই বা হবে কেন! ছমাস বয়সে ওর যখন মা মারা গেল তখন থেকে আমি ওকে মানুষ করেছি। সে বউঠাকরুণ বলতে অস্থির আর তোমার দুচক্ষের বিষ সে। এতো ভাল নয়। ছি, দেওরও যা, ছোট ভাইও তা, তার উপর এমন বিষ নজর তো ভাল নয় মা।

বিজয়া! (নতমুখে) থাক্ মা, তুমিই যাও।

কাত্যা। কেন? এই যাবা'র জন্ম অস্থির—

[বেহারীর প্রবেশ]

যাক্ এই তো বেহারী এয়েছে। বেহারী—আমাদের সঙ্গে একবার একটু যেতে হবে বাজারে, কে সন্ন্যাসী এয়েছে দর্শন করতে যাব।

বেহারী। আচ্ছা কাকীমা, আমি ভট্‌চায্যি মশায়ের কাছে একবার যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে আপনাদের নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—পথ

[একদল নাগরিকের প্রবেশ]

১ম না। ও ভাই আমাদের ঠাকুরকে এদিকে দেখেছ?

২য় না। কে ঠাকুর বাবা—আমি ঠাকুরও দেখিনি, কুকুরও দেখিনি।

৩য়। প্রভু, কোথায় অন্তর্ধান হলেন হঠাৎ, আমরা চ'খে চ'খে রেখে হারালাম।

৪র্থ। ওঁরা মহাপুরুষ। ওঁদের চোখে দেখতে পাই, সেই পুণ্যের ফল। সব সময় চোখে চোখে রেখে ওঁদের আটকাবে, এমন ক্ষমতা কার আছে?

১ম। হায় হায়—ছুটে আসছি, দেখি, আমার বাগানের ভেতর ওই অলপ্পেয়ে ভশ্চায্যির গরুটা ঢুকেছে। সেটাকে তাড়িয়ে আনতে যেটুকু দেরী—এরি মধ্যে ঠাকুর অন্তর্ধান হলেন। সবাই দেখতে পেল আর আমরাই পেলাম না।

৪র্থ। আর কেঁদে কি হবে বল—এখন সবাই মিলে জোড় হাত করে তাঁকে ডাক, যদি দেখা দেন।

সকলে। প্রভু দেখা দেও। দয়া কর। একবার দেখা দেও।

[ঠাকুরের প্রবেশ। সকলে গড় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

১ম না। বাবা, আমার বাগানের এই ফল এনেছি।

[একটা পেঁপে দিয়া প্রণাম]

৪র্থ। ঠাকুর এই দুধটুকু।

৩য় না। ঠাকুর এই ডালিম দুটো।

ঠাকুর। বাপ সকল, কেন তোমরা আমার পিছু পিছু ছুটে এসেছো? আমি ঠাকুর নই, দেবতা নই। সামান্য সাধক। আপন মনে শুধু মাকে ডাকি। আমাকে দিয়ে তোমাদের কি প্রয়োজন?

১ম। ঠাকুর আমার উঠানের আমগাছটায় ফল হয় না কেন বলে দিন দয়া করে।

৪র্থ। ঠাকুর, আমি এই রস-বাতে ভুগে ভুগে একেবারে অকর্ম্মা হয়ে গিয়েছি।

৩য়। ঠাকুর, আমি বাণিজ্যে যাচ্ছি—একটা তাবিজ কি ওষুধ কিছু দিন যাতে আমার যাত্রা সফল হয়।

ঠাকুর। বাপ সব, তোমরা তোমাদের দান ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যা তোমরা আমার কাছে চাও তা তোমরা পাবে না, তা দেবার শক্তি আমার নেই।

১ম না। তবে যা হয় কিছু দিন—

৪র্থ না। ঠাকুরের একটা আশীর্ব্বাদী ফুল দিন—

৩য় না। এক ফোঁটা চরণামৃত—

ঠাকুর। আমার কিছুই নেই, কিছুই দিতে পারি না তোমাদের। আছে একটা জিনিষ তাই যদি চাও দিতে পারি। তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সকলে। তাই দিন যা ঠাকুরের দয়া হয়।

ঠাকুর। বোঝ বাবা, সে বড় শক্ত জিনিষ, তা পেলে আর কিছুই ভাল লাগবে না—ধন দৌলত; দারা সুত, সংসারের সব কিছু একেবারে ঝরে পড়ে যাবে—

সব ছেড়ে আমারই মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। সে অমূল্য নিধি—বৈরাগ্য। নেবে কেউ?

১ম। (মাথায় হাত ঠেকাইয়া) হাঁ, হাঁ, বৈরাগ্যই তো সংসারের সার, তার চেয়ে বড় আর কি আছে। তা ঠাকুর আমি সামান্ত একটু চাকরী করি—আর বছর দুই চাকরী করলেই আমার পরিবারের একটা সংস্থান হবে। তার পর প্রভুর কাছে বৈরাগ্যের আদেশ নেব।

৪র্থ। আর আমার এই ভাইপোদের সঙ্গে এক সঙ্গীন মামলা চলছে—এখন আমি সরে পড়িতো বেটারা সব ঠকিয়ে নেবে।

৩য়। আমার মুস্কিলটা তো বুঝতেই পারছেন ঠাকুর আমার ডিঙ্গি তৈরী, বাতাসটা পেলেই ছাড়বো, এখন সে ডিঙ্গি ফেলে যাওয়া তো অসম্ভব।

ঠাকুর। তবে তোমরা বিদায় হও। আমাকে শান্তি দেও।

১ম। বাবা একটু আশীর্বাদ—

ঠাকুর। আশীর্ব্বাদ করি তোমার বৈরাগ্যলাভের সব অন্তরায় দূর হয়ে যাক।

১ম। আ মলো যা, এ কোন্ দেশী আশীর্ব্বাদ হ'ল—আমার চাকরীটুকু খসাবার ব্যবস্থা—দূর কর!

দ্বিতীয় দৃশ্য—বৃক্ষতলে আশ্রম।

[সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ।]

[সন্ন্যাসী আপন মনে গান গাহিতে লাগিলেন]

—গান—

আয়রে ছুটে আয়রে তোরা
আয়রে বিশ্ব-বাসী,
নয়ন ভরে দেখবি যদি
মায়ের মুখে হাসি,
ও সে, মেঘের কোলে জ্যোছনা ঝরে,
গজরাজের অঙ্গে দোদে
গজমোতির রাশি।
পুলকধারা উছলে ওঠে
সারা ভুবন শিউরে ওঠে,
শিউলি ঝরে হাসি।
চাঁদ আকাশে হেসে মরে
কমল হাসে সরোবরে
পুলকে বিকাশি।
আজ কি আনন্দ ক্ষেপা মায়ের
উঠলো ধরায় ভাসি।

১ম নাগরিক। আহাহা, কি গান। কান জুড়িয়ে গেল। বাবা পায়ের ধূলো দেও।

২য় নাগরিক। মার মরি, প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। বাবা। দয়া কর।

[পদধূলি গ্রহণ]

ঠাকুর।—গুরুদেব! এ কি আদেশ করলে আমায়! কেন পাঠালে আমায় এ লোকের ভিড়ে? এরা যে আমার একদণ্ড সাধনের অবসর দেয় না। কেমন করে এদের হাত থেকে মুক্তি পাব প্রভু।

[একজন লোক সুমতি ও সুন্দরকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া আসিল এবং সকলে চারিদিক হইতে খোঁচা দিতে লাগিল]

—আহাহা কেগো বাছা তোমরা।

সুন্দর। আমি বৈষ্ণবের দাস—আমার নাম সুন্দর দাস।

১ম না। আপাততঃ সুমতি দাস—মার শালা নেড়া বৈরাগীকে।

ঠাকুর। আহা ওদের মেরোনা। ওরা কি করেছে তোমাদের?

[সুমতি ও সুন্দরকে আগলাইয়া দাঁড়াইলেন]

৪র্থ না। ওই নচ্ছার বেটী ভদ্রবরের বউ। ও মাগী বেরিয়ে গেছলো—আজ তিনদিন বাদে ধরা পড়েছে ঐ মিন্সের সঙ্গে। তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ওদেরকে উল্টো গাধায় চড়িয়ে সহর থেকে বের করে দেওয়া হবে।

ঠাকুর। বাপ সকল, ওকে তোমরা ছেড়ে দেও।

১ম। প্রভু, ওরা পাপিষ্ঠ, আপনার দয়ার যোগ্য নয়।

ঠাকুর। না বাবা দয়ার যোগ্য নয়—ওরা মায়ের সন্তান। এক ব্রহ্ম ওতে আমাতে আছেন। ওকে দয়া করবো আমার এমন কি স্পর্দ্ধা আছে। ওদেরকে তোমাদের ছাড়তে হবে।

১ম। প্রভু এ আদেশ করবেন না।

ঠাকুর। এ শুধু আমার আদেশ তা নয়,—স্বয়ং ভগবানেরও—

৩য়। আচ্ছা প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য—কিন্তু কেবল হাতের সুখ ক'রে এক ঘা দেব!

[লাঠি তুলিয়া মারিল। সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া আসিলেন লাঠি তাঁর গায় লাগিল]

সকলে। আহা—হা—হা

ঠাকুর। কিছু হয়নি বাবা, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি দুঃখীর ব্যথা আপনার অঙ্গে নিতে পেরেছি।

৩য়। (সন্ন্যাসীর পায় পড়িয়া) প্রভু আমায় ক্ষমা করুন।

ঠাকুর। কোনও চিন্তা নেই বৎস। তুমি আমার কোনও অনিষ্ট করনি। তোমার ক্ষমা চাওয়ার কোনও দরকার নেই।

[সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে নাগরিকগণ পিছু পিছু চলিলেন]

(ক্রমশঃ)

প্রতিযোগিতা

ছোট গল্পের জন্য

প্রথম পুরস্কার—২০৲ * দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫৲

সম্পাদকের নিকট আষাঢ়ের ভেতরে পৌঁছান চাই।

সুখে-দুঃখে

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিবাহ হইল।—চব্বিশ পরগণার নিরক্ষর গ্রাম্য চাষীর একটি সুস্থ সবল বারো তেরো বছররের ছেলে, আর তাহাদেরই সমান-ঘরের বছর সাত-আট বয়সের কালো গোল-গাল গড়নের একটি মেয়ে।

বরপক্ষকে পণ দিতে হইল—এক কুড়ি তিন টাকা। এমনি পণ দেওয়া তাহাদের প্রথা।

বিবাহ হইল—।

মেয়েটি কিন্তু ছেলেটিকে দেখিয়া ঘোমটাও দেয় না, লজ্জাও করে না।

ছেলেটির তাহাতে ভ্রূপেক্ষও নাই। ভাবে,—তবু যা হোক খেলার সঙ্গী তো জুট্‌লো একটা।

বলে,—চ' আহুরী ঘোষগার বাগান থেকে কুল পেড়ে আনি গে।

দ্বিতীয় অনুরোধের প্রয়োজন হয় না; আহুরী তৎক্ষণাৎ রাজী। বলে,—কিন্তু খুব আস্তে ভাই। সুইকে শুটি মেরে মেরে যাবি যেন কেউ দেখ্‌তি না পায়।

চুরি করিয়া কুল পাড়া হয়। কিন্তু তাহার বিভাগ লইয়া বিরোধ ঘটে। স্বার্থ-পর স্বামী দশ আনা ছ' আনা অংশ করে। অর্দ্ধাঙ্গিনী আহুরী কিন্তু অর্দ্ধেকের কমে সন্তুষ্টা নয়। কাজেই ন্যায় সঙ্গত মীমাংসায় শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভগবানের পক্ষপাতিত্ব!—তাহাতেও আহুরী হারিয়া যায়। শেষে হয়তো সে রাগিয়া গিয়া ছেলেটার হাতে খুব জোরে একটা কামড় বসাইয়া দেয়। ছেলেটিও তাহার পিঠে গুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দেয়; তারপর কোঁচড়-ভরা কুল শুদ্ধ একেবারে উধাও।

ঘণ্টা খানেক পরস্পরে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

শেষে ছেলেটি হয়তো নিজেই আসে।

ডাকে,—আহুরি ও আহুরি—

আহুরীর কিন্তু তখনও রাগ পড়ে না।

বলে,—না, আমি আর তোর সঙ্গে কোতা কইবুনি, ঝা'।

পরদিন ছেলেটির হাতের ফুলাটুকু হঠাৎ তাহার মায়ের চোখে পড়িয়া যায়।

জিগ্‌গেসা করে,—তোর হাতে ও কিসির ফুলো রে?

ছেলেটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে,—বউ কেমড়ে দেচে।

পুত্র-বধূর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া শাশুরী গর্জ্জিয়া উঠে,—কোতাকার লক্ষীছাড়া মেয়ে রে বাপু! একটু নোজ্জা সরম নেই!

আহুরী ভয়ে ভয়ে সরিয়া যাইয়া তাহার বৃদ্ধ শ্বশুরের পিঠের কাছটিতে ঘেঁসিয়া দাঁড়ায়।

শ্বশুর সস্নেহে তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলে,— তোরও অমন বয়েসে তা' ছ্যালোনি বড় বৌ, তোরও অমন বয়েসে তা' ছ্যালোনি। আমার বাঁ ঠ্যাংএর বুড়ো আঙুলি একনও তোর দাঁতের দাগ আচে।

কৈশোরের শেষ দিন গুলিতে মুখে কী অপূর্ব্ব সুষমাই না ফুটিয়া উঠে!

ধান-কাটা তখন শেষ—

উজানি বেলায় পান্তা খাইয়া ছেলেটি গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। মাঠে কিন্তু তাহার মন বসে না। কেবলই একখানা নিটোল ঢল্‌ঢলে মুখ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া

উঠে। তাহার দু'টি আয়তআঁখির মোহময় আকর্ষণ কেবলই তাহার মনটিকে শুধু ঘর-মুখে টানে। বেলা না পড়িতেই সে তাহার গরুগুলিকে লইয়া ঘরে ফিরে।

বাড়ী-জমির ঘাস নিড়াইয়া ছেলেটির বাপ ঘরে ফিরিয়া জিগ্‌গেসা করে,—একটা গরুরও প্যাট্‌ ভরে নি। এত সোকালে ঘরে ফিরলি ঝে?

ছেলেটি মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া বলে,—অন্দুরে অগ টন্‌ টন্‌ করছ্যালো।

বাপ চটিয়া যায়। মুখ বিকৃত করিয়া বলে,—ওঃ, ব্যাটা আমার কি নেবাব পুত্তুর রে! অগ টন্‌ টন্‌ করছ্যালো না আমার ইয়ে—

অশিক্ষিত অসভ্য চাষীর মুখ……

মা সস্নেহ ছেলেটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীর দিকে একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলে,—অমন তোমারও একদিন করতো গো, তোমারও একদিন করতো।

দিন যায়। বয়স বাড়ে—ক্রমে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবন আসে। বসন্তের আশীর্ব্বাদে পরিপুষ্ট শ্যামাঙ্গী লতাটির মতো মেয়েটির সারা দেহে এক অপূর্ব্ব লাবন্যের সমারোহ ফুটিয়া উঠে।

স্বামীকে দেখিয়া এখন সে লজ্জা করে, ঘোমটাও দেয়।

ছেলেটি এখন আর তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে না, কোন কিছুর দশ আনা ছ' আনা অংশও করে না; বরং স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য এখন সে অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং এই ত্যাগ করাতেই এখন তাহার পরম সুখ।

মেয়েটিও এখন আর তাহার ন্যায় সঙ্গত অর্দ্ধেক প্রাপ্য-টুকু বুঝিয়া পাইবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়; বরং স্বামীর সুখের জন্য সে এখন তাহার সমস্ত কিছুই নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া ধন্য হইতে চায়।

দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই বোধ হয় এই।

মেয়েটি তাহার বুড়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা যত্ন করে। ছেলেটিও তাহার স্থবির বাপ-মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

গৃহস্থ চাষীর—স্বচ্ছল সংসার।—গোলায় ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ।

চাষীর ঘরের সুস্থ, বলিষ্ঠ জোয়ান ছেলে। নিজের হাতেই ক্ষেত-খামারের কাজ করে, ঘর-সংসার দেখে শোনে।

চাষীর ঘরের মেয়ে অতি অল্প বয়সেই গৃহিণী হয়;— নিজের হাতে ঘর নিকোয়, বাসন মাজে, রাঁধা-বাড়া করে।

সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন যায়।

জীবনে সুখ নিরবচ্ছিন্ন নয়।

সেবারে আশ্বিনের শেষা-শেষি পূজা। বেগুন-বাড়ীর বেড়ার গায়ে তুরুল লতায় তখন হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়াছে।

হঠাৎ দিন কয়েকের জ্বরে ছেলেটির বাপ মারা গেল। পূজার তখনও দিন চারেক বাকী।

নিরানন্দের মাঝেই মাটির প্রতিমার অর্চ্চনা শেষ হইল। কিন্তু বিসর্জ্জনের দিন ছেলেটির মা পড়িল জ্বরে।

চব্বিশ পরগণার চাষীরা সহজে বড় একটা কেহ ডাক্তার ডাকে না, গাঁয়ে যে হাতুড়ে বৈদ্য থাকে তাহাকেই দেখায়।

মেয়েটি কিন্তু এবারে ঘোর আপত্তি তুলে।

বলে,—বোদ্যি দেইকোনি, ডাক্তার ডাকো। বোদ্যি দেইকে তো বাবা বাঁচলোনি। এবারেও যদি ফের বোদ্যি দেকাও তবে উনিও আর বাঁচবেনি।

ছেলেটি কথা কয়টা বুঝিয়া দেখে।

শেষে ডাক্তারকেই ডাকা হয়।

চেষ্টার ত্রুটি হয় না। কিন্তু সব বৃথা ঔষধের ক্রিয়ায় যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে কিন্তু পরমায়ু দিতে পারে না। ছেলেটির দুরদৃষ্ট! তাই, মাও মারা গেল।

দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে তাহার অন্তেষ্টী ক্রিয়া শেষ হইল।

দিন যায়। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন করিয়া যাইত এখন

যেন আর ঠিক তেমনটি করিয়া নয়। কেমন যেন তাহার গতির মাঝে একটা উদাস করুণ শিথিলতা!

মেয়েটি রান্না ঘরে উনান গোড়ায় বসিয়া কাঁদে। শাশুড়ীর জন্য মনটা যেন কেমন হু হু করে।

ছেলেটির ক্ষেতে খামারের কাজ সব এলো-মেলো হইয়া যায়। একটি সতর্ক অভিজ্ঞ দৃষ্টির অভাব সে যেন প্রায়ই প্রতি কাজেই বড় নির্ম্মম ভাবে অনুভব করে।

তবু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।—মুখটি বুজিয়া তাহারা সবই করে—সবই সহে।

বিস্মৃতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ। হারানো দিনের কথা মাঝে মাঝে মনকে ব্যথিত করিয়া তুলে বটে কিন্তু সে ক্ষণিক।

দু'টি প্রাণীর প্রাণপন মিলিত চেষ্টায় অগোছালো সংসার আবার গুছাইয়া উঠে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ছেলেটির শরীর কিন্তু ভাঙিয়া যায়।

মেয়েটি তাহার ডব্‌ডবে করুণ চক্ষু দু'টি মেলিয়া বলে,—আমার মাতার দিব্যি, অত আর খেটু'ন তুাম।

ছেলেটি ম্লান একটু হাসিয়া বলে,—কি আর এমন বেশী খাটি!

মেয়েটির চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করে।

বলে,—তবে তুমি অমন শুইকে যাচ্চ কেন?

ছেলেটি বলে,—ধ্যেৎ! ঝ্যামন কোতা!

মেয়েটি জিদ করিয়া বলে,—অত জমী কিন্তু আর আকৃতি পাবে নি তুমি। একলা মনিষ্যি—কদ্দিকে আর নজর দেবে!

ছেলেটি কথা কয়টা উড়াইয়া দিতে চায়।

মেয়েটি কিন্তু শুনে না।

কাজেই বাধ্য হইয়া শেষে আশ্বাস দিতে হয়,—আচ্ছা, বছরটা যাক্। আসকে বছর যা হয় কোরব'খন।

বসন্তের মাঝা-মাঝি।

মেয়েটি একদিন হাসিয়া বলে,—আচ্ছা, আঙ্‌গার কি হবে বল দিকি?

ছেলেটি একটু বিস্মিত হইয়া বলে,—কিসির কি হবে?

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসে। ঘাড় বাঁকাইয়া বলে,—আহা. জানে না ঝ্যান!

ছেলেটি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলে,—আচ্ছা খুলেই বল না কেন!

মেয়েটি তাহার হাসি-মাখা সলজ্জ চোখ দুইটি নত করিয়া বলে,—এবার আঙ্‌গার খোকা হবে।

—মাইরি?

আনন্দে ছেলেটির বুক ভরিয়া উঠে।

মেয়েটি তেমনি ভাবেই মাথা নীচু করিয়া বলে,—আজ দু'মাস।

ছেলেটি তাহার আনন্দের আতিশয্য যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। সহসা আদর করিয়া দুই হাতে মেয়েটিকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরে।

মেয়েটি কৃত্রিম কোপে চোখ রাঙাইয়া বলে,—দিনির বেলা আবার একি অঙ্গ? ছিঃ, ছেড়ে দাও, কে কোতাদে' দেখ্‌তি পাবে।

তারপর হইতে সেই অনাগত কচি অতিথিটিকে ঘিরিয়া তাহাদের অবসর কালের সময়টুকু নব নব কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠে।

মেয়েটি ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতা দিয়া কাঁথা সেলাই করে।

ছেলেটি দড়ি পাকাইয়া দোলা বুনে।

—আচ্ছা, খোকা না হয়ে যদি খুকি হয়?—ছেলেটি একদিন জিজ্ঞাসা করে।

মেয়েটি গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলে,—উঁহু। তা হোতি পারে না। সেদিন আত্তিরে আমি স্বপন দেখেচি, বাবা এসে ঝ্যান আমায় বল্‌তিচে, 'আমি আর হেতা অইতি পারলমনি মা, তাই তোর প্যাটেতেই আবার ফিরে এলম।'

সরল বিশ্বাসী চাষীর মন, কথাটাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। ছেলেটি মনে মনে প্রণাম করিয়া বলে,—তাই ঝ্যান হয় ঠাকুর, তাই ঝ্যান হয়।—অনেক দিন দেকিনি তেনাকে।

মাস আষ্টেকের সময় মেয়েটি বাপের বাড়ীতে গেল। তাহার পর হইতে কিন্তু ছেলেটি রোজই প্রতীক্ষা করে কখন কি খবর আসে। মাস দুই পরে একদিন খবর আসিল,—একটি খোকা।

ছেলেটি স্যাক্‌রা বাড়ী হইতে একজোড়া ঝাঁঝর গড়াইয়া লইয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া শ্বশুর বাড়ী গেল ছেলে দেখিতে।

দুল্‌ দুলে খোকাটি।

দিন যায়,—দিনের পর মাস, মাসের পর বছর।

খোকা একটু ডাগর হয়। গলায় মাদুলী, কোমরে ঘুন্‌সি, পায়ে ঝাঁঝর। খোকা ঝুমুর-ঝামুর করিয়া উঠানে হাঁটিয়া বেড়ায়. তাই-তাই দেয়, চাঁদও ডাকে।

খোকার বাপ-মা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখে। মনে হয়, এতদিনে তাহাদের সংসার করা সার্থক।

মেয়েটি খোকার চোখে কাজল পরায়, কপালে খয়ের-টিপ দেয়, শেষে তাহার নরম কচি মুখখানি আঁচলে মুছাইয়া খাদের ক[illegible] তাহার উপ[illegible]কেটি চুম্ দেয়। মায়ের [illegible] বুঝ[illegible] পারে, খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মেয়েটির বুকের তলায় মুখ লুকায়।

কোন কোন দিন ঠিক এমনি সময়েই হয়তো কাদা হোড় মাখিয়া লাঙল কাঁধে লইয়া ছেলেটি মাঠ হইতে ঘরে ফিরে। ফিরিয়াই তাহার বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত হাত দুইখানি বাড়াইয়া দিয়া ডাকে,—খোকা আয়।

খোকা বাপের বিকট বিভৎস চেহারা দেখিয়া ভয় পায়। একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া সবলে তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে।

মেয়েটি হাসিয়া বলে,—হাঁা যাচ্ছে! বয়ে গেছে।-ঝ্যামন চেহারা!

ছেলেটিও হাসিয়া বলে,—ওঃ, ব্যাটা আমার কি ভদ্দর নোকের ছাবাল গো!

দুইটি জীবনের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি এই শিশুটিকে ঘিরিয়া, এমনি ধারা আনন্দ-গুঞ্জনের মাঝেই দিন কাটায়।

হঠাৎ খোকার একদিন একটু গা গরম হইল।

মেয়েটি চোখে অন্ধকার দেখে। ছেলেটি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। প্রতিবেশিনী দু'একজন মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়া বলে,—ভয় কি মা! ছাবাল বালসেচে—দু'একদিনেই সেরে উঠ্‌বে।

দু'একদিন কাটিয়া যায়, জ্বর কিন্তু ছাড়ে না।

ছেলেটি বৈদ্য ডাকে।

তিনি ভরসা দিয়া বলেন,—ভয়ের কারণ কিছুই নেই। শীগগিরই সেরে যাবে।

বৈদ্যের কথায় মেয়েটি কিন্তু ভরসা পায় না। ঠাকুর দেবতার মানত করে, খোকার কপালে পয়সা ছোঁয়াইয়া মুদো বাঁধিয়া রাখে, কালী-তলায় গিয়া গড় হইয়া প্রণাম করে।

বলে,—বুক চিরে তোমায় অক্ত দেব মা, বাছাকে আমার সেইরে দাও।

পাড়া গাঁয়ের পদ্ধতি বাড়ীতে কোন অসুখ হইলে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে নাই।

কিন্তু ভিখারীও আসে—ভিক্ষাও মাগে।

মেয়েটি তাহার ম্লান ব্যথা-ভরা চোখ দুইটি মেলিয়া বলে,—ভিক্ষে তো দিতি নেই বাবা! আমার খোকার ব্যামো যে।

চোখ দিয়া তাহার টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝড়িয়া পড়ে।

বলে,—চাল ডাল দিই, গইলে বসে দু'টি ফুইটে খাও বাবা।—কোন শাপ শাপান্ত করনি ঝ্যান।

ছেলেটী তাহার অসহায় আকুলতা বুকে চাপিয়া বসিয়া থাকে। মাঠে যাইতে তাহার আর মন সরে না।

বলে,—ভগোমান! মুখ তুলে চাও ঠাকুর—মুখ তুলে চাও। খোকা যে আমার চোকির মনি—

ঈশ্বরের মনে দয়া হয় হয়তো।—

খোকা সারিয়া উঠে।

মেয়েটির ম্লান মুখখানিতে আবার হাসি ফুটে।

ছেলেটি আবার উৎসাহ-ভরা বুকে লাঙল কাঁধে লইয়া মাঠে যায়।

অজন্মা—

দারুণ অনাবৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী সেবারে যেন একেবারে ঝল্‌সাইয়া গেল।

আষাঢ়ের আকাশে মেঘ উঠিল না, শ্রাবণের শেষেও বৃষ্টি ঝরিল না,—

মাঠের ঘাস শুকাইয়া জর্দ্দা-লাল।

চাষারা আকাশ পানে চাহিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে।

শেষে আশ্বিনের মাঝামাঝি দু'এক পশলা বৃষ্টি নামে বটে—কিন্তু সে যে বড় অসময়!

তবুও চাষারা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে।

ছেলেটিও তাহার লাঙল কাঁধে লইয়া মাঠে যায়।

কাত্তিক অঘ্রাণেও টাটা!

পৌষের শেষে শুষ্ক তৃণে শিহরণ জাগাইয়া মাঠের বুকের উপর দিয়া উত্তরী-বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যায়। সে বাতাসে চাষাদের বুকের পাঁজরগুলি অবধি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে।

চৈত্র মাসে আখেরী কিস্তি—

খাজনা চাই।

জমীদারের পাইক আসিয়া তাগাদা দিয়া যায়।

ফসল যদি না ফলে তো না-ই ফলিল,—রাজার ঘরে টাকা চাই।

ছেলেটি চোখে অন্ধকার দেখে।

মেয়েটি বলে,—অত ভাব্‌চো কেন? খোকার ঝাঁঝর জোড়াটা তো ছোট হয়ে গেচে—পায়ে এখন কেপ্‌টে নাগে। ঐটে বেচে না-হয় খাজনার টাকা কটা চুইকে দাও।

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে তাকায়। দেখে, সেখানেও একটি নীরব ব্যথার সজল আভাস চোখ দু'টিতে ছল্ ছল্ করে।

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলে,—ও কোতা আর মুখে আনিস্ নি কখনো, গোলায় আমার ছুরি দেলেও ও আমি বেচবুনি তবু।

তাহার পর বলদ জোড়াটির দিকে চাহিয়া উদাস কণ্ঠে ছেলেটি বলে,—ভাবচি ও দুটোর একটা খদ্দের দেক্‌বো এবার।

—খদ্দের দেক্‌বে?—মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে।

ছেলেটি তামাক টানিতে টানিতে তেমনি ভাবেই বলে,—হুঁ।

মেয়েটি এবার সত্যই অবাক হইয়া যায়।

মনে পড়ে, ঐ দুইটি বলদ তাহার স্বর্গগত শ্বশুরের কত যত্নের, কত আদরের ছিল। কত বৎসর তাহারা নিজেদের জীবনপাত করিয়া এই সংসারেরই উন্নতির জন্য অম্লান প্রশান্ত মুখে আপনাদের বুকের রক্ত মাঠে ঢালিয়া দিয়াছে।

মেয়েটি বিরক্ত হইয়া বলে,—নিজির ক্যামোতায় তো হলু নি কিছু। এবার বাপ-দাদার ঝা একে গেচে, তাই বোসে বোসে খোয়াও।

ছেলেটি কিন্তু এ কথার আর কোন জবাব দেয় না—চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুধু তামাক টানে।

অনটনের সংসার—

দারুণ অভাব। সব দিন আর দুইবেলা খাওয়া হয় না।

জলের অভাবে মাঠে আর কাজ নাই।

ছেলেটি পরের বাড়ীতে জন খাটে। সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর দিনান্তে মাত্র আট আনা মজুরী।

তাহাতে কি আর সংসার চলে ?—চলে না।

মেয়েটির কাপড় ময়লা, ছেঁড়া। তালি লাগাইয়া দু'মাস গিয়াছে ;—আর যায় না। ছেঁড়ার ফাঁকে ভরা-যৌবন উঁকি দেয়। মানুষের কুৎসিত দৃষ্টি অপলক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকে।

নিজের অক্ষমতায় ছেলেটির আহত আত্মসম্মান গুম্‌রাইয়া উঠে।—কিন্তু উপায় কি ?

হঠাৎ চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া জল আসে।

বলে,—তোর একখ্যানা কাপড় এবার না কিন্‌লি নয়।

—থাক্‌গে। ইতিই দিনকতক চেইলে দেব'কন। আমার জন্যি তোমার কাপড় কিন্‌তি হবেনি একন।

একটু থামিয়া মেয়েটি আবার বলে,—ঐ টাকাতি বরং খোকার জন্যি একটা জামা-টামা কিছু আইনে দাও। শীতির বেলা বড্ড কুন্‌ কুন্‌ করে ও।

ছেলেটি মনে মনে সঙ্কল্প করে, বলদ জোড়াটা এবার বেচিতেই হইবে। ঘরে একটিও বিচালী নাই, মাঠের ঘাসও তদ্রূপ। তবে আর কী সুখেই বা উহাদের আর রাখা! বেচিলে তবু উহাদেরও যাহা হউক একটা হিল্লে হইবে,—চাই কি, এ দিকেরও কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে।

মাঝে মাঝে দুই একজন ক্রেতাকেও সে ডাকিয়া আনে।—দরদস্তুরও হয় কিন্তু বনে না।

চলিয়া যাইবার সময় তাহারা বলিয়া যায়,—বেচ্‌বার মন নি তাই বল।

যথার্থই তাহাই। উত্তেজনার সময়ে ছেলেটি খরিদ্দার ডাকিয়া আনে, কিন্তু শেষে সত্যই বেচিতে তাহার আর মন সরে না—একটা অসম্ভব রকম দর হাঁকিয়া বসে।

ক্রেতারা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চায়। শেষে অসন্তুষ্ট হইয়া গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়। বলে,—ওগা ডিগ্‌ডিগে গরু।—ভাগাড়ে ফেল্লি শুগ্‌নিও ছোঁয় না! তাই বলে কিনা আট গোণ্ডা টাকার কম হুবুনি।

মেয়েটি সবই দেখে। কিন্তু আজ কাল আর ও-সম্বন্ধে মুখ ফুটাইয়া বড় একটা কিছু বলে না। চোখে জল আসে—আঁচলে মুছিয়া ফেলে। মনে মনে সে মনকে প্রবোধ দেয়,—না খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলার অপেক্ষা বেচিয়া ফেলা বরং ভাল।

কিন্তু স্বামীর ছলনাটুকু সে বুঝিতে পারে।—একটু স্বস্তিও হয়তো পায়।

দারিদ্র্যের উষ্ণশ্বাসে সংসারের সমস্ত শান্তি যেন উবিয়া যায়।

কথায়-কথায় খিটি মিটি বাধে—ঝগড়া হয়।

কাল হইতে অনাহার—

আজিও তাহার উপরে আবার এতখানি বেলা—

ঠোঁটে এখনও একটি ফোঁটাও জল পড়ে নাই কাহারো।

মেয়েটি বিরক্ত হইয়া বলে,—আমি জানিনি, ঝাও

ছেলেটি বলে,—এই মাত্তর আমি মদু খুড়োর ঠেঙে এক ছিলুম তামাক চেয়ে এনে খুঁটির গোড়ায় একে গেলুম, এর মধ্যি কি তা হাঁসে খেয়ে গেল ?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়া উঠে,—হাঁসে খেয়ে গেল কি কাগে খেয়ে গেল, আমি তার কি জানি ?

ছেলেটি গর্জ্জিয়া উঠে,—তুই জানবিনি তো জানবে কে রে হারামজাদী ? কাঁড়ি গেলবার বেলা তো খুব জানিস, আর—

মেয়েটি ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত ঠিক্‌রাইয়া উঠে।

বলে, ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোসাই! ওঃ কাঁড়ি গিইলে তো উনি আমার অক্কে আক্‌চে না একেবারে!

ছেলেটির মাথার ভিতরে সহসা যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। চীৎকার করিয়া বলে,—আমি গেলাইনি তো, তোর কোন্ বাবা এদ্দিন তোকে গিইলেচে রে—

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া চোখ তুলিয়া একবার স্বামীর মুখে দিকে চাহিয়া দেখে। বলে,—কি! তুমি আমার বাপ তুল্লে!

ছেলেটি কিন্তু সে কথা কানেও নেয় না। আপন মনেই গালাগাল দিতে দিতে বাহির হইয়া যায়।—যত সব অশ্রাব্য কুৎসিত গালাগাল—কোন্ পচা নর্দমার জলস্রোত যেন।

মেয়েটি গোলা হাঁড়িতে হাত ডুবাইয়া গুম্ হইয়া থাকে—ঘর নিকোন আর হয় না।

আজ কাল এমন প্রায়ই হয়।

তুচ্ছ খুঁটি-নাটি লইয়া কলহ—

অথচ এই কলহের ফলে উভয়ের অন্তরের মাঝে কেমন যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যবধানের রেখা পড়ে, প্রীতির বাঁধন দিনে দিনে কেমন আল্‌গা হইয়া আসে।

হঠাৎ ছেলেটি একদিন মেয়েটির গায়ে হাত তুলিল! তারপর তিন চার দিন কথা বন্ধ—

কেউ আর কাহারো খোঁজও রাখে না, খবরও লয় না; না ছেলেটি, না মেয়েটি।

ছেলেটি সেই ভোরে উঠিয়াই খাটিতে যায়। দুপুরে মাত্র একবার খাইতে আসে। খাইয়াই তখনি আবার বাহির হইয়া যায়—ফিরে সেই সন্ধ্যায়।—তাড়ির নেশায় একেবারে ভোম্।—পা দুইটা টলে—

মেয়েটি কিন্তু সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। সে রাঁধে, ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্ম করে—কিন্তু নিস্পৃহ। যেন কলের পুতুল।

দেখিলে মনে হয়,—উহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও চিনে না যেন।—এমনি।

ঘরের চালে খড় নাই। স্থানে স্থানে একেবারেই ফাঁকা। সেখান দিয়া রৌদ্রও আসে, হিমও পড়ে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া মেয়েটির একদিন একটু সর্দ্দি হইল—সঙ্গে সঙ্গে জ্বর।

কিষাণ ঘরের মেয়ে—সামান্য একটু সর্দ্দি জ্বরকে তাহারা ভয় করে না। জ্বর লইয়াই বাসন মাজে, ঘর নিকোয়, সবই করে।

ছেলেটির কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই হয় না।

একদিন সকালে মেয়েটা কিন্তু আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না—বুকে ও পিঠে ভয়ানক ব্যথা।

ছেলেটি প্রতিদিনকার মতো সেদিনও ভোরে উঠিয়া খাটিতে গেল।

দুপুর বেলা খাইতে আসিয়া দেখে,—বাসি ঘরে ঝাঁট পড়ে নাই।

ক্ষুধায় তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল।

মাথার উপরে রুদ্র বৈশাখ।

ডাকে,—খোকা!

নিঃঝুম নিঃসাড়।—সমস্ত বাড়ীটার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে যেন।

ব্যাপার কি?

ছেলেটি চীৎকার করিয়া ডাকে,—খোকা! ও খোকা! খোকা!

সব কিন্তু তেমনি চুপ, নিস্তব্ধ। শুধু মধ্যাহ্ন-মূর্চ্ছিত কুটির অঙ্গন তাহার বিকট বিভৎস গলার শব্দে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে।

সহসা ছেলেটির বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে।—কোন্ এক অজানা আশঙ্কায় হয়তো।—দৌড়াইয়া গিয়া সে ঘরে ঢুকে।

কিন্তু একি—?

ভয়ে ও বিস্ময়ে মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়ে—পরক্ষণেই কিন্তু আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া সে লুটাইয়া পড়ে,—ভগোমান!

মর্ত্ত হইতে স্বর্গ—অনেক দূর। তাই মানুষের আর্ত্তস্বর সেখানে পৌঁছায় না হয়তো।

মেয়েটি একবার চাহিয়া দেখে।—চোখ দুইটা লাল। মাথার অপর্য্যাপ্ত চুল গুলা রুক্ষ—যেন পাটের ফুঁসি। মুখ ময় তুলো—জিভে, ভুরুয়, গলার খাঁজে।—মাথার বালিসটা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়াছে বোধ হয়।

মাঝে মাঝে এক একবার ঝাঁকিয়া উঠে।—উঠিয়া বসিতে চায় হয়তো।—কিন্তু পারে না। নিরুপায় হইয়া মাথা চালে শুধু।

খোকা মায়ের স্তন দুইটা ধরিয়া টানাটানি করে। একবার মুখে দেয়—আবার বাহির করিয়া ফেলে।—দুধ নাই—কাঁদে।

চোখ ফাটিয়া ছেলেটির জল আসিতে চায়।—কিন্তু আসে না। দুঃখের বালুচরে কান্নার পাথর সমস্তই শুষিয়া গিয়াছে হয়তো।—মরুভূমি!

কিছুই তো আর ছিল না ঘরে—শুধু দু'টা কাঁসার থালা আর একটা পিত্তলের ঘটি।

তাহাই বাঁধা দিয়া ছেলেটি ভিন্‌গাঁ হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনে।

পথে কালী-তলা। মাথা খুঁড়িয়া সেখানে মানত করে।

—সেই রে দাও মা, ওকে সেই রে দাও। গরীব আমি—আমার যথা সর্ব্বোস্ব বেচে তোমার পূজো দোব মা, —হাতে মাতায় ধূপ-ধূনো জ্বালাবো, জোরা পাঁটা বলি দোব।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার মুখ-বিকৃতি করেন। ফুঁড়িয়া একটা ঔষধ দিয়া বলেন,—আজ যদি রাত কাটে তো কাল সকালে আমাকে একবার নিয়ে এসো।

কথা কয়টা ছেলেটি ঠিক বুঝিতে পারে না হয়তো।

গামছার খুঁট হইতে টাকা কয়টি খুলিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া পা দুইটা তাঁহার জড়াইয়া ধরে।

বলে,—আপনি আমার ধরম বাপ্। অক্কে কর বাবা,—ওকে আমার বেঁইচে দাও। ও যদি আমার বেঁচে ওঠে তবে আমরা মাগী মিন্সে গতর পিষে তোমার দেনা শুধ্‌বো বাবা।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। নিরন্ধ্র জমাট অন্ধকার। বোধ হয় অমাবস্যা।

অদূরে বাব্‌লা গাছের ঝাঁক্‌ড়া মাথায় অগন্য জোনাকী পোকার ফুল-ঝুরি ফুটে।

দূরে কোথায় একটা ঝিঁ ঝিঁ ডাকে।

কী দুইটা জানোয়ার উঠানের উপর দিয়া ছুটিয়া যায়।—বোধ হয় শিয়াল।

ঘরের কোনে একটি প্রদীপ জ্বলে।—তেল নাই।

স্তিমিত আলোকে ভাঙা-চোরা ঘরখানি বড় বিভৎস দেখায়।

মেয়েটি ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে আর ভুল বকে।

বলে,—ও কে? মাথায় জটা, সিঁদুর মাখা তিরশূল হাতে!……বাবা পেইটেচে? বসো তুমি। আমি যাবো তেনার কাছে।……ও আমাকে আর দেখ্‌তি পারে না—মারে।……দৈইড়ে কেন?……বসো না তুমি। বসবে না? তবে দাঁড়াও তুমি……আমি যাব তোমার সাতে… পেইলে যাবে……

মেয়েটি সহসা ঝাঁকিয়া উঠে।

ছেলেটি সযত্নে তাহাকে ধরিয়া রাখে।

চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসে।

বলে,—তোকে আর আমি দেখ্‌তি পারি না রে—।

গলার শব্দ ফুটে না আর।—ক্ষোভে আর কান্নায় রোধ হইয়া যায়। চুপটি করিয়া মাথার কাছে বসিয়া আঙুল দিয়া সে তাহার রুক্ষ এলোমেলো চুল গুলা ধীরে ধীরে কপালের উপর সযত্নে গুছাইয়া দেয়।

সাঁ—সাঁ—করে দুপুর রাত।—নিঃসীম, নিঃসার।

ছেলেটির মনে হয়,—ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে হয়তো।

ঘরে ঘড়ি নাই।—চাষার ঘরে কোনদিন তাহা থাকেও না।

ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন,—তিন ঘণ্টা অন্তর চার বার।

ছেলেটি আন্দাজী ঔষধ খাওয়ায়—ঘণ্টায় দু'বারও হয়।

ভাবে,—ঠিক সময়ে ঔষধ না পড়িলে অসুখ সারিবে কেন?

সহসা মনে পড়ে,—কাল আবার ডাক্তার ডাকিতে হইবে—ভোরেই।

কিন্তু টাকা?

ছেলেটি আকুল হইয়া ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখে।

আসবাবপত্র কিছুই নাই—!

উপায়?

শুধু হাতে টাকা ধার……অসম্ভব। দিবে কে?

সহসা ঘুমন্ত খোকা পাশ ফিরে! তাহার পায়ের ঝাঁঝর জোড়াটি ঝুন্ ঝুন্ করিয়া বাজিয়া উঠে।

আশায়-আনন্দে মুহূর্ত্তের জন্য ছেলেটির মুখখানি একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া গিয়া সে খোকার কাছে যাইয়া বসে। তারপর আস্তে আস্তে সে খোকার ঝাঁঝর জোড়াটিতে একবার হাত দেয়। নিঃশ্বাস ফেলিতেও সাহস হয় না—পাছে শব্দ হয়। বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠে। হাত দুইটা কাঁপে।—সে যেন চোর!

ধীরে ধীরে খোকার ঝাঁঝর জোড়াটি খুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

সহসা মেয়েটি একটা বিকট চীৎকার করিয়া সোজা একেবারে উঠিয়া বসে।

অর্থহীন চীৎকার।—কিন্তু তবুও মনে হয়,—ওর কী যেন একটা মানে আছে।

ভয়ে ও বিস্ময়ে ছেলেটি একেবারে থতমত খাইয়া যায়। তাহার কম্পিত শিথিল হাত দুইটি হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঝাঁঝর জোড়াটি মেঝের উপরে খসিয়া পড়ে।

পরক্ষণেই মেয়েটি কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়াস করিয়া তাহার বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়ে। চোখ দুইটা তাহার অসম্ভব রকম বড় হইয়া কপালের উপরে ঠেলিয়া উঠে—ঠিক্‌রাইয়া যেন বাহির হইয়া আসে আর কি!

ছেলেটি আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠে,—আদুরি! ও আদুরি—আদুরি!

নিস্তব্ধ নিঃশব্দ রাত্রি সহসা আহত হইয়া যেন চমকিয়া উঠে!

সুদূর বিসারী অন্ধকারস্রোত মুহূর্ত্তের জন্য যেন একবার আকাশের তটে দুলিয়া উঠে।

বহুদিন পরে আবার নাম ধরিয়া ডাকা—আদরে আবেগে, সোহাগে, সস্নেহে হৃদয়ের সমস্তটুকু ভালবাসা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া।—

কিন্তু মেয়েটি ও-আহ্বান আর শুনিতে পায় কি?

কে জানে!

—:*:—

দূরের লিপি

—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তোমার কাছে আমার আছে আজো কিছু গোপন নাকি ?
কথায় কথায় কিসের ব্যথায় ও সজনি সজল-আঁখি ?
ভুল বুঝোনা আমায় তুমি, দোহাই তোমার, ভুল বুঝোনা !
প্রশ্ন ক'রে জবাব না পাও, কষ্ট ক'রে ছল খুঁজোনা।
দোষ বের'লেই কৈফিয়তের তলব করার মালিক তুমি !
তোমার চোখে ধূলো দেওয়া,—ভুলো মনের সে মুখ্যুমি !

ভালোবাসি ভালোবাসি ওগো আমার ভোরের আলো !
ওগো আমার সাঁঝের তারা, বড্ড বাসি, বাসি ভালো।
রূপের গুণের ধনের প্রাণের সকল কথা যায় ডুবে যায়,
ভালো-ভালো-ভালোবাসার বিশ্বগ্রাসী ঝড়ো হাওয়ায়।
মাঝখানে তার কেবল জাগে একখানি মুখ একটি প্রিয়ার,
একখানি প্রাণ একখানি মন সকল-ভোলা একটি হিয়ার !

আমার কথার রুণুঝুণু কোথায় প্রিয়া কোথায় চলে ?
কাজ-হারা কোন্ সুরসিকার বাঁধ-হারা কোন্ চোখের জলে ?
যে হৃদয়ে জান্‌লনা কেউ, সেই নিদয়ে জান্‌তে কে চায় ?
যে কবি-প্রাণ রঙীন তারে করলে সসীম কিসের নেশায় ?
আমার স্মৃতি কর্‌ল আঘাত হাজারোবার হাজার বুকে !—
হিসাব-নিকাশ রইল কেবল একটি হিয়ার দুঃখে সুখে।
ভুলিয়ে দিলে সকল ভুবন দুইনয়নের একটি দিঠি,
মিষ্টি আমার, দুষ্টু আমার, লক্ষ্মী আমার, বান্ধবীটি !
পথের দুধার আঁধার হ'ল কাল-বোশেখের ধারায় ধারায়।

ঘুমন্ত মন জাগিয়ে তোল পদ্মহাতের মধুর সাড়ায় !
ঝড়ের কাঁপন ভাঙন আনে শ্যাম-কিশলয় পল্লবেতে,
চঞ্চলতার ঢেউ যে যাগে বন্ধু আমার অন্তরেতে।
কোন্ উদাসী সুরের পাছে মনখানি কোন্ দেশের পারে,
কোথায় ছোটে কোথায় প্রিয়া বৃষ্টিধারার অন্ধকারে ?

ভালোবাসি ভালোবাসি বড্ড বাসি, বাসি ভালো,
ওগো আমার সাঁঝের তারা, ওগো আমার ভোরের আলো !
রূপের গুণের ধনের প্রাণের সকল কথা যায় ডুবে যায়,
ভালো-ভালো-ভালোবাসার বিশ্বগ্রাসী ঝড়ো হাওয়ায়।
মাঝখানে তার কেবল জাগে একখানি মুখ একটি প্রিয়ার,
একখানি প্রাণ একখানি মন সকল-ভোলা একটি হিয়ার ॥

———:০:———

পনেরোই আষাঢ়ের ভেতর যিনি 'ধূপছায়ার'
চারজন গ্রাহক জোগাড় করে অগ্রিম মূল্য
কার্য্যালয়ে পাঠাবেন, তাঁকে এক
বৎসরের জন্য ধূপছায়া বিনামূল্যে
পাঠানো হবে। পনেরো
তারিখের পর এ
সুযোগ দেওয়া
হ'বে না।

সন্ধ্যা-তারা

—শ্রীপ্রণব রায়।

কাঁচা-চামড়ার দুর্গন্ধ— বস্তির বদ্ধ বাতাসটা যেন বিষাক্ত হইয়া আছে।

সরু একটা মেটে গলি—

দু'ধারে সারি সারি খোলার ঘর—কুঁজো আশী বছরের মতোই।—অন্ধকার, স্যাৎসেঁতে।

বস্তিটাকে মুচি-পাড়া বলে।

এই পঙ্কিল অন্ধকূপে মানুষ ইতর পশুর মতোই বাস করে। প্রতি ঘরেই কাঁচা-চামড়ার রাশ। কেবলই চামড়া-পিটানোর শব্দ—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—বিরাম নাই।

সুখনলাল ওস্তাদ কারিগর।

[illegible] মন মজবুত, টেঁকসই চটির 'সুখতলা' বানাইতে [illegible] পারে না। ঠনঠনের কয়েকটা দোকানে সুখন্ চটি সরবরাহ করে।

মতিয়া সুখনের মেয়ে।

আসন্ন-যৌবনা কিশোরী। বেশ গোল-গাল নিটোল গড়নটী। রংটা কালো হইলেও, দিব্য একটি স্নিগ্ধ শ্রী সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফুটিয়া আছে—যেন প্রভাতের স্ফুটনোন্মুখ অপরাজিতাটি।

সুখনের আপন বলিতে শুধু ওই মেয়েটিই। বছর পাঁচেক আগে বৌ তাহাদের মায়া কাটাইয়াছে। সংসারে এখন বাপ বেটি—কোনো ঝঞ্ঝাট নাই।

শান্তি-নীড় যেন!

রাতের কাজলা দীঘিতে আলোর পদ্ম ফোটে।

সুখন ঘুম হইতে জাগিয়া চামড়া পেটা সুরু করে।

মতিয়া ঘরের কাজ করে। তারপর বেলা বেশী হইলে হলুদ ছোপান শাড়ীখানি আঁটিয়া, 'গাগরী' কাঁখে কল-তলায়—'পানি' আনিতে যায়।

ভীড়ও জমে।

কে আগে 'পানি' ভরিবে—এই লইয়া তুমুল বচসা।

'পানি' ভরিয়া, মতিয়া রান্না চড়াইয়া দেয়। তারপর ভাত বাড়িয়া কর্ম্মরত বাপকে কোমল কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে, —আজ্‌কে কি ভাত খেতে হবে না? বেলা দু'পহর হোল যে!—

স্নেহ-মধুর হাসি হাসিয়া সুখন্ বলে, এই যাচ্চি বেটি—

সুখনের সাম্‌নের ঘরে থাকে—শুকদেও।

জোয়ান্ ছোক্‌রা। মিশ্‌মিশে কালো চেহারা—সুস্থ—সবল। মাথায় ঝাঁক্‌ড়া বাব্‌রি—কাঁধ অবধি।

সংসার বলিতে ওর কিছু নেই—দোসর-হারা। একলা থাকে। যেদিন খুশী হয়, সেদিন নিজেই রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। কখনো বা পয়সা চারেকের মুড়, ছোলাভাজা আনিয়া চিবায়।

কে আবার রোজ রান্নার হ্যাঙ্গাম করে!

বেলা দশটা নাগাদ্ শুক্‌দেও চামড়া ও যন্ত্রপাতি-ভরা থলিটি কাঁধে ফেলিয়া কাজে বাহির হয়। রৌদ্র তাতিয়া উঠিলে, মাথায় রঙিণ গামছাখানা বাঁধে।

পথে পথে হাঁকে, সুাই ব্রুশ্—

খরিদ্দার জুটিলে, ছেঁড়া জুতোয় তালি লাগায়, 'হাফ্‌সোল্' দেয়। কখনো বা কালি মাখাইয়া ব্রুশও করে।

পথ চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে খোশ্-মেজাজে সুর ভাঁজে—

"রহি গো পংথ, পাগর পাবনা,
সুনহর ঘুংঘট—কাজর-নয়না,
পার করো গোঁসাইয়া—"

সন্ধ্যার মুখে শুক্‌দেও ঘরে ফেরে। রোজগার যেদিন ট্যাঁকভর্তি হয়, সেদিন তাড়িও গিলিয়া আসে। অপরিসর দাওয়ার ওপর পথশ্রম-ক্লান্ত দেহখানা এলাইয়া জিরোয়!

সুমুখে সুখনের ঘরের সবটাই নজরে পড়ে। 'কুপির' অস্পষ্ট আলোয় দেখে মতিয়া রান্নায় ব্যস্ত। ওর কপালের উজ্জ্বল 'টিক্‌লি'টি চক্‌চক্ করে—গোধূলির তারা যেন। আগুন-তাতে-রাঙা ওর মুখখানির পানে চাহিয়া চাহিয়া শুক্‌দেও বলে,—বড়া পিয়াস্ লাগ্‌ল ভই, এ মতি—

মতিয়া 'একলোটা পানি আনিয়া দেয়—খানিকটা গুড়ও। শুধায়, রান্না-বান্না কর্‌বি নি আজ?

শ্রান্তি-অলস স্বরে শুক্‌দেও বলে, কে আবার ঝঞ্ঝাট করে?

মতিয়া বলে, তবে উপোস দিবি নাকি?

লোটা নিঃশেষ করিয়া, শুক্‌দেও জবাব দেয়, নাঃ—আজ মুড়ি আর 'চানা ভাজা' খাব' খন—

মতিয়ার অন্তরের মমতাময়ী নারীটি আর স্থির থাকিতে পারে না!

—তব্‌ তুহার ভাত হম্ বনা দি'—বলিয়া, মতিয়া উনুন ধরাইতে বসে। তারপর চাল-ডাল ধুইয়া রান্না চড়াইয়া দেয়।

শুক্‌দেও উচ্ছল আনন্দ অন্তরেই চাপিয়া, কুন্ঠিত আপত্তি জানায়, কেন তুই এ সব হ্যাঙ্গাম করচিস্ মতি?

—থাম্, বাজে বকিস্ নি—মতিয়া সরোষে ঝঙ্কার দেয়।

কী মধুর ওই ভৎর্সনাটুকু!

এক অনাস্বাদিত সুধায় শুক্‌দেওর রিক্ত প্রাণ-পাত্র উছলিয়া ওঠে। অবাক হইয়া ভাবে, কেন ওই দরদিয়া কিশোরীটি এই নিঃসঙ্গ লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে অনাহুত ভাবে আসিয়া এই অযাচিত সেবা স্নেহটুকু উপহার দিয়া যায়! ......কেন... ...কেন?

ও-ঘর হইতে সুখন্ ডাকে, মতি—

—বাবা ডাক্‌চে, যাই আমি। উনুনের পাশে তোর ভাত ঢাকা রইল।—এলোচুলে আল্‌গা খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে মতিয়া চলিতে উদ্যত হয়।

শুক্‌দেও ওর হলুদ-রঙের আঁচলের খুঁট্‌টা খপ করিয়া চাপিয়া ধরে। কেমন যেন মোহ-মুগ্ধ চোখে চাহিয়া শুধায়, সত্যি বল্ মতি, কেন তুই আমার জন্যে এত করিস্? আমি তোর কে?

—কে আবার? কেউ না!—আঁচল টানিয়া লইয়া, মতিয়া চলিয়া যায়। ওর চোখের কোনে চটুল চাতুরি ঝিক্‌মিক্ করে, পাপ্‌ড়ি-পেলব ঠোঁটের আড়ালে মুচ্‌কি হাসি উঁকি মারে।

বিমূঢ় শুক্‌দেও ভাবে, কী অস্পষ্ট কুহকের কুহেলিকার আড়ালে ওই মেয়েটি আপ্‌নাকে সুদূর করিয়া রাখিয়াছে! ওর মনের নাগাল পাওয়াই ভার!

দিন যায়—

সদ্য-স্ফুট যৌবন একটি কিশোর আরেকটি কিশোরীর অন্তরের সান্নিধ্য অনুভব করে—একটা অজ্ঞাত আকর্ষণও।

অলস অবসরে শুক্‌দেও কত কী ভাবে—

ভাবে, সুন্দর একখানি কমনীয় মুখ—হলুদ-রঙের অবগুণ্ঠনে আধ-ঢাকা কপালে রূপালি টিক্‌লি—ঠোঁটের লাল-পিয়ালায় মিঠা হাসির শরবৎ—

ভাবে, ওই মুখখানি তারই একান্ত আপনার!

পরক্ষণেই নিজের মনে হাসিয়া ওঠে—দূর, তা'ও কি হয়? সহায় সঙ্গতি-হীন একটা ছন্নছাড়া—

বিল্‌কুল্ ঝুটা!

তবু, ওই অলীক চিন্তাটুকু ভারি ভালো লাগে—মদের মতোই মাদকতাময়।

কিন্তু মতিয়ার মন ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে কী যে গভীর

রহস্যের মায়া-মাধুরীতে আপনাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, শুক্‌দেও তার কোনই সন্ধান পায় না। তুচ্ছ কারণে রাগে, তুচ্ছ কারণেই আবার হাসে।—ওর ঘনিষ্ঠ সেবা-যত্নের মধ্যে এ যেন ইচ্ছা করিয়া একটি দূর ব্যবধান রচিয়া রাখা!

মেয়েটি যেন হেঁয়ালি!

পুঁট্‌লি কাঁধে নাগ্‌রা পায়ে এক অচেনা ছোক্‌রা আসিয়া, একদিন সুখনের ঘরে উঠিল। সুখন্ প্রথমটা ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না—ছোক্‌রাটি কে? পরিচয় শুধাইতেই বলিল, সে সুনরা—সুখনেরি দেশের গ্রামের 'মাহতো' অর্থাৎ মোড়লের ছেলে।

সুখন্ আনন্দিত ও অপ্রতিভ!

বলিল, আরে তুই সুনরা! সেই ছোট্টবেলা তোকে দেখেছিলুম, আর আজকে এত ঢ্যাঙা হ'য়ে গেচিস্—তাজ্জব!

সুনরা হাসিয়া বলিল, যে, সে সুখন্-কাকার নিকট 'কাম' শিখিতে আসিয়াছে—শহরে নাকি মোটা রোজগার হয়।

সুখন্ প্রফুল্ল মুখে আশ্বাস দিল—তা'কে সে ওস্তাদ কারিগর বানাইয়া দিবে। তার কাছেই সে এখন থাকুক্।

সুনরা সুখনের ঘরেই কায়েমী আস্তানা পাতিল।

খায়-দায় আর চাম্‌ড়া পেটায়। মাঝে মাঝে ঠন্‌ঠনের দোকানেও গিয়া বসে—সুখন্ ওকে মজবুত্ চাম্‌ড়া চিনিতে শেখায়।

সুনরা ছোক্‌রাটি বেশ—নজরে ধরে। কাজে-কর্ম্মেও বেশ চট্‌পটে চতুর। ক'দিনেই সুখন্‌লালের স্নেহ অনেকখানি দখল করিয়া ফেলিল!

সুনরার পাশে মতিয়াকে দেখিয়া সুখন্ ভাবে—চমৎকার মানাইয়াছে! বুড়োর সাধ মতিয়াকে সুনরার হাতেই 'র্থাদি' করিতে হইবে

মতিয়ার 'মোলাকাৎ' পাওয়া ভার!

নবাগত অতিথির পরিচর্য্যাতে সে আজকাল ব্যস্ত! শুকদেওর খোঁজ-খবর লইবার ফুরসৎ বড় অল্প। সুনরার সহিত হাসি রঙ্গ করিতেই সময় বহিয়া যায়—

সারাদিন পথে পথে টহল্ দিয়া, শুকদেও সন্ধ্যার মুখে ঘরে ফিরিয়া, চুপ করিয়া বসে—এক্‌লাটি। বাতিও জ্বালায় না। 'পিয়াস্' লাগিলে মতিয়ার কাছে আর 'পানি'ও 'মাঙে' না। মতিয়া কদাচিৎ আসে। শুধায়, কি খাবি আজ?

গম্ভীর স্বরে শুক্‌দেও জানায়—আজ উপবাস দিবে, তা'র 'বোখার' হইয়াছে—

—তবে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্—ঠাণ্ডা লাগাস নি।—উৎকণ্ঠিত সুরে বলিয়া, মতিয়া ফিরিয়া যায়।

মুখের দরদ শুধু! অন্ধকার দাওয়ায় বসিয়া শুক্‌দেও চাহিয়া চাহিয়া দেখে—মতিয়া সুনরাকে ভাত বাড়িয়া দিতেছে।

দুর্নিবার একটা অভিমানের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ওর চওড়া ছাতিটার মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে—

সে দিন হোলীর পরব।

ভোর হইতে কেবলই হাসির হল্লা—খঞ্জনি-ঢোলের বেয়াড়া আওয়াজ—হোলীর অশ্লীল গান।

মুচি পাড়া গুলজার।

ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে—মেটে গলিটা অবধি কাদা ও ফাগে মাখামাখি।

শুক্‌দেও আজ বিচিত্র সাজ-সজ্জা করিয়াছে।—বছরকার পরবের দিন!

ময়লা চিরকুট্ কাপড়ের ওপর ফুলদার ধব্‌ধবে পিরাণ পরিয়াছে। মাথায় ঝাঁক্‌ড়া বাব্‌রির ওপর হাল্কা বাহারি টুপি। কালো মুখখানা ফাগ লেপিয়া রাঙা—যেন টিকের আগুণ!

সারাটা দুপুর ইয়ার দোস্ত্‌দের সহিত 'ফাগুয়া' খেলিয়া,

গলা ছাড়িয়া হোলীর গান গাহিয়া, বেলা তিনটার পর কলতলায় গিয়া হাজির হয়। অভিপ্রায়—'পাক্ সুৎরো' হইবে।

মতিয়াও সেখানে তখন দাঁড়াইয়া—কাঁখে 'গাগরী'।

আজ ওর রূপের খড় বাহার!

পরণে ডোরা-কাটা রঙ্গিলা 'মল্লা' শাড়ী, গায়ে সবুজ রেশ্মী আঙিয়া। সুগন্ধ তেল দিয়া পরিপাটি খোঁপা বাঁধা। ডাগর চোখের কোলে কাজলের মিহি রেখা।

মস্ত একটা রঙ-চঙা প্রজাপতির মত!

শুকদেওর ফাগ-লেপা মুখের কিম্ভূৎকিমাকার রূপ দেখিয়া মতিয়া বলে, ঠিক 'বন্দরকা মাফিক্' মানিয়েচে তোকে!

তা'রপর খিল্‌খিল্ হাসি—যেন উপলাহতা গিরি-নির্ঝরিনীটি!

একেই ভর-পেট তাড়ি গিলিয়া, শুকদেওর মনটা গুলাবী নেশায় বুঁদ হইয়াছিল—তা'র ওপর মতিয়ার মিঠা হাসির মদ—

—আয়, তবে তোকেও বাঁদরী সাজিয়ে দি'।—বলিয়া খুশীর উচ্ছ্বাসে পিরাণের পকেট হইতে এক মুঠো ফাগ নিয়া মতিয়ার মুখে বেশ করিয়া লেপিয়া দেয়।

—ই ক্যা হারামজাদ্‌গি বা?

শুকদেও সচমকে ফিরিয়া দেখে—সুনরা! রুদ্ধ রোষে ওর চোখ দু'টো ঠিক আগুণের ফুল্‌কি।

শুকদেওর খোশ্-মেজাজ পান্‌কা চড়িয়া যায়। এত দিনকার ধূমায়িত আক্রোশ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে—

—এক নিমিষেই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মু' সামাল্‌কে বাৎ বোল্ বে—

সুনরা রুখিয়া আসে—চড়া গলায় বলে, যে, ওরভাবী 'মেহ্‌রারু'র গায়ে হাত দিবার 'কৌন্ অখ্‌তিয়ার' ওই 'বিলল্লা হারামজাদ'টার আছে?

মতিয়া ওর ভাবী 'মেহরারু'!

শুকদেও যেন বজ্রাহত—স্তব্ধ, স্তম্ভিত! দাওয়ায় গিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে। হোলীর পর্ব্বের উৎসব-উল্লাস তা' কে ব্যঙ্গ করে—

সেদিন বেলা শেষে রোজ্‌গার করিয়া মুচি-পাড়ায় ফিরিতেই, শুকদেও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে—।

সুখনের রোয়াকে ঢোল বাজে—নহবতের সকরুণ সুরে সন্ধ্যাকাশ বিষণ্ণ।

মতিয়ার আসন্ন বিবাহের শুভ-সূচনা বুঝি!

শুকদেও সবই দেখে—বিবাহের আয়োজন, সুনরার মুখে-চোখে খুশীর উজ্জ্বল আভা!

বারে বারেই হিংস্র দৃষ্টিতে সুনরার সুপ্রসন্ন মুখের পানে তাকায়। ও যেন পিঁজ্‌রায় পোরা বুনো বাঘ—বাগে পাইলে, সুনরার টুঁটি ছিঁড়িয়া খায়! সে বুঝি ওর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলাইবে—

শুকদেওর সবল হাত দু'খানা নিস্‌পিস্ করে—অসহ্য!

আচম্‌কা খুর্‌পী দিয়া সজোরে এক খোঁচা—একেবারে সুনরার ঠিক বুকের পাঁজরে—ভলভল্ করিয়া তাজা রক্ত—

আর্ত্ত-চীৎকারে মুচি-পাড়া শিহরিয়া ওঠে।

সুখন্ ছুটিয়া আসে—আরো সবাই—। ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া যায়। বলে, মেরে ফেল্ ওই খুনে হারামজাদ্‌কে—

পড়্‌শীরা বাধা দেয়। রক্ত-লিপ্ত খুর্‌পী শুদ্ধ শুকদেওকে ধরিয়া শুধায়, কেঁউ মারা উস্‌কো—বাতাও—

শুকদেও যেন বোবা—নীরব। একটিও কৈফিয়ৎ দিতে পারে না। মুখের ভাষা বুঝি বুকের ব্যথার অতল সাগরে হারাইয়া গেছে!

ইতিমধ্যে লাল পাগ্‌ড়ীর আবির্ভাব হয়। হাতে হাত-কড়ি পরাইয়া, শুকদেওকে হাজতে টানিয়া লইয়া যায়।

কি একটা মোহের আকর্ষণে, শুকদেও পিছন ফিরিয়া তাকায়। দেখে,—ভীড়ের মাঝে মতিয়া দাঁড়াইয়া আছে—

নিশ্চল প্রতিমার মতোই। ওর চোখছুটি ঠিক বাদলের মেঘ-মেদুর আকাশের ছ'টি টুক্‌রো!

পাহারাওয়ালা নিথর-গতি শুক্‌দেওর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া কর্কশকণ্ঠে বলে, চল্, বে চল্—

খুব ঘটা করিয়াই এক রোশ্‌নি রাতে সুনরার সহিত মতিয়ার বিবাহ হইয়া যায়। মুচি-পাড়ায় ভাত-তাড়ির ছড়াছড়ি—সবাই খুশী!

'মুল্লুক' হইতে সুনরার বাপ সীতারাম মাহতো কলিকাতায় আসে—ছেলের বিবাহের তদারক করিতে। ছুই 'পুরাণা দোস্ত্'—বহুকাল পরে দেখা—আনন্দে মাতিয়া ওঠে! তারপর সুখনের মায়ার-ডোর টুটিয়া অবগুণ্ঠনা, অশ্রুমতী মতিয়া একদা সুদূর প্রবাসে শ্বশুর ঘর করিতে যাত্রা করে। বিদায়-বিধুর সুখন বাষ্পাকুল চোখে স্নেহের পুতুলি মেয়েকে বিদায় দেয়—

মন্থর-চারী দিনগুলি গড়াইয়া চলে—

মতিয়া যেন সেই কল-হাস্য-মুখরা আনন্দ-প্রতিমাটি নয়—অন্য কেউ! কেমন একটা স্থির গাম্ভীর্য্য ওর উচ্ছলতার চারিদিকে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে।

সুনরার মেজাজ সদাই রুক্ষ।

তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি লাগিয়াই আছে। সংসারে অশান্তি,—ইতর গালাগালি—কখনো বা মারপিটও।

সুনরা স্পষ্টই বলে, 'বেইমান্' মতিয়া তার সহিত এমন ত 'দিল্লাগি' করিবে জানিলে, কখনই ওকে বিবাহ করিত না।

মতিয়াও তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, বাঁচতুম তা' হোলে—হাড় জুড়োত—

সুনরা রাগিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া যায়।

ওরা নিবিড়তম সম্পর্কে জড়িত হইয়াও, পরস্পরের নিকটে সুদূর!

মতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে—

কি যেন তাহার হারাইয়া গেছে। তারই অভাবের অতৃপ্তিটুকু বুকের তপ্ত বালুচরে গোপন-ধারা-ফল্গুর মতো নিয়ত নিঃশব্দে গুমরিয়া মরে। রহিয়া রহিয়া তাহার মনে পড়ে—কলিকাতার এক পঙ্কিল মুচি-পাড়ার একটি অতি পরিচিত ঘর—আর এক বন্দী যুবার অসহায় ব্যথা-কাতর মুখচ্ছবি—

অন্ধকার সন্ধ্যাকাশের বুকে সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া ওঠে—যেন কোন্ সুদূরিকার অশ্রু-করুণ আঁখি!

নিশুতি নিশীথে কারাগারের বুক ভেদিয়া একটি বিনিদ্র আতুর কণ্ঠের গান শোনা যায়—

"পিয়া গিয়া পরদেশ
লিখত নাহি পাঁতি রে,
রোয় রোয় আঁখিয়া
ফাটত মেরি ছাতি রে—"

—:*:—

তীর্থ-পথ

যোহান বয়ার

অনুবাদক—শ্রীঅরিন্দম বসু

নানা কারণেই ক্লান্তি আসে। ক্লান্তির পর সুনিদ্রাও হয়—স্বাভাবিক, কিন্তু যাহারা সুখী, তাহাদেরই—

তেমন ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে আবার ইহার জন্যই জাগিয়া ওঠে, যেমন ওঠে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া।

বাতায়ন-পার্শ্বে সাতচল্লিশ নম্বর মেয়েটিরও তাহাই হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার পরই যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন ক্লান্তির অবধি যেন রহিল না—এমনটি আর কোনদিনই তাহার হয় নাই।

অসংখ্য শিশু ক্রোড়ে লইয়া সেই বৃহৎ কক্ষ, তাহারই মধ্যে বিশ্রাম-লাভ একটুও সহজ নয়। তাহার নিজের শিশুটি যদিও তখন নীরব, কিন্তু আর একটি কাঁদিয়া উঠিল। কিংবা একইসঙ্গে হয়তো অনেকেই—

এমনই অবসন্ন মন এবং বিনিদ্র নয়নে এতখানি গণ্ডগোল সহিয়া থাকা তাহার পক্ষে কঠিন। অথচ বারংবার জাগরিত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ না হইয়াও সে পারিল না।

আপনার শিশুটির বেলায় সে নিতান্তই নিরাশ হইয়া পড়িত—উপায় নাই। কিন্তু আর কেহ ক্রন্দন করিয়া উঠিলে সহসাই যেন সে দন্তে দন্তে চাপিয়া ধরিত,—রোষে, ক্ষোভে।

সাতদিন হইল সে আসিয়াছে কিন্তু ইহার ভিতরে একাদিক্রমে অর্দ্ধঘণ্টাও কোনদিন সে ঘুমাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

এই একটি মুহূর্ত্তেই তাহার মাথা যেন অস্বাভাবিক রকম ভারী হইয়া গেছে। একটুখানি আলোও যেন তাহার চোখে অসহনীয়।

নীচের অসমতল, কঠিন তোষকটিও কত বড় পীড়াদায়ক,—সারাপিঠে অনবরতই কেমন একটা বেদনা।

এমনই অপ্রত্যাশিত উদ্বেগে একটুপরেই তাহার চক্ষুদুইটি হইতে অশ্রুর উৎস ঝরিল; চেষ্টা করিয়াও তাহা আর রুদ্ধ রাখিতে পারিল না।

বাহু-নির্ভর করিয়া অতঃপর সে উঠিয়া বসিল। বাতায়নের পর্দ্দার ফাঁকে উঁকি দিয়া দেখিল সম্মুখের ছাদের উপর সেই অস্পষ্ট সূর্য্য রশ্মিটুকু আর লাগিয়া নাই।

পর্দ্দাটি উঠাইয়া মেয়েটি উদাস নয়নে বাহিরের সোনালী-সন্ধ্যার আকাশ খানির পানে চাহিয়া রহিল। সহরের পশ্চাৎ ভাগে অরণ্য-শ্যামল সুদূর পাহাড়ের গায় তখন অস্ত-রবির রক্তাভাষ।

চতুষ্পার্শ্বের নিকটতমব্যাপার গুলির পানে লক্ষ্য করার চেয়ে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকাটাই যেন শ্রেয়। ইচ্ছা হইল অন্য কোন জানালা দিয়াও এমন করিয়া সে তাকাইয়া থাকে,—সেখানকার দৃশ্য গুলি হয়তো তাহার চোখে মনোরম ঠেকিবে। এই গবাক্ষ-পথটাতে আর কিছুই যেন দেখা চলেনা;—শুধু একই ধরণের অগণ্য প্রাচীর, চিমনী, গৃহের কুশ্রী পশ্চাত অংশ;—ছাদের আঁচিলগুলিও সব এক রকম, যেন ওৎ পাতিয়া কতগুলি বিড়াল বসিয়া আছে। আর কিছু নয়, শুধু এই।

গতকল্যও বিচারালয়ের ঐ ছাদটিতে তুষার-স্তর দেখা গিয়াছিল,—আজ কিন্তু নাই,—অদৃশ্য হইয়া গেছে। সহরের একপ্রান্তে একটা গীর্জ্জা-চূড়ার নির্ম্মান চলিতেছিল; তাহারই পানে চাহিয়া মেয়েটি এক এক সময়ে যেন ভয়-চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত কোন শ্রমিক হয়তো ওখান থেকে পড়িয়া যাইতেছে। সহরতলীর একটা গৃহের ছাদে, অত্যুচ্চ লোহার কাঠামোর উপরে সেই অপরূপ

ফলকটি চোখে পড়িল,—উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা—আই, বি হানসেন,—কাষ্ঠ খোদক।

গতকল্যও যেমন ছিল, আজ ও ঠিক তেমনই,—চোখে ক্লান্তি বাড়াইয়া দেয় শুধু।

তবুও সেখানে বসিয়া বিপরীত দিক হইতে সে পড়া সুরু করিল।

অন্যান্য শয্যায় তখন অনেক কিছুই ঘটিতেছে—তাহাতে লক্ষ্য করিবার মত কি আছে?

সে তাহার সমস্তইতো জানে!—সকলের চক্ষু নৈশ-আহার্য্যের প্রতীক্ষায় এখন দ্বারের দিক উদগ্রীব। তাহদের মনে ক্ষীন আশা—গতকল্য যে আহার্য্য তাহারা পাইয়াছিল, আজ হয়তো তাহার চেয়ে উপাদেয় কিছু আসিবে।

বাহুতে কাহার স্পর্শ অনুভব করিতেই মেয়েটি মুখ ফিরাইল,—দেখিল, শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধাত্রি-বিদ্যার একটি ছাত্রী।

উদ্বিগ্নচিত্তেই সে নবাগতার পানে চাহিল।

ছাত্রীটি তাহার হাতে একটা অর্থাধার দিয়া, অবনত দেহে অস্ফুটস্বরে বলিল—'দশটি ক্রোণার মাত্র, এর বেশী তারা দিতে চাইলে না।'

যেন কথাটা বিশ্বাসের মত নয় এমনই ভঙ্গীতে সাতচল্লিশ নম্বর মেয়েটি অর্থাধারের পানে চাহিল। তাহার পর নিম্নস্বরে বলিল—'কিন্তু সেটা যে আমার সোণার ঘড়ীই ছিল।'

—'তারা বল্লে, খুব নাকি পুরোণো।

জানালার আলিসায় অর্থাধারটি তুলিয়া রাখিয়া সে বলিল—'আচ্ছা, এই কষ্ট স্বীকারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস……

আবারও একাকী,—মুহূর্ত্তের জন্যই সে একবার সম্মুখ পানে চাহিয়া লইল। তারপর বালিশের নীচে হাত দিয়া একখানি জড়ান রুমাল বাহির করিল। ভাঁজ খুলিয়া সঞ্চিত মুদ্রাগুলির হিসাব করিতে গিয়া দেখিল আটটি ক্রোণার তাহার সম্বল এবং এখন আরও দশটি পাওয়াতে মোট আঠারোতে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এই হাঁসপাতালের পাওনাই অন্ততঃ পঁচিশ ক্রোণার হইবে। যে চিন্তা দিবারাত্রি তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া আসিয়াছে, সেই সম্ভাবনা আবারও তাহর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—আপনা আপনিই।

হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের দাবীর জন্য তাহাকে কি নাম ও ঠিকানা জানাইতে বাধ্য করিবে না?

মুদ্রাগুলি রুমালে বাঁধিয়া পুনরায় বালিশের নীচে রাখিয়া দিল।

অতঃপর শুভ্র বাহু-যুগল শয্যাস্তরণের বাহিরে ছড়াইয়া দিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার চোখ দুটি কিন্তু নিবদ্ধ হইয়া রহিল কড়ি-কাঠের ছাদের পানে।

অবশেষে সে চিন্তা করিয়া দেখিল—হাঁ, আমার শীতের পোষাকটি এখনও খুব ভালো আছে, সে থেকেও আমি আরও দশ ক্রোণার পেতে পারি। বসন্তেরও বেশি দেরী নাই। যদি সচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারি, পরে কি হবে তার জন্য কিছু এসে যায় না।'

এই কল্পনা তাহাকে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত করিল। চোখের দুটি পাতাও স্তিমিত হইল একবার।

কি নিদারুণ ক্লান্তিকর এই চিন্তা,—দুর্ব্বিসহ, নির্ম্মম। নাঃ, আর কিছুই সে ভাবিবে না।

একটু পরেই দরজা উন্মুক্ত করিয়া দুইজন ছাত্রী প্রবেশ করিল। তাহাদের হাতে ট্রে পরিপূর্ণ রোগীদের আহার্য্য।

সেই একই ধরণের যবের রুটি, নীলাভ দুগ্ধ……

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগন্য উৎসুক মুখ বাঁকিয়া গেল—নৈরাশ্যে।

দুধের বাটি ও খাবারের ডিসগুলি নিয়মিত ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

স্ত্রীলোকদিগের অনেকেই দুর্ব্বলতা বশতঃ চামচের সাহায্যে আহার সম্পন্ন করিত।—অন্যান্য সকলের শয্যায়

বসিয়াই সুরু হইত। এমন অবস্থায় ক্ষুধার তাড়নায় যতটুকু সম্ভব ততখানিই,—তাহার বেশী কিছু নয়।

সাতচল্লিশ নম্বরের মেয়েটি প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পানেই একবার করিয়া চাহিয়া দেখিল।

একটি বৎসর পূর্ব্বেও কি সে কোন দিন ভাবিতে পারিয়াছে, আজ তাহাকে এই সব দরিদ্রতম রোগিনীদের মধ্যে কাটাইতে হইবে।

কুশ্রী পল্লী অথবা রাস্তার উপরে হয়তো ইহারা পড়িয়াছিল—কে জানে।

বাতায়ন-পথে অস্ত-রবির অলক্ত-আভা হেলিয়া আসিয়াছে—ঐ দেয়ালের গায়েও অপরূপ বর্ণচ্ছটা।

ওদিকটা কিন্তু বেশ ছায়াচ্ছন্ন; শয্যা-আশ্রিত দেহগুলিও চোখে ঝাপসা ঠেকে।

অনতিদূরে একটা কোণে বসিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয়া একটি যুবতী,—আরও কিছু আহার্য্যের দাবী করিতেছিল তখন।

প্রত্যাশার সুরে বলিল—'আমি এক ক্রোণ দাম দেবো,—এমন কেউই নেই, তার অংশ থেকে আমাকে কিছু দেয়!

যুবতীর পরণে হাঁসপাতালের কুদর্শন নৈশ-পোষাক,—সাদা ও হলদে রঙে অপরূপ বিচিত্র। কিন্তু তাহার কাঁধ অবধি লুটাইয়া পড়িয়াছে সোণালি চুলের রাশটি;—খাবারের থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িবার সময় সূর্য্য-রশ্মিতে তাহা ঝলমল্ করিতেছিল।

নিকটে আরও একটি মেয়ের পশ্চাতে একজন ছাত্র দাঁড়াইয়া। মেয়েটি আহার্য্য গ্রহণ করে নাই,—রোদনই করিতেছিল শুধু।

সে ছিল পথচারিণী দুর্ভাগা রমণী। গর্ভসঞ্চারিত কোন রোগে আগের দিনই মাত্র তাহার বাচ্চাটি মারা গিয়াছে। এই অতি শোকার্ত্তা নারীটিকে দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া কেহই পারে নাই।

ছাত্রটি বলিল—'তোমার খাবার খেয়ে নাও এখন, তা'হলে অনেকটা সুস্থির হতে পার্ব্বে—বুঝলে?'

সে কিন্তু পরিবর্ত্তে দেহাবরণখানি মাথা অবধি ঢাকিয়া দিল—তারপর তেমনই রোদন ধরিল, আরও স্পষ্ট।

সেই সুকেশা কোণের যুবতীটি বলিয়া উঠিল 'ঐ থালাখানি না-হয় আমাকেই দাও,—শ্রম-শালায় যতখানি খুসী ছিলাম,—ওটা পেলে এখানেও ঠিক তাই মনে হবে—দাও না?'

তখন উভয় শয্যা-শ্রেণীতেই চামচ ও প্লেটের ঠুনঠুনি সুরু হইয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে কদর্য্য আহার্য্যগুলির সমালোচনাও·……

একজন সদ্য-আগতা কৃষক রমণী কালই মাত্র প্রসব করিয়াছে।—কিন্তু তখনও তেমন অসুস্থ কিছু নয়। নার্সের সামনে তাহার দুধের বাটিটা তুলিয়া চামচ দ্বারা নাড়া চাড়া করিতে করিতে বলিল—'তোমরা কি একে দুধ বলো? আমরা কিন্তু গ্রামে একে আসমানী-রং বলেই জানি।'

অতঃপর এক চামচ দুধ তুলিয়া সে মেঝেতে ঢালিয়া দিল,—সঙ্গে সঙ্গে বাটিটাও নামাইয়া রাখিল নীচে।

নার্স তাহার জঙ্ঘায় হাত দুটি রাখিয়া উত্তর করিল—'চমৎকার তোমার ব্যবহার! সম্ভবতঃ অধ্যাপকের কাছে আমি তোমার নামে অভিযোগ করি এই তুমি চাও।'

সে মেয়েটিও বলিল—'হাঁ, চাই,—যাও, তাঁকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে এসো। আমিও তাঁর কাছে জানতে চাই, এ দেশের গাভী দুধই দেয়, না জল!'

একটি উগ্র-মুখরা শ্রমিক রমণীও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া উঠিল—'নিশ্চয়ই, এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা আশা করতে পারিনে। এখানে আমরা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই যে নই। আমাদের শিশু মরুক, বাঁচুক, তাতে এসে যায় না কিছু।……অথচ ঐ সুন্দর ওয়ার্ডের যে রূপসীরা রেশমের বিছানায়, রেশমের আবরণে শুয়ে আছেন, তাদের খাবারের জন্য আমাদেরই দুধ থেকে মাখন দরকার। পৃথিবীতে আমরা সবাই একই রকম ব্যবহার কি করে পাবো!'

বিভিন্ন শয্যা হইতেই এই কথায় অনুমোদন আসিল।

কোণের সেই যুবতীটি কিন্তু তখন পর্য্যন্তও অতিরিক্ত আহার্য্য কিছু পায় নাই—তবুও তাহার দাবীর বিরাম ছিল না একটুও।

এতক্ষণে সে সায় দিল—'সে তো নিশ্চয়ই! অধ্যাপকের যে আহার, ওদেরও তো তাই! আমাদের তিনি কুকুরের মতই দেখেন ঐ সমস্ত রূপসীদের সামনে জানু পেতে হস্ত-চুম্বন করেন, —সেবন ও প্রলেপের জন্য বলকারক ওষুধও দেন, হাঃ হাঃ—'

যে স্ত্রীলোকটি বই বাঁধিত, তাহার মুখের দুইটি ছিল হলদে।—বলিল,—'আমার কথা হচ্ছে, আমরা যে উপায়ে গর্ভে সন্তান পেয়ে থাকি, এই সমস্ত সুশ্রী মেয়েরা তার চেয়ে কোন স্বাভাবিক উপায়ে পেয়েছে, এ বিষয়ে কেউই যখন নিশ্চিন্ত নন, তখন আমিই বা এমি বাধ্য থাকবো কেন!'

এ উক্তিটিও অনুমোদিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকের হাসিও.........

ইহাদের উচ্ছ্বাস কলকণ্ঠে পথ-চারিণী সেই রমণীর রুদ্ধ-রোদন পুনরায় ফুটিয়া উঠিল;—তাহার সারা মুখখানি তখনও বসনাবৃত।

জনৈক শ্রমিকের একটি স্ত্রীও সেখানে ছিল—স্বাস্থ্য এবং যৌবনে লীলায়িত। তাহার মনে যেন কোন ক্ষোভই নাই—ইহাদের মধ্যে একমাত্র তাহাকে দেখিয়াই একথা মনে হইত।

শয্যা-পার্শ্বে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য পরিপূর্ণ একটি টেবিল। শ্রমিক-স্বামী প্রতিদিনই তাহার জন্য আপেল, কমলা, চকোলেট্, কেক প্রভৃতি আনিয়া রাখিয়া যাইত।

ইহার কোন কিছু স্বচ্ছন্দে খাইবারও কিন্তু উপায় ছিল না। সে সময়টিতে তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহিত—প্রত্যেকের তীব্র-দৃষ্টি তখন তাহারই পানে, স্থির, অপলক।

অথচ এমনও অনেক ছিল, যাহারা ঐ জিনিশগুলির অংশ থেকে বঞ্চিত হইত না। তবুও......

সেই বিকলাঙ্গী স্ত্রীলোকটির উপর অন্যান্য সকলের দৃষ্টি পড়িল। খাবার দিবার সময় তাহার শিশুটিকে ছল করিয়া সরান হইয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে তাহা জানিতে পারিল, খাবারের চিন্তা তখন সুদূর হইয়া গেছে—একেবারে।

বাহু-দুটি প্রসারিত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেও চাহিল, কিন্তু অতি-অস্ফুট একটা আন্দোলনই শুধু......ফেনিল অধর-প্রান্তে আসিয়া মিলাইয়া গেল।

বাঁধাই-ব্যবসায়ী সেই রমণী কিন্তু হাসিয়া উঠিল,—দৃশ্যটি তেমনই যেন।

বিলাপী মেয়েটির শয্যাপ্রান্তে গিয়া বিদ্রূপের সুরেই বলিল—'তুমি না হয় মনে করো, লজ্জা ও দুঃখের হাত হতে তোমাকে বাঁচবার জন্যই তাঁরা বাচ্চাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে,—পার্বে না কি?......ভয় নেয় কিছু, তাঁরা আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

লুণ্ঠিত-বাহু, দুর্ভাগা এই নারী,—উপহাসের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই তাহার নাই। তেমনই আর্ত্তনাদ, তখনও...

সে যেন উন্মত্তা হইতে বসিয়াছে। দুটি অধরের নিবিড় দংশন—রক্ত ঝরিবারই অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই কেমন একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন,—সে যেন একটি শুভ্রা, মমতাময়ী মাতা; মাতৃত্ব-বোধের নব-চেতনায় ভবিষ্যতের সমস্ত উদ্বিগ্ন চিন্তা শান্ত হইয়া গেছে, তাহার চোখে মুখে এমনই স্পষ্ট আভাষ।

কেননা তাহার মনে হয়তো হইয়াছিল, তাহাদেরই গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থার জন্য যে কর্ম্মচারীটি আসিবেন, তখন এই শিশুকে যে ছিনাইয়া লওয়া হইবে না, একথাই বা কে বলিতে পারে?

অবশেষে কিন্তু নার্স আসিয়া শিশুটিকে প্রত্যর্পণ করিল। নিমেষে মেয়েটি সযত্নে তাহাকে তুলিয়া লইয়া মমতা-মুগ্ধ আলিঙ্গন বদ্ধ লগ্ন করিল। একবার নয়,—তাহার পরও আবার......

মুখভরা হাসি, একটুও বিরাম নাই! এমনটি না হইলে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত

সাত চল্লিশ নম্বর মেয়েটি কোনরূপে আহারের অর্দ্ধেকটা নিঃশেষ করিয়াছিল; পরিত্যক্ত অংশটুকু কোণের সেই যুবতী স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিল।

সমস্ত বাটি, প্লেট প্রভৃতি ট্রে তে সজ্জিত করিয়া বাহিরে নেওয়া হইল।

অতঃপর প্রবেশ করিল দুই জন ছাত্রী। গাত্রাবাসের আস্তিন গুটাইয়া তাহারা শিশুদিগকে রাত্রির জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল।

তৃতীয় একজন সদ্যধৌত শিশু-পরিচ্ছদগুলি একটা ঝুড়ি বোঝাই করিয়া আনিয়া ষ্টোভের উপর ঝুলাইয়া রাখিল; পরিচ্ছদগুলি তখন পর্য্যন্তও শুষ্ক হয় নাই।

অত্যুষ্ণ ষ্টোভের উত্তাপে পোষাকগুলি হইতে বাষ্প উত্থিত হইতেছিল। সমস্ত কক্ষ ভরিয়া আর্দ্র সাবান ও সিক্ত পরিচ্ছদের তীব্র গন্ধ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। বাতাস-টুকু পর্য্যন্ত দূষিত, উগ্র।

সদ্য-নগ্ন সাতটি শিশুর মল-পরিত্যক্ত মুক্ত-বসনগুলি ষ্টোভের পাশেই স্তূপীকৃত। কয়েকটি রমণী নাসিকা রুদ্ধ করিয়াছিল। আবার অনেকে কাশিতেও সুরু করিল। নার্সদের অভ্যস্ত নাড়াচাড়ার ফলে শিশু-কণ্ঠের অবিরাম চীৎকার;—সারা ঘরখানি মুখর, ভয়ার্ত্ত।

এমনই দূষিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিস্ফল-রোষে নীরব থাকা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিলনা। সকলে শুধু আশা করিতেছিল কখন এই শিশুদিগকে তাহাদের জননীর কাছে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে!

সেই কটু-কণ্ঠী স্ত্রীলোকটি তাহার খোকাকে আপনার সম্মুখে শায়িত করাইয়া হঠাৎ উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল—'আচ্ছা, একটি বার চেয়ে দেখো তো,—একে তুমি পরিষ্কার করা বলতে চাও?......কক্ষনো নয়।'

একজন নার্সকে হাতছানি দিয়া কাছে ডাকিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল।

এই সমস্ত শিশুদের পরিচ্ছদগুলি, পরিষ্কার করা হয় বলিয়া তাহারা জানায়। কিন্তু তাহা মোটেই পরিষ্কার করা হয় না।—জলের মধ্যে মাত্র একবার নিমজ্জিত করিয়া, নরম সাবান দিয়া আলগোছে বুলাইয়া যায়। অতঃপর শুষ্কও করে ষ্টোভের উত্তাপে।

ইহারই ফলে একটি রুগ্নশিশুর পোষাকে যখন কোন সুস্থ শিশুর দেহাবৃত হয়—সংক্রামক রোগে এত শিশু যে কেন প্রাণ হারায়, সেকি বিস্ময়ের কথা কিছু? একটুও নয়।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকই তাহাদের শিশুদের বসনগুলির গন্ধ গ্রহণ করিল।

মনের অস্বচ্ছন্দতা মুহূর্ত্তে পরিণত হইল দুর্ব্বাক্যে।

নার্সকয়টি পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল—'আমরা কেউই এগুলি পরিষ্কার করি নি। সংঘের সুন্দরীরাই করে গেছে। তারা কোন দিন জলে আঙ্গুল স্পর্শও করেন নি এর আগে।'

কিন্তু এই জননীদের কাছে একথার মূল্যই বা কিসের? তাহারা সত্য করিয়াই নির্দ্দোষ কি না তাহাতে কি আসিয়া যায়?

বরং ঝড়ই উঠিল,—অনেকগুলি কল-কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চীৎকার,—সঙ্গে সঙ্গে শপথ ও অভিশাপ......

উর্দ্ধপানে অগণ্য মুষ্টিবদ্ধ কম্পিত বাহু—বিভৎস সে দৃশ্য।

—কাশির শব্দে সমস্ত ঘরখানি মুহূর্ত্তে পরিপূরিত হইয়া গেল।

সাতচল্লিশ নম্বর মেয়েটি দুই হস্তে কাণ চাপিয়া ধরিল,—কি নিদারুণ এই উক্তি!......

অবশেষে আপনা আপনিই সমস্ত শান্ত হইল। সমর্থা জননীরা শিশুদিগকে যত্ন করিতে সুরু করিল। কিন্তু পরে স্তন-পানোন্মুখ সন্তানদের প্রতি বিষন্ন মুখে চাহিয়া সংসে আবারও

তেমন কটুক্তি।……এবার উচ্চশ্রেণী ভুক্ত সম্ভ্রান্ত নারীদেরই লক্ষ্য করিয়া। তাহারা বিশিষ্ট-রকমের ব্যবহার পাইয়া থাকে,—ইফাই হেতু।

'কোন শিশুর অতি প্রথম শাস্তি যদি মাতার স্তন পানের সময় থেকেই আরম্ভ হয়, তবে একথা একটুও মিথ্যা নয়, এই সমস্ত শিশুরা একদিন বিপ্লববাদী হইয়া উঠিবে।

অধিকাংশ শিশুকে খাওয়ান হইত, চামচের সাহায্যে নয়—শুধু হাতে।

তাহাদের জন্য একটি বৃহৎ পাত্র পরিপূর্ণ, বাষ্পাচ্ছন্ন, ফুটন্ত দুগ্ধ মেঝের মাঝখানে আনীত হইত।

একটি ছাত্রী আসিয়া সাত চল্লিশ নম্বর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার খোকাকে এখন দুধ খাওয়াতে হবে কি?'

সারা দেহ মন যেন কত অবশ, এমনি সুরেই বলিল,—'হ্যাঁ, তা'ছাড়া আজ আর খাওয়াতে হবে বলে আমার মনে হয় না!'

ছাত্রীটি খোকাকে তুলিয়া লইয়া গেল। অতঃপর দুগ্ধ-পাত্রটির চতুর্দ্দিকে তিনজনে ঘিরিয়া শিশুর মুখে চামচ দিয়া দুধ ঢালিয়া দিতে সুরু করিল।

শিশুটি কিন্তু মুহূর্ত্তে কাঁদিয়া উঠিল—দুধটুকুও উদ্গারের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

শিশুকে তাহার জননীর কাছে ফিরাইয়া দিতে গেলে, সেই মেয়েটি কিন্তু ছাত্রীর এক হাতের কব্জিটা ধরিয়া ফেলিল—অকস্মাৎ। বলিল—'তুমি কি করেছে, জানো?'

সে উত্তর দিল—'না, কেন?—তোমার বাচ্চাকে খাওয়ানো কি ভুল হয়েছে?'

'—তুমি এর আগে ঐ কঠিন রোগাক্রান্ত ছেলেটিকে এই চামচ দিয়ে খাইয়েছো, তারপর সেটা কোন রকম না ধুয়ে মুছেই আমার খোকাকেও খাওয়ালে,—তুমি নিশ্চয়ই একটা উন্মাদ!'

'—হ্যাঁ, এমন কিছু গুরুতর হয়নি তাতে।'

হাতটা মুক্ত করিয়া মেয়েটা চলিয়া গেল,—মুখে অবজ্ঞার হাসি!

সাতচল্লিশ নম্বরের মেয়েটি আপনার রুমালখানি দিয়া খোকার মুখ মুছিয়া লইল। চোখ দুটিও সজল হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তে পাশ ফিরিল, পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে,—সেই আশঙ্কায়।

একটু পরে সুপ্ত শিশুটিকে বাহুর উপর তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—সোণালি সন্ধ্যার আকাশের পানে তাহার দুটি আঁখি যেন উদাস, অনিমেষ।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। সহরের বুকেও তখন সন্ধ্যার গাঢ় ধূসরতা,—সম্মুখের ছাদগুলি পর্য্যন্ত অস্পষ্ট।

আরও একটা রাত…… হয়তো এমনই নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া। এই চিন্তাটুকুই যেন আজ তাহার কাছে কত বড় একটা ভীতি!

ঘরের রাতটাও অসহনীয়,—গলাও শুকাইয়া গেছে একেবারে। পানীয় পাত্র হইতে সে জল লইয়া পান করিল।—উষ্ণ তো বটেই, সাবানেরও আস্বাদ…সে যেন প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়িল,—এই একটি মুহূর্ত্তে।

তিনজন নার্স শিশুদের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু এই রুদ্ধ কক্ষে বাতাস চলাচলের কোন উপায় রাখিয়া গেল না। হয় তো ভুল, না হয় উপেক্ষা!

ষ্টোভ হইতে তখনও অসহনীয় অগ্নুত্তাপ উঠিতেছিল। এই সমস্ত শয্যায় রুগ্না রমণীরা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল একেবারে।

নার্সদের চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা পুনরায় তাহাদের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিল।

যে স্ত্রীলোকটি বই বাঁধিত, হাসপাতালের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার কাহিনী সেই প্রথম বর্ণনা করিল।—

একদা একটি ছাত্রী সদ্য-প্রসূতি কোন নারীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করায়, মেয়েটির রক্তস্রাব হয়—ফলে আপনার শয্যাতেই সে প্রাণত্যাগ করে।

আর একবার দুইজন রমণীর একই সময় প্রসব-সুরু হয়—এবং সদ্য-জাত শিশু দুইটিকে তাড়াতাড়ির ফলে রাখাও হয় একই শয্যায়। পরে শিশুকে আপনার কাছে লইবার সময় কোনটি যে কাহার, কোন মাতারই তাহা নিশ্চয় করা সম্ভব হইল না। প্রত্যেকে ইচ্ছামত শিশু লইয়া চলিয়া যান। অতঃপর তিন বৎসর পরে আবার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

একজন নবীন চিকিৎসক শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে মাত্র ফিরিয়াই একজন রোগিনীকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—ফলে স্ত্রীলোকটি বীজাণু সংক্রামিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এমনি ধরণের গল্পের পর গল্প চলিতে লাগিল। একটির পর অন্যটি অধিকতর বীভৎস।

অসাচ্ছন্দ্যকর ঘর খানিতে অন্ধকার ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

সাতচল্লিশ নম্বর মেয়েটি দেহাবরণে মস্তকাবৃত করিল—যেন আর কিছুই তাহার কাণে প্রবেশ না করে।

(ক্রমশঃ)

—:*:—

সত্য-মিথ্যা

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দিনের বেলা সেখানে সত্যই আলো জ্বলে।

বড় রাস্তার পাশে ভাঙা পুরান একটু ভুতুড়ে গোছের বাড়ি। তারি অন্ধকার একটি গলি পথ দিয়ে দোকানে উঠতে হয়।

চায়ের দোকান, বিজ্ঞাপন নেই তবু চলে ভাল। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিক্রির কামাই নেই।

হঠাৎ ভাগ্যক্রমে দোকানটি আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম এবং তার চেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম অপূর্ব্বকে আবিষ্কার করে।

মাঝারি গোছের প্যাংলা ছিপছিপে চেহারা, মুখে অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতার শত চিহ্ন সত্ত্বেও কেমন যেন একটি মাধুর্য্য আছে—কিন্তু সে মুখ দেখে তার বয়স ঠিক করা কঠিন।

প্রথম দিন আমারি পাশে বসে ছেলেদের খেলার মার্বেলের মত একটি সুবৃহৎ আফিঙের ডেলা মুখে ফেলে দিয়ে আমার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে সে বিনা পরিচয়েই বলেছিল, 'হজমি গুলি মশাই, ভয় পাবেন না।'

কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ হল একটু অদ্ভুত ভাবে। দুটি পেয়ালা চা উপরোউপরি নিঃশেষ করে পয়সা বার করতে গিয়ে হঠাৎ সে যেন অত্যন্ত ভীত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। এক এক করে পকেট গুলো উল্টেপাল্টে তন্ন তন্ন করে খুঁজে অত্যন্ত করুণ হতাশ ভাবে বল্লে, 'আমার পয়সা কি হল ?'

দোকানদার হাত পেতে সামনেই দাঁড়িয়েছিল—বল্লে, 'কোন পকেটে রেখেছিলেন ? পড়ে গেছে বোধ হয়।'

'পড়ে গেছে কি হে, পকেট ফুটো নয়, কিছু নয়, পড়ে অমনি গেলেই হ'ল!—দশ টাকার একটা নোট—আর খুচরো আনা দশেক—সব পড়ে গেল!'

দোকানদার এবার চটে গিয়ে বল্লে 'গেল না গেল আমার কি মশাই, দিন চায়ের দাম দিন!'

ভেংচে অপূর্ব্ব বল্লে, 'চায়ের দাম দিন, দেব কোথা থেকে শুনি'!

'মিনি মাগনা চা খেয়ে চোখও রাঙিয়ে যাবেন নাকি মশাই !'

অপূর্ব্ব হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, 'আপনাকে বলতে আমার বাধছে মশাই কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে দু আনা পয়সার জন্যে কি অপমানটা হলাম চোখে ত দেখলেন। অনুগ্রহ করে যদি'……

তার দুআনা পয়সা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, অপূর্ব্ব সঙ্গে আসতে আসতে উচ্ছসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিল 'চেনা শুনো নেই তবু আজ যে ভাবে ভদ্রলোকের মান আপনি রাখলেন মশাই আপনাকে কি আর বলব—হ্যাঁ আপনার ঠিকানাটা বলুন ত!

না না আপনার ও দু আনা দু শ টাকার সামিল, কিন্তু তবু যতটুকু ঋণ শোধ হয়।'

প্রথম দিনই মনে হয়েছিল লোকটা বকে বড় বেশী কিন্তু তবু কেমন যেন তাকে ভালও লেগেছিল।

বাড়ি ফিরে এসে সে দিন মণিব্যাগটা খুঁজে পাই নি।

পরের দিন সকাল বেলাই অপূর্ব্ব এসে হাজির। গায়ে একটি ছেঁড়া পাঞ্জাবী, পায়ে ছেঁড়া জুতো। ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে বল্লে, 'কাল সারা রাত মশাই আপনার কথা ভেবেছি—ওই চোরের আড্ডায় দু আনা পয়সার জন্যে কি অপমানটাই যে হতুম সে কথা ভেবে বার বার আপনাকে কত যে ধন্যবাদ দিয়েছি তা আর বলতে পারি না।'

বল্লাম—'সামান্য দু আনা পয়সার জন্যে আপনি আমায় বড় বেশী লজ্জিত করে তুলছেন অপূর্ব্ববাবু।'

''না না সামান্য নয় মশাই, ওরা দু আনা পয়সার জন্যে মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে—আপনি জানেন না ওটি কি ভয়ানক গুণ্ডার আড্ডা।'

'আপনিই বা এত কথা জানলেন কি করে ?'

অপূর্ব্ব ঈষৎ হেসে গলার স্বর নামিয়ে বল্লে, 'আমাদের ও সব যে জানতে হয় !'

'কেন ?'

অপূর্ব্ব গলার স্বর আরো নামিয়ে বল্লে—'পুলিশের চাকরী মশাই অনেক ল্যাঠা। এইত এখন প্রাণটি হাতে করে নিয়ে চল্লাম এক কোকেন খোরের আড্ডায়, ধরব কি ধরা পড়ব স্বয়ং বিধাতা পুরুষও জানেন না।'

'আপনি গোয়েন্দা নাকি ?'

'নামটা আর করবেন না মশাই, জানি বড় ছোট কাজ কিন্তু কি করব, পেটের দায়।'

পকেট থেকে হঠাৎ আমার মণিব্যাগটি বার করে টেবিলের ওপর রেখে অপূর্ব্ব বল্লে, 'কিন্তু আমরা এই ছোট কাজ করি বলেই ধনপ্রাণ নিয়ে আপনারা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান এইটুকুই যা সান্ত্বনা।—দেখুন এটা আপনার ত ?'

বিস্মিত হয়ে বল্লাম আপনি পেলেন কোথায় ?'

'পাব আর কোথায়—চোরের ওপর অমন বাটপাড়ি আমাদের হামেশা করতে হয়। কখন হারিয়েছিলেন মনে আছে ?'

বল্লাম, 'না।'

হেসে অপূর্ব্ব বল্লে, 'দোকানদারের পকেট থেকে এটা আমায় উদ্ধার করতে হয়েছে। দোকানদারকে চায়ের দাম দেবার পর এটা আপনার পকেটে আর ঢোকেনি।'

অপূর্ব্ব সেদিন কিছুতেই ছাড়লেনা। দুআনা পয়সা দিয়ে দুশবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কোকেনের আড্ডায় ছদ্মবেশে চোর ধরতে যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধে ভয়াবহ বক্তৃতা দিয়ে এবং পরিশেষে আমার সিগারেটের প্যাকেট টা ভুলে নিজের পকেটে রেখে দুঘন্টা বাদে যখন সে বেরিয়ে গেল তখন ব্যাগ খুলে দেখলাম সেটি একেবারে খালি।

তারপর অপূর্ব্বর যাতায়াত ঘন ঘন আমার মেসে সুরু হল। অত্যন্ত বক্তার বলেও মানুষের মনোহরণ করবার একটি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা তার ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই মেসের সকলের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সে হয়ে উঠল যেন সবার সাথে কতদিনের তার পরিচয়। তার ম্যাজিক দেখাবার কৌশল, গোয়েন্দাগিরির অসাধারণ কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে

আমাদের মাঝে সে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা কিছুদিনের মধ্যেই অর্জ্জন করে নিলে।

দোষ ত্রুটি অবশ্য তার যথেষ্ট ছিল। সন্ধ্যাবেলা হয়ত বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘর আমার অসাক্ষাতে খুলে আমার ভাল ভাল পোষাকগুলি বেছে পরে সে বেরিয়ে গেছে। পরের দিন কিন্তু কিছু বলবার অবসর সে দিত না। নিজে থেকে সহস্র বার ক্ষমা চেয়ে আমায় অবশেষে লজ্জিতই করে তুলত।

পাশের ঘরের বিনয় বাবু একদিন এসে বললেন, 'আচ্ছা অপূর্ব্ব বাবুত গোয়েন্দাগিরি করেন কিন্তু ওঁর অত টাকার অভাব কেন হয় বলতে পারেন ?'

"কি করে জানলেন ?'

'কেন মেসের সবার কাছেইত ওঁর দশ বিশ টাকা ধার সেদিন দেখিনা ঠাকুরের কাছ থেকেই পাঁচ টাকা ধার করে নিলেন। আমাদের কাছে ধার করুন তাতে কিছু বলিনা কিন্তু ঠাকুর চাকরের কাছে অমন করলে যে মান যাবে।'

সেদিন সত্যি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলুম এবিষয়ে তাকে শাসন করে দিতেই হবে।

কিন্তু লোকটা যেন অন্তর্য্যামী। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকেই কি যেন মনে পড়াতে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে, দাঁড়াও ভাই, ঠাকুরকে পাঁচটা টাকা দিয়ে আসি, কাল যা বিপদে পড়ে ঠাকুরের কাছে টাকা চেয়েছিলাম বলতে পারি না।'

ফিরে এসে বিপদের যে কাহিনী সে বল্লে—তাতে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

ঘরে ঢুকেই ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বল্লে, 'ঝকমারির কাজ ভাই এই গোয়েন্দাগিরি। এক এক সময়ে মনে হয় ছেড়ে দিই, কি নিষ্ঠুরতা যে করতে হয় এক এক সময় !,

কাহিনীটি তার করুণ। কিছুদিন থেকে কলকেতার এক ট্যাঁশ পাড়ায় লুকিয়ে কোকেন বিক্রি হচ্ছে সংবাদ পেয়েও পুলিশ কাকেও ধরতে পারছিলনা। সেই খোঁজেই অপূর্ব্ব সেদিন সেপাড়ায় গিয়ে নাকি আবিষ্কার করে একটি সাত আট বছরের ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মেয়েই এ ব্যাপারের মূল।

বলতে বলতে অপূর্ব্বর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল। '—ছোট্ট সাত বছরের মেয়ে ভাই, ছোট ছোট দুটি ধবধবে খালি পা, ধুলোয় ময়লাতেও সে পা দেখলে পোটোর গড়া লক্ষ্মীর পা দুখানির কথা মনে পড়ে। গায়ে ছেঁড়া নোংড়া জামা, আর ফ্যাকাশে রোগা মুখে দুটি সরল বড় বড় ভীরু কাতর চোখ। সে মুখ দেখলে করুণা হয় না এমন পাষণ্ড বোধহয় নেই। মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেই মনে হয় এই মাত্র সে যেন কেঁদে চোখ মুছে উঠেছে। সেই কোকেন বিক্রি করছে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যে এতদিন পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি এইবার বুঝতে পারলাম। মেয়েটি ভিক্ষে করে বেড়াতে বেড়াতে হাত পাতে, কেউ পয়সা দিলে বলে, 'চলবেত ?' যারা এ ব্যাপারের ব্যাপারি নয় তারা 'চলবে' বলে চলে যায়। যারা সন্ধান জানে তারা তখন বলে 'না চলবেনা', বদলে দিচ্ছি।'—এইটুকু ইঙ্গিত। তারপর কোকেন ও তার দাম বিনিময় হয়।

উপায় নেই। ওই কথা বলার পর কোকেন বার করতেই ধরতে হ'ল। শীর্ণ রোগা দুটি হাত মনে হয় টুসকি দিলে ভেঙ্গে যাবে। ধরবা মাত্র কাতর ভাবে সে একবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বল্লে 'আমায় ছেড়ে দাও'

কঠিন হবার চেষ্টা করে বল্লাম, 'তুমি কোকেন বিক্রি করছ কেন ?'

এবার সে কেঁদে ফেল্লে। ফ্যাকাশে রক্তহীন গাল বেয়ে সে অশ্রু পড়ার দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। তার জামার ভেতর থেকে কোকেনের মোড়কগুলি বার করে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। কাজ নেই আমার গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরিতে। সবাই বিফল হয়েছে আমিও না হয় তাই বলব।

কিন্তু মেয়েটি তবু কাঁদতে লাগল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেড়ে দিলাম তবু কাঁদছ কেন ?'

মেয়েটি প্রথমে কিছু বলতে চায়না। অনেকক্ষণ ধরে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করবার পর বল্লে, বিক্রি করে টাকা না নিয়ে যেতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'

এই 'ওদের' কথা আমার অজানা নয়। এমনি সব নিরীহ লোকদের দিয়ে ব্যবসা তারা চালায় আর কোন ত্রুটি হলে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। একবার ইচ্ছা হ'ল ওর সাহায্যে তাদের ধরা যাক্। অন্য কেউ হলে তাই করতাম। কিন্তু তা করলে এই মেয়েটির জীবন যে কি ভয়ানক বিপন্ন হয়ে উঠবে তা ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত টাকার জিনিষ ছিল।'

বল্লে, 'দশটাকার।"

পাঁচটা টাকা মাত্র আমার কাছে ছিল। বাকী পাঁচ টাকা তখন কোথায় পাই? মেসে এসে তাড়াতাড়ির জন্য নীচে থেকে ঠাকুরের কাছেই তখন চেয়ে ছিলাম।'

গল্প শেষ করে অপূর্ব্ব বল্লে, 'একথা যদি পুলিশে জানতে পারে ত আমার শুধু চাকরী যাবে না, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

অবিশ্বাস করিনি তবু একটা খট্‌কা সেদিন লেগেছিল। কখন বাঙ্গালী কখন হিন্দুস্থানী কখন ফিরিঙ্গি এমনি একটি সাতবছরের অনাথা অসহায় মেয়েকে অপূর্ব্বর অনেক কাহিনীর ভেতরেই দেখেছি।

রাত্রে ঠাকুর ওপরে খাবার দিতে আসার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'অপূর্ব্ব বাবু তোমার টাকা শোধ দিয়েছে ঠাকুর?'

ঠাকুর একটু সঙ্কুচিত হয়ে বল্লে, 'না বাবু।'

পরের দিন সকালে অপূর্ব্ব এলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লাম 'তোমার সব গল্প বানানো। কাল তুমি ঠাকুরকে টাকা ত দাওনি।'

সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিস্মিত হয়ে বল্লে, 'দিইছি তাওত কাল আমি বলিনি। ঠাকুরকে কাল যে নীচে গিয়ে পেলাম না দেব কি করে? এইত এখন দিয়ে আসছি।

কিন্তু গোয়েন্দাগিরি একদিন অপূর্ব্বর ফাঁস হয়ে গেল। বিনয়বাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে মেসে খবর দিলেন, 'আমি বরাবর জানি সে একটা জোচ্চোর বদমাস মশাই, শুধু আপনাদের কথাতেই আমার পঁচিশ টাকা গচ্চা গেল!'

আরো কিছুক্ষণ গালাগাল করে বিনয়বাবু অবশেষে জানালেন যে খুন করবার চেষ্টা ও লুকিয়ে কোকেন বিক্রির অপরাধে পুলিশ অপূর্ব্বকে ধরে নিয়ে গেছে। গোয়েন্দা সে কোন পুরুষে নাকি নয়। লুকিয়ে কোকেন বিক্রিই তার ব্যবসা। কোন জঘন্য পাড়ায় এক গণিকার বাড়ি থেকে সে ব্যবসা চালাত। সে বেশ্যার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া হওয়ায় বেশ্যা পুলিশকে সব কথা বলে দেবে বলে ভয় দেখায়। এই রাগে অপূর্ব্ব নাকি তাকে পানের সঙ্গে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। বেশ্যা মরে নি কিন্তু হাসপাতালে সব কথা প্রকাশ করে দেওয়ায় পুলিশ অপূর্ব্বকে গ্রেপ্তার করেছে।

আইনের ফাঁকিতে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে লুকিয়ে কোকেন বিক্রি ইত্যাদির অপরাধে অপূর্ব্বর তিন বৎসর জেল হল।

* * * *

তিন বৎসরে অপূর্ব্বর কথা একরকম ভুলেই গিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন নীচে থেকে নেয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখি সে দিব্য আরামে আমার খাটের উপর শুয়ে আছে।

আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে, 'তুমি যা বলবে তা জানি, কিন্তু সত্যি বলছি একেবারে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

বিরক্ত হয়ত একটু প্রথমে হয়েছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আমার মনোভাব বোধহয় বোঝাবার চেষ্টা করে সে বল্লে। 'সত্যি তোমায় বিরক্ত করবার ইচ্ছা আমার নেই। বল, চলে যাব?'

বল্লাম, না থাক্, তুমি খেয়ে এসেছ?'

সে একটু ম্লান হেসে বল্লে, 'কাল ত জেল থেকে বেরিয়েছি।'

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা সে বল্লে, 'এই দুপুরটুক্ কাটিয়েই ভাই যাব, কিছু মনে করোনা।'

'কোথায় যাবে?'

'দেশে'—বলতে বলতে তার চোখ অশ্রু-সজল হয়ে এল, 'তিন বছর তাদের কোন খোঁজ পাইনি ভাই, আছে কিনা তা'ও জানি না।'

খানিক সে চুপ করে অন্য দিকে চেয়ে রইল। তার পর আমার দিকে ফিরে বল্লে, 'তোমার কাছে আগাগোড়া মিথ্যে বলে এসেছি। প্রথম দিন মিথ্যে অভিনয় করে তোমার কাছে চায়ের পয়সা আদায় করেছি, তোমার ব্যাগ চুরি করে গোয়েন্দাগিরির গল্প করেছি, সুতরাং আজ যদি আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস কর তাহলে তোমার দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সত্যি ভাই এই শেষ বারটা আমায় বিশ্বাস কর—আমি মিথ্যা বলছিনা।'

বল্লাম, 'তোমায় অবিশ্বাস করব এমন কথাত বলিনি।'

'না বলনি, কিন্তু আমিত জানি আমায় বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কত কঠিন·· ……

আরো অনেক কথা সে বলতে যাচ্ছিল। বল্লাম, 'আসল কথা কি বলই না?'

আসল কথা পঞ্চাশটি টাকা সে চায়। দেশে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে। তিন বৎসর সে তাদের খোঁজ পায়নি। তাদের বিশেষ করে তার ছোট মেয়েটিকে দেখবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

দেশে যাবার ভাড়াও সামান্য কিছু না হলে সে যেতে পারে না। সেই টাকা কটি যদি আমি দিই।

বল্লাম 'তা দিচ্ছি, কিন্তু দেশে গিয়ে খাবে কি?'

'যা জমিজমা আছে তাতে কোন রকমে চলে যাবে।' হেসে বল্লাম, 'আর ও ব্যবসা করো না।'

সে উত্তরে একটু ম্লান হাসলে মাত্র।

সমস্ত দুপুর শুয়ে শুয়ে সে তার সেই ছোট মেয়ে ডলুর কথাই থেকে থেকে বলতে লাগল। সাত বছরের মেয়ে কিন্তু তার দৌরাত্ম্যে বাড়ির লোক শুধু নয় পাড়ার লোক পর্য্যন্ত অস্থির।

'শুনলে বিশ্বাস হবে না ভাই, মেয়েটার কোন ভয় ডর নেই। ডলুর মা হয়ত ভয় দেখিয়ে বলে, 'ভূতে ধরে নেবে ডলু'। ডলু বলে, 'কোথায় ভূত দেখব।'

—হেসে বল্লাম, 'বাপেদের ছেলে মেয়েগুলো শুনেছি ওই রকমই হয় অপূর্ব্ব।'

অপূর্ব্ব উঠে বসে তীব্র প্রতিবাদ করে বল্লে, 'কখখন না, আরো ত ঢের ছেলেমেয়ে আছে। ওইত আমার বড় ছেলেই রয়েছে, সবাই কি ও রকম!'

এখানে কথা বলা উচিত নয়, চুপ করে রইলাম। অপূর্ব্ব বলে যেতে লাগল, 'ধমকে কোনও কথা তাকে বলবার যো নেই। তাহলে ডলু একেবারে কুরুক্ষেত্র করে তুলবে। কিন্তু মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্লে ডলুর আর কোন আপত্তি নেই।'

খানিক চুপ করে থেকে আবার অপূর্ব্ব বল্লে, 'সেবারে অসুখ করেছিল ডলুর; তাকে নিয়ে যে কি মুস্কিলে পড়ে ছিলাম বলতে পারি না। আর কেউ তার কাছে থাকলে চলবে না তার বাবা থাকা চাই। কারো কথায় বালি খাবেনা কিন্তু আমি যদি বলি, 'বালিটুকু খেয়ে নাও ত ডলু নইলে তাড়াতাড়ি ভাত খেতে পারবে না, আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারবে না।' ডলু তৎক্ষণাৎ রাজী।'

একটু থেমে অপূর্ব্ব বল্লে, 'ঘুমোচ্ছ নাকি!'

বল্লাম, 'না, তোমার ডলুর কথা ভাবছি।

তাকে ছেড়ে ঠিক আসতাম না ভাই, সময় পেলেই যেতাম কিন্তু কিযে পয়সার নেশা ধরেছিল! ভেবেছিলাম এমনি করে কিছুদিন জুয়াচুরি করে যদি চিরদিন সুখে থাকবা মত পয়সা রোজগার করে নিতে পারি মন্দ কি? কারো ত আর সত্যকারের অনিষ্ট করছিনা। যাক্ সে কথা!'

কিন্তু বেশী ক্ষণ চুপ করে থাকতে অপূর্ব্ব পারে না।

খানিকবাদেই বল্লে, 'যাবামাত্রই ছুটে এসে বলবে, বাবা লকেট এনেছ ? লকেট ফল ?' একবার লকেট ফল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম ; সেই থেকে লকেট ফলের দিকে তার ভারী ঝোঁক। এখন আবার লকেট ফলের সময় নয়, দেখি কোথাও পাই কি না।'

এবার হেসে বল্লাম, 'তোমার মেয়ে কিন্তু আর সাত বছরের নেই অপূর্ব্ব এই তিন বছরে সে অন্ততঃ দশ বছরের হয়েছে, আর লকেট ফলের কথা মনে নাও থাকতে পারে।'

কিন্তু একথায় অপূর্ব্বর মুখ যেন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমার দিকে একবার বিমূঢ়ের মত চেয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদ এ সাময়িক বিষাদ যেন ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে বল্লে,—আর আমার ওপর তার টান যদি দেখতে ভাই। আমার জিনিষ সে কাউকে ছুঁতে দেবে না—তার মাকে পর্য্যন্ত না। ছুঁয়োনা ও যে বাবার।' কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমি যে অপূর্ব্বর মা হই।'

এমনিতর সারা দুপুর অপূর্ব্ব বকে গেল। বিকাল বেলা টাকা নিয়ে চলে যাবার সময় আমার হাত ধরে সত্য সত্যই কেঁদে ফেলে সে বল্লে, 'আমার যে উপকারটা তুমি করলে ভাই। কি আর তোমায় বলব।'

অপূর্ব্ব বেরিয়ে যেতেই বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বল্লেন, 'কে এসেছিল ? সেই চোট্টা খুনেটা অপূর্ব্ব না ?'

বল্লাম, 'হ্যা।'

'টাকার জন্যে এসেছিল ত, উঃ, ওর বেহায়া সাহসকে বলিহারি যাই—কিন্তু একটু বাধল না কি বলে চাইলে ?'

'ওর বৌ ছেলে মেয়েকে অনেকদিন দেখেনি, দেশে যেতে হবে এই বলে ?'

'আপনি দিলেন নাকি টাকা ?'

'দিলাম ত' বলে একটু হাসলাম।

বিনয়বাবু পরম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বল্লেন, 'আপনি ওর কথায় বিশ্বাস করে ওকে টাকা দিলেন! ও বল্লে, 'বৌ ছেলে মেয়েকে দেখতে যাব 'আর আপনি অমনি ভাল মানুষটির মত সমস্ত বিশ্বাস করলেন! আশ্চর্য্য আপনার বিশ্বাস! আরে ওর কি বৌ ছেলে মেয়ে আছে! আমি যে ওর সব খোঁজ নিয়েছি।'

'কি নিয়েছেন ?'

'কি আবার নিইনি, সব নিইছি! ওর কোন চুলোয় কেউ নেই। একটা বিয়ে করেছিল বটে কিন্তু সে বৌত দশ বছর আগে ওরই জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। একটা বছর ছয় সাতের মেয়ে ছিল তাকে ত ও সঙ্গে নিয়ে সেই বছরই কোন মেলায় গিয়ে হারিয়ে আসে। বলে হারিয়ে আসে কিন্তু আমার বিশ্বাস ওসব মিছে কথা। ও কাকে মেয়েটা বেচে দিয়েছে। ওসব লোক সব পারে। কিন্তু আপনি না জেনে শুনে এটা কি করলেন বলুনত! এমন ডাহা আপনাকে ঠকিয়ে গেল!'

বল্লাম 'আপনি যা বলেন আমি সবই জানি।'

'জানেন! বলেন কি, জেনে শুনে আপনি জোচ্চার-টাকে টাকা দিলেন। না মশাই আপনি হয়ত বিশ্বাস করছেন না। ওর বৌ ছেলে মেয়ে নেই। আমি সত্যি সব খোঁজ নিয়েছি!'

'আমি আপনার চেয়ে আরেকটুকু বেশী খোঁজ নিয়েছি' বিনয়বাবু! দশ বছর ধরে ওর স্ত্রী কন্যা নেই জানি, কিন্তু এই দশ বছর ধরে সমস্ত অন্যায় অপরাধ জুয়াচুরির ভেতর ও সেই সাত বছরের মেয়েকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত জায়গা তোলপাড় করে বেড়িয়েছে, যেখানে কোন ছোট অসহায় মেয়ে দেখেছে সেখানে উন্মত্ত হয়ে তাকে আদর করেছে। অসম্ভব প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলেছে, এমন কি ওর সেই সাত বছরের মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ যে সতেরো বছরের হয়েছে সে খেয়াল পর্য্যন্ত ওর নেই, এই পাগলামিটুকুর কথা বোধ হয় আপনি জানেন না। ওর

সমস্ত কথা হয়ত মিথ্যে কিন্তু ওর মনের সে সাতবছরের মেয়ের জন্যে ব্যাকুলতা মিথ্যে নয়।'

বিনয়বাবু আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় বোধ হয় বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে গেলন

অপূর্ব্বর সঙ্গে আর জীবনে দেখা হয় নি। তার সেই হারাণো শাশ্বত সাতবছরের মেয়েকে সে পেয়েছে কি না কে জানে।



শেষ-উৎসর্গ

—শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দত্ত

জানি এই চিরোজ্জ্বল প্রাঙ্গন-মাঝারে
অম্লান-উৎসবে—
ক্ষণিক অতিথি মোরা তিথি শেষ না হ'তে সবারে—
চলে যেতে হবে।
তবু কেন লুব্ধ প্রাণ বাসনার সহস্র শিখায়—
রহে জড়াইতে,
অপূর্ণ পিয়াস সুধা চূর্ণপ্রায় পানপাত্র মাঝে
চাহে ভরাইতে!

মিলন-মদির-গন্ধে অন্ধপ্রায় ভ্রমর সমান
বায়ুর তরঙ্গে—
দেহহারা কুসুমের ব্যক্তিহীন অরূপ পরশ
চাহে নিজ অঙ্গে।
না ফুরা'তে পিয়ালার শেষবিন্দু, সমাপ্তি চুম্বন,
নিবে যায় আলো;
ঝরা-জীর্ণ প্রাণ'পরে ম্লানোৎসবে নামে অকাতরে—
অন্তহীন কালো।

বীণাতন্ত্রী ছিঁড়ে যায়, অসম্পূর্ণ ঝঙ্কার রাগিণী—
নির্দ্দয় পীড়নে,
নামে শ্রাবণের ধারা পরিম্লান অকাল সন্ধ্যায়—
ঘন গরজনে।
সাথীহারা শ্রান্ত বায়ু খোঁজে কোন্ ব্যাকুল আশ্রয়
অশান্ত ক্রন্দনে,
নিবে দিবসের আলো, নেমে আসে সন্ধ্যার তমসা
নিঃশব্দ চরণে।

অসম্পূর্ণ পিপাসার পাত্র শেষ না হ'তে নিঃশেষ—
নেবে যদি আলো,—
এ পৃথিবী-খেলাঘরে হেলাপূর্ণ উত্তর-সমীরে—
হ'বে মোর ভালো।
সে সন্ধ্যার অন্ধকারে দিশাহারা সেই সে তিমিরে—
ক্ষীণ দীপালোকে,
পথ বাহি' যাবো সেথা যেথা জাগে সাথীহারা প্রিয়—
সলজ্জ পুলকে।
এ ধরার খেলাঘরে যেই আশা রহিল অশেষ—
তা'রে নিয়ে সাথে,—
অকথিত বাণী দিয়ে রাখী মোর তুলিব রচিয়ে—
দেব তা'র হাতে॥

——:০:——

আসচে সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
প্রবন্ধ—

মায়া

—শ্রীকালিদাশ গুহ

অলকা যে বাড়ীর বউ, অজিত সে বাড়ীর কেউ নয়,—পরিচয় ছিলো পাশাপাশি বাড়ী বলে।

ছোট্ট গ্রামখানির মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা যে পথটী সাপের চলার মতো এঁকে বেঁকে সুদূর গ্রামান্তরে মিলিয়ে গেচে, তারই ওপর দিয়ে দুটি বেলা যাওয়া-আসার পথে অজিতের কোনদিন ঐ মেয়েটিকে চোখে পড়তো, কোনদিন পড়তোও না।

শ্যাওলা-পানায় ভরা ছোট বড় বিল পুকুরের পাড় ছুঁয়ে—আম অশথের ছায়ার স্পর্শ নিয়ে,—সবুজ ক্ষেতের আল ঘেসে ঐ যে সুন্দর পথটী……তারই ওপর সর্ব্বপ্রথম যে মানুষটী তার চলার ছাপ টুকু রেখেছিলো,—তার কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে অজিতের কাছে পথটী কখন নিঃশেষ হ'য়ে আসতো,—অনুভূতির কাছে আর ধরা পড়তো না। তারপর যখন চম্‌কে উঠ্‌তো তখন ডাইনেই দেখা যেতো অতি পরিচিত একটী পুকুরের পাড়,—নীচে কাল জল,—আর তারই বুকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সবুজ মসৃণ পানার দল।

অজিতের দুটি চোখই বিদ্যুৎগতিতে খেলে যেতো অদূরে শান বাঁধানো জীর্ণ একটী ঘাটের ওপর কিন্তু দর্শন কখনো মিলতো, কখনো নয়।

কিন্তু অতি অভ্যস্ত অভ্যাস—ক্ষণিক চেতনার অবকাশ-টুকুও ওতে ছিলো না। এম্‌নি করেই দিনের পর দিন কেটে গেচে।

তার ঐ বুভুক্ষু যৌবনের দ্বারে বিবেকের সমস্ত শাসনটুকুও যেমন পঙ্গু হয়ে গেচে, তেমনি তার নিজের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দের সমাধির ওপরও ফুটে উঠেচে মোহ ভরা অপূর্ব্ব একটী মায়া,—রজনী-আঁধার আকাশে ছায়াবিথীর মতোই অস্ফুট, অস্পষ্ট।

পুকুরের খুব কাছেই আমবাগানের আড়াল থেকে যে বাড়ীর খানিকটা চোখে পড়ে,—সেই বাড়ীরই বউ অলকা। তারপরের যে বাড়ীখানি সেটা চোখে না পড়লেও অজিতের পিসীমার বাড়ী ঐটীই।

আমবাগানের পাশ দিয়ে ছোটো পথ একটা বরাবর পূবদিকে নেমে এসেচে! ঘাটে আসবার পক্ষে সেটা একমাত্র অবলম্বন হ'লেও সুমুখের ঐ পায়ে-চলা পথে বেরিয়ে পড়বার কাজও ওতে চলে।

অজিত সেই পথই অনুসরণ করলো।

কিন্তু আজ দেখা হোল ঐ টুক্‌রো পথের মাঝখানটায়।

অন্যদিন আজিত পাশ কেটে চলে গেচে—আর ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠিতা মেয়েটী পথ ছেড়ে তিন হাত সরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েচে। তারপর খানিকটা চলে গিয়ে কি একটা কথা মনে পড়ায় অজিত যখন পেছন পানে ফিরে চেয়েচে তখনই চোখে পড়েচে ডাগর কালো চোখের বিস্মিত চাউনি ভরা অতিকমনীয় একখানি মুখ—শাড়ীর চওড়া লাল পাড়ের সীমার মাঝখানে সুন্দর, সুস্পষ্ট।

শুধু একটী মুহূর্ত্ত……

তারপরই মুখের ওপর একহাত ঘোমটা নেমেচে—নিঃসাড় দেহটী ত্রস্ত গতিশীল হয়ে পড়েচে।

কিন্তু আজ স্নানার্থিনীর সংখ্যা তিনটী। তারই পিসীমা,—পশ্চাতে সাত আট বছরের শিশু একটি মেয়ে—আর নিত্যকারের চোখের দেখা সলাজ-বধূ তরুণীটি।

গত দুটি মাস ধরে অজিত কত কিই না ভেবেচে। কত উপন্যাসের কথা, কত মনস্তত্বের বিবরণ, কত বৈষ্ণব কবিতার প্রেম বৈচিত্র……

আ'লোড়নের পর আলোড়ন এসে পথের দুরত্বটুকু অবধি ভুলিয়ে গেচে। মাঝে মাঝে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথাও যে মনে না জেগেচে তা নয়—নিজের মনেই প্রশ্ন করে জানতে চেয়েচে—এত কি ওর লজ্জা, কেনই বা ?……

কিন্তু সমাধান কিছু হয় নি—বিস্ময়টাই বেড়ে গেচে শুধু।

পাশ কেটে চলবার সময় পিসীমা বল্লেন—'এমন রোদ্দুর, একটু সকাল করেই ফিরিস অজু,—চা খেয়ে সেই কোন সকালে বেড়িয়ে পড়েচিস·····

কি একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়,—কিন্তু শেষ অবধি তাকে ছাপিয়ে একটা ক্ষীণ সলজ্জ হাসি ছাড়া আর কিছুই ফুটতে পারে না।

ঘোমটার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা চমক চাউনিও ঝিলিক মারে। অজিত আনমনে চলে যায়।

পিসীমাকে একদিন শুধোয়,—ও বউটি কে পিসিমা,—আর সেই ছোট মেয়েটি ?

তিনি বল্লেন—ওকে চিনলিনে!—অমন মেয়ে হয় না অজু, সহরে চিরকাল মানুষ,—কিন্তু এই পাড়া গাঁয়ে এসেও একটু টু শব্দ করেনি কোনদিন, সেও তো কমদিন নয়, দশ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে।—আর বকুর কথা বলছিস,—সেতো ওরই মেয়ে। কি অভাব ছিল ওর,—স্বামীটা অমানুষ শুধু তাই।

অজিত হেসে বল্লে, সে তো হ'ল পিসিমা, কিন্তু আসল পরিচয়টাই যে অজানা রইলো। পিসিমা হেসে বল্লে, ও আমাদের নরেণের বউ অলকা। ঐ যে ওদের বাড়ী—সেদিন যে তোকে যেতেও বলেছিল—তা' তোর খেয়ালের তো অন্ত নেই, কাণেই তুললি নে সে কথা। একদিন যাস্ কিন্তু।

—'আচ্ছা সে হবে'খন।'

অজিত আনমনেই অন্তরাল হয়ে গেল।

একদিন আলাপও হ'ল—হটাৎ। অজিতের নেমন্তন্ন ছিল অলকাদের বাড়ীতে। আসবার সময়টিতে অলকা আপনা থেকেই বল্লে,—আপনাকে কষ্ট দিলাম—বাড়ী গিয়ে সে-কথা সবাইকে বলে বেড়াবেন না যেন। পাড়া গায়ে সব সময়েই সব কিছু জোগাড় করা দায়। যাক্ মাঝে মাঝে আসবেন, নিন্দে করে বেড়ান, আপত্তি নেই,—কিন্তু এ বাড়ীর প্রতি বিমুখ হয়ে থাকবেন না।—এ কথাটি মনে রাখবেন আশাকরি।

অজিতের কাছে সেদিন অপরূপ মনে হ'ল এই সপ্রতিভ মেয়েটিকে।—মনে হ'ল যেন কতদিনের পরিচয়, কত আপনার।

দিন কাটে একের পর দুই, তিন—

কিন্তু অজিতের কল্পনার যেন অন্ত থাকেনা এই তরুণীকে কেন্দ্র করে।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া পৃথিবীর বুকে ছাড়িয়ে গেছে ফেরবার পথে সেদিন অজিতের সঙ্গে অলকার দেখা।

অলকাই প্রথমে বল্লে,—'শুনলুম, আপনি নাকি শিগগিরই চলে যাচ্ছেন? এরই ভেতরে যাবেন কি, আর ক'টা দিন থাকুন না ?'

'পিসিমা বলেছেন বুঝি ?—হ্যাঁ, যেতে হবে বৈ কি,—অনেক গুলো কাজ পড়ে আছে সেখানে।'

'আচ্ছা, কাল একবার যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে—সত্যিই যাবেন!'

'—আচ্ছা!'

এই ছোট্ট একটু মিনতির কথা অজিতের মনে যেন মায়া সৃষ্টি করে যায়। ভাবে, অপরূপ ওর কথার ভঙ্গিমাটি।

পরদিন সকালবেলাতেই বকু এসে বল্লে, 'মা আপনাকে ডেকেছেন,—

ছোট মেয়েটি।—দেখলেই বুকে করতে ইচ্ছে করে। ওর কালো চোখ দুটিতে যেন অনাবিল স্নেহের ইঙ্গিত। ছাড়া ছাড়া কথাগুলি, কিন্তু ভারি মিষ্টি।

অজিতের একখানা হাত, কোমল কচি আঙুলের বন্ধনে বন্দী করে তারপর বল্লে—এক্ষুনি চলুন, নইলে আমি ছাড়চিনে।'

শিশুমেয়ের নিঃসঙ্কোচ আবদার—অগত্যা তখনই যেতে হয়।

রাত্তির বেলায় পিসিমা অবশ্য বলেছিলেন, 'তোকে ওরা সকালে চায়ের নেমন্তন্ন করে গেছে, যাস্ অজিত।'

অনুমান করা সহজই ছিল,—তবুও যেন রহস্য মনে হয়।

সেদিনও অনেক কথাই হল,—প্রথমে আপ্যায়ন, তারপর আলাপ,—অন্তহীন যেন।

ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে।

অজিতের মনের আকর্ষণ মোহ হয়ে ফুটে, রক্তের প্রবাহও চঞ্চলতায় ভরে যায়!

একদিন কিন্তু যাবার দিনটি ঘনায়ে আসে,—আয়োজন সুরু হয়।

নিরিবিলি দেখা।

অলকা বল্লে, 'আবারও আসতে হবে কিন্তু। কথা দিয়ে যাও, আসবে?'

—হ্যাঁ, আসবো, সামনের ছুটিতেই যদি পারি।

ঘনিষ্ঠতা পরস্পরের সম্বোধনকে আপনার করে দিয়েছিল, কখন আপনা থেকেই।

প্রথমটায় অজিত চমকে উঠেছিল। তারপর কিন্তু গা' সওয়া হয়ে পড়েছে।

যাবার সময় স্নেহাতুরা পিসিমার আঁখি ছলছল করে ওঠে। অজিত প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করে বলে, 'আচ্ছা', যাই এখন।'

পিসিমা বাধা দিয়ে বলেন,—'ওকথা বলতে নেই অজু, বল্, আসি!'

অদূরে উঠানের এক প্রান্তে শাড়ীর আঁচল দেখা যায়,—মুখখানিই শুধু অস্পষ্ট। চোখের দৃষ্টিটুকু চেষ্টা করলে চোখে হয়তো পড়ে।

অতীতের স্মৃতি নিয়তই হাতছানি দেয় কিন্তু মনের বাসনা মনেই গুমট হয়ে থাকে, সে স্মৃতিটিকে আজ রূপে-রসে, সজীব করে তোলে না।

অজিতের চোখে ভাসে শুধু শ্যামলা সেই মেয়েটির স্নিগ্ধ স্নেহাতুরা মূর্ত্তিখানি,—অপরূপ লীলায়িত যৌবনের বর্ণে, গন্ধে।

মাসের পর মাস কেটে বছর ঘুরে গেল, অলকার অনুরোধটুকু রক্ষা করা অজিতের পক্ষে আর সম্ভব হল না। স্মৃতিটুকু শুধু তার সম্বল হয়ে রইল, যেন কালো মেঘের বুকে ঢাকা অদৃশ্যমান বিদ্যুৎ রেখা একটি। মাঝে মাঝে শুধু ঝলকিয়া ওঠে, তার বেশী নয় কিছু।

তারপর একদিন সমস্ত ভরসাই নিরাশা-তিমিরে পথহারা হয়ে গেল। অথই জলের বুকে ছিন্ন-মৃণাল পদ্মের মলিন প্রতিচ্ছবির মত তার মনের অতল স্মৃতি-সায়রে অলকার নামটি অস্পষ্ট হয়ে মিশে রইল ছন্নছাড়া।

অলকা যেন যৌবনের মোহ-মন্দিরে আরতি-হারা মৃন্ময় প্রতিমা একটি। অতীতের সেই অপরূপ-রূপা অপরাজিতা মানসী নয়, নিশুতি-স্বপ্নের অপরাজিতা অতিথিই শুধু, ক্ষণিকের জীবন-সঙ্গিনী।

কর্ত্তব্যের সহস্র আকর্ষণ, যৌবনের অনন্ত অভিযান, নিত্য নব রূপে গন্ধে, গানে। যে অলকার স্মৃতি অজিতের মনে অনাবিল হয়েছিল, আপনা থেকেই একদিন তা' অলীক হয়ে গেল।

যৌবন শুধু স্বপ্ন, যৌবনের সত্য শুধুই একটা মোহ।

তিনটি বছরও কেটে গেল।......

লণ্ডন।

হল বোর্ণ ষ্ট্রীটের 'ষ্টেপল ইন্' প্রাসাদের সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি বাঙ্গালী যুবক একাকী বসে সিগারেটের ধোঁয়ায় ভবিষ্যতের কল্পনার রূপ দেখছিল।—আকা বাঁকা ধোঁয়ার রাশটি যেন মূর্ত্তিমতী দেহলতা একটি।—সেই এডিস্ ভার্ড্রাইন; বিধাতার সৃষ্টিতে ওর চেয়ে বড় শ্রী নেই কোথাও। যুবক মোহাতুর, মদালস তার দুটি চোখ।

প্রথম দেখা হয় একদিন 'রাসেল স্কোয়ারে'র নিভৃত একটি কুঞ্জ বীথির পাশে লতায়িত মর্ম্মর বেদীতে।

সেদিনকার সন্ধ্যা সোনালী, আকাশ নীলাভ রক্তিম। আপেলের প্রস্ফুট পুষ্পে বাতাস আমোদিত হয়ে ছিল।

সেই থেকে পরিচয় সুরু। দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতাও যেমন বেড়ে গেছে তেমনি মনের মোহ-মদির আকর্ষণও।

সে কিন্তু অজিত। বাংলার তাতল বুক ছেড়ে সে আজ দুটি বছর লণ্ডনের এই স্নেহহীন পাষাণ আবরণে। তার চোখে, মুখে রূপের উচ্ছ্বলতা কোনদিনই কম ছিলনা, তারই ফলে তার কল্পনারও যেন অবধি নাই আজ।

নির্জ্জন, নিরালা কক্ষে এডিস্ তার সারা মনটি জুড়ে ছিল মদের নেশার উন্মত্ততা নিয়ে।

একটু পরেই দ্বার উন্মুক্ত হল। ভেতরে প্রবেশ করলো জনৈক পোর্টার।

তার হাতে একটি ফুলের কাস্কেট—তারই আচ্ছাদনে একখানি রঙিণ লিপি।

পোর্টার চলে গেলে অজিত তখনই লিপিটি খুলে ধরলে। মুহূর্ত্তের অপেক্ষাও যেন অসহনীয়।

আত্মহারা আনন্দে দুটি চোখ একই সঙ্গে নেচে উঠলো।

ছোট্ট দুটি কথা,—প্রিয়—আমার সারা দেহে আজ যৌবনের আকুলতা, রাত দশটায় রাসেল স্কোয়ারে দেখতে চাই তোমায়—এডিস্।

বাংলার বুকে তখন বসন্তের অপরূপ শ্রী।

কলকাতার নির্জ্জন প্রান্ত ভাগে একটি সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ী। তারই এক কক্ষে প্রৌঢ় জনৈক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইছিলেন।

অলস দুপুর।

আপনার স্ত্রীর হাতে সদ্যমুক্ত একখানি চিঠি দিয়ে প্রৌঢ়টি বল্লেন—'তোমার ছেলের চিঠি পড়ে দেখ!'

'কি লিখেছে অজিত? শুনি।'

'সে এখন দেশে ফিরবে না এবং কবে ফিরবে তারও ঠিক নেই। কিন্তু তাই শুধু কথা নয়, সে একটি মেমসাহেবকে ভালবেসে ফেলেছে, তাকেই সে বিয়ে করবে। সম্প্রতি হাজার দুই টাকা তার নেহাৎ-ই দরকার। এই নাও চিঠি।'

উৎকণ্ঠিতা মাতা চমকে উঠলেন। অস্ফুটকণ্ঠে যা' বল্লেন তাও শোনা গেল না তেমন।

মুহূর্ত্তকাল স্বামীর মুখের পানে চেয়ে তারপর জিজ্ঞাসু-নেত্রে বল্লেন—'এমন একটা কিছু যে হবে সে তো আমি আগেই বলেছিলাম কিন্তু ছেলের মর্জ্জি ও তোমার কর্ত্তব্যের ওপর হাত তো আমার কিছু ছিল না। তা' কি কর্ব্বে ভাবছো?

'লিখে দেবো টাকা পাঠাবার শক্তি আমার নেই। তোমার মা, বাবার বিনা অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবার

অভিরুচি যদি তোমার হয়ে থাকে তো তার সমস্ত দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে একা, সে সম্পর্কও আমরা স্বীকার কর্ব্বো না। পরের মাস থেকে টাকা পাঠাতেও আমার হাতে বাধবে এবং সে পার্ব্বোও না।'

অজিতের ক্ষুব্ধ পিতার কথা যখন শেষ হল তখন পুত্র-স্নেহ-সম্বলা মাতার দুটি চোখে অশ্রুর অস্থিরতা।

অজিতের অত বড় চিঠিখানি যেন মস্ত একটা অভিশাপ। দুটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হৃদয়ে দুশ্চিন্তার দুঃসহ দহন ছড়িয়ে গেল।

কিছুদিন পরে আরও একটা দুঃসংবাদ—অজিতের স্নেহাতুরা পিসিমার আকস্মিক, অকাল প্রয়াণ সামান্য অসুখেই......

অজিত তার স্নেহপ্রবণ পিতার কথাই ভাব্‌ছে শুধু। তিনি শিক্ষিত, উদার—পুত্রের হৃদয়ে আঘাত তিনি দিতে পারেন না, কখনই নয়। আর একটি মাস—পিতার অনুমতি সে পাবে, নিশ্চয়ই।

কিন্তু অতদিনও দিন গুণে প্রতীক্ষা করা হল না। একদিন চিঠি এল এডিসের, তার দেশের কারো নয়।

অজিতের চোখে ছোট্ট চিঠির প্রতিটি বর্ণ পর্য্যন্ত ঝাপসা মনে হ'ল। এডিসের চিঠি এ নয়, নয়তো সে দুষ্টুমি করে লিখেছে। সব তার ছল।

কিন্তু মিথ্যা সে সান্ত্বনা।

স্পষ্ট, রূঢ় সত্যের অর্থ ভরা সেই ক'টি লাইন,—ওতে যাদু নেই, ছলও নয়।

'প্রিয়'—এতদিন যা ভেবেছি, যত কিছু বলেছি, সব মিথ্যা তুমি আমায় ভুলে যেয়ো। তা'ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তোমাকে আমি কোন দিনই ভালো বাসি নি। তুমি পরদেশী, পরপদানত দুর্ভাগা যুবক,—এ মিলন অসম্ভব আমাদের। তোমায় অন্তর থেকে কখনই আমি চাইনি, তুমি যা বুঝেছো, সব ভুল। তার মূলে ছিল আমাদের যৌবনাতুর দেহের বিজাতীয় মোহ, রহস্য ভরা মনের ক্ষণিক চঞ্চলতা, রক্তের উগ্র আকর্ষণ। এর বেশি যা কিছু সব মিথ্যা।

আমি নিউজিলাণ্ড চলে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে দেখা আর হবে না। এই রূঢ় লিপির জন্য ক্ষমা করো।—এডিস্ জার্ডাইন।

বিমূঢ় অজিত নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইল।—অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস।

সেই সপ্তাহেই অজিত দেশে রওনা হয়ে গেল।

তিন মাস পর।

ভবানীপুরের একটা দ্বিতল কক্ষে অজিত একাকী।

সন্ধ্যা সহরের বুকে তখন জমাট হয়ে এসেছে কালবৈশাখীর নিশ্চল কালো কুশ্রী মেঘের মত। আকাশের গায়ে অগণ্য নক্ষত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি-শিখা।

অন্ধকার কক্ষে অজিত প্রহেলিকা ভরা তার এই ত্রিশ বছরের জীবনের অশান্ত চিন্তায় অবসন্ন।

পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করেছে, মাতার স্নেহ-উচ্ছল বুকে অসহায় শিশুর মত আত্ম সমর্পণ করেছে।

পিতা-মাতার মনে হয়তো আর ক্ষোভ নেই কিন্তু তার নিজের?

মা বলেছেন,—আসছে মাসেই তার বিয়ে দেবেন, সুন্দর, টুক্‌টুকে অনতি-যৌবনা কোন এক মেয়ের সঙ্গে।

সে আপত্তি করে নি।

পিসিমার শোক তাকে আরও বিহ্বল করে দিয়েছিল, —সেই কবে, আট, নয় বৎসর পূর্ব্বে শেষ দেখা,—তারপর আর নয়। সে অদৃষ্ট মানতো না, কিন্তু আজ মানে। সান্ত্বনার কোন পথই তার সম্মুখে খোলা নেই।

বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ের রাত্রে অজিত চমকে উঠেছিল,—ঐ কচি মুখখানি যেন তার চেনা। বাড়ী এসেও তাই মনে হয়েছে—রহস্য তাকে যেন নতুন করে দোলা দিয়ে গেল।

নবোঢ়া স্ত্রীর নাম বকুল। রূপসী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যশোভনা অপরূপ তরুণী। সবাই খুসী হয়েছে। পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলেই।

কিন্তু অজিতের মনে অনুশোচনার যেন অন্ত নাই।—বকুল তার জর্জ্জর জীবনকে যে আরও দুর্ব্বহ করে দিয়েছি।

বকুল অলকার মেয়ে বকু। সেই আট বছর আগে দেখা আট বছরের শিশু মেয়েটি।—সে জানতোও না যে অলকা আর বেঁচে নেই।

হায় রে অদৃষ্ট!



ঘরে বাইরে

—শ্রীগ্রহাচার্য্য

অতি আধুনিক কথাটার অর্থ লইয়া বাদ বিসম্বাদ চলিতেছে যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তর্কটা নিরর্থক।

শ্লীলতা কিম্বা অশ্লীলতা, প্রাদেশিকতা, অথবা এমন কোনও লেখার ধরণ-সম্বন্ধীয় বিশেষত্বের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কিছু নাই। ধূপছায়া, কল্লোল অথবা প্রগতির ছাপ মারা থাকিলেই অতি আধুনিকের পর্য্যায়ে পড়িল, অথবা কয়েক জন বিশিষ্ট লেখকের অনুকরণে যাঁরা লেখেন তাঁরাই শুধু ঐ বিশেষণটার গৌরব দাবী করিবেন এমন কোন কথা হইতে পারে না।

সাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে অতি আধুনিকের সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটার মধ্যেই তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ এবং চিন্তার ধারার বাইরে ইহার অর্থ খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

লেখকের বয়স অথবা লেখার ধরণের মধ্যে অতি আধুনিকত্বের কোনও প্রমাণ বা যুক্তি নির্ভর করে না।

যে লেখার ভিতরে যুগধর্মের প্রভাব পূর্ণভাবে ফুটিতে দেখি, বর্ত্তমান সমাজ এবং সভ্যতার রূপটুকুই যাহার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে কেবল তাহাকেই আমরা অতি আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিব।—সে লেখার লেখক তরুণ হোন বা বৃদ্ধ হোন, সে খোঁজে আমাদের দরকার নেই।

হাজার বছর আগে সমাজে যে আদর্শ ছিল, আজ যদি মানুষ তা না স্বীকার করে, আমাদের সাহিত্যেও আমরা বর্ত্তমান আদর্শটাকেই বড় বলিয়া মানিব।

পুরাতনকে না মানার নাম বিদ্রোহ নয় কিছুতেই।

দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী দোষের ছিল না, কুন্তীদেবীর পুত্রদের জন্ম-ইতিহাসের কাহিনীটা আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত মনে করিবার কারণও নেই, শুধু তাই নয়, অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী মন্দোদরী এঁরাই ছিলেন পঞ্চ মহাসতী। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এক পুরুষের একশোটা বিবাহও লোকে সহ্য করিত এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় স্ত্রীকেও সহমরণে

যাওয়া গৌরবের কথা বলিয়াই সকলে সমর্থন করিত। আজ যদি যুগধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া পুরাতনের ঐ সব আদর্শকেই ভালো বলিয়া সাহিত্যের মারফত প্রচার করিতে চেষ্টা করি কেহই কি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন?

দিনে দিনে মনের ধারণা ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

বিবাহের বন্ধনটাকেই মানুষ সব সময়ে বড় বলিয়া মানে না। বিবাহের চেয়ে বড় স্নেহ এবং মমতার বন্ধনে বাঁধা পড়াটাই যদি কেহ জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করে আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না। কেবল মাত্র স্বামীত্বের অধিকারের দাবীতে স্ত্রীর দেহটীকে হয়তো বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে মনের উচ্ছ্বাস বা উৎশৃঙ্খলতা কেমন করিয়া রোধ করিবে? এমনি চলিবার পথে প্রতি পদক্ষেপে আজ আমরা প্রতি মানুষকেই মুক্তি দিতে চাই যদি,—তাতে হয়তো ইষ্ট বা অনিষ্ট অনেক কিছুই ঘটিতে পারে, তথাপি সেইটাই জীবনের লক্ষণ। ন্যায় নীতি এবং রুচির আদর্শ বাঁধা ধরা নিয়মে যদি চলিত, নড়িবার শক্তি রহিত হইয়া মানুষ আপনা হতেই মৃত্যুর মাঝে নির্ব্বাণ লাভ করিত। সজীব বা চেতন বলিয়া কেহ অবশিষ্ট থাকিত না জগতে—সবাই পাথর এবং মাটির মত জড়ত্ব লাভ করিয়াই হয়তো বা অমরাপুরীর স্বপ্নে বিভোর হইত।

বস্তির চিত্র আঁকা, অসহায় পতিতা সমস্যা লইয়া মাথা ঘামান উচিত না, গরীব দুঃখী এবং মুটে মজুরের ব্যথা বেদনার ছবি অহৈতুক—এমনি বিধি নিষেধের মানেই হয় না।

ব্যারিষ্টার দত্ত সাহেবের সংসারের সম্পূর্ণ চিত্রটীর ও সাহিত্যের দরবারে প্রবেশের যতটুকু অধিকার আছে পতিত এবং দুঃখীর ও তেমনি।

কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ যদি কেহ এই হতভাগাদের অন্তরের রুদ্ধ হাহাকারটী নিজের প্রাণে অনুভব করিয়া প্রকাশ করিতে আসেন অমনি চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে,—সমাজ রসাতলে গেল, পাঁচটা অকাল পক্ক ছেলে মিলে বিদ্রোহ করিয়াছে, তাহাদেরই আঘাতে পৃথিবীর আয়ু নিঃশেষ হইবে। উহাদের হাত হইতে পলাইয়া কেমন করিয়াই বা আত্মরক্ষা করা যায়?

সমস্যার কথাই বটে!

কাগজের পাতায় লেখাটই সব চেয়ে বড় অপরাধ হইল, এবং ইহার ভয়েই সমাজ ভাঙিবার আশঙ্কা। কিন্তু চোখের সামনে ঘরের দুয়ার হইতে ঐ বিরুদ্ধ বন্যাটীকে প্রতিরোধ করিবার কি উপায় করিয়াছি?

আত্মরক্ষার পথ ঝড় এবং বন্যার সামনে পরাজয় মানিয়া পলায়ন করা নয়। নিজেদের সবল করিয়া গড়িয়া বিরোধী তরঙ্গ জয় করিতে শিখিতে হইবে।

ক্রমাগত পলাইয়া বাঁচিবার পথ খুঁজিতে চাহিলে, প্রাণ বাঁচানো দায় হইয়া পড়েই।

অতি আধুনিকদের সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা আর একটা কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই,—এঁরা শুধু যে দুঃখের কবি, তা নন। এঁরা আনন্দকেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন।

মৃত্যুর আর্ত্তনাদটা এঁদের কাছে যেমন সত্যি জীবনের জয়োল্লাসটাও তেমনি।

এঁরা শুধু রোগাতুর ও ব্যথিতের অন্তর বেদনাটাকেই সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিয়া আঁকিতে চান না—চির

দরিদ্রেরও বুকে মা বৌ এবং সন্তানের প্রতি অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝর প্রবাহিত হয় এবং তাহারই উপলব্ধিতে সে আপনাকে রাজার চেয়েও সুখী মনে করে।

সাহিত্যের বাজারে ফাঁকিও যে চলিতেছে না তা নয়, অভিযোগটা রূঢ় এবং অপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু সত্যি।

অনেক লেখক আছেন, তাঁহারা গোলে হরিবোলে গোঁজামিল দিয়া যখন যে দল ভারী সেই দিকে ভিড়েন।

ইহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি থাকিতে পারে?

ফাঁকি দিতে বসিয়া কেহ কেহ শুধু শব্দ এবং ভাব চুরি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে আর্ট অভিজাত সাহিত্য ইত্যাদি অনেক কথার আজগুবি অর্থ প্রবর্ত্তন করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছেন। এই কথাগুলি শুনিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু এঁদের এই সাহিত্যের গণ্ডীটা মুখে যতই বলুন না কেন, ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

সাহিত্য বলিতে অনেকে বোঝেন গল্প এবং কবিতা, বৈদেশিক সাহিত্যের সামান্য পরিচয়, দুই চারিটী বড় বড় গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের রচনা লইয়া সমালোচনা নামক প্রবন্ধ—এই টুকুই।

ফুটবল খেলার বিবরণ অথবা আইন আদালতের ঝগড়া যেমন সংবাদ পত্রেরই নিজস্ব,—বেদবেদান্তের আলোচনাটাও তেমনি চক্রবর্ত্তীদের চণ্ডীমণ্ডপে সীমাবদ্ধ থাকুক, এই তাঁদের মত। স্বাস্থ্য, কিম্বা কৃষি ও বাণিজ্য লইয়া প্রবন্ধও সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ একদিন সাহিত্যের সীমানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নরেশচন্দ্রকে কতই নাকাল হইতে হইয়াছে। কোন কোন বিষয়বস্তু সাহিত্যের পর্য্যায়-ভুক্ত হইবে, কোন গুলাই বা বাতিল এ আলোচনার শেষ মীমাংসা হওয়া অসম্ভব; তর্ক চিরদিনই চলিবে।

যে লেখার মধ্যে মনস্তত্ত্বের ছড়াছড়ি থাকিবে কিন্তু বিষয়-বস্তুর একেবারেই অভাব সেইটার বড় দরের সাহিত্য। —তা সে গল্প কবিতা অথবা অন্তঃসারহীন প্রবন্ধ যাহাই হোক না কেন!

অর্থাৎ যিনি যতটা বেশী ফাঁকি দিতে পারিবেন তিনিই তত বড় সাহিত্যিক।

প্রবন্ধ লেখার রেওয়াজ আজকাল একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। কিছু না পড়িয়া অথবা জানিয়াও গল্প এবং কবিতা লেখা চলে, প্রবন্ধ লিখিতে হইলে তেমনি কতক-গুলা রাশিয়ান ও ফ্রেঞ্চ নভেলের নাম জানা থাকিলেই—আর কিছু ভাবনা নাই। লাইব্রেরীর ক্যাটলগ দেখিয়া লইলেই চলিবে। সম্পূর্ণ বই পড়িবার আবশ্যকতা কিছু নাই। তথাপি এইটুকু পরিশ্রমই বা করে কে?

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধের মত জিনিষের স্থান আর আজকাল আমাদের সাহিত্যে নাই। কেন না, উহা যেমন লিখিতে তেমনি পড়িতে এবং ততোধিক বুঝিতে রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই অসাহিত্যিক হইয়াই তিনি মহা-প্রস্থান করিলেন, আধুনিক কোনও সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁহার তর্পণে কাহারও ভক্তি অশ্রু দেখা দিল না।

বীরবলের লেখার মধ্যেও পাণ্ডিত্য আছে অনেকখানি, শিক্ষার জিনিষও আছে যথেষ্ট,—কাজেই ফাঁকি দিতে পারেন নাই বলিয়া তিনিও সাহিত্যিক হইতে পারিলেন না। (দ্রষ্টব্য—শনিবারের চিঠি, বৈশাখ)।

গল্প উপন্যাস লিখিতে হইলে নায়ক নায়িকা এমন হওয়া চাই যাহারা কল্পনায় হাসিবে, কাঁদিবে, নাচিবে, গাহিবে—সর্ব্বদাই চোখে মুখে (Sentimentalism) ভাব-প্রবণতার ছোঁয়াচ লাগিয়া থাকিবে। সবিস্তার বর্ণনার কিছু দরকার নাই। নায়কমাত্রই প্রেমের জলে হাবুডুবু খাইবেন এবং নায়িকা দিনে আটবার স্বপ্ন দেখিবেন। এই হইলেই যথেষ্ট। পতিতা মাত্রেরই বুকের কোণে অনাদি ক্ষুধার অনন্ত স্বপন জাগে। পটলডাঙ্গার ধোঁয়ার

দলের চুণোপুঁটিটি পর্য্যন্ত প্রেমিকার আদর্শ, মাঝে মাঝে মুখ বদলানর মত সন্তান বুকে করিবার আকাঙ্খাটাও বিরাট হইয়া দেখা দেয়,—যেন, মা হইতে পারিলেই তাহারা ধন্য হইয়া যাইবে এবং নিজেদের নোংরামি ভুলিবে! পাড়ার লোকেদের চোখে যে সবাকার রক্ষিতা তাহার মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিতে এত পাণ্ডিত্য দেখানো হইয়াছে, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর তাঁহার স্বরচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে ঐ রচনাটী একত্র করিয়া ছাপাইয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধা হয় যথেষ্ট। গল্প হিসাবেও ও জিনিষটি হীরার টুকরো।

মনস্তত্ব বাদ দিয়া বিষয় বস্তু দেখিতে হইলে আধুনিক সাহিত্যিক বলুন অথবা পুরাণো পাণ্ডাদের কথাই বলুন—অনেকেই শ্রীহীন হইয়া পড়েন। তখন গল্পলহরী-সম্পাদক এবং তাঁহারই কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গকে শ্রেষ্ট সাহিত্যিক বলিয়া মনে হইবে। কেন না, এঁদের লেখায় শুধু মনস্তত্ব নয়, অনেক কিছুই থাকে! ঘটনার পর ঘটনা, ডাকাতের লড়াই, ভূতের নৃত্য, ডিটেক্‌টিভের বাহাদুরী, সয়তানের চালাকি—শুধু এই সবই থাকে।

কিন্তু অনেকে যে ফাঁকি দিতে পারিলে সুযোগ ছাড়েন নাই তাহার প্রমাণ অনেক আছে। তা নইলে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর তুলনা নাই তাঁকেও কত সময়ে নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ছদ্মনামের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তাঁহারাই যদি এ রকম হীনতা (?) স্বীকার করিয়া থাকেন, কেতকীর হাটে মোহিতলাল নিজেকে নিজেই র‍্যাফেলের সমকক্ষ বলিয়া জাহির করিয়া এমন কিই বা অপরাধ করিয়াছেন, বুদ্ধদেবও চৈত্রের প্রগতিতে নিজের লেখার প্রবন্ধের সম্বন্ধে বিস্তারিত ইঙ্গিত করিয়া মাসিকীতে নিজের ঢাক নিজে পিটিয়াছেন সেটাও লজ্জার বিষয় নয়। অপরে যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া ঢাক পিটিয়া সাহায্য করিতে না আসে সেটা তো আর লেখকের দোষ নয়। দোষ তাহাদের যাহারা প্রতিভার সন্মান বোঝে না।

কবিতা এবং গানে বর্ত্তমানে যে ফাঁকি চলিতেছে সেইটাই সবচেয়ে বাহাদুরীর কথা। যে কোনও মাসিক পত্রিকার পাতা খুলুন,—দেখিবেন প্রত্যেক কবিতাতে মাত্র একই সুর বাজে।—হাহুতাশ, কাঁদুনি, এবং তোমায় ভালবাসি।

বনের পাখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি তুমি আমার প্রিয়ারে দেখেছ কি? প্রিয়াকে সোণার মেয়ে অথবা মায়াবী এমনি দু একটা বিশেষণ দিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকি, এবং বলি তুমি যখন আমারি মত একা রয়েছো, আমার অতিথি হতে তোমার কিই বা বাধা?—এমনি কয়েকটা ফাঁকা পঙ্‌ক্তি সাজাইয়া কবিতার বড়াই করি। কিন্তু মেকী কবিত্ব কতদিন টেঁকিবে কে জানে!

সত্যেন্দ্র দত্ত অক্ষয় বড়ালের কথা ছাড়িয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যিকার কবি চিনিয়া লইতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। মাঝে মাঝে যতীন সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, অচিন্ত্য, নজরুল, সৌরীন চটোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেবের দু-একটা কবিতার মধ্যে কিছু কিছু কবিপ্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাই। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র ওঁদের লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে।—কিন্তু সে কতটুকু মাত্র? বৌদ্ধ এবং পালি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে গাথা সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সব কবিতা লিখিয়াছিলেন কাব্যের ওদিকটা কি একেবারেই চাপা পড়িয়া গেল? দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য,—ও জিনিষ কি আর কাহারও কলমে বার হয় না? কাহিনীর মধ্যে কর্ণ কুন্তী সংবাদটী পড়ি,—ওরকম ভাব সম্পদের সমকক্ষ জিনিষ কি আর কোন কবিই লিখিতে পারেন না? মোহিতলাল একরূপে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন সদর্পে, আর একরূপে কবিতা যে কত অশ্লীল লেখা যায় নিজের সঙ্গেই নিজে প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিতেছেন, ওঁর শক্তি কি ঐটুকুতেই পর্য্যাপ্ত? অচিন্ত্য কি ভাবিতেছেন মরীচিকা

ছুড়ে প্রিয়ার উদ্দেশে ছুঁফোঁটা ব্যর্থ চোখের জল ফেলা ছাড়া তাঁর আর কোনও শক্তি নাই ? পূরবীর যে কোনও কবিতার সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াইতে পারে এমন কবিতা আর কাহারও হাতে বাহির হইল না, আমাদের এ আপশোষের জায়গা নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতেও আর বাহির হয় না, আজ কাল তিনি কেবল গোলে হরি বোলে গোঁজামিল দিয়াই চালাইতেছেন, কিন্তু এটাও তো ভাবিবার কথা, একজনের কাছে আমরা কতখানি আশা করিতে পারি ?—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার আছে, শনিবারের চিঠির আরাধ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অভিমান দেখাইবার অনেক কথাই ছিল কিন্তু একথাতো ভুলিয়াও অস্বীকার করিতে পারি না পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয়। আজ আবার রবীন্দ্রনাথেরই আশীর্ব্বাদে সঞ্জীবিত শনিবারের চিঠিতে তাঁহার নিজেরই ধূলালুন্ঠিত ব্যঙ্গ ছবি দেখিয়া চোখে জল আসাও বন্ধ হয় না।

যতীন সেন, মোহিতলাল, অচিন্ত্য, প্রেমেন, সৌরীন বুদ্ধদেব প্রভৃতি, আধুনিক যুগের কবিযশঃ প্রার্থী সকলেই ফাঁকি দিয়া কাব্য সাহিত্যের শুধু একটা অথবা আর একটা অংশের প্রতিকৃতি আঁকিয়াই নাম করিতে চান,—কিন্তু এরকম আশা করাটা ধৃষ্টতার নামান্তর। শুধু ফাঁকি দেওয়াটাই যদি সাহিত্য হয়, না হয় তাঁহারা সাহিত্য নাই লিখিলেন! আমরা ওঁদের প্রত্যেকের কাছেই অনেক কিছু আশা করি। সেণ্টিমেণ্টাল কবিতা বাদ দিয়া কাব্য সাহিত্যের অপরাপর ধারাগুলির উৎসও খুলিয়া দিন, এই আমাদের সবিনীত প্রার্থনা।

সওদা—

—শ্রীউপগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য যে দেশের কত অপকার কর্‌ছে নীচের দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে।

পাণিবাগানের কাছাকাছি এক পণ্ডিত থাকেন,—রাস্তার মোড় থেকে খামে-মোড়া ফরাসী ছবি কেনেন, ইনি ফরাসীর ও ফরাসের বড় ভক্ত। তাঁর কোন আত্মীয় আধুনিক সাহিত্যের একখানি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সম্প্রতি সেই অশ্লীল সাহিত্য পড়ে' পড়ে' তিনি নাকি খারাপ হ'য়ে গেছেন বলে' পণ্ডিত শোক কর্‌ছেন। কি করে খারাপ হয়েছেন তা' বল্‌তে অবশ্যি পণ্ডিতবরের লজ্জা বোধ হয়েছে। পণ্ডিতবর নাকি পাঠকটিকে শাসাতে গিয়ে কান মলা খেয়েছিলেন এবং তাঁর গোঁফজোড়া নির্ম্মূল হয়ে গেছে। আত্মীয়টির ভবিষ্যত চিন্তা করে' পণ্ডিতজির ঘুম হয় না, খিদেও পায় না।

এক বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে ওষুধ বাৎলে দিয়েছেন। বলেন, "তোমার ভাইকে ঐ পত্রিকার বদলে তোমাদের 'শনিবারের চিঠির' গ্রাহক হ'তে বলো, ঐ পত্রিকায় আর ক'টাই বা অশ্লীল লাইন থাকতে পারে, তার চেয়ে এটি পড়, —প্রতি পাতায় পাতায় পাবে 'সীৎকারের হিয়া' 'হালে প্রেম' 'শিশ্ন' প্রভৃতি। দামেও সস্তা. অবতারের পরেই।"

তাই করা হয়েছে। পাঠকটি আজকাল শনিবারের

চিঠিই মন দিয়ে পড়েন,—তাঁর নীতিজ্ঞানের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে। তিনি বাড়ি থেকে আর বেরোন্ না, শুধু শনিবার মধ্য রাত্রে একবার মাত্র তাঁর সজনীর উদ্দেশে বহির্গত হন্!

অতি-আধুনিক সমালোচকদের সাফাই—

কেউ বলেন, "আমরা উকিল। আমরা তর্ক করে' যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাই যে, আজকালকার সাহিত্যটা কিছুই নয়।"

কিছুই যদি না হয়, তবে তর্ক করিয়ে বোঝাবার সার্থকতা কি?

আর এক দল বলেন, "আমরা ডাক্তার। এই সাহিত্যের মূলে কি ব্যাধি বর্ত্তমান, আমরা তাই নিরূপণ করে' দেখাই।"

এঁরা আবার ব্যাধির ওষুধও দেন। বলেন,—"এই সব সাহিত্যিকের বিয়ে করা উচিত।"

মনে হয় এই সমালোচকেরা সবাই হয়তো কন্যাদায়-গ্রস্ত। এবং তাঁদের কন্যারা সবাই হয়তো সাহিত্যরসিকা!

আবার কেউ কেউ বলেন, "আমরা সমাজ হিতৈষী। এই সাহিত্য সমাজের বহু অনিষ্ট করছে।"

তার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দেন যে অমুকের বৌ এই সাহিত্য পড়ে' বেরিয়ে গেছে, অমুকের ভাই সিটিকলেজ ছেড়েছে, অমুকের বোন্ ভালোবেসে, না পেয়ে কেরোসিন জ্বালিয়ে পুড়ে মরেছে।

সব শেষে একদল বলেন, "আমরা কুকুর। খাওয়া জোটে না তাই পাত চেটে বেড়াই আর ঘেউ ঘেউ করি।"

এরা আর যাই হোক্ ভণ্ড নয়।

'প্রবাসীর' সম্পাদক ধর্ম্মের ধ্বজা কাঁধে নিয়ে বেড়ান,—এম্নি একটা সস্তা বড়াই করতেন, যদিও গান্ধি চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষের ওপর তাঁর শ্লেষ নিন্দা ও ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। তিনি একজন পরম নীতিবাগীশ, এ গৌরবও তাঁর আছে যদিও চড়ুই পাখীর বিজ্ঞাপন ও লালন শা'র "ছুন্নৎ-দেওয়া" গান তাঁর কাগজেই বেরিয়েছিল।

'রমণী,' 'শুক্রবার,' প্রভৃতি শব্দ তিনি উচ্চারণ করেন না, কারণ তাঁর নীতিজ্ঞানে আঘাত লাগে। অথচ যে কাগজে "শিশ্ন" ও "সীৎকার" ছাপা হয় সেই কাগজকে অবলম্বন করে' তিনি লাট সাহেবকে হুমকি শোনান্ সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভণ্ডামির এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নি।

কালিকলমের ব্রাহ্মস্পর্শের যোগটা ভাংভেবেই কেটে গেছে,—এবার দেখা যাক্—গঙ্গাস্নানের ফল কতখানি।

পুস্তক পরিচয়

অমিয় :—শ্রীতমাললতা বসু প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত; মূল্য পাঁচসিকা। কয়েকটী গল্পের সমষ্টি। সব কয়টী গল্পই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া অবিশ্বাসী ও পরাজিত গল্প দুইটাই আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে, যদিও প্রত্যেক রচনাই পাঠক সাধারণকে পরিতুষ্ট করিবে নিঃসন্দেহ! লেখায় করুণ রস এবং হাসির ফোয়ারা দুইই আছে। লেখিকা বইখানি উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার পরলোকগত একমাত্র পুত্রের উদ্দেশে। পুত্রহারা মায়ের মনের হাহাকার এবং তারই সঙ্গে ভগবানে আত্মসমর্পণ জনিত পরিতৃপ্তি দুইটী জিনিষই অলক্ষ্যে সকল গল্পের মধ্যেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। শ্লীলতা অশ্লীলতার দ্বন্দ্ব নাই, বড় বড় সমাজ সমস্যা অর্থনীতি লইয়া বিচার বিভ্রাট নাই, সাধারণ ঘরোয়া কথা অতি সাধারণ ভাবেই বলা। পুত্র কন্যা এবং স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে উপহার দেওয়া চলে।

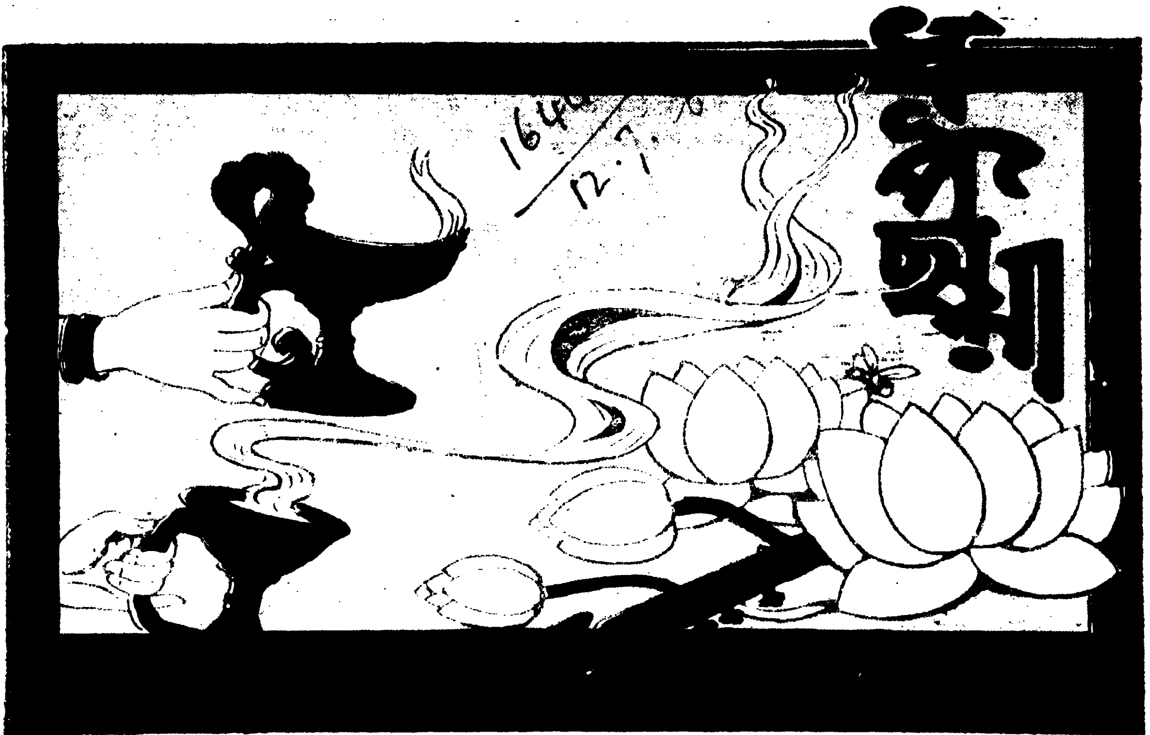
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

বর্ত্তমান বৎসরে
কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য
আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগটাই
কেবল ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের
আফিসে রহিল,

তা ছাড়া
লেখা পত্র, অন্যান্য চিঠি এবং গ্রাহক
মূল্যাদি পাঠাবেন
আমাদের প্রধান কার্য্যালয়
৭৯।২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা
এই ঠিকানায়।

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।



সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শ্রীঅরিন্দম বসু।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

বার্ষিক ।৵০ আনা।

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়া

সম্পাদক—

শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি,

শ্রীঅরিন্দম বসু।

আষাঢ়, ১৩৩৫

দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।



হে ধরণী বক্ষে তব

—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত।

হে ধরণী, বক্ষে তব লক্ষ লক্ষ মূর্খ মানবক
বিচরিছে নিত্য মোর চারিপাশে নির্ব্বোধ আরামে।
বোঝেনি তোমারে কেহ, দম্ভের দু'পণ কড়ি দামে
কিনিয়াছে মূঢ় সুখ, জানে নাই তব চিত্তলোক।

আমারেও দম্ভীনর বোঝে নাই; তা'রা মোর চোখ
হেরিয়াছে বহ্নিদীপ্ত, বোঝেনিক সে কৃশানুধামে
গুপ্ত কত মুক্তা মণি, রজনীর দীর্ঘ চারিযামে
দেখেছে তমিস্রা শুধু, দেখে নাই তোমার অলক।

হে ধরণী, তুমি জানো মোর চিত্ত, তুমি জানো মোরে,
আমি শুনিয়াছি তব হৃদয়ের নিগূঢ় স্পন্দন।
আমি সুখী। তবু হায় মূর্খ নর শূন্য দম্ভ ঘোরে
তব রূপ করে হেলা ঘৃণা করে আমার জীবন!
মূর্খ ওরা সুখী থাক্ আমাদের অবহেলা করে'
আমি শুধু তব সনে প্রাণ রস করিব ভুঞ্জন॥

বিসর্জ্জন

—শ্রীচুনীলাল মুখার্জ্জী

ফটোগ্রাফের স্বচ্ছ নিগেটিবে যে প্রচ্ছন্ন রূপটি আলোর ক্ষীণ রেখা স্পর্শে অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে একদিন নিঃশেষে মুছিয়া যায়, হয় তো তারই মত মানুষের মনের রূপটি,—চিরন্তনী তাকে বলা চলে না। একথার পর হয়তো তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা এই গল্পের বিষয়ীভূত নয়।

একমাত্র মেয়ে হইলেও নলিনীর বয়স হইয়াছিল, তার মতামতের অগোচরে তারই বিবাহ সুস্থির করা পিতা মিঃ সেনের কাছেও যেমন অনভিপ্রেত, মাতা নির্ম্মলা দেবীর কাছেও তাই।

কিন্তু অতি আদরের একটি মাত্র মেয়ে, মায়ের বুকে অনন্ত সাধ, আশা। ভাবেন, ওকে যেন সুখী দেখে যেতে পারি, ঠিক আমারই মত।

সন্ধ্যা তখনও ঘোর হয় নাই, একদিন নিরালায় সম্মুখের রকে বসিয়া মা ডাকিলেন,—নলিন, কাছে আয়, শোন্—

উচ্ছল যৌবন-চঞ্চলা সোহাগী মেয়ের মত নয়; যে তরুণীটি ধীর পদক্ষেপে কাছে আসিয়া মায়ের আঁচল ঘেসিয়া বসিল, মুখে তার অন্তরের রূপদীপ্তি, ছুটি চোখে প্রতিভার ছায়া নিবিড়তা। অলস গতি ভঙ্গী কিন্তু হাল্কা নয়, অপূর্ব্ব দৃঢ়তার। ষোড়শী বলা চলে না, অনেকটা বেশিই যেন।

বলিল, 'কি মা, বল না?'

'বলি, শোন্। খুবই দরকারী কথা কিন্তু, অবিশ্যি বলতে তোকে বাধে না, এখন বড় হয়েচিস্, লেখা পড়াও শিখেচিস্,—নিজেই ভাবতে পার্ব্বি।'

'কেন মা, বিয়ের কথা তুলবে বুঝি?' মায়ের আঁচলের প্রান্তটি আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে মৃদুস্বরে বলিল, 'বেশ তো বল না?'

উনিও বলছিলেন, বিয়ে যখন একদিন দিতেই হবে, রমেনের মত এমন ছেলে যখন হাতে আছে, তখন নলিনের যদি মত হয়—'

'না মা, আমার ক্ষমা করো, সে কোনদিনই হবে না।'

মায়ের স্নেহার্ত্ত বুকে কি যেন একটা কঠিন স্পর্শ বাজে। উৎকন্ঠিত স্বরে বলেন, 'সে কি রে নলিন?'

'আচ্ছা মা, বিয়েটাই কি জীবনের সর্ব্বস্ব, তার কি আর কোন দিকই বড় হয়ে থাকতে নেই? কিন্তু সে কথা থাক্। আমার আজ একটা সব চেয়ে বড় কথা বলবার আছে, বিয়ে আমি করতে পার্ব্ব না মা, আমি একজনকে কথা দিয়েছি।'

মেয়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া মায়ের মনে যেন বিস্ময় খেলে। অন্ধকারে নলিনীর মুখটি সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট তার ছুটি চোখের ভাষা। বলে, 'তোমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে না মা? সত্যিই বলছি,—বিমলদাকে আমি কথা দিয়েছি, আর কিছু আমায় জিজ্ঞেস করো না। আমি জানি অন্ততঃ তুমি আমাকে ঠিকই বুঝতে পার্ব্বে।'

নিঃশব্দে নলিনী উঠিয়া যায়।

মায়ের ইচ্ছা হয়, চীৎকার করিয়া বলেন, ওরে নলিন, ওরে সর্ব্বনাশি, আমি যে কোনদিনই তোকে ঠিক বুঝতে পার্ব্বো না। এত বড় অসম্ভবকে তুই অত বড় করে ভাবিস্‌নে। আমি যে তোর মা, সংসারের পরিচয় যে তোর চেয়ে আমার অনেক বেশি।'

মায়ের বুক ছিঁড়িয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়, মুখে একটি কথাও ফোটে না।

বিমল মিঃ সেনের সম্পর্কিত আত্মীয় কিন্তু খুব নিকট

নয়। ঐ সংসারেই সে বড় হইয়াছে, আপনার বলিতে তাহার আর কেহই নাই। তাহাদেরই সহানুভূতিতে শিক্ষা পাইয়াছে, মানুষ হইয়াছে। কিন্তু তাহার বেশি নয়,—অর্থ, সুযশ, সম্মান কিছুই তাহার ছিল না। নলিনীর কাছে সে যাহা পাইয়াছে তাহার তুলনা হয় না, যাহা সে দিয়াছে তাহারও অন্তঃ নাই।

মায়ের মন কিন্তু উৎকণ্ঠায় উদ্বেল,—কেন এমন হইল? কোথায় ইহার পরিণাম?

নলিনীকে কত বুঝাইলেন, কত উপদেশ, সান্ত্বনা কিন্তু মেয়ের মুখে ঐ এক কথা। বলে, মা গো, মনের একান্তে যে জিনিষের ছায়া, তার রূপটি যে মুখে প্রকাশ হয় না। কি করে বলবো বিমলদার কথা? তুমি যে মা, তুমি যে আমারই মত একটি মেয়ে,—আমি পার্বো না মা, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমাকে থাকতে দাও এম্‌নিই, একলাটি।

মায়ের ক্ষুব্ধ বেদনার ইতিহাস, সে যে কি, তাহা শুধু জানিতে পারিল তাহার দুটি চোখ, আর আঁচলের প্রান্তটি।

মিঃ সেনও শুনিলেন। একদিন গম্ভীর মুখে বিমলকে ডাকিয়া কি বলিলেন, তাহার ফলাফল তখন কিছুই স্পষ্ট হইল না, কিন্তু একদিন সহসাই দেখা গেল বিমল নিরুদ্দেশ।

নলিনীর বাহিরের রূপ দেখিয়া কিছুই মনে হইল না। তবুও মায়ের দুটি চোখ থেকে গোপনে অশ্রুর উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। দেবতার কাছে সহস্রবার প্রার্থনা জানাইলেন, 'ওগো, এটুকুই যেন নলিনীর জীবনের অতি বড় সত্য হয়ে না থাকে।'

কিন্তু আর একদিকে সকলের চোখের অন্তরালে নলিনী তখন বিমলের শেষ চিঠিখানির উপরই মাথা কুটিয়া বলিতেছিল, 'ওগো, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, এর চেয়ে বড় সত্য যে এ জীবনে আর কিছুই নেই! ওগো প্রিয়তম, ওগো দয়িত, আমার সে মর্য্যাদাকে তুমি ম্লান করো না।'

মা বলেন, 'নলিন্, মা আমার, তুই ছাড়া যে আমাদের আর কেউই নেই! আমাদের কথা একটিবারও কি তুই ভাব্‌বি নে?'

বাবা বলেন, নলিনি, ছেলে মানুষী করো না। আমার মর্য্যাদা কি তুমি রাখতে চাও না? ও সব তুচ্ছ জিনিষ, আমার কথা শোন, সব ভুলে যাও। তোমার মায়ের মত যখন ছেলের মা হবে, বুঝ্‌বে, কত বড় ভুল তোমার হতে বসেছিল।'

নত-নয়না কন্যা নীরবে শুধু জানায়, 'বেশ তো, তোমাদের যা' খুসী, আমি তো বলছি নে। কিন্তু রমেনবাবু তো একথা শুনেছেন, তার মতটাও ভালো করে হয়তো—'

'সে হবে, সে চিন্তা আমার।'

স্ত্রীর পানে কটাক্ষ ইঙ্গিত করিয়া মিঃ সেন বাহির হইয়া যান। সেদিনকার মত ঐখানেই ইতি পড়ে।

মায়ের মন অনাগত শান্তির জন্য খুসীতে ভরিয়া উঠে। মনে মনে ভাবেন,—নলিনীর শিক্ষা আজ সার্থক। মোহকে সে বড় করিয়া দেখে নাই।

বিবাহ হইয়া যায়।

নলিনী মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কাউকে বলে নি। সত্য কে যে দুঃখ দিয়া হৃদয়ে বরণ করিল, তাহার কাহিনী আত্মীয় স্বজন কেহই জানিল না। সে যেন কলের পুতুল।

নীরব নিশুতি। নবোঢ়া স্ত্রীর প্রতীক্ষায় রমেন তখনও সজাগ। পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়া অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের এক ঝলক আলো ক্ষণিক অতিথির মত বাতায়ন পথে আসিয়া কক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

রমেন উন্মনা, তাহার চোখে যেন মোহ মরীচিকা।

সহসা মৃদু পদশব্দে সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কে নলিনী ?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'এসো, অনেকটা রাত হয়েছে, না ?'

নলিনী তাহার উত্তর দিল না। মুহূর্ত্ত খানিক মৌন থাকিয়া সহসা কেমন একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, আশা করি শুনবেন।'

'কি কথা নলিন ?

'আপনি হয়তো শুনেছেন কতকটা বাবার কাছে ! আমি বিমলদার কথা বলতে চাই, শুনবেন কি ?'

'বল, কিন্তু সে প্রয়োজন হয়তো হবে না। আমি ও সব বিশ্বাস করিনে, মিথ্যা মনে হয়। সে জন্য তোমার যদি অনুতাপ হয়ে থাকে সত্যি করেই, তবে মনে করো সে কথা বড় একটুও নয় আমার কাছে।'

'কিন্তু আপনি ভুল বুঝছেন,—অনুতাপ আমার একটুও নেই। সে কথা আমার জীবনে সব চেয়ে বড় বলেই আপনাকে বলতে চাচ্ছি।'

'তারপর' ?

'আমি আপনার স্ত্রী হলেও, সত্যিকারের সম্পর্ক তা' নয়। বিমলদার চেয়ে বড় আমার কেউই নেই। আশা করি আমার সে মর্য্যাদাকে আপনি ভুল বুঝে হীন কর্ব্বেন না। সে ভরসা আমি আপনার উপর রাখি।'

রমেন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি এত বড় কথাটি বুঝতে একটুও ভুল করোনি ? সত্যি করেই কি ভেবে দেখেছো ?'

'আপনাকে বলতে আমার সঙ্কোচ নেই কিন্তু সে কথা ভেবে দেখবার প্রয়োজন হয় না, আপনা থেকেই তা ফুটে উঠে।'

'বেশ তাই হবে, আমাকে তুমি হীন মনে করো না, তোমার সে মর্য্যাদার উপর কোন দাবীই আমার দৃষ্টি দেবে না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

মুহূর্ত্তকাল রমেনের মুখের পানে চাহিয়া নলিনী অস্ফুট-স্বরে বলিল, 'আমাকে আপনি ক্ষমা কর্ব্বেন, আপনার কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ।'

'কাল থেকে সমস্ত বন্দোবস্তই আমি ঠিক করে নেব। তোমার হয়তো ঘুম পেয়েছে, এখানটাতেই তুমি ঘুমোও। আমি চলে যাচ্ছি।'

রমেন সন্তর্পণে পাশের ঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে সহসা একবার মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমাকে তুমি সঙ্কোচ করো না নলিনী। অসুবিধা কিছু হলে জানিও, এ গৃহে তোমার অশান্তি হয় নি, এটুকু যেন আমি বুঝতে পারি।'

সে রাত্রি উভয়েরই বিনিদ্র কাটিল।

রমেনকে নলিনী সন্দেহ করিত না। কিন্তু এক বিমলদা ছাড়া আর কারো উপরই তাহার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও ছিল না। পিতা হইয়া যিনি মেয়ের অন্তরের রূপ দেখিতে পান নাই, আর কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সন্ধান রাখিবে, সে দুরাশা। পুরুষকে সে ভয় করিত এবং রমেন ও সে সীমা থেকে একেবারে বাহিরে পড়িত না। নলিনী ভাবিত, সে অন্ততঃ সমাজের চক্ষে তাহারই তো স্বামী,—সে সংস্কারে ভুল হওয়া তাহার পক্ষে তেমন কিছু অসম্ভব নয়।

কিন্তু রমেনের জীবনে কোন ব্যতিক্রমই চোখে পড়িল না। সে যেন উদাসীন, স্বামীত্বের পরিচয়টুকু তাহার যথেষ্ট, অধীকার কে সে ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতে চায়।

এমনই দিনের পর দিন কাটিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন-গতি এই দুইটি নবীন নর নারীর ভিতরের সন্ধান কেহই জানিল না। নলিনী তো নয়ই, রমেনও মুখ ফুটিয়া সামান্য আভাষও কাহাকে জানাইত না। তাহদের জীবন যেন সহজ, সরল—তাহার কোথাও কিছুমাত্র বৈষম্য নাই, বাহির হইতে এইটুকুই চোখে পড়িত।

এমন করিয়া দিনের পর দিন, মাস, বৎসর......

রমেন নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল, নলিনীর জীবনে পরিবর্ত্তন একদিন আসিবেই। কিন্তু তাহা যে অতিবড় ভুল, সে তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিল। সে ভবিষ্যতে বৈচিত্র আশা করিয়াছিল, কিন্তু দেখা দিল যাহা, তাহা বৈচিত্র নয় নর্জীবতা।

রমেণ অস্থির হইয়া উঠিল। সে যে দিনের পর দিন নিস্বঃ, রিক্ত হইয়া চলিয়াছে। ভুল সে করিয়াছে খুবই সত্য কথা। কিন্তু চিরদিন কি তাহারই নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে,—তাহার কোন সমাপ্তিই কি নাই ?

রমেণের জীবনের একটি বৎসর এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া গতি লইয়া কাটিয়া গেল। মনে স্বস্তি নাই, যৌবনের কামনাও ব্যর্থ। আশা-নৈরাশ্যের অহর্নিশি দ্বন্দ্ব তাহার মনে। আদর্শকে, ঔদার্য্যকে সে পরিত্যাগ করিতে চায় না—কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য্যের আবরণে তাহার জীবন যে একান্তই নিস্ফল আজ। নাঃ, আর সে ভাবিবে না।

নলিনী,—আশ্চর্য্য, এই মেয়েটি। সংসারের প্রয়োজনের দিক দিয়া সে রমেণের সাচ্ছন্দ্য ও সম্মান, তাহাকে সে বিন্দুমাত্রও ভোলে নাই। সমাজে সে শিক্ষিত স্বামীর গৌরব লইয়া,—তাহাকে সে ক্ষুন্ন করিত না, একটুও না। কিন্তু যাহা হইতে পারে না, তাহাকে অসম্ভব বলিয়াই সে মানিয়াছে—দেহে, মনে। নিজের যৌবনের সমস্ত স্বার্থ বিমলদাকেই গ্রহণ করিয়াছিল,—বিরহে তাহা ক্ষুন্ন হয় নাই। সে স্মৃতি তাহার চিরকালের চরম সম্পদ,—ভালোবাসা তাহার অনাদ্যন্ত, সেদিনের কামনা তাহার চোখে চির মধুর।

সুষুপ্ত রাত্রি।

রমেণের চোখে সুপ্তি নাই। আস্তে আস্তে সে শয্যা ত্যাগ করিল। একধারে স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের অস্পষ্ট শিখাটি—সে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, তেমন খেয়াল থাকেনা ; কিন্তু অশেষ বলিয়া মনে হয় বিনিদ্র রজনীকে। অশান্ত, অবিশ্রান্ত মন, চিন্তার অবধি নাই তার।

পাশেই নলিনীর ঘরের পর্দ্দাটি চোখে পড়িল। ভাবিল ওর হয়তো এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রা।

দুই এক পা করিয়া সে অগ্রসর হইল। উজ্জ্বল, প্রদীপটি হাতে তুলিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চোখে পড়িল, বিস্রস্ত একরাশ চুলের আবরণে ঘুমন্ত মুখখানি অপরূপ, অনুপম।

প্রদীপটি তুলিয়া নলিনীর মুখের অতি কাছে ধরিল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসও সারা বুকটিকে দোলা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘুম-ভারাতুর দুটি চোখের আকস্মিক চমক, প্রদীপের সেই দীপ্তিস্পর্শে। ত্রস্তে নলিনী উঠিয়া বসিল,—নিজের দৃষ্টিকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না।—কেন? কি প্রয়োজন ?

এমন নির্জ্জন নিশুতি,—আর সে তাহারই স্ত্রী। স্বাভাবিক আশঙ্কায় তাহার অধর দুটিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—নির্ব্বাক, নিশ্চল।

প্রদীপটি মেঝের একপ্রান্তে রাখিয়া রমেন অদূরের চেয়ারখানি টানিয়া আনিয়া বসিল, বলিল, 'ভয় নেই নলিনী, তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। তোমার মর্য্যাদার কথা আমি ভুলিনি।'

'এতরাত্রে,—হটাৎ,—আচ্ছা বলুন ?'—নলিনীর কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট।

'এই বিনিদ্র রাতে হটাৎ-ই সে কথা মনে হয় নলিনী। তোমার হয় না,—তোমার অতিবড় সত্য হৃদয়ে জেগে আছে, সুন্দর স্মৃতি আছে, ভালবাসার পরিপূর্ণতা আছে, কিন্তু আমার তা' নেই। সেই কথা-ই আমি বলিতে চাই। মনের গভীরতায় তোমার যৌবন নীরব হয়ে থাকতে পারে, তার মুহূর্ত্তের সার্থকতাও তোমার মনে মধুর হয়ে চিরকাল

থাকবে হয় তো, কিন্তু আমার কথা তা' নয়। আমি রিক্ত, সবদিক থেকেই। আমার অপূর্ণ হৃদয়, অসার্থক যৌবন। দেহ মনে আজ আমার কি সে বিপ্লব, তুমি তা' বুঝ্‌বে না নলিনী।'

'তারপর ?'

'তারপর তোমার কথা ; আমারই পরিবর্ত্তনে জীবনে তোমার ব্যথার সৃষ্টি হবে না, সেই কথাটাই আমি আজ শুনতে চাই, তোমারই কাছে। তুমি আমার স্ত্রী, সে সম্পর্কে সমাজের কটুক্তি তোমার মনে গ্লানি জাগাবে না, তুমি তাকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না, এইটুকুই তোমার মুখে আমি শুনবো আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পার্ব্বো না ; অনন্ত দুর্ব্বলতা আমার মনে ছেয়ে গেছে, সে দুর্ব্বলতা সর্ব্বনাশের—নিষ্ঠুর বিস্মৃতির।'

নলিনী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল ; আজ একটী বৎসর পরে রমেণ তাকে কিসের কথা বলিতেছে ? একি দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া, দুঃখের কাহিনি গাহিয়া তারই সহানুভূতি জাগাইবার প্রচেষ্টা ? বাসনার সকরুণ মিনতি ?

মুহূর্ত্তে নলিনী কঠোর হইয়া উঠিল, তীব্র কণ্ঠে বলিল,—সে জন্য আমার বিন্দু মাত্র গ্লানিও মনে জাগবেনা রমেন বাবু। আমার উপর ব্যক্তিগত অধিকারও যেমন আপনার নেই, আপনার উপরও সে অধীকারের স্পর্দ্ধা আমি কোন দিনই রাখবো না। এ ছাড়া আপনাকে কোন কিছুই আমার বলবার নেই। রমণের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে আজ স্ত্রীর কাছে রমেণ বাবু, হায়রে অদৃষ্টের কী নির্ম্মম পরিহাস !

রমেণ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল—যেন মদ-মাদকতা তার সারা অঙ্গে।

অর্থের অভাব রমণের ছিল না বরং প্রভাবই ছিল বেশি। একদিন পরিবর্ত্তন সুরু হইল, মনুষ্যত্বের নির্লজ্জ হীনতায়। দিনের পর দিন—রমেণ মদ ধরিল, ক্রমে মদ্যাসক্ত হইল,। আত্মীয় স্বজনের উপদেশ, বন্ধুর অনুরোধ সব ব্যর্থ। সে সুখ চায় নাই, জীবনে একটানা বিস্মৃতি চাহিয়াছিল। তার পর ?

যৌবনের সে নিষ্ঠুরতা, সর্ব্বনাশের সে চরম আকুলতা—উদ্দাম, অস্থির। প্রথম যৌবনের আদর্শ শিথিল, একদিন লুপ্ত ও হইল কখন—সে বিস্তৃত ইতিহাস এ গল্পের নয়।

আরও এক বৎসর পরের কথা।

আজ রমণের দিকে চাহিয়াও চেনা যায় না, সে রমেণ যেন মরিয়াছে, এ যেন তার কঙ্কাল। সে যৌবন নাই, সে রূপ নাই, সে স্বাস্থ্য নাই,—সমস্তই নষ্ট হইয়া গেছে। অত্যাচারে নির্জ্জীব ঐ দেহটা, একদিন একেবারে শয্যা-সঙ্গী হইল। নানাস্থানে সংবাদ গেল,—আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, প্রায় সকলের কাছেই। বিজ্ঞ ডাক্তার, অভিজ্ঞা নার্স বিলাতি ঔষধ, কোথাও ত্রুটি নাই—সমস্তই আসিল।

নলিনী এতদিন সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলে নাই, একটি কথাও নয়। কিন্তু সে নির্ব্বিকার হইয়াই ছিল না। তাহার মনেও দোলা লাগিয়াছিল। কতবার নিজের মনেই প্রশ্ন করিয়াছে,—এই যে এতবড় হীন পরিবর্ত্তন, নিজের প্রতি এই যে এতবড় সর্ব্বনাশ, ইহার জন্য দায়ী কে ? তার নিজের অপরাধ কি একটুও নাই ? বিমলদার প্রথম জীবনের ভালবাসাকে শুধু দেহের মর্য্যাদা দিয়া এতবড় করিয়া দেখিল ; ভালবাসার মহত্তম রূপটী কি তাই ? সে কি শুধু তুচ্ছ দেহ লইয়া ?

কিন্তু উত্তর ও সে পাইয়াছিল,—হাঁ গো, দেহের সম্পর্ক ও আছে বৈ কি, দেহটাকে যদি সে নির্ব্বিকার চিত্তে দান করিত, তবে ভালবাসা যে বিরুদ্ধ না হইয়া পারিত না। হয়তো একদিন মাতৃত্বের নব অনুভূতি স্বামীর দিকেই তাহার মনকে টানিয়া লইয়া যাইত, অতি অলক্ষ্যে। না, সে কখনই তাহা পারিত না ! বিমলদার যে স্মৃতিটী তাহার মধুর হইয়া আছে তাহাই যে তখন দুঃসহ হইয়া জাগিত ; তাহার জীবনের নারীত্বের, মনুষ্যত্বের অতিবড় কলঙ্ক হইয়া দেখা দিত। সে দেহমনের দ্বন্দ্বে তাহার সান্ত্বনা কোথায় ?

নিজের সোনার হারটি যখন কণ্ঠ-মুক্ত করিয়া বিমলদার গলায় একদিন পরাইয়া দিয়াছিল, অসহ্য পুলকে ; সে দিন তাঁরই গলায় আবার তাহা পরাইয়া দিতে গিয়া সে বলিয়াছিল

'নলিনী, প্রিয়তমা আমার, এ বন্ধন আজ মনের নয়, দেহের। আজ আমাদের পরিণয়,—দুষ্মন্ত শকুন্তলার যে বন্ধন ছিল, এও তাই, তুমি তাকে ভূলোনা। সে অমর্য্যাদায় আমার ভালবাসার অপমান হবে।'

সে বলিয়াছিল, 'আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্য যে এই,—একে ভুলবার শক্তি আমার কোথায় ?'

নলিনী নিজেকে অপরাধী ভাবিতে পারে নাই। অন্ধ সমাজের আদর্শ তার অন্তরের সত্যের কাছে হীন, তুচ্ছ।

কিন্তু কর্ত্তব্য ?.........

নলিনী নীরবে স্বামীর শুশ্রূষায় নিজেকে আহুতি দিল। বাহিরের লোক-চক্ষু তাহার অন্তরের বেদনাকে বাহিরেও লক্ষ্য করিবে, সে অধীকার সে দিতে পারে না।

কিন্তু রমেণের পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। ডাক্তার শঙ্কিত হইলেন আত্মীয় স্বজন বেদনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। দেহের উত্তাপ, অগ্নু্যুতাপের মতই যেন।

সেদিন নিশুতি রাত্রি। রমণের পাশে বসিয়া বিনিদ্রা নলিনী। আজ তার মমতা ব্যাকুল ক্ষুব্ধ নারী হৃদয়ে দোলা লাগিয়াছে। নিজের গর্ব্বকেই সে এতদিন বড় করিয়াছে ;—কর্ত্তব্যকে নিষ্ঠুরের মত পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে বাধা দিতে পারিত, বন্ধুর মত অনুরোধ জানাইতে পারিত, কিন্তু তার কিছুই তো সে করে নাই। কেন ? কেন ? একটু মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাও কি তার জাগিল না ? এতটা সঙ্কীর্ণ সে ?

সহসা রমেণ কি একটা অস্ফুট আড়ষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর অসংবদ্ধ প্রলাপ......

'কত বড় ভুল......কত বড় প্রায়শ্চিত্ত......নলিন, আমাকে ক্ষমা করো। আমি বাঁচ-বো না, কিন্তু তার আগে যদি তোমার একটুখানি ক্ষমা......বিমল ! সার্থক তোমার ভালোবাসা ; আমি অভাগ্য......হীন......নিজের ব্যর্থ ভালোবাসার ধীকারে মনুষ্যত্ব হারালাম......উঃ ; কী এ বেদনা......আমি এমন ছিলাম না, কত আশা আকাঙ্ক্ষা—নাঃ।'

নলিনী ঝুকিয়া পড়িয়া একদৃষ্টিতে রমেণের মুখের পানে চাহিয়া রহিল,—অডিকলোন্ মিশ্রিত জল ঘন ঘন মাথায়, ললাটে সিঞ্চন করিল। তারপর হটাৎ-ই একটা দীর্ঘশ্বাস...

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত।

রমেণের মুখে আবারও সেই প্রলাপ, কিন্তু এবার যেন আড়ষ্ট, অসংবদ্ধ নয়, অনেকটা ধীর, সুস্পষ্ট।

'একদিন সব ছিল......তারপর সমস্তই হারিয়ে ফেলি। সংসারে নির্ব্বান্ধব, একাকী, ভেবেছিলাম মনের মত স্ত্রী পেয়ে হয় তো......

সহসা তাহার দুটি চোখ উন্মীলিত হইল। তারপরই কেমন একটা চমক...কে, কে, নলিনী?......সরে যাও, ছুঁয়োনা। হীন, অতিবড় কলঙ্ক আমার ; তুমি দেবী,—আমি তোমাকে চিনি নাই, অভিমান করে এতবড়......

নলিনীর মনে যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করিল।—রমেনের হাতটি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া, মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল,—'চুপ কর এখন, একটু ঘুমোও তুমি, ভয় কি এই তো কত কাছে রয়েছি।'

'আঃ'—

মুহূর্ত্তে রমেণ তার অবশ হাতটি কোনমতে তুলিয়া নলিনীর কাঁধের উপর রাখিল, নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

নলিনী আরও খানিকটা সরিয়া গিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'ভয় কি, ডাক্তর বলে গেছেন, তুমি দুদিনেই ভালো—'

মুখের কথা তার শেষ হইল না। সহসা রমেণ তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, না,—তুমি যাও,—সরে যাও, আমি ভালো হতে চাইনে,—তুমি যাও, এখুনি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি......

উত্তেজনায় পরমুহূর্ত্তেই সে নিঃসাড় হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

নলিনীর সারা দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ,......দুশ্চিন্তায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল,......

দুটি আঁখিতে অশ্রুর অস্থিরতাই শুধু। সে নড়িলও না, সরিলও না।

কোন কথাই বেশিদিন চাপা থাকেনা। মিঃ সেন ও নির্ম্মলাদেবী মেয়ের বিবাহিত জীবন এবং তাহার স্বামী সৌভাগ্যের কথা শুনিয়াছিলেন। যেমন করিয়া ছোট জিনিষ মুখে বাড়িয়া যায়, অতিরঞ্জিত হইয়া সে কথাও তাহাদের কানে গেল একদিন। ইতিমধ্যে অনেক চিঠিই উপদেশের আকারে নলিনী তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল, কিন্তু কোন কথাই সে খুলিয়া বলে নাই। অতঃপর ক্ষুন্ন বেদনা ক্লিষ্ট মাতা পিতা শুভ পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—যদি বা মেয়ের মন রূপান্তরিত হয়। আর কিই বা উপায় ?

কিন্তু একদিন চিঠি আসিল অন্যরূপ,—তাহা রমেনের শোচনীয় অধঃপতনের কাহিনী। সে সংবাদ নলিনী জানায় নাই, জানাইয়াছিলেন মিঃ সেনের এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।

তাহাদের মনে সে কলঙ্ক কালিমা অনুশোচনীয় বহ্নি জ্বালিল।

এমন করিয়াই দিনের পর দিন,—একটু স্বস্তিও কোথাও নাই। সমস্তই যেন নিষ্ঠুর অভিশাপ।

রমেনের কোন পরিবর্ত্তনই দেখা দিলনা। মনের বিকার তাহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। নলিনী নিঃশেষে নিজেকে স্বামীর শুশ্রূষার আহুতি দিল। জীবনে সে এক নব অনুভূতি—যদি জীবনের বিনিময়েও.........

সমস্ত কিছুই সে সচ্ছন্দে সঁপিয়া দিতে পারে আজ।

মায়ের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অনুতাপ,—মা হইয়া তিনি মেয়েকে বুঝিতে পারেন নাই। কতবড় সত্যকে তিনি মোহ স্থির করিয়াছিলেন,—ইহার জন্য দায়ী তিনি একা।

কিন্তু কি আজ উপায়,—তার সবই যে শেষ হইতে চলিল !

অনেক ভাবিলেন। অবশেষে একদিন গোপনে চিঠি লিখিয়া বিমলের নামে পাঠাইলেন—একান্ত আশায়।

বিমলের সংবাদ ইতি মধ্যে তাহারা পাইয়াছিলেন। বাংলা থেকে বহুদূরে একটি স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ছিল—একাকী।

চিকিৎসায় শুশ্রূষায় রমেন অনেকটা তখন সুস্থ। নলিনী মুহূর্ত্তের জন্যও কাছ ছাড়া হয় না।

অলস মধ্যাহ্ন। ভৃত্য আসিয়া তার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল ;—

সেই চিঠি......কতদিন সে এই সৌভাগ্যটুকুই প্রতীক্ষা অধীর চিত্তে করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহা নিতান্তই মিথ্যা মনে হইল। না, এ চিঠি সে পড়িবেনা, সে তাহা চায়না। অবশেষে সঙ্কল্পও কি করিয়া যেন শিথিল হয়।

খাম ছিঁড়িয়া ভিতরের ছোট কাগজখানি চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে।

কিন্তু কি সে ভাষা.........

হায়রে, এতবড় তুচ্ছ জিনিষকেই সে এতদিন বড় করিয়া দেখিয়াছে, নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

অদূরে খাটের উপর রমেন পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। ছন্ন ছাড়া চিন্তা......কিন্তু তার সব কিছুরই কেন্দ্র আজ নলিনী।

নলিনী আর পারিলনা। মুহূর্ত্ত ছুটিয়া গিয়া রমেনের দুটি পায়ে পড়িয়া বলিল—'ওগো তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমি মিথ্যার উপাসনা করেছি, তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, একটিবার আমাকে ক্ষমা করো, একটিবার।'

চিঠি খানি ছুড়িয়া স্বামীর মুখের কাছে সে ফেলিয়া দিল।

রমেন তার অবশ হাতখানি নলিনীর দিকে সরাইয়া লইয়া বলিল, 'ছিঃ, নলিনী, ওঠো। অপরাধ যে একা তোমারই নয় ?'

চিঠি খানিও তুলিয়া ধরিল—ঝাপসা দৃষ্টি,—তবুও দুটি লাইন তাহার চোখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল—'আমি তোমাকে ভাল বাসিনি, সব ছলনা, মিথ্যা। আমি এখানে এসে মনোমত মেয়ে দেখে বিয়ে করেছি।—তোমার চেয়েও সুন্দরী, তোমার চেয়েও শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। আজ আমি সুখী, এত সুখী যে সে কথা তোমাকে বলতে পারি নে। তুমি আমাকে নিঃশেষে ভুলে যেয়ো।'

মুহূর্ত্তকাল রমেন নির্ব্বাক হইয়া রহিল,—তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া নলিনীকে উঠাইয়া, নিজের বুকের একান্তে টানিয়া আনিল।—

বলিল, নলিন, আজ আমি সত্যই সুখী, বিমলের চেয়েও।

নলিনী স্বামীর বুক থেকে মাথা তুলিল না, একটি কথাও বলিল না। তার দুটি চোখে শুধু অশ্রুর বন্যা।

মনে মনে বলিল, 'ওগো, তাই যেন হয়, আর কিছু চাই নে।'

কিন্তু বিমলের মনের সত্যটি কেহই জানিল না।

ঃ—

সুখের বিষ

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

সুন্দর। সুমতি, চল আমরা এই ফাঁকে পালাই।

সুমতি। [বিস্ফারিত চক্ষে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে] কোথায় যাব?

সুন্দর। ওই যে সম্মুখে ঘাট—চল একখানা নৌকা নিয়ে পালাই।

সুমতি। ও কে? ও কে গো?

সুন্দর। সে খোঁজে আমাদের কাজ কি কমলা? চল আমরা পালাই।

সুমতি। কোথায় যাব?

সুন্দর। যে দিকে দু চক্ষু যায়। এখান থেকে পালাতে পারলে আর আমাদের নির্য্যাতন সইতে হ'বে না। সুমতি, কথা কও, আমার দিকে চাও। আমা হ'তে তোমার এত লাঞ্ছনা হ'য়েছে ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেন আমি তোমায় নিয়ে এলুম তাই ভাবছি।

সুমতি। কেন আনলে?

সুন্দর। এ কি কথা সুমতি?—আমি যে তোমাকে ভালবেসে পাগল হ'য়েছিলাম সুমতি। তুমিও যে আমায় ভালবাস—ভালবেসে তুমি তোমার সর্ব্বস্ব ছেড়ে এসেছ।

সুমতি। দেখছো কি আশ্চর্য্য ও সন্ন্যাসী! কি রূপ! শরীর থেকে যেন আগুণের ছটা বেরুচ্ছে।

সুন্দর। সুমতি, আমার কথা তুমি শুনছো না। শোন, আমাদের বিপদ এখনো কাটে নি—এখনই পালাতে হ'বে। চল—[হাত ধরিয়া টানিল।]

সুমতি। সবাই ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ছে!—আমি পারি না?

সুন্দর। উনি মহাপুরুষ, ওঁর পায় লুটিয়ে পড়া উচিত, কেন না উনি আমাদের জীবন দিয়েছেন। কিন্তু সে জীবন তো রক্ষা ক'রতে হ'বে! চল আমরা পালাই।

[আবার হাত ধরিয়া টানিল।]

সুমতি। ছাড়—আমাকে টেনো না—তুমি যাও—আমি যাব না। [সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইল।]

সুন্দর। কি বলছো তুমি? সুমতি—তুমি কি ঘুমোচ্ছ? চেয়ে দেখ, আমি তোমার সুন্দর। আমার জন্য যে তুমি কুল মান সব হাসি মুখে বিসর্জ্জন ক'রেছ। চল প্রিয়ে—

সুমতি। চুপ—উনি শুনতে পাবেন—ছিঃ—

সুন্দর। তবে চল।

সুমতি। চল যাচ্ছি। [সন্ন্যাসীর দিকে অগ্রসর হইল]

সুন্দর। [তার হাত টানিয়া ধরিল] ওদিকে কোথা যাচ্ছ? আবার ওদের হাতে পড়লে ওরা তোমায় ছিঁড়ে খাবে।

সুমতি। ফেলুক ছিঁড়ে, আমায় টুকরো টুকরো করে ওঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিক—তাই তো আমি চাই—ওর পায়ের ধুলোর সঙ্গে মিশে যেতে চাই—ছাড় আমায়—

[আপনাকে ছাড়াইয়া ছুটিয়া গেল।]

সুন্দর। আশ্চর্য্য এই মেয়েমানুষ। আমার জন্য পাগল হ'য়ে যথা সর্ব্বস্ব ছেড়ে এলো। আর আজ তিনদিন না যেতে সে আর একজনের পানে ছুটে চল—রে কড়ু বাঁটা মার মেয়েমানষের কপালে।

[অন্যদিকে প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

[ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিল, নৌকা হইতে উঠিয়া আসিল গঙ্গারাম ও নায়েব-দেওয়ান।]

গঙ্গা। এই যে আসুন হুজুর—পাল্কী বেহারা বেটারা গেল কোথায়। মর বেটারা! বায়না দিয়ে বেটাদের বসিয়ে রেখে গেলুম শালারা পিট্‌টান দিয়েছে। হুজুর একটু কিস্তিতে তসরীফ দিন আমি এক্ষুনি পাল্কী ডেকে আনছি।

না, দে। কেন মিছে তক্‌লিফ ক'রছো ঠাকুর, আর আমায় নাহক হয়রাণী ক'রছো। তুমি দেওয়ান সাহেবকে যা সব বলেছ সব মিছে বানানো সে কথা আমি জানি। বেকায়াদা কেন আমায় তকলিফ দিচ্ছ।

গঙ্গা। না হুজুর, ভগবান জানেন, একেবারে খাঁটি সত্যি, হুজুর গিয়ে ঔরতদের একবার জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন তারাও সম্পত্তি আমাকে দিয়েছে।

না, দে। হাঁ হাঁ সে আর জানি নে! ছুটো ঔরৎকে ফুসলিয়ে তুমি তাদের দিয়ে কবুল করাবে সে আর বেশী কথা কি? আমি সওয়াল ক'রলে তারা কি বলবে সে আমি জানি, আর এও জানি যে সে তোমার শেখান কথা। এই কর্ম্ম ক'রে ক'রে হাড় পেকে গেল তোমার এই চাল টুকু আর বুঝবো না। লেকিন হুজুরের কাছে আমি যা এত্তেলা দেব তাতে খাঁটি সত্যি কথাই থাকিবে।

গঙ্গা। দোহাই হুজুর, আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'রবেন না। আমি সত্যি বলছি হুজুর আমার এর মধ্যে একটু মিথ্যে নেই।

না, দে। আর তুমি তো আচ্ছা বেউকুফ দেখছি, সত্যি হ'ক মিথ্যা হ'ক তাতে কি এলো গেল। কয়সাল আমার হাত, আমি যা বলবো তাই হ'বে—যে কথা হুজুরে এত্তেলা করবো সেইটাই তো সত্যি হ'বে।

গঙ্গা। হুজুর গরীব পরবর, গরীবের উপর মেহেরবাণী ক'রে—

না, দে। সরকারী নৌকরের মেহের বাণী কিসে পাওয়া যায় তা' কি জান না সাহেব?

গঙ্গা। হুজুর সে জন্য চিন্তা করবেন না, হুজুর আমার গরীবখানায় পা দিলেই হুজুরকে এক আসরফী নজর দেব।

না, দে। এক আসরফী—ফোঃ! তালুক খানার মুনাফা যে পাঁচশো টাকা।

গঙ্গা। জনাব, বান্দার উপর নারাজ হ'বেন না, আমার এখন শক্তি নেই হুজুর, নইলে,—

না, দে। পাঁচশো টাকা মুনাফার তালুকখানা দশটা আসরফীর জন্য ছেড়ে দেবে?

গঙ্গা। দশ আসরফী—জনাব আমাকে কেটে ফেলেও তা পাবেন না।

না, দে। তবে আর বেকায়দা তকলিফ কেন করছো। আমি তোমার ঘরে গেলেও যা এতালা করবো এখান থেকেও তাই কর্‌তে পার্‌বো। তুমি ছুটো বিধবাকে ঠকিয়ে তাদের তালুকখানা কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছো। ব্যস্!

গঙ্গা। দোহাই জনাব, গরীবের ওপর এমন নারাজ হবেন না। আমার যতদুর ক্ষ্যামতা আমি দিচ্ছি। পাঁচ আশ্‌রফী নিয়ে গরীবকে মাপ দিতে হুকুম হয়।

না, দে। খয়ের! তাই দাও, দেখি যার করো।

গঙ্গা। জনাব বান্দার গরীবখানায় গেলেই হুজুরের হাজির কর্‌বে।

না, দে। না সাহেব, তোমার দৌলত খানায় আমি যাচ্ছিনে। এপার হোক ওপার হোক যা এতালা কর্‌বার সে আমি এখান থেকেই কর্‌বো। পাঁচ আশরফী দাও, আমি তোমার পক্ষে লিখ্‌বো, না দাও তালুক যাবে।

গঙ্গা! না হুজুর নারাজ হবেন না, পাঁচ আশ্‌রফীই হবে। চলুন

না, দে। না সাহেব চল্‌ছি না। এই খানেই নগদ দিন, এইখান থেকেই ফিরে যাবো মৎলব করেছি।

গঙ্গা। কিন্তু একবার বাড়ীতে যাবেন না? নইলে কথা হবে না?

না, দে। সে আমার হাত। আপ্নি আশ্রফী ফরমায়েশ করুন তারপর কাজ হাশিল হয় কিনা আমি দেখ্বো।

গঙ্গা। পাঁচ আশ্রফী!

না, দে। না সাহেব, আপ্নার সঙ্গে কাজ হবে না। চল্লাম আমি।

গঙ্গা। দোহাই হুজুর যাবেন না। আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। তবে পাট্টা খানা আজই হবে তো?

না, দে। এই কাছারী ফির্তে যতটুকু সময়। তার পরেই আপ্নি হবেন তালুকের মালিক।

[সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

গান—

মন ভেবেছ করবে চুরি।
লোকের চোখে দিয়ে ধুলো
দেখবি তোর জারিজুরি।
ছয়টা রিপুর মশাল জ্বেলে
বিবেকের চোখ ঝলসে দিলে
(তাই) ভাবছো ব'সে তুড়ি মেরে
ভবসাগর দিবে পাড়ি
(ওরে) পারের পাটনী হাজার চোখে
হাজার দিকে দিচ্ছে আড়ি
সে চোখে যে ধুলো দিবি
কোথায় তোর সে কারগরি?

গঙ্গারাম। (সন্ন্যাসীর পায় পড়িয়া) দোহাই প্রভু আমার দোষ নেই। এই নায়েব-দেওয়ান সাহেব—

না, দে। চুপ বেইমান্! ভালো চাও আস্রফী নিয়ে এসো

গঙ্গা। (সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া) প্রভু, প্রভু দয়া করুন। আমায় শাপ দেবেন না।

সন্ন্যাসী। না বাবা আমি শাপ দিই না কাউকে। কি হয়েছে তোমার? ওঠো, আমার মুখপানে চাও

[হাত ধরিয়া গঙ্গারামকে উঠাইল]

[গঙ্গারাম ও সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ আবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিল।]

গঙ্গা। প্রভু, আমি বড় পাপী, আমার কি গতি হবে?

স। কোনো চিন্তা নেই ভাই, লোভ মোহ ত্যাগ করো। মায়ের চরণে মতিস্থির করো। তাঁর হাতে সব ভাবনা চিন্তা তুলে দাও—পাপের জন্য ভাবনা ক'রো না ভাই—মায়ের পায়ে আশ্রয় নিলে বুঝতে পারবে যে পাপ পুণ্য সব ফাঁকি, সব মায়া—তাঁর অভয় চরণের পরশ পেলে সব ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে।

গান—

শ্যামা করুণাময়ী,
মিছে মাগো খড়্গ নিয়ে, রক্ত আঁখি ঘুরাচ্ছ ওই।
আমার কাছে ঠকামী তোর চলবে না মা ইচ্ছাময়ী।
ওমা, আমি যে তোর বুকের ছেলে
বুকের ভিতর পেতে কাণ,
শুনছি যে গো ডাকছে সেথা
করুণার কি জোর বাণ,
তাই, চক্ষু যতই গরম কর, জানি মাগো লীলাময়ী,
তুমি বহুরূপীর সাজ সেজেছ,(কিন্তু) হাসি তোমার লুকালে কই।

না, দে। কি সাহেব? আসরফী কই?

গঙ্গা। না হুজুর সাহেব আমি আসরফীও দেব না তালুকও চাই না। বান্দার গোস্তাকী মাফ হয়।

না, দে। বেইমান! 'কথা দিয়ে কথার খেলাপ করিস?

গঙ্গা। হুজুর—মাফ করুন—

না, দে। মাফ—সে আমি কখনও করি নি—চল কাছারী চল, তোমার পিঠে বাঁশমোড়া দিয়ে আমি টাকা না বের ক'রেছি তো—

স। রাগ ক'রছেন কেন ভাই সাহেব—

না, দে। চুপরও বেতমিজ, আমি নায়েব দেওয়ান আমাকে বলিস ভাই সাহেব, তুই কে রে শয়তান।

স। হাঁ ভাই তুমি ভাই—আমরা দুজনেই যে এক বিশ্বমায়ের ছেলে ভাই।

না, দে। কেয়া! মুখ সামলে কথা কও বলছি।

স। কে কার মুখ সামলাবে ভাই। এ মুখ যে আমার মায়ের কাছে কোবালা ক'রে দিয়েছি। এ তাঁর হুকুমে কথা কয় তাঁর হুকুমে চুপ করে।

না, দে। বটে, কোই হ্যায়।

গঙ্গা। আজ্ঞে না হুজুর এখন কোই নেই হ্যায়। সুতরাং আপনি কিস্তিতে গিয়ে বসুন।

না, দে। আচ্ছা এর শোধ তুলবো—কেমন শয়তান তোমরা দেখে নেবো।

[প্রস্থান।]

[কৈলাসের প্রবেশ]

কৈ। বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা—আমাদের ঠাকুরকে দেখে নেবে—নিস্‌রে বেটা নিস্,—দুটো চোখে হ'বে না দু'হাজার চোখ নিয়ে আসিস তবে দেখবি?

স। ছি কৈলাস, অত রাগ ক'রো না। কি খবর কি?

কৈ। খবর ভীষণ, লোক আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আপনার হুকুম সব লোককে হাতে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে দিতে হ'বে, কিন্তু হাত পা কোন ছার ঘাড়ে ধরে পর্য্যন্ত ফেরাতে পারছি না।

স। এ কোথায় এনে ফেল্লে মা আমার? এরা যে আমায় এক দণ্ড তোমার সঙ্গে নিরিবিলি থাকতে দেয় না—যাও কৈলাস, তাদের আসতে দেও।

[কৈলাসের প্রবেশ]

[অনেকগুলি লোক আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলা লইতে লাগিল সুমতি প্রবেশ করিয়া আবিষ্ট ভাবে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল]

সন্ন্যাসী। ওরে মূর্খ, তোরা কার পায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিস—এযে মেকী—এক দম ফাকি,—

৩য়। প্রভু, দয়া ক'রে আমার ছেলের মনটা ঘুরিয়ে

১ম। না দেবতা এমন আজ্ঞা ক'রবেন না, আমাদের উপর দয়া করুন।

২য়। প্রভু আপনার শক্তি যে আমরা নিজ চক্ষে দেখিছি।

স। শোন কথা—ওরে বেটারা আমি যে চিনির বলদ—সে বেটা তার বিশ্বের বোঝা আমাকে দিয়ে যদি বইয়ে বেড়ায় তাতে আমার কি?

৩য়।—আমি ছা-পোষা গেরস্থ মানুষ, ছেলেটি আমার শিবরাত্রের স'লতে। ওরই জন্ত আমার সব। তা' সে বেটা বলে বিয়ে ক'রবে না, বিবাগী হ'বে।

সন্ন্যাসী। ওই যে, পাগলের কাছে এসেছে পাগলামীর অসুধ নিতে—দূর হ দূর হ!

৩য়। না দয়াময়, আপনার পা আমি ছাড়বো না। ওই ছেলেই যদি আমার গেল তবে আমার বিষয় আসয়ে কাজ কি?

সন্ন্যাসী। কোনও দরকার নেই, সে সব আঁস্তাকুড়ে ফেলে তুমিও বেরিয়ে পড়।

৩য়। প্রভু—নির্দ্দয় হ'বেন না, আমি মরে যাব প্রভু।

সন্ন্যা। এ যে বিষম বিপদরে বাপু। দেখি কই তোর ছেলে?

৩য়। [ছেলেকে অগ্রসর করিয়া] এই যে প্রভু।

সন্ন্যাসী। [স্থির দৃষ্টিতে তার মাথায় হাত দিয়া তার দিকে চাহিয়া শেষে হাসিলেন] দূর দূর—মিছে ভয় পাচ্ছ বাবা, এ ছেলে তেমন নয়। ছেলে মানুষের দশ রকম সখ হয়, এঁরও গেরুয়া পরবার সখ হ'য়েছে। কিন্তু এ ঘর ছাড়বার জাত নয়। যদি নেহাৎ ঘর ছেড়ে যায়ই তবে আবার ফিরে আসবে। তখন এর বিয়ে দিও।

ছেলে। প্রভু?

স। হ্যাঁরে ব্যাটা হাঁ। তোর রক্তের মধ্যে এক ফোঁটা বৈরাগ্য নেই—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঠাসা আছে অহঙ্কার। তোর সাধ্যি কি তুই বিবাগী হ'স।

৩য়। [সন্ন্যাসীর পায় লুটাইয়া পড়িয়া] মরা মানুষকে জীবন দিলে বাবা !

[প্রণাম করিয়া পায়ের উপর টাকার থ'লে রাখিল]

১ম। [পায়ের উপর টাকার থ'লে রাখিয়া] প্রভু আমার উপর দয়া করুন। আমি সওদাগর আমার ডিঙ্গা ছাড়বার জন্য ত'য়ের প্রভু তাতে পায়ের ধূলো দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান।

২য়। প্রভু, আমার ছেলেটা বাঁচে না, প্রভুর পায়ের তলায় রেখে দিচ্ছি—

সন্ন্যা। আরে তোল তোল, ম'রে যাবে।

২য়। না প্রভু আপনি তুলে আমার হাতে দিন তবেই ত বাঁচবে।

সন্ন্যা। [ছেলে তুলিয়া দিয়া] নে নে নে—জ্বালালে আমায় এরা।

১ম নারী। বাবা আমার শূল বেদনার একটা ওষুধ—

সন্ন্যা—পাগ্‌লা বেটী, আমাকে কি বদ্যি পেয়েছিস না বেদে পেয়েছিস ? বেরো।

১ম না। আমি এই রইলাম পড়ে।

[সন্ন্যাসী প্রস্থান—পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসীর পুনঃ প্রবেশ সুমতি তাঁ'র পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল।

সন্ন্যা। ওরে ছাড় ছাড় ছাড় !

সু। না ছাড়বো না—আর ছাড়বো না।

সন্ন্যা। কি চাস তুই।

সু। কিছুই চাই না,—চাই শুধু তোমাকে তুমি আমায় গ্রহণ কর—আমার আঁধার জীবনের দীপ্ত রবি তুমি, মরুভূমির বন্যা তুমি—আমায় গ্রহণ কর !

সন্ন্যা। [তাহার দুই হাত ধরিয়া তুলিয়া] মা ! [সুমতি চমকাইয়া উঠিল—তার হাত ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী দৃঢ় মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সুমতি অবসন্ন হইয়া নুয়াইয়া পড়িল]—ওঠ মা, সময় হ'য়েছে তোমার কৃপাময়ীর দয়া হয়েছে আমি গ্রহণ ক'রলাম।

[সুমতি ভক্তি ভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া পদতলে বসিয়া রইল। ভক্তের দল ফিরিয়া আসিল। পরে কাত্যায়ণী ও বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। মা গো!—এ কে ?—এ—

কাত্যা। কেন বউ ? কে ? কি বলছিস ?

বি। মা গো, বাঁ পা খানার দিকে চেয়ে দেখ—

কাত্যা। অ্যাঁ তাই তো—ওই তো সেই—বাপ আমার, ফিরে এসেছিস, এ পোড়ার মুখীকে এতদিনে মনে প'ড়েছে ? এসেছিস যদি তবে আর এখানে কেন বাপ-ঘরে চল বাবা, ঘরে চল।

সন্ন্যা। তোমার ও ছোট ঘরে মা আমাকে ধরবে কেন ? আমি যে বিশ্বমায়ের আপন হাতের তৈরী ঘরে ঠাঁই পেয়েছি মা। দেখছো না তার ওই নীল চন্দ্রাতপ, তার অপরূপ শোভা সম্পদ। রাজার প্রাসাদ ছেড়ে দীন ভিখারীর কুটীরে কেন যাব মা ?

কাত্যা। ওরে হতভাগা, না হয় আমি ভিখারী, না হয় নাই আছে রাজার বাড়ী, তবু আমি যে তোর মা, দশ মাস যে তোকে এই পেটের ভিতর বয়ে' বেড়িয়েছি—ওরে আমার সে দেনা তুই কি এমনি ক'রে শুধবি।

সন্ন্যা। মা গো, আমি যে মায়ের রাজ্যে বাস করি সেখানে দেনা পাওনার আইন নেই। এখানে লোকে সুধু দেয়, দুহাতে কেবল ভালবাসা ছড়ায়—বিশ্বের সব সম্পদ বিলিয়ে দিলেও সেখানে এক কাণা কড়ি পাওনা হয় না। মা, তুমি যে সেই বিশ্বমায়ের ছবি, তুমি কেন পাওনার হিসেব করছো ? কেন চেয়ে বেড়াচ্ছ। বুকের মধ্যে অতল সাগরের মত তোমার স্নেহ—বিলিয়ে দেও মা, বিলিয়ে দিয়ে জীবন ধন্য কর সুধু।

কাত্যা। বাপ, আমার, কথা রাখ, বাপ, বুকে আয়। এত দিন তোর জন্য বুক আমার শুকিয়ে ম'রেছে—এসেছিস

যদি আর আমায় দগ্ধাস নে। আর ক'দিনই বা আছি—এ ক'টা দিন তুই আর আমায় পুড়িয়ে মারিস নে।—আমি চক্ষু বুজলে যা' মন চায় করিস।

সন্ন্যা। মায়ায় অন্ধ হ'য়ে র'য়েছ মা—চোখ মেলে দেখ মা তুমি কে? আমি কে? এ বিশ্বজগৎ কি? আমায় আর ডেকো না মা।

কাত্যা। বউমা, তুমি চুপটি ক'রে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলে? এগিয়ে এসো—বাছার পা বাড়িয়ে ধর। চল বাপ সব, আমরা একটু তফাৎ যাই।

[সন্ন্যাসী ও বিজয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান]।

ক্রমশঃ

নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলা

—শ্রীভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়

নাটক কাহাকে বলে? অনেকে অতি সহজেই ইহার উত্তর দিবেন—"যেখানে গ্রন্থকার নিজে কিছু না বলিয়া, অর্থাৎ শুধু ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা মাত্র না করিয়া, কয়েকজন লোককে দিয়া কথোপকথন ছলে ঘটনার বর্ণনা করেন তাহাই নাটক"। কিন্তু 'কথোপকথন' নাটকের বহিঃ প্রকৃতি মাত্র। পুস্তকের চরিত্রগুলি কথোপকথনে নিযুক্ত হইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন চলিল, কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে পরস্পরের চিত্তবৃত্তির উপর কেহই কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। কথোপকথনের প্রারম্ভে তাঁহাদের যেরূপ মনের ভাব ছিল, কথোপকথন কালেও সেইরূপ রহিল, শেষে যখন কথাবার্ত্তা ফুরাইয়া গেল তখনও সেইরূপ রহিল। লেখকের মনোভাব জানাইবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছিলেন, কার্য্য ফুরাইয়া গেল তাহারা চলিয়া গেলেন। এরূপ ভাবের কথোপকথন যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, তাহাকে "নাট্য" বা "নাটক" আখ্যা দেওয়া যায় না। ইহাকে কথোপকথন ঘটনার বৃত্তিমাত্র বলিতে পারা যায়। Socrates এর শিষ্য, Aristotle এর গুরু Aristocles (plato) অনেক দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ কথোপকথন লিখিয়া গিয়াছেন; সেগুলি আদৌ অভিনয়োযোগী করিয়া লিখিত নহে। সেগুলির মধ্যে যেটাতে সক্রেটিস ও ভ্রান্তবুদ্ধি কূটতার্কিক (sophist) হিপিয়াসের তর্ক বর্ণিত হইয়াছে, সেইটী সম্পূর্ণ নাট্য লক্ষণ সমন্বিত। সক্রেটিস হিপিয়াসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান কাহাকে কহে। হিপিয়াস তৎক্ষণাৎ একটা ভাসাভাসা উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু যখন সক্রেটিস যুক্তিদ্বারা ব্যঙ্গোক্তিসহকারে তাঁহার মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কতকটা অবান্তর কথাবার্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন সংজ্ঞার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পর্য্যায়ক্রমে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটায়, এই কথোপকথনটী শ্রোতৃবর্গের প্রাণে শেষ জানিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলে। এইটীই প্রধান নাট্য-লক্ষণ। ইহাকে ইংরাজীতে Dramatic interest বলে।

বিশ্বনাথ তাঁহার নাটক প্রকরণে নাট্যস্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

চতুর্বিধৈরভিনয়ৈঃ সাত্ত্বিকাঙ্গিকপূর্ব্বকৈঃ।
ধীরোদাত্তাদ্যবস্থানুকৃতির্নাট্যং রসাশ্রয়ম্ ॥

সাত্ত্বিকাঙ্গিকপূর্ব্বক চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা রসাশ্রিত ধীরোদাত্তাদি অবস্থার অনুকৃতির নাম নাট্য বা নাটক। নাটকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যখন চতুর্বিধ অভিনয়ের কথা আসিতেছে তখন অভিনয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অভিপূর্ব্বস্তনীঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থ নির্ণয়ে।
যস্মাৎ পদার্থান্ নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥
অনুকর্ত্তৃস্থিতো যোঽর্থো হভিনয়োসোঽভিধীয়তে।
আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবে সাত্ত্বিকাহার্য্যকাবিতি ॥

চতুর্বিধ অভিনয়, যথা—সাত্ত্বিক, আঙ্গিক, বাচিক ও আহার্য্যক। পরগত-সুখদুঃখ-ভাবনা-হেতু ভাবিতান্তঃকরণের যে ভাব তাহাকে সত্ত্ব কহে; ইহার অভিনয় সাত্ত্বিক অভিনয়। অঙ্গের চালনাদ্বারা ভাবাভিব্যক্তির সহায়তা করার নাম আঙ্গিক অভিনয়। রসোচিত রাগানুষঙ্গী যে বাক্য নাট্যে তাহাকে বাচিক অভিনয় কহিয়া থাকে। বাক্যে উচ্চারণ ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রসোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বাক্য ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপাদন করাতে বাচিক অভিনয় বলা হয়। নাট্যোচিত অলঙ্কার বা ভূষণাদিধারণের নাম আহার্য্যক অভিনয়। এই চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা ধীর, উদাত্ত প্রভৃতি নায়কাবস্থার অনুকৃতিকেই নাটক বলিব। এই চারি প্রকার লক্ষণের কোন একটীকে বাদ দিয়া অভিনয়োপযোগী —নাটক হইতে পারে না। অভিনয়োপযোগী কেন, উহাকে নাটক আখ্যা দেওয়াই যায় না। উহা উৎকৃষ্ট পাঠ্য বা শ্রাব্য কাব্য হইতে পারে কিন্তু উহা কখনও উপভোগ্য দৃশ্য-কাব্য হইবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে শুধু কথোপকথনকে নাটক বলিলে চলিবে না। উহা কেবলমাত্র সাত্ত্বিক বা বাচিক হইতে পারে, এবং উহাতে নাট্যোকোচিত ঔৎসুক্য সৃষ্টি (Dramatic interest) ক্ষমতা না থাকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত সক্রেটিস ও হিপিয়াসের কথোপকথনের সুন্দর অভিনয় হইতে পারে। কথোপকথনে নিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় স্থান-কাল পাত্রোচিত বেশভূষাদি ধারণ করিতে পারেন, কণ্ঠস্বর ও বাক্যের সাহায্যে বিভিন্ন রসোৎপাদন করিতে পারেন, অঙ্গচালনাদ্বারা ভাবাভিব্যক্তির সাহায্য করিতে পারেন, বাক্য কথন কালে পরগত-সুখ-দুঃখানুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না, উপরন্তু উহাতে নাট্যোচিত ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও আছে।

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে যে-কোন কথোপকথনই ঐরূপে অভিনীত হইতে পারে; লেখকের মনোভাব প্রকাশক কথোপকথন মাত্রই নাটক। কিন্তু তাহা নহে। উদাহরণ স্বরূপ খুব পরিচিত দুই একটী কথোপকথনের উল্লেখ করিতেছি:—

'পিতা। দেখ মতি, কত ফুল ফুটেছে বাগানে।
পুত্র। দুটী ফুল দেও বাবা, পরি দুটি কাণে ॥'

এটী খুব উৎকৃষ্ট উপদেশজনক কথোপকথন, ইত্যাদি কিন্তু নাটক নহে। ইহাতে রস সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, ইহাতে নাট্যোচিত ঔৎসুক্য সৃষ্টির ক্ষমতা নাই।

মাইকেল মধুসূদনের "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"—শীর্ষক কবিতাটী কথোপকথন হইলেও নাটক নহে। ইহাতে সাত্ত্বিক ও বাচিক অভিনয়ের সুবিধা এবং নাটকোচিত ঔৎসুক্য সৃষ্টির ক্ষমতা থাকিলেও, আঙ্গিক ও আহার্য্যক অভিনয়ের সুবিধা নাই। রসাল বা স্বর্ণলতিকার বেশ ধারণ করিয়া উহাদের অংশ যথাযথরূপে অভিনয় করা অভিনেতার পক্ষে অসম্ভব।

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে নাটকের বিশেষত্ব ও আকর্ষণী শক্তি কোথায়। জীবনের আনন্দ কার্য্য—তাহাই বা কেন? কার্য্যই জীবন। নিষ্ক্রিয় সুখভোগ এক প্রকার বাসনা শূন্য, অনুরাগবিহীন পরিতৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে, বটে কিন্তু যদি তাহা কার্য্যের স্পন্দন আদৌ না থাকে তাহা হইলে সে আনন্দ ক্রমশঃ পীড়াদায়ক ও ক্লান্তিজনক হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুত্বহীন কার্য্যাবলীর দ্বারা

সাধারণ মনুষ্য-জীবন সীমাবদ্ধ। প্রচলিত রীতির নিদ্রালস নিয়মের মধ্য দিয়া তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে কোথা দিয়া জীবন অনিয়মগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, অবশেষে প্রথম যৌবনের সতেজ চিত্তবৃত্তির স্রোত প্রৌঢ়ত্বের আবিল হ্রদের মধ্যে পড়িয়া পথ হারাইয়া ফেলিতেছে। এই জন্য মানুষ অসন্তুষ্ট হইয়া নিত্য নূতন আনন্দের অনুসন্ধান করে, জীবনের এই একমুখী গতির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। এই সকল আনন্দের উপকরণের মধ্যে অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যাহা করিতে পারি না, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কৃপায় অপরকে সেইরূপ কার্য্য করিতে আমরা দেখিতে পাই। নাটকে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত বন্ধু বা শত্রুরূপে ধীশক্তি ও নৈতিকশক্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিজ নিজ মত ভাবাবেগ এবং চিত্তবৃত্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সর্ব্বক্ষণ একটা ঔৎসুক্যের দ্বারা আমাদের হৃদয়কে উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছেন,—অবশেষে—জয়-পরাজয়ে ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হইলে, কাহারাও বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল কাহারাও বা ক্ষুণ্ণ হইল। নাট্যকার তাহা হইলে কি করিবেন? তাঁহার কর্ত্তব্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাহা ঘটিয়াছে ঘটিতেছে বা ঘটিতে পারে সেইরূপ ঘটনাবলী একত্র করিয়া অল্পের মধ্যে সেইগুলিকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এরূপভাবে উপস্থাপিত করা, যাহাতে আমরা তদগতচিত্ত হইয়া যাই এবং আমাদের হৃদয়ে অদম্য ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠে।

Recitation অর্থাৎ আবৃত্তিতে কিন্তু উহা করিলেই যথেষ্ট হইল না বাচিক অভিনয়ের সহিত আঙ্গিক অভিনয় সংযুক্ত করিয়া একজনের দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন করান যাইতে পারে, উহাতেও স্বর ভঙ্গীর দ্বারা বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, উহাতেও দেশকাল পাত্রোপযোগী বেশ ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নাটক ও ঐরূপ বাচিক অভিনয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আবৃত্তিতে কবির উক্তিটুকু আবৃত্তিকার স্বরভঙ্গীর দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে বলিয়া থাকেন। নাটকে নাট্যকার কথোপকথনের মধ্যে বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁহার চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা অভিনীত হয়; সুতরাং ঘটনাপরম্পরার পরিবর্ত্তন তাঁহাদের দ্বারাই সূচিত হইয়া থাকে, নাট্যকারকে কিছু বলিয়া দিতে হয় না। যিনি যে চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন দেশ, কাল ও পাত্রোচিত আকৃতি-প্রকৃতি, কণ্ঠস্বর, বেশভুষা ও অঙ্গাদি-সঞ্চালনই তাঁহাকে সেই চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ করিবে; সুতরাং নাট্যকার তাঁহার লিপি কৌশলে সম্পূর্ণ অভিনয় করিবার সুবিধা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

তাহার পর নাট্যকারনির্দ্দিষ্ট দৃশ্যাবলীর সাহায্যে নাটকের অভিনয়। এইখানে Theatre বা রঙ্গালয়ের প্রয়োজন।

সুধা ও গরল সম আগ্রহে আমি যা'ব পান করি'

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমার আকাশে যদি কভু হাসে কোজাগরী পূর্ণিমা,
জুঁইফুলী রাতে যদি চাঁদ উঠে অপরূপ ভঙ্গিমা,
চকোরের মত জ্যোছনা-আসবে মশ্‌গুল্ করি' প্রাণ
সুষমী নদীতে তরণী ভাসায়ে গেয়ে যা'ব আমি গান।
মধু-রাতে যদি মাধবী-বিতানে হাসির মাধুরী ফুটে,
অলি গুঞ্জরে প্রতি ফুলে ফুলে, কোকিল কুহরি' উঠে.
বনানী বীণায় বাজে দখিনায় মধু মর্ম্মর ধ্বনি,
পত্র-শিহর বেণুর কুঞ্জে কলতান উঠে রণি'
আমার মনের বীণাখানি আমি বেঁধে নেব সেই সুরে ;—
পুষ্পিত শাখে আমি ফুল-টুকী ফূর্ত্তিতে ফুরফুরে।
অথবা আমার আকাশে যদি বা ঘন ঘোর দেয়া ডাকে,
বিজলী ঝলকে, যদি বাজ পড়ে, প্রবল ঝটিকা হাঁকে,
মাতোয়ালা নদী, নাগিনীর মতো যদি তরঙ্গ ফোঁসে,
আছাড়ি' পিছাড়ি' গোটা-নাল ভাঙ্গে প্রতিহত আক্রোশে,
কোন ভয় নাই......নির্ম্মম সুখে ছেড়ে দেবো আমি হাল,
যেথা খুসী তার ভেসে যা'ক তরী হয় হোক বান চাল।
যদি তারা-হারা অমাবস্যায় পউষের শীত রাতে
কাঁদে হা হা স্বরে পাতা-ঝরা বন হু হু উত্তরী বা'তে,
আমার পরাণ ভাঙিবে না ভাই, ভয়ে ও দীর্ঘশ্বাসে ;—
জল-হারা চোখে বাজাইব বীণা উৎকট উল্লাসে।
জীবন-পাত্রে ভরি'
সুধা ও গরল সম আগ্রহে আমি যা'ব পান করি'।

চালমাৎ—

—শ্রীসুমিত্রা রায়

হিরণের শ্বশুর মহাশয় ছিলেন একজন বড় দরের ব্যবসাদার।

মেয়ের বিবাহ দিয়া এবং জামাইকে মানুষ গড়িতে যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত অর্থব্যয় করিয়াও কিন্তু তাঁহাকে যে রকম নাকাল হইতে হইয়াছে এমন আর কখনো অন্য কোন ব্যবসায় হয় নাই।

হিসাবের গোড়াতেই গোল বাঁধিল।

লাভের মাঝখানে হিরণেরই শুধু পরের পয়সায় বিলাত যাওয়া, এবং অক্সফোর্ডের ব্যাচেলর হয়ে অবশেষে বার্-এর মেম্বারসিপটাও পেয়ে আসা—নির্ব্বিঘ্নেই ঘটিয়াছিল। এদিকে সৌভাগ্যের চরম সীমায় তুলিয়া দিয়া বৌটাই গেল মারা।

হিরণের মামা দাঁও কষিতে লাগিলেন, এবারে আর একবার বিয়ে দিয়া যে টাকাটা পাওয়া যাবে, তাতে বেশ ভালো যায়গা বাছিয়া নিয়া ব্যবসায় জাঁকিয়া বসিবারও ষ্টার্ট হিসাবে একটা সুরাহা হইবে।

এবং হিরণ নিজেও মানসপটে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখিয়া আকাশ কুসুমর মালা গাঁথিতেছিল।—

মামা বলেন, দশ হাজার টাকা চাই, একটী মিনার্ভা কিম্বা সান্‌বিম্—

পাত্র নিজে কল্পনা করে যশ মান গৌরব—

বন্ধুরা আসিয়া নিয়তই শুনাইয়া যায় তাঁহাদের দাবী মিষ্টান্নমিতরে জনা।—

বাংলা দেশের কন্যাদের পিতারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ওঁদের প্রত্যেকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে।—

মাধবীরও বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছে।

এক একবার এই চিন্তাটায় মন কিছু অস্থির হয়, কিন্তু ওটা নিছক দুর্ব্বলতাই।

মাধবী নিজে হ'তেই তাহাকে নেমন্তন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একমাস পরে ওদের শুভমিলনোৎবে যোগদান করিতে হইবে তাহাকে—এই কটা দিনেরই যা অপেক্ষা। নহিলে হিরণ, এখন হইতেই আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়াছে, —এ মাসের টাকা কটা নেহাৎ লোকসানই গেল। তা যাক্ গে। ছেলেবেলা হইতে মাধবীর পিতা বিনয় বাবু পরলোকগত প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র সন্তান হিরণের এখানে থাকিবার এবং পড়াশোনার খরচ চালাইয়া আসিয়াছেন। আজ এখন সে স্বাবলম্বী হইয়াছে আর পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকাটা পোষায় না,—তাইতেই।

এদিকে উদ্যোগ আয়োজন অনেক কিছুই চলে।

না জানি কেন হিরণের মনটা ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। মাধবীর বিবাহে তাহারই সবচেয়ে উৎসাহ দেখাইবার কথা অথচ সে একলাই যেন কোন কাজে সাহস পাইতেছে না।

মাধবীর সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার মত স্পর্দ্ধাটুকুও নাই।

উনিশ বছর ধরিয়া কাছে কাছে থাকিয়াও যাহার প্রতি হয়তো বা কিছুমাত্র আকর্ষণ জন্মে নাই, আজ না জানি কেন কেবলই তাহাকে লুকাইয়া বারে বারে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

মাধবী বলে Life would not be worth living without love,—ও কথাটার মানেই বা কি ?

হিরণ মনে মনে ভাবিয়া দেখে—

সমপাঠী কলেজের মেয়েরা নাছোরবান্দা। মাধবীকে ধরিয়া বলে, খাওয়াতেই হবে।

মাধবী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে,—আমি খাওয়াবো? না তোমরা?

অরুণা ব্যঙ্গ করিয়া বলে, তাতো বটেই। তোমার বিয়ে,—জমিদারের ঘরণী হতে চলেছো,—মজা কতই যে লুটবে,—আর খাওয়াবার বেলায়—

মাধবী অগত্যা পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দেয়।

শ্যামলী তখনই মুখে মুখে হিসাব করিয়া দেখে, শুধু তাহাদেরই ক্লাসে সাতাশ জন মেয়ে,—তাছাড়া আরও অন্ততঃ আটজন,—সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। গড়ে একটা করিয়া টাকা ধরিলে—

বাকিটা নিজেরাই চাঁদা করিয়া দিতে রাজী হইয়া অরুণা বলিল, শুভস্য শীঘ্রং, কালই—লজিকের ঘণ্টাটা বেমালুম ফাঁকি দেবো—

ফর্দ্দ ঠিক করা হইল, লুচি মাংস চপ কেক পুডিং—

এই বারেই প্রধান সমস্যা আয়োজন করে কে?

মাধবী বলিল, হিরণদাকে জানিস্?

আরুণা জিজ্ঞাসা করিল, কে? সেই চালিয়াৎটা? ওঃ, সে তো জানিই এ সব ব্যাপারে এক্সপার্ট—তাকে রাজী করাতে পারলে ভালই হয়—

মাধবী আশ্বাস দিল,—সে ভার আমার!—

তখন সন্ধ্যা।

হিরণ বেড়াতে না গিয়া আপনার ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মাধবী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ কি পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব কিছু বেধেছে?

হিরণ সচকিত হইয়া বলিল,—না একটা কবিতা লিখছি—

—তুমি কবিতা লিখছো? মা সরস্বতীর কমন্ডলে কি দুর্ভিক্ষ জেগেছে?

—কেন, আমাকে কি তুমি এতই অপদার্থ মনে কর?

—বাপ্‌রে, তা কেমন করে বলি। বিশেষ তুমি সাগর ডিঙিয়ে ফিরে এসেছো,—এবং—

—অত ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। আপাততঃ কি দরকারে এসেছো বল'—। আর কাজ না থাকে তো আমার জীবনের এই প্রথম লেখা কবিতাটারই পাদপূরণ করে দাও,

—আমার কাছে নিজের দৈন্য জানিয়ে লিখিয়ে নিতে লজ্জা করবে না?

—না, তোমারই শুভমিলন দিনটিকে উপলক্ষ করে অন্তরের কল্যাণ কামনা জানাতে চাই। ছন্দ বা মিলের যদি অভাব হয়, মনের ভাষা পড়ে নিয়ে, তুমিই সেটা মানিয়ে নিতে পারবে—এটুকু ভরসা আছে—

—যাও, সব তাইতে তোমার ঠাট্টা! কবিতা লিখছো না হাতী! একটা সত্যিকার কাজ করতে পারবে তো বল, ও সব বাজে জিনিষ ছেড়ে—

—তুমি যেদিন যখনই যা আদেশ করেছ করে তা শুনিনি বল, যে আজ—এমন করে অনুরোধ করছো?—কি করতে হবে—?

—কাল আমাদের এক পার্টি আছে, তোমাকে কিছু খাটতে হবে আমাদের জন্য—

—কাল? আচ্ছা, বেশ তো যাব!—আমার কিন্তু আর একটা engagement ছিল। এখনি একবার পোষ্টাফিসে যেতে হবে, টেলিগ্রাফ করে বারণ জানিয়ে আসি গে—

—তোমার কবিতাটা কিন্তু রেখে যাও দেখি মেলাতে পারি কিনা—

—ওটা সত্যিই কবিতা নয়।

—তবে?

—আজ থাক আর একদিন দেখাব!

—এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলছিলে ?

—তোমারই বিবাহ উপলক্ষে লেখা শুনে লজ্জায় হয়তো দেখতে চাইবে না, তোমার কাছথেকেই গোপন রাখবার জন্যে—

—বেশ তো, না যদি দেখাতে চাও নাই দেখালে। আমি তোমার ব্যক্তিগত গোপন সুখ দুখের কথা কিছুই জানতে চাই না—

মুখে যদিও স্বীকার করিল, হিরণের অন্তরের কথা জানিবার জন্ত তাহার কৌতূহল নাই সে চলিয়া গেলেই ঔৎসুক্যের আতিশয্যে মাধবী অস্থির হইয়া ঘরের জিনিষপত্র খানা তল্লাশ করিতে লাগিল, যদিইবা দৈবানুগ্রহে কোন সন্ধানই মেলে।

হিরণ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে নিজে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার দুর্ব্বলতার পরিচয়ও দিতে পারিবে না—তথাচ—

এমন সময় ছোট ভাই মন্টু আসিয়া খবর দিল, সুরমা ও কমলা আসিয়াছে।

এই দুইটী বাল্য সাথীর আগমন সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাঁচ মাস পরে দেখা—

তবু ইহাদের কাছে যাইবার মত শক্তি হটাৎ যেন সে হারাইয়াই ফেলিয়াছিল। নিজের অন্তরের দৈন্য ও দুর্ব্বলতা আর সকলার কাছেই গোপন করিয়া চলা যায়, কিন্তু ইহাদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হয়তো তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে।

উদ্‌গত সঙ্কোচের আবছায়াটুকু কোনও রকমে ঢাকিয়া মাধবী বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

কমলা বলিল,—বেশ যা হোক, আধঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি—

সুরমা টিট্‌কারি দিল—হয়তো বসে বসে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন, এত' বিহ্বল, অভাজনদের ডাক গিয়ে পৌছায় নি।

মাধবী লজ্জিত হইয়া বলিল,—ঠাট্টা করতে হবে না। তারপর তোদের খবর বল। সুবাবু এবং নিবাবু হটাৎ যে সদয় হয়ে পড়লেন ?—খোকা কোথায় ?

কমলা বলিল—গাড়ী থেকে নামতেই চালিয়াৎ হিরণবাবুর সঙ্গে দেখা। সুরমার ছেলেটীও হয়েছে, মায়ের মতই হ্যাংলা। আপন পর মানে না—যে ডাকে—

সুরমা রাগতঃ স্বরে প্রতিবাদ করিল, থাম্ তুই, নিজেরই বরং পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। এই দুবছরতো এক বাড়ীতে থেকে অনেক কিছুই দেখ্‌লাম। যেন বিলেতে কেউ কখনো যায় না। চালিয়াৎই একমাত্র অসম সাহসী পুরুষ। দিন রাত গল্প শুধু ওর সম্বন্ধেই। কখনো নিন্দে কখনো রাগ কখনো বা অনুরাগ—

হিরণ বাড়ী ফিরিতেছিল দেখিয়া মাধবী সুরমাকে বাধা দিয়া বলিল, থাম্ বাপু। লোকে শুনলে মনে করবে কি ?

অতঃপর হিরণের হাত হইতে খোকাকে নিজের কোলে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—সমীর বুঝি নাম ? দেখি, এসতো খোকা ! আমি তোমার মাসী হই যে—

সমীর কিন্তু মাকে দেখিয়াই হিরণের কাছ হইতে তাহারই অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িল, মাধবীর দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

মাধবী রাগ করিয়া বলিল, এই বুঝি চেনা অচেনা নেই,—

কমলাও শ্লেষ করিল,—তাইতেই বলছিলাম,—হিরণবাবুই আপনার লোক—এবং—

সুরমা বলিল,—তাই—বুঝি ? তবে খোকন আমার আদর চেনে এটা মিথ্যে নয়। ডাইনী মাসীর দরদ ও' দেখেই বুঝে ফেলেছে।

হিরণের ঘরটাতেই চায়ের আয়োজন চলিল।

প্রথম দর্শনে সরিয়া যাইলেও সমীর কিন্তু মাধবীকেই বেশী করিয়া ভাল বাসিল।

আনন্দের আতিশয্যে মাধবীর ফিরোজা মাদ্রাজী শাড়ীটাতে চা ফেলিয়া দিয়া, খেলা করিবার সময় ফুলদানীর কাচ ভাঙিয়া ও এমনি সহস্র উপায়ে সমীর সকলকেই উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল।

সুরমা তিরস্কার করে। নিজের মনে আক্ষেপও করে,—হতভাগাটার জন্য কোথাও বেড়াতে এসে সোয়াস্তি নেই,—

মাধবী বাধা দিয়া বলিল,—বালাই ষাট্, গাল দিতে নেই। ছেলে মানুষ দুষ্টুমিতো করবেই—

কমলা হিরণকে বলিল,—আপনি যে একেবারে নিঃসাড়, নিস্পন্দ,—

হিরণ হাসিয়া উত্তর দিল,—আপনারা সবাই যেখানে স-রব, অন্ততঃ একজন শ্রোতা হিসাবেও চাই তো—

মাধবী বলিল,—অভিনয় করলে দর্শকেরও প্রয়োজন।—হিরণদা, তুমি তো ভাল অভিনয় করতে পার', একটু দেখাও না এঁদের, অনেক আশা করে এসেছেন—

হিরণ বলিল—অভিনয় করবে তো তুমি-ই ?

মাধবী জবাব দিল,—না, তার এখনো দেরী আছে। আজকের জন্য অন্ততঃ—

কমলা বলিল,—আমরাও আনন্দচিত্তেই এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

মাধবী বলিল,—তুমি যে কবিতা আজ রচনা করেছ, সেইটাই না হয় আবৃত্তি কর'—

সুরমা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—উনি কি এবার কবিতা ধরেছেন ?

মাধবী বলিল,—প্রমাণ পাবে এখনই! দেখছ না মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস,—অনবরত কড়িকাট দর্শন,—সলজ্জ নীরবতা,—আর আর যত কিছু লক্ষণ আছে—

সুরমা প্রশ্ন করিল,—এ অদ্ভুত বৈরাগ্যের কারণ কি ?

কমলা বলিল,—হয়তো আমাদের সঙ্গ ওঁর ভাল লাগছে না-

সুরমা বলিল,—আপনি আবার বিয়ে করুন হিরণবাবু। নইলে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবেন—

মাধবী হাসিয়া বলিল,—এতক্ষণে ঠিক ঔষধ বাতলেছ—

কমলা বলিল,—তা আর অন্যায় কি, ওঁর বয়সে কত ছেলে একবারই বিয়ে করে না—

সুরমা বলিল, দেখিস্ প্রেমে পড়িস্ না যেন।

হিরণ বলিল,—আপনাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু—

সুরমা বলিল,—শুধু ফাঁকা ধন্যবাদ পেয়ে কি হবে? আমাদের কৃতার্থও করুন! আমরা ইতর জন নই, শুধু মিষ্টান্ন পেয়ে ভুলব না। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়েও দেবেন স্বীকার করুন,—

হিরণ বলিল,—তাতে আর বাধা কি? আপনাদের কৃতার্থ করতে পারলে আমার নিজেরও জন্ম সার্থক হবে—মনে করব!—

পরের দিন।

টি পার্টির প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বটী ভালো ভাবেই কাটিল। সুরমা ও কমলা বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

হিরণ যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে সমস্ত আয়োজন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। সে কিন্তু মেয়েদের যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও নিজে কিছু আহার্য্যের অংশ না লইয়া অন্যত্র বিশেষ কাজের অছিলায় প্রস্থান করিয়াছিল।

তাহার এই পলায়নের অন্তরালে কতদূর সয়তানী দুষ্টামি ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে মেয়েদের বেশী দেরী লাগে নাই।

পানের মধ্যে হয়তো বা ইচ্ছা করিয়াই জর্দ্দা দিয়াছিল,—যাহাদের অভ্যাস ছিল না তাহারা তো মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম করে।

হিরণকে সে সময় কাছে পাইলে অপমান করিবার কোন উপায়ই কেহ বাদ দিত না।

সুরমা এবং কমলার বিশেষ কিছু হয় নাই।

মাধবী কিন্তু অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া অবধি হিরণের সহিত আর জীবনে কথাটীও কহিবে না সঙ্কল্প করিয়া বসিল।

হিরণ যেন কিছু না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল,—ব্যাপার কি মাধু? তোমরা আজ হটাৎ এত গম্ভীর হয়ে পড়লে যে! পার্টির আগে এত খোসামদ আর—এখন—

মাধবী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, কি হয়েছে জানেন না যেন! ন্যাকা!

— সত্যিই জানি না। কেন কি হয়েছে?

—পানে দোক্তা দিয়ে রেখেছিল, সবাই খেয়ে মরে আর কি—

—দোক্তা দিয়ে রেখেছিলাম? পাগল? আমি কি জানি না,—ও জিনিষটাতে তোমাদের অনেকেরই অভ্যাস নেই?—

— তা হলে এল কোথা থেকে?

—পানওয়ালাকে বলেছিলাম, খুব ভাল করে পান সেজে দিতে, তার মানে যে ওরা বুঝেছে—সত্যি বলছি মাধু, আমার কিছুমাত্র দুরভিসন্ধি ছিল না—

হিরণ মুখ চোখ বিষন্ন করিয়া এমন কাতরতা দেখাইল, মালতী তাহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিল না।

অবশেষে নিজেই হিরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া সবার কাছে তাহার নির্দ্দোষিতার কথাই ঘোষণা করিতে লাগিল।

মণ্টু ভোরবেলাতেই সেদিনকার সংবাদপত্রখানি হাতে লইয়া চোড়দিকে দেখাইতে আসিল, এক জায়গাতে লেখা আছে,—কাশ্মীর ষ্টেটের নূতন দেওয়ান ব্যারিষ্টার হিরণ্ময় রায়ের সহিত পার্ব্বতীপুরের জমিদার অমৃতদেব মিত্রের একমাত্র কন্যা লীলারাণীর শুভ পরিণয় হইবে, আগামী তেরই ফাল্গুন। এই উপলক্ষে হিরণ বাবুর কাশ্মীর গিয়া কাজে যোগদান করিতে পনের কুড়িদিন দেরী পড়িয়া গেল।

—তেরই ফাল্গুন, অর্থাৎ মাধবীরও যেদিন বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে!

কমলা এবং সুরমাও শুনিল।

এত বড় একটা ব্যাপার, তাদের কেহই জানে না,—হিরণ নিজেও ইচ্ছা করিয়া প্রকাশ করে নাই!—সংবাদপত্রে ছাপা না হইলে সকলেই হয়তো বিবাহ না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারিত না। আশ্চর্য্য! হিরণ এতো চাপা ছেলে কেহই আশা করে নাই।

এমন কি কাশ্মীরের দেওয়ান হইবার সুখবরটাও জানাইতে নাই! নিঃসম্পর্কীয় হইলেও,—হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুতো বটেই। এতদিনকার পরিচয়, আলাপ, ভালবাসা, সেকি কিছুই স্বীকার করে না?

মাধবীর একথাটাও মনে হইল, পরশু যে কবিতা লেখার নাম করিয়া কি একখানা কাগজ গোপন করিয়াছিল তাহাদের দেখিতে দেয় নাই, হয় তো বা এই সম্পর্ক ঘটিতই কোনও চিঠিপত্র। লেখা শেষ হইলে পোষ্টাফিসে নিজেই ফেলিয়া দিতে গিয়াছিল!

অভিমান করিবার কারণ আছে যথেষ্ট কিন্তু সে তথাটা ব্যবহারে জানাইয়া লাভই বা কি? এই ভাবিয়া মাধবী নিজেকে সংযত করিল, এবং হিরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে ও ব্যাপার লইয়া কোনও রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিতে ইচ্ছা তার হয় নাই মোটেই।

কলেজের পার্টিসংক্রান্ত কাণ্ডকারখানাটাও আজ আবার মনে হইল, হিরণের স্বেচ্ছাকৃত দুষ্টামিই—mere accident নয়।

মাধবীর বাবা বিনয়বাবুও শুনিলেন। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু খবরের কাগজে যখন লিখিয়াছে—অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই।

তিনি নিজেই মাধবীর বিবাহের দিন আরও এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিলেন। বলিলেন, হিরণ না বললেও আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। একদিনে দুটো বিয়ে ঘটলে

কোনটাতেই আমোদ পাব না। হাজার হোক, হিরণকে আজও ছেলের মতই ভালবাসি যখন, তার আনন্দ-উৎসবে আমরা যোগ দেব না সেটা হোতেই পারে না।

মামা বন্ধু আত্মীয় পরিজন সবাই আসিয়া হিরণকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন, কোথায় বিয়ে, কি বৃত্তান্ত, আগে থাকতে কিছুই জানালে না কেন—ইত্যাদি—

হিরণ মামাকে আশ্বাস দিল, দশহাজার টাকা এবং একখানি সেভ্রোলেট,—কিছুই বাদ পড়ে নাই।

বাড়ীর অপরাপর পরিজনদের জানাইল, সে শুনিয়াছে বধূটী নাকি গৃহকর্ম্মে অসাধারণ পটু—অর্থাৎ রাঁধিতে বাড়িতে দ্রৌপদীর মতই।

বন্ধুরা যে মিষ্টান্নের ব্যাপারে বাদ পড়িবেন না, সেই সংবাদটুকু জানিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

কমলা ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার? একেবারে চুপি চুপি কাজ সারছেন যে? আমরা তো কেড়ে নেব না, ভয় কি,—

সুরমা মন্তব্য জানাইল, হয় তো বা বৌ কাণা কিম্বা খোঁড়া,—ভয়ে এবং লজ্জায় প্রকাশ করেন নি।

হিরণ সস্মিতমুখে জানাইল,—সকলকে হটাৎ surprise করব ভেবেই আগে বলি নি। যাক্, জানাজানি যখন হয়েই গেছে, তখন আর বলতে বাধা নেই,—বৌ অপরূপ রূপসী এবং গুণবতী এবং দশসহস্র রূপার চাকতিও সঙ্গে করে আনবে,—অতএব—

মাধবীর বিবাহে হিরণ বিলাত থেকে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছে, এবারে কিন্তু হিরণের বিবাহে মাধবী বাড়ীতে থাকিয়াও জানাইল, সে ও উৎসবের কোন অংশেই যোগ দিবে না।

হিরণ নিজে আসিয়া সাধাসাধি করিল, কিন্তু মাধবী বলিল, ওটা আমাদের পক্ষে অপমানই শুধু আর কিছু নয়। যখন নিতান্তই জানাজানি হইয়া গিয়াছে, আর না বলিলে নয়—তাই—

বরানগরে এক বাগান বাড়ীতে কন্যাপক্ষ বিবাহের সব আয়োজন করিয়াছে।

বরের সহিত মহিলা বন্ধুদের মধ্যে কমলা এবং সুরমা প্রভৃতি অনেকেই বরযাত্রী হইয়াছিলেন, মাধবীদের বাড়ীর সকলেই গেলেন, একা মাধবীকেই কিছুতেই রাজী করান গেল না।

হিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—মাধু, তুমি কি আমার এই বিবাহে সন্তুষ্ট নও? সত্যি যদি বল, আমি এখনও অস্বীকার করে আসি—

মাধবী বলিল,—স্বীকার করবার সময়ও যখন আমাদের মতের দরকার হয় নি—এখনও হবে না।—তবু জিজ্ঞাসা করি টাকা, গাড়ী বধূর রান্নাকরিবার ক্ষমতা এবং অপরূপ রূপ—সমস্তই তুমি পাবে, কিন্তু নিজের মনেই নিজে সন্তুষ্ট হতে পেরেছ কি?

—কেন এ ছাড়া মানুষ আর কি চায়?

—চাইবার কিছুই নেই কি? টাকা এবং রূপের চেয়েও বড় জগতে কাম্য তোমার নেই কিছুই!

—আছে, তা জানি। জগতে এমন জিনিষ আছে যা পাবার আশা থাকলে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি—কিন্তু সেটা দুরাশাই। তাই পাছে লোভ জানিয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ি সেই ভেবেই তো নিজের মনকে নিজেই প্রলোভন দিয়ে ভোলাতে চাই। তোমার কথায় মনের ব্যাকুলতা আমার বাড়েই তাই এ আলোচনা করতে চাই নি। যা পেতে চাই কিন্তু পাব না তাই নিয়ে ভাবতে গেলে শুধু দুঃখই জাগাবে।—কিন্তু তুমি আসবে না কেন?

—নিজের মনের সঙ্গেই বোঝা পড়া শেষ না করে তুমি আর একটী মেয়েকে হত্যা করতে চলেছ। এ মিলনের সাক্ষী হতে আমি পারব না!

অ্যাসিটিলিন আলো, তিন দল বাজনা, তেইশখানা মোটর ইত্যাদি সমভিব্যাহারে হিরণ বরবেশে যাত্রা করিল।

মাধবী ঘরে বসিয়া খুব খানিক কাঁদিল—নীরবে—নির্জ্জনে। নিজে হইতে উপযাচিকা হইয়া কেমন করিয়া সে জানাইতে পারে একমাত্র তাহাকেই সে কামনা করিয়া আসিয়াছে এবং হিরণের আজিকার এই শোভাযাত্রা তাহারই মৃত্যুর আর্ত্তনাদ ঘোষণা করিতেছে। মাধবী প্রতীক্ষা করিতেছিল, হয় তো হিরণ নিজেই বলিতে আসিবে সেও যে শুধু তাহাকেই চায়। অর্থ সম্পত্তি অথবা অসার রূপ তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। হিরণ একবার যদি বলিত—

আশা এবং আকাঙ্ক্ষার শেষ সূত্রটুকুও আজ ছিঁড়িয়া গেল।

ঘণ্টা দুই ধরিয়া কাঁদিয়া মাধবী অবশেষে উঠিয়া বসিল। পিতার নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিল, 'মন নিতান্তই খারাপ, চুপ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া রাতের গাড়ীতেই মামার বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আবার কালই ফিরে আসব'—

এদিকে হাওড়া ষ্টেশনে সেকেণ্ডক্লাশ একখানা গাড়ীতে উঠিয়াই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

হিরণ নিজে,—

বরবেশ ত্যাগ করিয়া আসে নাই, কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিবার জন্যই অত্যন্ত উদগ্রীব—

মাধবীকে দেখিয়া সেও কম আশ্চর্য্য হয় নাই।

সেই মুহূর্ত্তেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল,—মাধবীর পাশ দিয়া নামিয়া পড়িবারও সুযোগ হ'ল না তার।

যেন কোন একটা কৈফেয়ৎ না দেওয়াটা ভাল দেখায় না তাই হিরণ বলিল,—তুমি হয় তো আশ্চর্য্য হচ্ছ মাধু,—

মাধবী বলিল,—না, তোমার কোন ব্যবহারে আশ্চর্য্য বা কৌতূহল বোধ করবার অবসর আমার নেই। তোমার সঙ্গে কথা কইবার স্পৃহাও নেই জেনে রাখলে বাধিত হব।—

—সত্য কথাটা তোমাকে না জানালেও আমি সুস্থির হব না। আজকের সমস্ত ব্যাপারটাই আমার ছলনা—কদিন থেকে নিয়তই সকলে মিলে আমাকে পাগল করে তুলেছিলেন বিয়ে কর' বিয়ে কর'—এই এই একমাত্র অনুরোধের ছলে অভিশাপ জানিয়ে।—পালাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। চাকরীটা পেয়েই একটু সুযোগ হল ভেবে লুকিয়েই বেড়িয়ে পড়বার মতলব ঠিক করে রেখেছি, তোমারই নামে একখানা চিঠিও লিখছিলাম কাতরতা জানিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তোমার বিয়েটা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হল না। তুমি কিন্তু নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর' এই কথা বলে চিঠি লিখ্ছিলাম, এমন সময় তোমাদের পার্টির জন্য সাহায্য করতে ডাকলে। নিজের কাশ্মীর যাত্রার দিনটা postpone করতে হল। কিন্তু কারণ একটা জানাতে হবে। আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজে বিয়ে করছি এই মিথ্যে ওজরটাই জানালাম। কথাটা মনে জাগতে শেষ মুহূর্ত্তে তোমাদের সকলার সঙ্গে একটু রহস্য করবারও ইচ্ছা হল।—এই জন্যই বিবাহের নকল আয়োজন। ওখানে সকলি উপস্থিত হয়ে দেখলেন,—দশ হাজার টাকার তোড়া মজুতই আছে তবে ওটা মামাকে না দিয়ে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাছেই তাঁর কথঞ্চিৎ ঋণ শোধ হিসাবেই পাঠাতে বলে এসেছি। গাড়ীখানা মামাকেই দিলাম। আর কনের বদলে সেখানে হাজির করিয়ে রেখেছিলাম, একটা উড়ে বামুন বাড়ীতে রান্না করে দেবার জন্য এবং একটা ছোকরা খোট্টা চাকর অন্যান্য গৃহকর্ম্মে সাহায্য করতে। ভূরি ভোজনের ব্যবস্থাটাও ফাঁকি দিই নি। আমিও সেই ফাঁকে লুকিয়ে একেবারে সোজা কাশ্মীর অভিমুখেই চলেছি।—বিলাতে থাকবার সময় একটা ওয়ারবণ্ড লটারিতে বিশ হাজার টাকার প্রাইজ পেয়েছিলাম—তার সমস্তটাই এই রকম

খরচ পত্র করে রিক্ত হস্তেই দেশ ছেড়ে চলেছি---হয়তো বা চিরদিনের জন্তই—

—হিরণদা তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম তাই সহ্য করতে পারি নি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর', এবং—এবং—আমার অনুরোধ—

—কি বল !—এ কি, কাঁদছ কেন ? তোমার কথাটাও আমার জিজ্ঞাসা করা হয় নি। একেলা ঘরে বসে রইলে, তারপর হটাৎ আবার কিই বা মনে হল কোথায়ই বা চলেছ ? তোমাকেও কি আমি ভুলই বুঝেছি এত দিন ? তুমিও কি আজ বাড়ীতে এখানকার সব কিছুই ফেলে রেখে আমারই মত রিক্ততার বেদনা বুকে করে নিরুদ্দেশে পালাতে ছুটেছ ? সত্যিই কি তাই ?

মাধবী কিছুই বলিতে পারিল না। হিরণের হাত দুখানির মধ্যে নিজের মুখ ঢাকিয়া বিহ্বল হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অদূরে আর একটা বার্থে একটা সাহেব গোরা বসিয়াছিল। সে ব্যাপার দেখিয়া কিছুই না বুঝিয়াও ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—Bah ! Capital ! Excellent !

মাধবী লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

হিরণ লাফাইয়া উঠিয়া সাহেবটার নাকের উপর এক ঘুষি মারিল, সে বেগতিক বুঝিয়া ক্ষমা চাহিয়া তবে রেহাই পাইল।

হিরণ মাধবীকে বলিল,—আমি প্রার্থনা করলে তুমি বিমুখ করতে না, এ আভাষ যদি জানতাম !—আমি মনে করেছিলাম। নিজের গোপন কথা সবার কাছ থেকেই গোপন রেখে চলে আসব—

মাধবীও রুদ্ধ স্বরে বলিল,—আমিও যে তোমাকে চিনতে পারি নি—

সে রাত্তে বরানগরের বাগানবাড়ীতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সকলেই অনুপস্থিত হিরণের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছিলেন অনেকেই এখনো এই অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রকম ফাঁকির কথাটা আলোচনা করিতেই উন্মত্ত—গৃহে ফিরিবার জন্ত ব্যস্ততা কাহারও ছিল না। একমাত্র বিনয়বাবুই সেখান হইতে লজ্জায় গা ঢাকা দিয়াছিলন।

হিরণের মামার গালাগালি চীৎকারটাই সব চেয়ে বেশী শোনা যাইতেছিল।

পিওন আসিয়া টেলিগ্রাম দিল—কেহই ফিরিবেন না। হিরণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। বিবাহোৎসবটা সত্যিই ফাঁকি নয়—

বিনয়বাবুও বাড়ীতে এই রকম আর একটা তার পাইয়াই হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আবার কি চালাকি দেখাতে চায় !

হিরণের মামা বল্লেন,—ও বেটার কোন কথাই বিশ্বাস করি না।

বিনয়বাবু নিজের টেলিগ্রামখানি দেখালেন,—মাধবী নিজে জানাচ্ছে—

গোলমালে আরও ঘণ্টা দুই কেটে যাবার পর সহসা—

একটি মোটর আসিয়া থামিল।

হিরণ নিজে, এবং সঙ্গে মাধবীও—

বিনয়বাবু আপনি অগ্রসর হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।

কমলা মন্তব্য প্রকাশ করিল, অভিনয়টা খুব ভালই হয়েছে হিরণবাবু !

সুরমা নূতন উৎসাহে শাঁখে পোঁ ধরিল।

এবং ... ...

পরদেশী চিঠি

—শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

—এক—

গেণ্ডেরিয়া

ভাই মিনি, ২রা ডিসেম্বর।

তোর ২৭শে নভেম্বরের চিঠি পেয়ে খুবই সুখী হয়েছি। তুই খালি খালি নূতন খবর চাস্, এবার একটা সত্যিই মনের মতন খবর দোব।

গত রবিবার আমাদের নারী-সমিতিতে একটি বাঙ্গালী মহিলাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। তিনি সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে জাপান বেড়িয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে জাপানীদের জাতীয় উন্নতির নানারকম কাহিনী শুনতে যে কি চমৎকার লাগছিল সে আর কি বল্‌বো!

তিনি বললেন, তোকিও সহরের হঙ্গকু নামক অঞ্চলে একটি জাপানী হোটেলে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। জাপানের বিশাল রাজধানীর সর্ব্বত্রই তখনও সেই ভীষণ নিষ্ঠুর ভূমিকম্পের ধ্বংস লীলার প্রমাণ-চিহ্ন অনেক কিছুই চোখে পড়ে। কিন্তু সেই ধ্বংসের ভিতর হতেই যেন কোন যাদুকরের ইসারায় অসংখ্য অট্টালিকা শ্রেণী দিন দিন বেড়ে উঠে জাপানীদের অবিচলিত অধ্যবসায় ও উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছিল। ঐ স্বল্পভাষী অক্লান্ত-কর্ম্মা জাপানীগণ তোকিওর মত (কলিকাতার তিন গুণ) একটি বৃহৎ সহরের পুনর্গঠন কার্য্যও যে কত শৃঙ্খলায়, কত বিনা আড়ম্বরে হতে পারে তাই যেন প্রমাণ করতে ব্যস্ত। এই রূপ সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংশের অভিনয় কল্‌কাতা বা বোম্বেতে হলে যে কি হতো ভাব্‌তেও শিউরে উঠতে হয়,—কল্পনা অবসন্ন হয়ে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় জাপানীগণ সর্ব্ব বিপদ জয়ী হতে, ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত রাখতে কৃতসঙ্কল্প: এই লুপ্ত সমৃদ্ধির জন্য, আপশোষ করবার অবসর তাদের কোথায়?

জাপানের পূর্ব্বাঞ্চলের লোক প্রকৃতি দেবীর যে সর্ব্ব-সংহারক মূর্ত্তি, মৃত্যুর যে ভীষণ দৃশ্য, ধ্বংসের যে নির্ম্মম ছবি দেখেছে তা কখনো ভুল্‌তে পারবে না—মানুষ তা পারে না। কিন্তু তার জন্য আছে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ও এক ফোঁটা অশ্রু। তাও সম্পত্তির শোকে ততটা নয়, জাপানের লোকক্ষয় ও বলক্ষয়ের জন্য যতটা।

তিনি বল্‌ছিলেন যে নৈরাশ্যের চিহ্ন কোথাও দেখেন নাই। যে লক্ষপতি বৃদ্ধ বয়সে ঐ আকস্মিক বিপদে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফকির হয়েছে, হয়ত সন্তান-সন্ততি প্রিয়জন সবই ঐ নিদারুণ ধ্বংশযজ্ঞে আহুতি দিয়েছে, সেও কর্ত্তব্যের আহ্বানে কর্ম্ম যজ্ঞে ব্রত। বড় ঘরের ছেলে যারা আভিজাত্যের গর্ব্বে কায়িক পরিশ্রমের কায এক সময়ে নিতান্ত তুচ্ছ বা হেয় মনে করতেন আজ সেই শ্রমিকের কাযও তাঁর কাছে আদরনীয়, নচেৎ দেশের এই মহা ক্ষতি যে শীঘ্র পূরণ হবে না, জাপান যে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদিগের সঙ্গে সমান গৌরবে চল্‌তে পারবে না? জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার কঠোর সাধনার নিকট শোক, দুঃখ, দুর্ব্বলতার স্থান কোথায়? জাপানের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে দেশমাতার এমন কে কুসন্তান আছে যে প্রাণান্ত চেষ্টায় দেশের ক্ষতি পূরণে বিমুখ হবে? প্রত্যেক দেশ ভক্তের একাগ্র সাধনার ফলেই না জাতি এতদূর উন্নত ও সম্মানিত হয়েছে, তাতে শৈথিল্য এলে আবার যে পিছিয়ে পড়তে হবে।

তারপর বড়ই আক্ষেপের সহিত তিনি বল্লেন যে দুঃখিনী

ভারত মাতার সন্তান আমরাই এখনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সম্মুখের অজানা নূতন পথ না পশ্চাতের চির পরিচিত পথ। কোনটি অধিক নিরাপদ! দেড়শত বৎসরেও তার বিচার শেষ হল না। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগতে কত কীই ঘটে গেল। কত নিপীড়িত জাতি স্বাধীনতা লাভ করলো, কত অনুন্নত জাতি উন্নত হলো। আর আমরা ভারতবাসী সর্ব্বস্ব হারিয়ে এখন বিদেশী বিজেতাদের সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের তর্ক করেই বিনা আয়াসে দেশোদ্ধারের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং তর্ক করছি যদি কিছু ফিরিয়ে পাওয়া যায়, তার অংশ কে কতটা ভোগ করবো তাই নিয়ে। হায় রে! স্বদেশ সেবা যে ত্যাগের—ভোগের নয়, দানের—দাবীর নয়, সে জ্ঞান এখনও অতি অল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঐ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের মনে বিস্তার করতে না পারলে ত আত্মবিরোধ দূর হবে না; কারণ বিরোধ হয় ভোগ ও ভোগ্য বস্তু নিয়ে নয়।

তিনি বলছিলেন যে তাঁর পরিচ্ছদের নূতনত্বে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও বন্ধু জুটতে মোটেই বিলম্ব হয় নাই। পার্ক মন্দির, স্কুল প্রভৃতি যখনি যা দেখতে যেতেন সর্ব্বত্রই বহুলোক ব্যগ্রভাবে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতো।

তোকিওতে পৌঁছিবার পরের দিন বিকেলে তাঁরা উয়েনোপার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন যে ঐ উদ্যানটি আয়তনে যেমন বড়, দেখতেও তেমনি মনোরম। ভূমিকম্পে এর বিশেষ ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না। সুবিস্তীর্ণ একটি টিলার উপরিভাগ প্রায় সমতল, নানা বৃক্ষ-লতা-পুষ্প সুশোভিত ঐ উদ্যান রচিত হয়েছে। পার্কের নীচেই পশ্চিমদিকে একটি বৃহদায়তন হ্রদ তাতে অসংখ্য পদ্মফুলের শোভা। ঐ উদ্যানের মাঝখানে বহু পুষ্প পত্রে আচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ হ্রদ এবং পার্শ্বস্থিত গৃহ শ্রেণী সন্ধ্যার ম্লানালোকে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে সে দৃশ্য অতীব মুগ্ধ কর।

উয়েনো পার্কের একপ্রান্তে একটি পশুশালা অবস্থিত। উহা আলিপুরের চিড়িয়াখানার মত অত জমকাল না হলেও বেশ দেখবার মত। এখানে কোন কোন ভারতীয় জীবেরও সাক্ষাৎ ঘটলো।

জাপানের যে কোনও উদ্যান, হ্রদ বা মন্দির প্রান্তে যখনি তিনি গিয়েছেন তখনি আরও একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেছেন—জাপানের শিশু ও কিশোর কিশোরী। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখেন নাই। আর যখনি তাদের সংস্পর্শে এসেছেন তখনি শিষ্টাচার ও নির্ভীকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। শিশু ও বালক বালিকাগণ পরিবার ও জাতির যে কি মহাসম্পদ, জাপানীরা তা ভাল করেই বুঝেছে। দেশ-ভক্তির বড়াই আমরা সকলেই করে' থাকি, অন্ততঃ নিজের মনে মনে, কিন্তু তার প্রথম নিদর্শন নিজ নিজ পরিবারস্থ শিশু ও বালক বালিকাদিগকে নবীন আদর্শে বর্ত্তমান জগতের যোগ্য করে গড়ে তোলা, জাতীয় দুর্গতি ও দুর্নাম ঘুচাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে সঞ্চার করা! কিন্তু সে চেষ্টা আমরা ক'জনে করি? জাপানের ঘরে ঘরে মানুষ গড়বার একাগ্র সাধনা। তাই জাপান উন্নত, আর ভারতের সর্ব্বসাধারণ ত দূরের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়, এমন কি দেশপূজ্য নেতাগণ ও অনেকেই নিজ নিজ সন্তান-দিগকে মানুষ করা বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য দেখিয়ে পরিবার ও দেশের ক্ষতি করেছেন। কাজেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাপানের সৌভাগ্য যেমন তার সুকৃতির পুরস্কার ভারতের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যও তেমনি আমাদের দুষ্কৃতির শাস্তি। দেশের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে তিনি মানুষ গড়বার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত না হয়েই পারেন না। দেশের দুঃখ দূর করনের জন্য যিনি যে চেষ্টাই করুন না কেন, কোন প্রকারেই তেমন সফল হবেন না যতদিন না দেশে যথেষ্ট সংখ্যক প্রকৃত মানুষের আবির্ভাব হবে। অতএব এই কাজই প্রথম কাজ, পরিবার ও জাতির গৌরবের কাজ—সকল মহত অনুষ্ঠানের ভিত্তি। আমরা মায়ের জাতি, আমরা যদি মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করি, যদি নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ছেলে মেয়েদের শৈশব হ'তেই শিষ্টাচার, সাহস ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেই তবে জাতির এই দুঃখ

দুর্গতি অচিরেই ঘুচে যাবে। জাতির ভবিষ্যত আমাদের কর্ম্মের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য দৈববলে ঘটে না কর্ম্ম ফলেই ঘটে থাকে।

জাপানের মত কালোপযোগী আদর্শ সামনে রেখে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যদি নিজ নিজ পরিবারে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ গড়্‌বার ব্রত গ্রহণ করেন তবে ভারতের দুঃখও ঘুচতে বিলম্ব হবে না। আপনারা দারিদ্র্যের কথা তুলছেন, কিন্তু মনে রাখ্‌বেন যে মানুষের কোনও মহত উদ্যমই কখনও অর্থের অভাবে ব্যর্থ হয় নাই। মনের দারিদ্র্যই আমাদের উন্নতির একমাত্র অন্তরায়—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ জাতির কি অন্য কোনও বিঘ্ন থাকতে পারে?

তিনি আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা বল্লেন সবই ত আর এক চিঠিতে লিখে শেষ করা যাবে না, আর তেমনিকরে গুছিয়ে লিখ্‌বার বিদ্যেও আমার নেই; তবে যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে তোমার চিঠির উত্তরে ফের লিখবো। তার বক্তৃতা যে খুবই ভাল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং সমিতির পক্ষ হতে তাকে ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার মনে দুঃখ হচ্ছিল এই বলে যে যারা একবার বিদেশে যান তাদের চোখে দেশের কিছুই আর ভাল লাগে না এবং বিদেশের সবই একেবারে চমৎকার।

সমিতির মিটিংএর পর বহু অনুরোধ করে তাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম এক পেয়ালা চা খাওয়াবার জন্য, কেন না আমাদের সমিতিতে পান খাওয়ান ও সিন্দুর ছোয়ান ছাড়া আর কিছুরই ব্যবস্থা নেই। এই চা খাওয়ার সুযোগেও জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গেল। তাঁরা কালই শিলং যাচ্ছেন এবং কলিকাতায় ফির্‌বার পথে আবার এখান হয়ে যাবেন। তখন এসে ডাক্‌বাংলায় না উঠে আমাদের বাড়ী দু চার দিন থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ কল্লুম—বাবাও বল্লেন। তিনি বলেছেন পরে লিখে জানাবেন—যদি আসেন কি মজাই হবে!

পিসীমা সে দিন কি কাণ্ড করেছিলেন জানিস্? আমাদের চা খাওয়া শেষ না হতেই তার জপের মালা ঘুরাতে ঘুরাতে একেবারে বারান্দায় এসে হাজির। মিসেস্ রায় (জাপান ফেরতা মহিলাটির নাম) উঠে যাচ্ছিলেন তাকে নমস্কার করতে। বাবা বলে উঠলেন—আপনি বড়দিকে ছুঁয়ে দিলে ওঁর আবার এই অবেলায় নাইতে হবে।

মিসেস্ রায় তখন দূর হতে নমস্কার করেই নিরস্ত হলেন। দু মিনিট যেতে না যেতে পিসীমার মালা জপা শেষ হয়ে গেল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তা তুমি বামুনের মেয়ে ত মা!

মিসেস রায়—আজ্ঞে হাঁ।

পিসীমা—তাকি আর দেখে চেনা যায় না? এমন সতী-লক্ষ্মী ভগবতীর মত চেহারা একে ছুঁলে নাইতে হবে কেন্ যাটু?

মিসেস্ রায় আমার অনুরোধে ঠিক তখনই আর একটি সন্দেশ নিয়ে মুখে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার হাত থেকে সন্দেশ খানি মেজেতে পড়ে গেল; আর মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মুখখানি একেবারে ফেকাশে হয়ে গেল। ভয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—বাবাও ভয় পেয়েছিলেন।

একটু পরেই কিন্তু মিসেস্ রায়ের এই ভাব কেটে গেল। তিনি একটু মৃদু হেসে বল্লেন যে তার মাথায় কি একটা ব্যাধি আছে তাতে কখনো কখনো এমন হয় আবার তখনই সেরে যায়—ও কিছু নয়।

মিষ্টি আর তিনি কিছুই খেলেন না, অবশিষ্ট চা টুকু পান করেই চলে যেতে চাইলেন। বাবা বল্লেন—সুধীরা আপনাকে ডাক্‌বাংলায় পৌছে দিয়ে আস্‌বে, একটু দেরী করুণ।

সইসকে গাড়ী জুত্‌তে বলা হলো। আমি তৈরী হয়ে তার সঙ্গে ডাক্‌বাংলায় চল্লাম।

চিঠি বড়ই লম্বা হয়ে গেল আজ এখানেই শেষ করি। আশা করি কুশলে আছিস্। ইতি—

তোর—সুধীরা।

—দুই—

ভাই মিনি, গেণ্ডেরিয়া।
৭ই ডিসেম্বর।

তোর ৫ই তারিখের চিঠিখানি পেয়ে অত্যন্ত খুসী হয়েছি। আমার আগের চিঠিতে সেই জাপান ফের্‌তা মহিলাটির বক্তৃতার যেটুকু তোকে লিখেছিলুম তা তোর খুব ভাল লেগেছে, ভাল কথা। কিন্তু তুই যে সব কথা শুন্‌বার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিস্‌ সেই হয়েছে মুস্কিল; কেন না সব কথা দুই এক চিঠিতে শেষ হবে না

উয়েনো পার্কের কথা ত তোকে আগেই লিখেছি। তিনি বলছিলেন যে প্রথম যে দিন তাঁরা উয়েনো পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেদিনই সেখানে এক প্রৌঢ় জাপানী দম্পতীর সঙ্গে তাদের আলাপ হয়। সে আলাপ পরে যে অতটা বন্ধুত্বে পরিণত হবে সেদিন তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই জাপানী দম্পতীর নাম সুমিমতো। উভয়েই ইংরাজি বলতে পারেন, তবে নিতান্তই অক্লেশে বা অনর্গল ভাবে নয়। মিসেস্‌ রায় বলছিলেন যে তার স্বামী ১৯০৭ সালে আমেরিকা যাওয়ার পথে কয়েক মাস জাপানে ছিলেন এবং জাপানী ভাষাও তখন শিখেছিলেন; তাই জাপানে ও দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্‌তে তাদের অসুবিধা হয় নি।

তিনি বলছিলেন—সুমিমতোরা আমাদিগকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস্‌ করলেন—আমরা ভারতবাসী কিনা? আমরা স্বীকার করায় সুমিমতোসান্‌ হর্ষোৎফুল্ল মুখে বল্লেন যে, জাপানে একটি ভারতীয় দম্পতীর সাক্ষাত লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি স্বীকার করলেন যে পূর্ব্বে আর কখনো তাঁরা ভারতীয় মহিলা দেখেন নি। তারপর ভারতীয় মহিলাদের সৌন্দর্য্যের ও পরিচ্ছদাদির অনেক প্রশংসা ক'রে, আমার দিকে ফিরে বল্লেন যে, আপনারা ভারতবাসী, বিদেশী হলেও আমাদের নিতান্ত পর ন'ন। যুগ যুগান্তর ধরে আপনাদের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আপনারা যদি দয়া করে একবার আমাদের দীন কুটীরে পদার্পণ করেন তবে আমাদের পরিবারস্থ সকলেই আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হবে এবং আমাদের গৃহও পবিত্র হবে।

তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমরা সকলে ট্রাম চড়ে আসাকুসা অঞ্চলে তাদের গৃহাভিমুখে চলুম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমস্ত তোকিও সহর উদ্ভাসিত। বিচিত্র রঙের পরিচ্ছদ পরা জাপানী পুরুষ ও মহিলাদের জোড়ায় জোড়ায় ভ্রমণ আমাদের চোখে বড়ই সুন্দর লাগ্‌ছিল। তাহাদের মুখে চোখে যে আনন্দের দীপ্তি দেখেছি তা এদেশে বড় একটা চোখে পড়ে না। ট্রাম থেকে নেমে ৭।৮ মিনিট হেটেই আমরা সুমিমতোদের নব-নির্ম্মিত গৃহের দরজায় পৌছলুম। ভিতরেও তখন বৈদ্যুতিক আলো জলছিল।

আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করে সুমিমতো দম্পতি গৃহে প্রবেশ করলেন। ফটক খুলেই আমরা একটি হলে ঢুক্‌লুম। আমার স্বামী টুপি ও ছড়ি সেখানে রাখলেন এবং আমরা সকলেই জুতো খুলে রেখে সম্মুখের বস্‌বার ঘরে প্রবেশ করলুম। জাপানে ফটকের সঙ্গে ঘণ্টা বাঁধা থাকায় ফটক খুল্লেই ঘণ্টার শব্দ হয়। আমরা হলে ঢুক্‌তেই পাশের ঘর থেকে দুটি বালিকা বের হয়ে এসেছিল, তারাও আমাদের পিছু পিছু বস্‌বার ঘরে এলো! হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদিগকে দেখে বালিকা দুটি বিস্মিত হয়েছিল। সুমিমতোসান্‌ তাদের বল্লেন এঁরা ভারতবাসী জাপানে বেড়াতে এসেছেন। উয়েনো পার্কে দেখা হলো তাই অনুরোধ করে নিয়ে এলুম। তোমরা এদের সঙ্গে আলাপ করে খুসী হবে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবর জানতে পারবে।

বালিকাদ্বয় তৎক্ষণাৎ মাদুরপাতা মেজের উপর হাটুগেড়ে বসে আভূমি মাথা নীচু করে বারম্বার আমাদিগকে নমস্কার করলো,—আমরাও যথাসাধ্য তাদের অনুকরণ করলুম।

যে ঘরে আমরা বসেছিলুম সে ঘরখানি আয়তনে বেশ বড়ই এবং প্রয়োজন হলে তিনদিকের কাগজের দেয়াল সরিয়ে আরও অনেক বড় করা যায়। আস্‌বাব্‌ পত্র তাতে

বিশেষ কিছুই দেখলাম না; তবে দেয়ালে কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো ছিল।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন মাদুর আঁটা ঘরের মেজেতেই সকলে বসে গেলুম। আমরা দুজনে আমাদের দেশী প্রথা মত আর তারা সকলে হাটুগেড়ে বসলেন। সুমিমতোসান্ মেয়ে দুটিকে দেখিয়ে বল্লেন যে এরা দুটি তাদের কন্যা—ওকুমিসান্ ও ওহানাসান্। বড়টির বয়স ১৯ বৎসর হাসপাতালে ধাত্রীর কাজ শিখে, আর ছোটটির বয়স ১৫ বৎসর স্কুলে পড়ে। সকলের বড় একটি পুত্র, বয়স ২৯ বৎসর, সে জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। আরও একটি পুত্র ছিল বেঁচে থাকলে এখন ২৪ বৎসর হ'ত, গত মহাযুদ্ধে সে দেশের জন্য কাউচাউ হতে জর্ম্মানদের হাতে জীবন দিয়েছে।

সুমিমতোপত্নী ইতি মধ্যে কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন অবিলম্বে আরও একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ও একটি খোকার হাত ধরে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহিলাটি পুত্রবধূ, নাম ওছুঙ্গিসান্ আর খোকাটি পৌত্র নাম তারো। আবার উভয় পক্ষে নমস্কারাদি হইল। বধূটির বয়স অনুমান ২৩।২৪। জাপানীদের সৌন্দর্য্যের বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের মাপ-কাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে জাপানীদের, শুধু জাপানীদের কেন, সমগ্র মোঙ্গলিয়ান জাতির, নাক চোখের খুঁত ধরা যেতে পারে। তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাপানের অধিকাংশ ভদ্রমহিলার মুখেই বেশ লাবণ্য দেখতে পাওয়া যায়, কারণ তাদের স্বাস্থ্য অতি চমৎকার, জীবনে আনন্দও প্রচুর।

সুমিমতোসান্ আমাদের পরিচয়াদি নিয়ে বল্লেন যে তিনি প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ ঐ আসাকুসা অঞ্চলে ডাক্তারি করছেন। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে তাঁর পসার বেশ ভালই ছিল। তিনি এই বাড়ী কিনেও দু'তিনটি যৌথ কারবারের অংশ খরিদ করেছিলেন, তাতে লাভও হ'ত, কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে তা প্রায় সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর ভূমিকম্পের দরুণ কাজ তার কিছুমাত্র কমে নি, কিন্তু আয় যথেষ্টই কমেছে; কাজেই জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি সত্বেও ব্যয় সংক্ষেপ করতে হচ্ছে। এই অবস্থা তার একার হলে আপশোষ্ ছিল না, কিন্তু প্রায় সকলেরি এই সমস্যা। তাই তার অনুরোধ, আমরা জাপান ভ্রমণকালে যখনি যার সংস্পর্শে আসি না কেন, জাপানীদের আতিথেয়তায় ত্রুটী দেখলে তা তাদের জাতীয় স্বভাব বলে যেন মনে না করি; বরং একটি দুস্থ জাতির দীনতা ও অক্ষমতা বলে যেন ক্ষমা করি।

আমাদের এই সকল কথা হচ্ছিল ইতিমধ্যে আরও একটি মহিলা একখানি ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জামাদি এনে, গৃহিণীর সম্মুখে অনুচ্চ একখানি ছোট টেবিলের উপর রেখে, যথারীতি নমস্কারাদি করে প্রস্থান করিল। জাপানে ভদ্র-মহিলা ও পরিচারিকাদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তাতে তাদের প্রকৃত পরিচয় অনুমান করা অনভ্যস্ত বিদেশীর পক্ষে সহজ নয়। চাকরাণীদের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে আমাদের ঝিদের ত দূরের কথা, শুচিবায়ুগ্রস্থা গৃহিণীদের 'পরিচ্ছন্নতা'ও তুলনীয় নয়।

চা প্রস্তুত করে সুমিমতো-গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দিয়ে পরে একে একে পরিবারস্থ সকলকে দিলেন। এই চা এবং ওকাশি (জাপানী পিষ্টক) দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ঐ দেশে একই পরিবারস্থ পরিজনদিগের মধ্যে কিরূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শিষ্টাচার বিরাজ করে তার পরিচয় সেই প্রথম পেলুম। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পরে আরও পেয়েছি এবং যখনি এই দৃশ্য দেখেছি তখনি মুগ্ধ হয়েছি। তাই দেশে ফিরে অবধি যখনি কোনও পরিবারের সংস্পর্শে আসি, তখনি জাপানী পরিবারের মত শৃঙ্খলা, তৃপ্তি, শিষ্টাচার ও যত্ন-সতর্ক-পরিচ্ছন্নতার অন্বেষণ করি।

আজ ভাই এখানেই শেষ করি, এক্ষুনি স্কুলের গাড়ী এসে পড়বে। ভালবাসা জেনো। ইতি—

সুধীরা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ—

—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়ের আকাশে আজিকে আবার পথিক মেঘের উৎসব-সমারোহ সুরু হইয়াছে,—কিন্তু বিরহী যক্ষের আর্ত্ত আবেদন ঊর্দ্ধলোকের উদ্দেশে অঞ্জলি দেওয়া হয় নাই! দূর উজ্জয়িনীর মহাক্রান্ত ছন্দে যে কবি বাংলার বেণুবনচ্ছায়ে নব-মেঘোদয়ের বন্দনা গাহিয়াছিলেন,—সে কবি আর নাই। বিশ্বতরুণীর শ্যাম-স্নিগ্ধ আঁখি-পল্লবে ছায়াঘন বরষার স্নেহের কাজল প্রতি বৎসরই অন্ধ অনুরাগে স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করিবে,—অথচ সেই কাজল-আঁকা কালো-নয়নের করুণা যাচিয়া আর কেহ বাদল জোছনার সজল মায়ায় বাংলা ভাষায় 'কাজরী পঞ্চাশৎ' এর শব্দ চিত্র আঁকিবে না! মাঘের শীতেও মেঘের মাদল বাজাইয়া যাঁহার জন্মোৎসবে আত্মহারা বাদলধারা ঘুর্ণী হাওয়ায় ওড়্না উড়াইয়া সাঁওতালী-নাচ নাচিয়াছিল,—তাহারাই আবার বিদ্যুতের মশাল জ্বালিয়া জলধারার কলস্বনে হুলুধ্বনি দিয়া তাঁহাকে লইয়া কোন্ অন্ধ তমসার তিমির খেয়ার পারে গিয়াছে! সত্যেন্দ্রনাথ আজ আর ইহজগতের নহে। কোন্ অজানিত দেশে তাঁহার নব-জীবনের প্রথম প্রভাত অন্তঃপুরচারিণী কল্যাণীদের শুভ শঙ্খনাদে অভ্যর্থিত হইয়াছে কে জানে,—কিন্তু বাংলার দুয়ারে অনভিনন্দিত অতিথি আষাঢ়ের বিরহ-বেপথু আকাশ-আঁখি আজিকে ব্যথার কুয়াশায় অশ্রু ম্লান!

দুর্ভাগ্য আমাদের—মাতৃ ভাষাকে আজিও আমরা জাতীয় সম্পদ বলিয়া ভাবিতে শিখি নাই। তাই, বাংলার চির-প্রিয় চারণ কবির মৃত্যু তারিখে আমাদের বৈচিত্রহীন প্রত্যহের সাথে কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হইল না,—দণ্ডই আষাঢ়ের তমিস্রা-ঘন বরষার রাত্রে কাহারো গৃহ-বাতায়নে উজ্জ্বল দীপালোকের ঊর্দ্ধায়িত আরতি শিখায় স্বর্গীয় কবির উদ্দেশে একটিও ব্যথিত অন্তরের শ্রদ্ধা-সিক্ত আর্ত্ত প্রণতি উৎসৃষ্ট হইল না। দেশকে আমরা ভালবাসি না! তাই দেশাত্মবোধের শ্রেষ্ঠ নকীবের মৃত্যু-তিথি আমাদের অপরিসীম অশ্রু-সলিলে অভিসিঞ্চিত হইল না।

মেঘভার পুঞ্জীত পাঁচটি বরষার অশ্রু-ধারা সত্যেন্দ্রনাথের নিবানো চিতার পরে ঝরিয়াছে মাত্র;—শুধু পাঁচটি বসন্তের মধু-সঞ্চিত মাধবী-মঞ্জরী,—শুধু পাঁচটি শরতের শুভ্র-সুন্দর শেফালি অঞ্জলি তাঁহার শূন্য আঙিনায় ধূলি তলে মিশিয়াছে মাত্র। তাই, সতেন্দ্রনাথের কবিতা সমালোচনার সময় আজিও ঠিক আসে নাই হয় তো। কালের কষ্টিপাথরে তাঁহার প্রতিভার সোনা কসিত হইবার বিলম্ব আছে এখনও। কিন্তু অনাগত অতীতের সুদূর অন্ধকারে চির-প্রদীপ্ত নক্ষত্রের সভাতলে তাঁহারও একটি স্বতন্ত্র আসন যে চিরদিনের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ রাখিবার অবকাশ নাই বোধ হয়। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্যগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ যে শুধু অন্যতম ছিলেন তাহা নহে—তিনিই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্র নাথের নিকট হইতে কাব্য-প্রেরণা লাভ করিয়াও সত্যেন্দ্র নাথ যে রবীন্দ্র নাথের পথেই চলেন নাই, ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। গঙ্গার পবিত্র বারিরাশি যমুনার স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইয়া এক অপরূপ স্নিগ্ধ শ্যাম শান্ত শ্রীর সৃষ্টি করিয়াছে—প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রচণ্ড রশ্মিরাজি চন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া এক অভুত পূর্ব্ব স্নেহ শীতল মাধুর্য্যের মহিমায় অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে! মনে হয় সত্যেন্দ্র নাথ নিজেই যেন একটি স্বতন্ত্র গ্রহ—তাঁহার বিচিত্র বর্ণ-বৈভবের নিমিত্ত আর কাহারো নিকট তিনি যেন ঋণী নহেন!

রবীন্দ্র নাথের কাব্য আমাদিগকে কোন্ অসীম অনন্ত রহস্যালোকের মাঝখানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেয় —গণ্ডী-বদ্ধ মানুষের সহজ জ্ঞান অতখানি অবাধ উন্মুক্ততার মাঝে যাইয়া যেন দিশা-হারা হইয়া পড়ে! কিন্তু সত্যেন্দ্র নাথের কাব্যে এমনি একটি অতিপরিচিত সুনির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা আছে যে তাহার সবখানিই একেবারে সমগ্র ভাবেই আমাদের কাছে অনায়াসায়ত্ত;—অনুভূতি সেখানে বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয় না, আনন্দলোকের আলোর আশীর্ব্বাদটুকু সে বেশ সচেতন ভাবেই গ্রহণ করে।

ভাষার দিক দিয়াও রবীন্দ্র নাথের সহিত সত্যেন্দ্র নাথের যথেষ্ট পার্থক্য। রবীন্দ্র নাথ সংস্কৃতের বাঁধ ভাঙিয়া বাংলা ভাষার মধ্যে যে একটি প্রবহমান স্রোতের বেগ আনিয়াছিলেন তাহার কলধ্বনির ঝঙ্কার উটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দমুখর কাব্যের উপকূলে।

এই ধ্বনির ঝঙ্কারই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার প্রাণ। সত্যেন্দ্রনাথের মত এমন সুললিত একটি সুমিষ্ট harmony বাংলা দেশের আর কোনও কবির কাব্যেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না বোধ হয়। এই harmony তেই সত্যেন্দ্র নাথের সমস্ত কবিতার impression। Technic এর দিক দিয়া সত্যেন্দ্র নাথের ওস্তাদী যেমন অভূতপূর্ব্ব ছিল art এর দিক দিয়াও ঠিক তেমনি একটি সুসংযত শিল্পীর বাহাদুরী ফুটিয়া উঠিত। শুধু তাহাই নহে শব্দসম্পদেও বাংলা ভাষা চিরদিনই সত্যেন্দ্র নাথের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিবে। এই শব্দ চয়নে সত্যেন্দ্র নাথের কোন গোঁড়ামী ছিল না, বরং ছিল একটি অসাধারণ সুর-বোধ। তিনি সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সি প্রভৃতি বহু ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করিয়াছেন এবং বহু অন্ত্যজ প্রাদেশিক শব্দকেও তিনি অভিজাত শব্দ সম্প্রদায়ের সহিত এক পংক্তিতেই বসাইয়া ছাড়িয়াছেন, অথচ কোথাও এতটুকু বেসুরা বাজে নাই। তিনি বাংলা ভাষাকে সম্পৎশালী করিবেন বলিয়া যেখান-সেখান হইতে যা'-তা' শব্দ আনিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন নাই,—এমন কি allitertion এর খাতিরেও নহে। তাঁহার শব্দ সংগ্রহ ও তাহার সুনিপুন প্রয়োগের মধ্যে এমনি একটি সুললিত সুরের সঙ্গতি আছে যে তাহা একবার পড়িলে আর কখনও ভোলা যায় না। এই খানেই সত্যেন্দ্রনাথের শেষ কৃতিত্ব—ইহাতেই সত্যেন্দ্রনাথের চরম গৌরব।

সত্যেন্দ্র নাথ ছিলেন একজন সত্যিকারের বাঙালী কবি। বাংলার স্নেহার্দ্র মাটির স্নিগ্ধ সৌরভে তাঁহার প্রায় সমস্ত কাব্যগুলি ভরিয়া আছে। বাংলার কথায় তিনি একেবারে আত্ম হারা। সুশ্যাম সৌন্দর্য্যময়ী বাংলার শ্রীমতী মূর্ত্তিটি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক যেমনিটি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমনিটি আর কোথাও ফুটে নাই।

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
 সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
 খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধ-ভরা,—
 শীতল করা,—ক্লান্তি হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
 সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি!
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
 সোনার কাটি-ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌ মহলের জ্যোৎস্না নিতি
 বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
 হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
 সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি—।
মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
 লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
 অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপাণি জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

এ যেন হৃদয়ের সমস্তটুকু শ্রদ্ধা-প্রীতি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া অন্তরের অপরিসীম দরদ দিয়া আঁকা বাংলা দেশের ছোট্ট একখানি bird's-eye view। অথচ প্রকৃতিগত impression টুকুও বাদ পড়ে নাই এমনি নিপুণ artistic effeciency।

পরপদনিপীড়িতা দীনা-হীনা জন্মভূমি—কবি তাঁহার সেই ম্রিয়মানা মূর্ত্তিটিকে personify করিয়াছেন—অথচ বাংলার নৈসর্গিক বিশেষত্ব কোথায় এতটুকু ম্লান হয় নাই।

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে' আছিস বিরস মুখে?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে?
ঢলঢল নয়ন-যুগল জলভরে পড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কালোচুলো।
শিথিল মুঠি—ত্রিশূল কেন ধরার ধুলা আছে চুমি'?
কে মা তুই, কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গ ভূমি?

সত্যেন্দ্রনাথের পাল্কীর গান কবিতাটিতে ছন্দের দিক দিয়া একটি বিশেষত্ব আছে। কিন্তু উহার মধ্যে শান্ত-শ্রী সুস্নিগ্ধ শ্যামা বাংলা দেশের ধেনুচরা মাঠের পারে ছায়া-শীতল পল্লী গ্রামের যে নগ্ন সরলতাটুকুর হুবহু ফটোগ্রাফ উঠিয়াছে তাহা আর কাহারো কাব্যে একান্তই দুর্লভ।

বৈরাগী সে—
কণ্ঠী বাঁধা,—
ঘরের কাঁধে
লেপ্‌ছে কাদা;
মট্‌কা থেকে
চাষার ছেলে
দেখ্‌ছে,—ডাগর
চক্ষু মেলে।
দিচ্ছে চালে
পোয়াল গুছি;
বৈরাগীটির
মূর্ত্তি শুচি।

শুধু ইহাই নহে। পাল্কী গ্রামে প্রবেশ করিয়া আগাইয়া চলিল। পথের দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত কুটির গুলি,—কোথাও কঞ্চি-মাচায় হলুদ বরণ শশার ফুল ফুটিয়াছে, তাহার উপরে প্রজাপতি উড়িতেছে,—একটু দূরেই পাড়ার পুকুর, সেখানে—

করা বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথার
কাপড় গোছায়!

এত সংক্ষিপ্ত শব্দ সংযোজনায় এমন সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে বাংলার লজ্জা-মধুর পল্লী বধূর মূর্ত্তি আর কেহ কখনও আঁকিয়াছেন কিনা জানি না—কিন্তু এ চিত্র একেবারেই অপরূপ। তাহার পরে—

পাঠশালাটি
দোকান ঘরে,
গুরুমশাই
দোকান করে!

*   *   *

পোড়ো ভিটের
পোতার পরে
শালিক নাচে
ছাগল চরে।

*   *   *

গ্রামের শেষে
অশথ তলে
বুনোর ডোরায়
চুল্লী জলে।
*　*　*
গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে
বাঁধের দিকে
সূর্য্য ঢলে।
*　*　*
ওই আমাদের
ওই হাটতলা,—
ওরি, পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।—

ভাব ও ছন্দের এই স্পর্শ কবিতাটিকে একেবারে বাংলা দেশের নিখুঁত গ্রাম্যতার মাঝে টানিয়া আনিয়াছে।

বাংলার প্রতি ধূলিকণা, প্রতি তৃণ, প্রতি ফুল, প্রতি পাখী সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় প্রতি কবিতার ছত্রে ছত্রে যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশাইয়া রহিয়াছে। বাংলার স্নিগ্ধ মধুর পল্লীগ্রামগুলির শুভ্র সবুজ বনের প্রীতি, দিক-হারানো মাঠের মায়া এবং স্বচ্ছ তরল নদীর স্নেহ সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাকেই এক অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যে গৌরবময়ী করিয়াছে। বাংলার অন্তর্নিহিত ভাব-ধারা-গুলিও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে একেবারে সূর্য্যালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়াছে। বাংলার কোনও কিছুর কথা বলিতে যাইলেই সত্যেন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ যেন আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। বাংলার অতীত গৌরবে অন্তর তাঁহার গর্ব্বে ভরা ছিল। বাঙালীর অতীত কাহিনীর উল্লেখ প্রসঙ্গে স্বর তাঁহার তূর্য্য-ধ্বনির মত গম্ভীর উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গ,
দশানন-জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে তার শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লী নাথে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপরেও তাঁর আস্থা ছিল।

'কালোজামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে
—কালোর আলো জলছে আজো।'
আজো প্রদীপ যায়নি নিবে।

বাঙালীর ভবিষ্যত সম্বন্ধেও চিরদিনই তিনি আশান্বিত ছিলেন। 'বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে'—এ বিশ্বাস তাঁহার অতিশয় দৃঢ় ছিল। তাই তিনি বাংলার ছেলেদের লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন।

তবু ওরাই আশার খনি—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

তিনি অসংশয়ে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—
'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।'

বাংলার শ্মশান-বক্ষে যে পঞ্চবটী রোপিত হইয়াছে একদিন—
'তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের সাত কোটি।'

স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি বাংলার কাছে তাঁহার সমস্ত জগত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সুরে বন্দেমাতরম্ রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যে সুরে সোনার বাংলার গান গাহিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল যে সুরে জন্মভূমি লিখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সুরেই সত্যেন্দ্রনাথও গাহিয়া গিয়াছিলেন—

কোন্ দেশেতে তরু-লতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?

কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয়রে দূর্ব্বা কমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

'গঙ্গাহৃদি বঙ্গ ভূমি' কবিতাটিতে তিনি বাংলা মায়ের মহিমময়ী মূর্ত্তির স্তব করিয়াছেন।

কামরূপা তুই ক্যামাখ্যা তুই, দাক্ষায়ণী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা ! শক্তিরূপা ! নও তুমি নও দানহীনা !
'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গা-হৃদিনামটি গো,
গতির ভুখে চলিস রুখে, বাংলা ! সোনার তুই মৃগ !
চির যুবনমন্ত্র জানিস্ চিরযুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী !

বাংলার মত বাংলা ভাষাও তাঁহার কাছে সকল ভাষার সেরা ছিল। বাংলার গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, কর্ণফুলী সত্যেন্দ্র নাথের কাব্যে নব নব রসের স্রোত বহাইয়াছে। বাংলার জবা, কাশ, ভুঁইচাঁপা, ধুতুরা প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য লক্ষ্মীকে এক বিচিত্র ভূষায় বিভূষিত করিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি যে শুধু বাংলাতেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে, কুলপ্লাবী জলস্রোতের মত তাহা বাংলা ছাপাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে পরিসিক্ত করিয়াছে।

ছালিক্য ছন্দের অনুসরণে তিনি ভারতবর্ষের স্তোত্র রচনা করিয়াছেন—

জয় জয় ভারত ! বিশ্বের স্তুতা !
পৃথ্বীর তিলক ! তীর্থস্তুতা !
মন্দার মুকুল ! নন্দন চ্যুতা ! জয় ! জয় !
পদ্মের মেখলায় লক্ষ্মীর ছবি !
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী !
নিষ্কাম যাগের নির্ম্মল হবি ! জয় ! জয় !

হিমালয়ের উদ্দেশে তাঁহার অন্তর হইতে প্রণতি মন্ত্র উঠিয়াছে। কাঞ্চন-কান্তি চন্দন সুবাসিত সিংহলদ্বীপের বন্দনা তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল মাত্র বাংলার বন্দনীয় মনিষীগণের উদ্দেশেই তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের যেখানে কেউ 'ভয়-তরণের সুধা ক্ষরণের' জলজ্যোতি হোম-শিখা জ্বালাইয়া গিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশেই সত্যেন্দ্রনাথের প্রণতি-সঙ্গীত অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি বাংলার বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু, মধুসূদন, জগদীশ বসু প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণের উদ্দেশে যেমন তাঁহার অন্তরের মন্দাকিনী ধারায় সশ্রদ্ধ তর্পণ করিয়াছেন, তেমনি গুর্জ্জরের গান্ধী মহারাষ্ট্রের তিলক প্রভৃতিরও রাতুল চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সে পবিত্র ধারা সমান কলস্বনে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

স্বদেশের সীমা ছাড়াইয়া এই প্রেম শেষে সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহী বীর ম্যাকসুইনির মৃত্যু-উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

'মুক্ত হবই' ! একথা যে বল্‌তে পারে
জোর কোরে বুক ঠুকে—
পাষাণ কারা তাদের গৃহ,
লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।

টলষ্টয়, বিশফ লেফ্রয়, বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম ষ্টেড্ এর বন্দনা করিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনি যে অপূর্ব্ব স্তোত্র রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংস্কার-মুক্ত অন্তরের অপার স্বচ্ছতা নির্মেঘ নীলাকাশের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাইত তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থ লীন
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমায় সঙ্গে যোগ যে আছে, এসিয়ার আছে নাড়ীর টান।

সমগ্র বিশ্ব-মানবের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরের আত্মীয়তা ছিল। তাই সে অপূর্ব্ব সাম্য-সামের বেদসূক্ত তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা অতি বিরল।

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে
সে আছে আমারি বুকে ;
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল
সে আমার দুখে সুখে।
কুসুম-সরস ধরণী যাহার
বহিছে পরশ খানি,
জীবনে মরণে কাছে কাছে তারা,
মনে মনে তাহা জানি।

* * * * *

সমান হইক মানুষের মন,
সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ,
এক হোক পুনরায়'
সমান হউক আশা-অভিলাষ,
সাধনা সমান হোক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত
ব্যথিত মর্ত্যলোক।

এই সাম্য-বোধ সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল বলিয়া শুদ্ধ মাত্র উপবীতের জোরে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে শ্রদ্ধা আদায় করিতে পারে নাই।

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি' গলে ?
পশুর অধম, অসুর-দম্ভে মানুষেরে তবু দলে !

জন্মই জাতীয়তার মাপ কাঠি বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই !

কর্ম্মে যাদের নাহি কলঙ্ক,
জন্ম যেমনি হোক,
পুত তাদের চরণ পরশে
ধন্য এ নরলোক।

তাই শূদ্রের উদ্দেশে তিনি গাহিয়াছেন—

শুদ্ধসত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহা মানবের পতি সে মূর্ত্ত,
শূদ্র কখনো শুদ্র নহে।

অস্পৃশ্য অশুচি মেথরও তাঁহার বন্ধু সম্বোধন লাভ করিয়াছে।—

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহ-বাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

সত্যেন্দ্র নাথের মন ছিল আকাশের মতই উদার। সমস্ত পৃথিবী তাহার তলে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই কুলাইয়াছে।

জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত,
একই রবি শশী মোদের সাথী।

শ্রীক্ষেত্রের মত সত্যেন্দ্র নাথের পবিত্র চিত্ত তীর্থে এক বিরাট সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। সেখানে উচ্চ নীচ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই,—সবাই সমান। সত্যেন্দ্র নাথ ধর্ম্ম প্রচারকের মত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

'গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক,
মানুষ মিলুক মানুষ সাথে !' সে ঈপ্সিত ভবিষ্যতের আর বেশী বিলম্ব নাই—

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই মহাদিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে আর একটি বিশেষত্ব ছিল এবং সেই বিশেষত্ব তাঁহার কাব্যের মধ্যেও চিরকালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। যাহা কিছু অন্যায়, অসত্য, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহারই প্রতি সত্যেন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শক্তির প্রাচুর্য্য কখনও অসংযত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে নাই। এই বিস্ফুরিত শক্তির কেন্দ্রগত সংযমই তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অন্ধতা ছিল

না। হাঁচি-টিক্‌টিকিরও তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেন না। তাই সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে যে নিষেধ ছিল তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—

সাগর-পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধুমাঝে—মুক্তাভরা শুক্তি ও ;
ফিরব মোরা দশটা দিকে রত্নাকরের বুক চিরে,
রত্ন নেব, মুক্তা নেব, সঙ্গে নেব লক্ষ্মীরে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু বিধি-নিষেধের উপর তিনি তাঁহার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। সমাজের যূপকাষ্ঠে প্রাণের মর্য্যাদাকে যে প্রতিনিয়তই বলি দেওয়া হইতেছে সত্যেন্দ্রনাথ তাহা সহিত পারেন নাই।

কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি ?

নির্জ্জলা একাদশীর সাহারা মরুতে জলসত্র খুলিবার জন্ত তিনি বাংলার তরুণদের ডাকিয়াছেন—

কে নেবে এই পুণ্য ব্রত ? কে হবে মার পুত্র গো ?
একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জল সত্র গো ?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্ব্বাদ ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার করতে বিজয়-শঙ্খনাদ।

শুধু দেশের নহে জগতের যেখানে যাহা কিছু অন্তায় ও অসত্য দেখিয়াছেন সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই প্রতি তাঁহার ক্ষুর-ধার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ ই বলিয়াছেন—

অন্তায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্র বেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর,
নির্ম্মল নির্ম্মম, করুণ কোমল।

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যে সব চেয়ে বড় কথা তাঁহার ছন্দ। ছন্দের রাজা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তীরের বন্ধনের মধ্যে কলধ্বনি তুলিয়া নদী যেমন প্রবাহিয়া যায়—ছন্দের বন্ধনের মধ্যে অপরূপ কলগুঞ্জন তুলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের ভাবধারাও ঠিক তেমনি ভাবেই বহিয়া গিয়াছে। এই ছন্দের বন্ধন আছে বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা গুলিতে এমনি একটি force আছে যাহা বাস্তবিকই বিস্ময় জনক। সত্যেন্দ্রনাথ দেশদেশান্তরের বিভিন্ন ভাষা হইতে বিবিধ ছন্দ আনিয়া বাংলা ভাষাকে সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতের অতি দুরূহ ছন্দগুলিকেও বাংলায় তিনি রূপ দিয়াছেন। তিনি নিজেও অনেক নূতন ছন্দ আবিস্কার করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে কথা বস্তুর বিচার হিসাবে তিনি তাহার ছন্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য ছন্দের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তাই—আমরা তাঁহার কয়েকটি মাত্র অপরূপ ছন্দের উদাহরণ মাত্র দিয়াই এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিব।

সত্যেন্দ্রনাথের পাল্কীর গান কবিতাটিতে বাংলা দেশের মনুষ্য বাহী অপরূপ যানটীর চমৎকার গতি ছন্দটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পাল্কীর গান কবিতাটিতে ঠিক সেইরূপ জলস্রোতের বুকে মাঝিদের তালে তালে দাঁড় ফেলার শব্দ শুনিতে পাই।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান কৌটি,
দ্যায় ডুব চুপ চুপ
ঘোমটায় বউটি।
ঝক্ ঝক কলসীর
বক্ বক্ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক বয়,
মন উন্মন গো!

ঝর্ণা কবিতাটিতে গিরিদরীবিহারিণী নির্ঝরিণীর অবিরাম ঝর্ঝর ধ্বনি যেন অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন বর্ণা!

অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণ,
তনু ভরি যৌবন তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !

সত্যেন্দ্রনাথের চরকার গান করিতাটি কেহ অদূরে বসিয়া পড়িলে মনে হয় কাছে বসিয়া কেহ যেন চরকা কাটিতেছে। এমনি কি কি সুতা গুটাইবার দীর্ঘটানটুকুও হুবহু তাঁহার ছন্দের শেষে ধরা পড়িয়াছে !

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন্ ভাই !
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই !
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার।
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর !
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর !
পড়শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া

সংস্কৃত পঞ্চচামর ছন্দ—

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

মালিনী ছন্দ—

উড়ে চলে গেছে বুল্ বুল্
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

মেঘ দূতের মন্দাক্রান্তা—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও,
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

রুচিরা—

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম কোরক ফুলিছে বাদল বাতাস লেগে ;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা নারীর মুখের সীধু ;—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস—কে সেই বালা ?

গজগতি—

হর মুকুট !
হর মুকুট !
ভূ-স্বর্গের
সুমেরু-কূট,
গগনে প্রায়
ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায়
তারকা লুট !

এমনি শুধু সংস্কৃত হইতে নহে—বহু-ভাষা হইতে বহু ছন্দ তিনি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। বাংলা তাঁহার এ দান কখনও ভুলিতে পারিবে না। ছন্দ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি যে সমস্ত কঠিন ছন্দকে বাংলায় রূপ দিয়াছেন তাহার Uniformity বজায় রাখিয়া যত দূর সম্ভব বড় বড় বড় কবিতা তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন। একটু খানি নমুনা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বহু বিদ্য পণ্ডিত এবং একজন কৃতী সমালোচক। বৈদিক শাস্ত্রে তাঁহার অসীম বুৎপত্তি ছিল ! পুরাণ ও শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি নূতন ভাবের অমৃত বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তীর্থ-সলিল, তীর্থ রেণু প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। তাই সমস্ত পৃথিবী চুঁড়িয়া তিনি তাঁহার কাব্য লক্ষ্মীর জন্য বিবিধ আভরণ আহোরণ করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক কবিতা অপেক্ষা অনুবাদ কবিতার সংখ্যাই হয়-তো অধিক। কিন্তু সেই অনুবাদ-গুলি এত চমৎকার যে সে গুলিকে মৌলিক কবিতা বলিয়া চালাইতে এতটুকু বাধে না। উদাহরণ উল্লেখ করিয়া স্থান নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।—কেবল মাত্র বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুবাদগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য। বাংলা সাহিত্যে এ অনুবাদ গুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব্বনিবাসের 'পাশ' দেখাইয়া চলিতে হইবে না। যথার্থই তাই। সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ বিষয়ে একেবারে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাঁহার তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের এই স্থানটি পূর্ণ করিবার জন্য আজি আর কেহই নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না বোধ হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের অভাব কবে পূর্ণ হইবে জানি না—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছত্র-ছায়া তলে বসিয়াও সত্যেন্দ্রনাথের অভাব আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছি।

সাংসারিক জীবনেও সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন শুদ্ধ শান্ত ব্রতচারী তপস্বীর মত। বিবাহিত হইয়াও তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের এই দৃপ্ত দৃঢ় তেজোপূর্ণ অন্তরের ছাপ প্রায় তাঁহার প্রতি কবিতাতেই বড় গভীর ভাবে inpressed হইয়া রহিয়াছে। সত্যেন্দ্র-নাথের স্বদেশ প্রেম কেবল মাত্র তাঁহার কাব্য মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা ভীষণ ভাবে প্রবল ছিল। পরাধীনতার বন্ধন জ্বালা তাঁহাকে এতদূর নিপীড়িত করিত যে শুনিয়াছি স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এমন উগ্র স্বদেশ প্রেম বাংলার জীবিত কবি গণের মধ্যে আর বড় একটা দেখিতে পাই না। বাংলার দুর্ভাগ্য—বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে সত্যেন্দ্রনাথের মত—কবি বাংলা দেশে আর একটিও নাই!



রিক্তা—

—শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

ফুলশয্যা। নবযৌবন তরুণ তরুণীর চির-আকাঙ্ক্ষিত মধুযামিনী—অপূর্ব্ব সেই রাত্রিটী—সাধ আকাঙ্ক্ষায় ভরা প্রস্ফুটিত দুইটী হৃদয় সোহাগ সরমের মাঝে পরস্পরকে নিবিড় করিয়া চিনিয়া লয়…।

তেমনি 'ফুলশয্যা' আজ মেহেশেরও, বধূ সুরূপা চেয়ারে বসিয়াছিল যৌবন বসন্তের সমস্ত মাধুরী লইয়া নত মুখে—সুন্দরী তো বটেই, সু-শিক্ষিতাও!

এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া মেহেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল—গলায় তাহার অম্লান যুঁই ফুলের মালা, কিন্তু মুখ তাহার আনন্দের আভায় তো জলন্ত নয়—কেমন একটা পাণ্ডুর ম্লানিমা তার মুখে মাখা!

মেহেশ দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে বধূর পাশের চেয়ারটায় আসিয়া বসিল—কিন্তু কোন কথা কহিল না, নীরবে দেয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল—বহুক্ষণ!

বধূ অবাক হইয়া গেল,—নব পরিনীত স্বামীর ব্যবহারে।—ফুল-শয্যার এই রাত্রিটিকে কত কল্পনার রঙে সে রাঙাইয়া রাখিয়াছিল…সে সব কি এমনিই ভাবে বিফলে যাইবে? মনে মনে সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল খুবই।

আধঘন্টা কাটিয়া যাইবার পর মেহেশ কথা কহিল—সুরূপা, মিথ্যার আড়ালে যে বন্ধন বাঁধা হয় ভবিষ্যতে তা শিথিল হ'য়ে যায়ই—তাই যে গ্লানিটুকু আমার প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে কলঙ্কিত করে রেখেছে, সে সমস্তই প্রকাশ করে দিতে ইচ্ছা করি আজ তোমার কাছে—শুনবে কি?

বধূ বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। কী গ্লানিময় কাহিনী লুকানো আছে তাহার স্বামীর জীবনে? ডাগর চোখের সকরুণ স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলিয়া সে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

মিনিট চার পাঁচ কাটিবার পর ধীরে মেহেশ আরম্ভ করিল—

গৌরী আমার প্রতিবেশী—প্রতিবেশী কেন ছেলেবেলার সহচরী বন্ধু সবই সে। তাকে ঠিক ভালো বাসতুম কিনা জানি না, তবে একটা মোহময় আকর্ষণ ছিল তার প্রতি। ঠিক তেম্নি আকর্ষণ তারও ছিল। কৈশোর পার হ'য়ে গৌরী একদিন যৌবনের দ্বারে অতিথি হ'য়ে এল—আমারও প্রাণে তখন রঙিন উন্মাদনা। ক্রমে বি-এ পাশ করলুম অনার্স নিয়ে—। তখন আমরা কেউই ভাবতে পারিনি—যে জীবনের সেই অবেলাতেই স্রোতের তরীর মতো কে কোথায় ভেসে যাবো সংসারের নিয়তি চক্রে। তারপর সেবার গরমের ছুটীতে বাড়ী আসতেই মা বল্লেন 'মেহেশ গৌরীর কাল বিয়ে যে…গৌরীর বিয়ে…' মনের মাঝে কোথায় যেন খচ্ করে কাঁটা ফুটে উঠলো, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বেদনায় মুখখানা আমার পাংশু হয়ে গিয়েছে। মা আরো বল্লেন—বড্ড সাধ ছিল তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গৌরীকে আমার বউ করে ঘরে তুলবো। মেয়েটা বড্ড ভালো ছিল রে, আর নামের সঙ্গে রূপটাও তেম্নি ওজন করে নিয়ে এসেছিল…কি করবো বল্ বরাত আমার—ওরা যে কুলীন। অন্তরের চাঞ্চল্য গোপন করতে না পেরে, মার সুমুখ থেকে সরে গেলাম গৌরীর বিয়ে হয়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুর বাড়ীও চলে গেল সে—বিদায় বেলায় তার সেই অশ্রু সজল করুণ মুখখানির ছবি—জীবনে ভুলতে পারবো না—বিশ্বের বেদনা সে যেন একা তার নিজের মুখের প'রেই ফুটিয়ে

তুলেছিল...আমিও কম দাগা পাইনি তখন—বিশ্ব সংসার সবই তখন অন্ধকার বলে মনে হয়েছিল! তারপর বছর দুই বাদে ফিরে এলো সে সিঁথীর সিঁদুর মুছে আর হাতের লোহা ঘুচিয়ে—কোলে তখন তার ছ' মাসের শিশু—অণু......ফুটফুটে সুন্দর দেখ্‌তে...গৌরী তখন—মা', অণুর মা...তার কথা ভাবা তাকে চিন্তা করাও তখন আমার পক্ষে পাপ—মহাপাপ...

গৌরী একদিন বল্লে...

—দেখ্‌ছ স্নেহেশদা, বিধাতার কি নিষ্ঠুর বিধান...এই নিঃসঙ্গ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ কোর্‌ব বলেই তখন আমার কপালে অমনটা ঘটেছিল...না হোলে তো আর এরকম হোত না। তরুণী গৌরী অপরূপ রূপ—যৌবন তা'র! এই, শুভ্র শ্রীহীন বেশ কি তাকে মানায়? মনটা বেদনায় বিকল হয়ে গেল...বল্লুম—

কি কর্‌বে গৌরী—এই আমাদের অদৃষ্টের লিখন হয়তো—গৌরী বল্লে, এইটেই কি তুমি সত্য বলে মানো স্নেহেশদা—? চম্‌কে উঠ্‌লাম—গৌরীর একী অদ্ভুত প্রশ্ন—? চোখ চেয়ে দেখ্‌লুম—গৌরীর চোখের কোণে কিসের একটা আগুন—জল্‌ জল্‌ করে জ্বলে উঠেছে—সেই অগ্নিশিখায় আমার বিবেকের শাসন পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল—তারপর আর কি বল্‌বো সুরূপা—? নিজের অধঃপতনের আর কত কাহিনী তোমাকে শোনাবো বল—?

জীবনের তরুণ বেলায়—কলঙ্কের ভরা পসরা মাথায় নিয়ে গৌরী একদিন আত্মহত্যা কর্লে—লোক গঞ্জনা আর মনের জ্বালা সইতে না পেরে। ছ' বছরের অনাথ শিশু 'অণু' একেবারে অনাথ হয়ে পড়্‌ল—।

—মাও আমাকে নিয়ে একেবারে কল্‌কাতায় চলে এলেন—আমার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন—আমিও তাতে বাধা দিলুম না...কিন্তু গৌরীকেও ভুলতে পারলুম না—একটা দুঃস্বপ্নের মতো সে আমার মনের মাঝে জেগে রইল। গৌরীর শেষ অনুরোধ কি জানো সুরূপা—? মৃত্যুর আগে সে আমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল দেখ্‌বে—? স্নেহেশ স্খলিত চরণে উঠিয়া গিয়া ড্রয়ার খুলিল......তারপর একখানা ক্ষুদ্র চিঠি আনিয়া বধূর হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিল—কহিল...

—পড়ো...পড়ো—সবই যখন তোমায় জানালুম—তখন এটুকু আর কেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়...

চিঠিখানা হাতে করিয়া বধূ বসিয়া রহিল—অসাড় আড়ষ্ট ভাবে......খুলিলও না—পড়িলও না; তাহার মনে হইতেছিল আজিকার এই মিলন যামিনীর ফুলশয্যা তাহার মিথ্যা...একটা ভূয়ো বাহ্যিক প্রবঞ্চনা মাত্র......ওই যে পাশে দাঁড়াইয়া তরুণ স্বামী তার...তাঁর অঙ্গের প্রত্যেক স্থানটীতে যেন বিশ্বের যত গ্লানি ম্লানিমা মিশাইয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে—ওই যে কথাগুলা তিনি এতক্ষণ ধরিয়া কহিলেন...ও গুলাও যেন দূষিত কলঙ্কের মূর্ত্তি ধরিয়াই বধূর চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল...ওই স্বামী...উঁহাকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতে হইবে...চির জীবন উঁহারই সংস্পর্শে থাকিতে হইবে—একথা ভাবিতেও বধূর সারা দেহ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।...অসহায়া বাল-বিধবা তরুণী গৌরী আর এমনিই লঘু চপলচিত্ত ওই মানুষটী—নিজের একটু সুখ একটু আনন্দের জন্য অনায়াসে তাহার নারীত্ব দু' পায়ে দলিত করিয়া দিলেন—একটু কি কুণ্ঠাও হইল না তখন...?

স্নেহেশ চিঠিখানা বধূর চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল কহিল...পড়ো—পড়ো...গৌরীর শেষ অনুরোধটা কি জেনে নাও...

বধূ ঝাপ্‌সা দৃষ্টি মেলিয়া পড়িল—ক্ষুদ্র চিঠি—

'স্নেহেশদা—

আমি চল্লুম—কি ব্যথা কি বেদনা আজ আমার তরুণ জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলেছে তা তুমি সবই জানো...আমার শেষ অনুরোধ, অনাথ অণুকে দেখো—তার সুশিক্ষার যেন কোন রকম ত্রুটি না হয়—

অভাগিনী গৌরী,

……হায়রে……কি ব্যথা কি বেদনাই না গৌরীর ওই কয়ছত্র লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে…বধূর মনে হইল বিশ্বের যত অভাগিনীর আর্ত্ত ক্রন্দন যেন গৌরীর লেখার মধ্যে সে আজ শুনিতে পাইতেছে…

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল স্নেহেশ কহিল সবই তো শুনলে সুরূপা—? এখন এই হতভাগ্য স্বামীকে কি তুমি তোমার মনের মতো করে গড়ে নিতে পারবে না—, আজ সেই আশার মোহে যে আমি……বধূর মনে হইল তাহার স্বামী যেন তাহার কাছে একটা হীন অভিনয় করিয়া যাইতেছে মাত্র…… কঠিন ভাবে সে কহিল—'না—না' ওকথা বোলনা তুমি, তোমার সঙ্গে থাকা—তোমার সংস্পর্শ—এ আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব……তুমি জেনে রেখো আজ হতে তোমার সঙ্গে আমার কোন রকম সম্বন্ধ নেই…… সে অধিকার তুমি হারিয়েছ,

বধূর বুকের ভিতর অশ্রু সাগর দুলিয়া উঠিল প্রচণ্ড তালে—কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাহা তিলমাত্রও প্রকাশ পাইল না; এই মিলনযামিনী দাম্পত্য—জীবনের এই বাঞ্ছিত নিশা—কিন্তু আজ—

স্নেহেশ কথা কহিল—অলস শ্রান্ত কণ্ঠে……এ কী রাণু! এ অসম্ভব কথা কেন বোল্‌ছ? তবে তবে কি তুমি আমাকে ঘৃণা কর? বল—বল? স্নেহেশের কণ্ঠ আবেগোচ্ছ্বাসিত—

মুহূর্ত্তের জন্য বধূর সুগৌর মুখখানি বেদনায় অশ্রু-করুণ হইয়া উঠিল—না না—এ কী দুর্ব্বলতা তাহার? কঠিন স্বরে বধূ কহিল—হ্যাঁ ঘৃণিত কাজ করলে ঘৃণার পাত্রই সে হয় এ কি তুমি জান না?

স্নেহেশের অধীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সে বধূর মৃণালবাহু দুটী' দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহিল—বেশ—এই তো আমার যোগ্য পুরস্কার সুরূপা 'এর বেশী আর আমি কি আশা কর্‌তে পারি বল? যাক্ এখন শুতে চল, রাত যে তিনটে বেজে গিয়েছে……

বধূ কাঁদিয়া ফেলিল—কহিল……ওগো আর একটুক্ষণ অপেক্ষা কর—একটু……ভোর হয়ে যাক্ এ আমার ভয়ানক অসহ্য বলে বোধ হচ্ছে……

স্নেহেশ আর কিছু বলিল না—ধীরে গিয়া কুসুম-সুরভিত শয্যায় একাই শয়ন করিল; তাহার দেহ মন—যেন শ্রান্ত ক্লান্ত……

জানালা দিয়া শুক্লা একাদশীর খানিকটা চাঁদের আলো আসিয়া—বধূর অশ্রু সজল চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই রূপ এই মাধুর্য্য—বৃথা……সবই বৃথা—বধূ উদ্‌ভ্রান্তের মতো বসিয়াছিল—ভাবিতেছিল…কি বিড়ম্বিত আজিকার এই রাত্রিটী……ওই যে ঘরময় ছড়ানো নির্ম্মল অম্লান পবিত্র ফুলগুলি—ওগুলাও যেন কীটের মূর্ত্তি ধরিয়া বধূর চোখের সামনে আসিয়া ধরা দিল—ভাবিতে ভাবিতে সহসা বধূর মানস-মুকুরে ভাসিয়া উঠিল……পিতৃ মাতৃহারা এক অনাথ শিশুর করুণ মুখচ্ছবি—

বধূ কহিল……একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

স্নেহেশ বধূর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, কহিল, কি বল?

বধূ কহিল—'অমুর' সুশিক্ষার ত্রুটি যেন না হয়—এইটের একটু বিশেষ দৃষ্টি রেখো—বুঝলে —?

স্নেহেশ কহিল—বেশ—এ অনুরোধ আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলুম রাণু—

—আবার ওই আদরের ডাক? বধূর সারা দেহ যেন কী একটা ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় কাঁপিয়া হইয়া উঠিল—

স্নেহেশ কহিল—

আর কোন অধিকারই কি দেবে না রাণু?

না—না—না…বধূ প্রবল ভাবে মাথা নাড়িল—

শেষ রাত্রির বাঁশীতে তখন বড় করুণ সুরে বাজিতেছিল—

—কেন ধরে রাখা—সে যে যাবে চলে……

মিলন যামিনী গত হ'লে……

স্নেহেশের মনে হইল…সত্যই ইহাকে ধরিয়া রাখিবার মতো ক্ষমতা আজ আর তাহার নাই……

পাণ্ডুর আকাশের এক প্রান্তে চাঁদ কখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল—বিবর্ণ মুখে। মেহেশ চাহিয়া দেখিল—সাম্‌নে যে দীপ্ত তারাটা জল্‌ জল্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল—সেটাও কখন্‌ নিভিয়া গিয়াছে—উহার সঙ্গে সঙ্গে বধূর সুন্দর মুখ খানিও কি নিশান্তের ফুলের মতো চিরদিনের জন্যই শুষ্ক ম্লান হইয়া যায় নাই?······

প্রবাসীর পত্র

—শ্রীঅম্বিকা চট্টোপাধ্যায়

লিখ্‌তে তুমি নাই জানিলে—নাই জানিলে প্রিয়া!
কাজ কি পরের দয়ার দ্বারে বৃথাই ধন্না দিয়া?
মনের কথা থাক্‌না মনে; দেখা যেদিন হ'বে,
সারাটি রাত জেগে না-হয় সেদিন কথা ক'বে।
চোখের পরে চোখটি রেখে শুনবো বিভোর হয়ে,
গোপন গুহার ঝর্ণা যা'বে কলস্বরে বয়ে।
রাতের পাখী রইবে নীরব, গাইবে না সে গান;
দূর আকাশে দুষ্টু সে চাঁদ রইবে পেতে কান;
জানালাটা খোলাই র'বে,—চপল মেয়ের মত
জ্যোচ্ছনা সে পাত্‌বে আড়ি;—আমরা কূজন রত।
ঘুমিয়ে-পড়া রাতের বাটে নিদ মহলের পরী,
হাল্‌কা পায়ে একলাটি সে ফির্‌বে সফর করি।
ঝাউএর শাখায় বাউরী বাতাস বাজিয়ে যা'বে বাঁশী;
কুঁড়ির মুখে ফুট্‌বে মধুর গন্ধ-বিধুর হাসি।
জাগ্‌বে কুহক তোমার চোখে—জাগ্‌বে মদিরতা,
ভাষার মাঝে ধর্‌বে না ভাব,—হারিয়ে যা'বে কথা!
রইবে চেয়ে পলক-হীনা;—হাতের 'পরে হাত;—
অম্‌নি কোরেই—অম্‌নি কোরেই—পুইয়ে যা'বে রাত।
কিম্বা তুমি—থাক্‌ সে কথা;—দেখা যখন হ'বে;
সেদিন-কারের সে পরিচয় হ'বে তখন তবে।

আজ্‌কে শোন একটি কথা,—লিখ্‌ছি সঙ্গোপনে ;
সইকে দিয়ে পড়িয়ে নিও একলা ঘরের কোণে।
তুমি আমায় লিখো চিঠি সে এক নুতন ধাঁচে ;—
তেমন চিঠি কেউ লেখেনি কভু কারুর কাছে।
আখর-বিহীন শাদা কাগজ,—শুধু তাহার 'পরে
বিম্ব ঠোঁটের একটি চুমু দিও রঙীন্ কোরে।
আর কিছুনা ;—ওতেই সুরু, ওতেই কোরো শেষ ;—
তারপরেতেই পাঠিয়ে দিও এই সুদূরের দেশ !
হয়-তো শুনে হাস্‌ছো তুমি, হাস্‌ছে তোমার সই ;
ভাবছো মনে, আর কিছু না, এ এক খেয়াল বই।
সত্যি তা' নয়।—একটি তোমার মিষ্টি চুমার লাগি'
এই তৃষাতুর মন যে আমার রয় সারা রাত জাগি'।
দিনের বেলা বেশ থাকি সে নানা লোকের মাঝে,
রাতের বেলার নির্জ্জনতা বেজায় যেন বাজে।
কেবল মনে দেয় যে উঁকি একটি ভীরু আশা ;
সেই আশাটি সফল কোরো, হে মোর ভালোবাসা !
রাত্রি যখন স্তব্ধ নিঝুম, ঘুমে আচুল হাওয়া
ফির্‌বে ফুলের বনে-বনে মধুর নিশি-পাওয়া ;
আমি তখন একলা বসে আমার নিজন ঘরে
একটি চুমু দেব তোমার চিঠির চুমুর' পরে।
ঘুমাও যদি সেথায় তুমি উঠ্‌বে হটাৎ জেগে,
প্রাণের বীণায় বাজ্‌বে বেহাগ সে কোন্ পরশ লেগে।
হেথায় আমার রাত পোহাবে একটি স্বপন দেখে,
পাৎলা দু'টি মিষ্টি ঠোঁটের সোহাগ-সুধা মেখে।

———

ভালো করলেও বিপদ—

—জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—প্রথম—

দেশবৎসল শ্রীমান্ গোলকবিহারী অধিকারী ঠিক কোন্ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃদেব-পরিত্যক্ত চন্দননগরস্থ ত্রিতল অট্টালিকায় আসিয়া অগণিত কোম্পানীর কাগজের তাড়ার উপর পরম নিশ্চিন্ত মনে সুখে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন সে তথ্য আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কিন্তু দেশের কাজে তিনি যে কিরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহার প্রকৃত সংবাদ ন'মাসে ছ'মাসে আমাদের কর্ণগোচর হইয়া থাকে। তাহাতেই শুনি, মাসিক হাজার টাকা সুদের সমুচিত সদ্ব্যয় কি প্রকারে হইতে পারে তাহা স্থিরীকৃত করিতে করিতেই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। কি করিলে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করা যাইতে পারে—কি প্রকারে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন, ঘরে ঘরে নল কূপ স্থাপন—ধূলি-ধূসরিত মৃত্তিকাকর্দ্দমাক্ত পল্লীপথের পরিবর্ত্তে পাকা চোস্ত সহুরে রাজপথের প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতি সৎকার্য্যে অশেষ পুণ্যলাভ করা যায়—এতদ্বিধ বিবিধ বিষয় লইয়া মান্ধাতার আমলের বৃদ্ধ দেওয়ান গণ্ডু মহারাজ বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেন, জল্পনা কল্পনায় দিবারাত্রি কোন সুযোগে নিঃশব্দে পলায়ন করিল—সতর্ক গোলকবিহারী তাহার সবিশেষ তদ্বির করিয়াও স্থির করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, সময় যখন এ হেন গতিতে ধাবমান—এমন সময় সহসা একদিন সংবাদ আসিল মহাকৃপণ কুবেরপ্রতিম খুল্লতাত মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন।

আপনার বলিতে গোলকবিহারীর একমাত্র খুড়া মহাশয়ই ছিলেন। কাজেই এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে গোলক বিশেষ ক্ষুব্ধই হইলেন। অতঃপর যথাসময়ে মহা ধুমধামসহকারে খুল্লতাত মহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনমণ্ডলী শ্রদ্ধোপলক্ষ্যে সবান্ধবে শুভাগমন পূর্ব্বক গোলকবিহারীর শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া গেলেন। কত শত সহস্র লোক খাইল—কত প্রার্থী চরিতার্থ হইল, কয়দিন ধরিয়া অকাতরে অজস্র অর্থ নিঃশেষিত। সকলে জানিল, হাঁ খুড়ার উপর সত্যিকার টান আছে যা হোক।

কিন্তু দুষ্টলোকে এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যেও গোলকবিহারীর সাংসারিক পাটোয়ারী বুদ্ধির আধিক্য আবিষ্কার করিতে ছাড়িল না। স্বর্গত খুল্লতাতের পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার অফুরন্ত সম্পত্তি যে একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র গোলকবিহারীরই প্রাপ্য ইহা লইয়া আনাচে কানাচে যথেষ্ট আলোচনার ঢেউ খেলিতে লাগিল। এবং সে রকম কোনও প্রাপ্তি সম্ভাবনা না থাকিলে গোলকবিহারীর মানসিক গতি ঠিক অবিচলিত থাকিত কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহবাষ্প জমা হইয়া চারিদিক জমাট করিয়া তুলিল।

কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, গোলকবিহারী এরকম কূটস্বভাবের মানুষ ছিলেন না। খুল্লতাতের অগাধ ঐশ্বর্য্যের উপর কোন দিনই তাঁহার শ্যেন দৃষ্টি পতিত হয় নাই। নিজের সম্পত্তিই শেষ করিয়া ফুরাইয়া উঠা ভার। তাছাড়া ভোগ করিবার লোকই বা কই, মানুষ ত একা নিজে। তাই মাসান্তে হিসাব—নিকাশ-অবসানে যখন জানা গেল, গোলক দশ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী উপরন্তু খুল্লতাতের কলিকাতাস্থ প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক—তখন বিস্ময়ে আর সকলের চক্ষু কপোলতলগত হইলেও গোলকের নিজের কিছুই ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। বরং কৃপণ খুল্লতাতের হস্ত-বিগলিত

হওয়ার সম্পত্তিটী দেশের পক্ষে কত দূর কল্যাণ-কর হইবে ইহা চিন্তা করিয়াই তাহার অন্তর দেশপ্রীতির উচ্ছ্বাসে অপার আনন্দে উথলিয়া উঠিল।

গোলকবিহারীর সত্যকার জীবন যাত্রা বোধ করি এইখানেই সুরু। সবে মাত্র সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। এখন সম্মুখে তাহার অনন্তপ্রসারিত সাধনার ক্ষেত্র। কত আশাই না জলবুদ্বুদের ন্যায় মানস সরোবরে উদিত অস্তমিত হইতেছে। কত শত কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই মান্ধাতার আমলের অন্নপ্রাশনের সময়কার বিরাট নামের ভারে সংসারের পিচ্ছিল পথে পদে পদে বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধিবলে মাত্র "অধিকারী মহাশয়" নামই বাহাল রাখিলেন। অতএব আমরাও তাঁহাকে এবার হইতে ঐ নামেই অভিহিত করিব।

অধিকারী মহাশয় চন্দননগরেই পত্তন গাড়িয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি। তাই নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের আশায় খুল্লতাতের বাড়ীতে আসিয়া কলিকাতা-বাসী হওয়াটা মোটেই সুবিধা বোধ করিলেন না। জলের মাছ ডাঙ্গায় গেলে কোন দিন সুস্থ থাকে? তাই কলিকাতার বাটী পূর্ব্ববৎ ভাড়া খাটিতে লাগিল।

বাড়ীখানিতে অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশটী পরিবারের বাস। ইহাতে মাসিক ন্যূনাধিক দেড় সহস্র মুদ্রা ভাড়া উঠে। অধিকারী মহাশয় ভাবিলেন, আহা, বৃথা গরীব গৃহস্থদের পিষিয়া মারা! কেন, অত টাকা নাই বা আদায় করা হইল। লোকসান বিশেষত কিছু হইবে না বরং গৃহস্থগণ একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। বেচারারা অতিরিক্ত বাড়ীভাড়ার টাকা টানিয়া টানিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে! শুধু এই বাড়ীভাড়ার জন্তই কত গৃহস্থই না সহরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গরীব গৃহস্থ ভাড়াটিয়াগণের দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। অবশেষে অনেক গবেষণার পর স্থির হইল বাড়ীভাড়া কমাইতে হইবে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। অধিকারী-মহাশয় দেওয়ান গণ্ডু মহারাজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে দেওয়ান স্বশরীরে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—হাঁ শুনছ মহারাজ—আজই কলিকাতায় ভাড়াটেদের খবর দিয়ে এস আমি তাদের ভাড়া অর্দ্ধেক কমিয়ে দেব।

হঠাৎ চক্ষের সম্মুখে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটনে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে দেওয়ান বাহাদুরও ঠিক তেমনিই শিহরিয়া উঠিল। শুনিতে না পাইবার ছলে জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছেন বাবু?

বাবু পুনরায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন।

গণ্ডু মহারাজ বাবুর পিতৃদেবের আমলের লোক। তাই বাবুকে পুত্রের মতই স্নেহ করে এবং প্রতিকাজেই ভাল মন্দ উপদেশ দিয়া থাকে। তাই এ ক্ষেত্রেও বলিল—ও কি কথা বলছেন বাবু? ভাড়া কমাবেন, না বাড়াবেন বলুন। আপনি কি বলতে চান ভাল করে খুলে বলুন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না আপনার কথা!

কিন্তু বৃদ্ধের এ ঔদ্ধত্য বাবুর আজ ভাল লাগিল না। কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, সব সময় তোমার উপদেশ ভাল লাগে না মহারাজ। কতবার এক কথা বুঝোতে হবে তোমায়? আজই কলকাতায় গিয়ে বলে এস ভাড়া অর্দ্ধেক কমান হবে—বাড়ান নয় বুঝলে?

—আপনার বোধ হয় এখন মাথা ঠিক নেই বাবু। কি বলছেন কি করছেন তা নিজেই হয়ত এখন বুঝতে পারছেন না। ভাড়া ত বাড়ানই হয়ে থাকে সব জায়গায়—কমাবার কথা কে কবে শুনেছে?

—এই এখন আমার কাছে শুনলে ত? যাও—বৃথা বাক্য ব্যয় কোরো না—আমার কাজ আছে।

—আর একবার ভেবে দেখুন বাবু পরে এর জন্যে অনুতাপ করতে হবে হয়ত। আর লোকেই বা বলবে কি একথা শুনে?

কিন্তু কোন অনুনয় বিনয় উপদেশই আজ অধিকারী মহাশয়ের মন টলাইতে পারিল না। অবশেষে সন্ত মন্ত্র-পারীর মত টলিতে টলিতে মহারাজ প্রভুর ঘর ছাড়িয়া চলিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? এতক্ষণ প্রভুর সঙ্গে যে এত কথা হইল সে সব কি অলীক? তা না হইলে এরকম অসম্ভব কথা সে কিরূপে শুনিল? উহারা ত ভাড়া কমানর জন্ম কোনো আবেদন করে নাই। বরং মাসের পয়লা তারিখেই সকলে নিজে আসিয়া যে যাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া যায়। তবে কেন হঠাৎ প্রভুর মাথায় এরকম অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। হায় হায় খুড়ামহাশয় এ কথা জানিতে পারিলে যে শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিবেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এতদুর উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে যে ভাড়া কমাইতে চায়! হায় তাহার এত সাধের ঐশ্বর্য্য সব একেবারে তিন-নয়-ছয় হইতে বসিয়াছে! কে জানে মনিব ইহার পর আবার কি এক নূতন খেলা খেলিয়া বসিবেন। হায় হায়, কেমন করিয়া প্রভুর সুমতি হইবে?

সমস্ত রাত্রি মহারাজের নিদ্রা হইল না। কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। মনে হইল যাই আর একবার প্রভুর কাছে যদি এখনও তাঁহার মন ফিরে। কিন্তু প্রভুর সেই উগ্র মূর্ত্তির কথা স্মরণ করিতেই যাইতে সাহস হইল না। এ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য?—চিন্তায় মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে। অথচ ভাবিয়াও কোন কুল কিনারায় পৌছিবার উপায় নাই। অবশেষে রাত্রিশেষে ঔৎসুক্যের বেগ ঈষৎ নিবৃত্ত হইলে কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইল।

হরিহর নিদ্রা ছাড়িয়া উঠিয়া সবেমাত্র দাঁতের মাজন হস্তে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াছে এমন সময় নাদুস নুদুস রাঙুখুড়ো ভুড়ি দোলাইতে দোলাইতে এক গাল হাসিয়া আসিয়া কহিল,—কি ভায়া, আজ কা'র মুখ দেখে ওঠা গেছে বলতে পার? তা না হ'লে সবে এক টিপ নস্য নাকে ঠেসেছি কি না ঠেসেছি অমনি হাঃ হাঃ হাঃ—

—ব্যাপার কি হে, অত হাসি কেন? আরে বলেই ফেল না ছাই আগে ব্যাপারটা কি তারপরে—

—ওহো এমন সুখবর কি আর ছুটো আছে? খবর পেলুম নাকি আমাদের বাড়ীভাড়া ছ'কুড়ি টাকা কমে গেছে! কী সুসংবাদ—মহারাজের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—

—হ্যাঁঃ তুমিও যেমন, একেবারে অতটা উতলা হয়ে পড়েছ। আগে ভাল করে জান খবরটা সত্য কি না, তারপরে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ো। তা' না হলে আজ বিশ বছর একাদিক্রমে রয়েছি এখানে, বাড়ীভাড়ার তাগিদের জ্বালায় অস্থির, এক পয়সা ছাড়ান নেই তা' কমান চুলোয় যাক্; আর আজই কি না মালিক সদয় হয়ে আপনা থেকেই খামকা ভাড়া কমাতে লেগে গেছেন। তোমারও যেমন কথা—

—কি যে বল আর কি যে কও। আমি নিজে কানে শুনলাম ধরণীধরের মুখে আর তুমি কিনা সে সব উড়িয়ে দিতে চাও! মহারাজ দেওয়ান আজ এসেছিল সকালে। এসে বলে গ্যাছে বাবুর এবার মন ফিরল, ভাড়া কমাবেন। আর আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ঐ ত পণ্ডিত মশাই যাচ্চেন—ওঁকে ডেকে জিগ্যেস কর না কেন?

ডাকিবার প্রয়োজন হইল না, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত এই দিকেই আসিতেছিলেন সুসংবাদটা প্রচার করিবার জন্তই। তাই জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ হে হরিহর, শুনেছ ত ব্যাপারখানা মহারাজের মুখে? ভাগ্যি আমাদের ভাল বলতে হবে যা হোক্।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে তথায় ছোটখাট একটা কমিটির সৃষ্টি হইয়া উঠিল। রাখহরি নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। অপরের কথায় কান দিবার তাহার সময় নাই। পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে অবধি দাঁড়াইয়া গেল ব্যাপারটা কী জানিতে। কম্পাউণ্ডার গদাই মণ্ডল নাকি স্বকর্ণে মহারাজ প্রমুখাৎ শুনিয়াছে ভাড়া কমানর কথা; অতএব তাঁহার এখানে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পতিতপাবন, দিগম্বর, যজ্ঞেশ্বর নিয়োগী, পরাণ অধিকারী প্রভৃতি যে

যেখানে ছিল সকলেই জুটিয়া আসিল। বাক্‌বিতণ্ডার আর অন্ত রহিল না। কেহ সুসংবাদ পাইয়াই খুসি, কেহ বা নিজের অভিজ্ঞতা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে ব্যস্ত—মহারাজ তাহাকে নিজ মুখে কি কি কথা কহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই মহারাজের উক্তি যে কতদূর অজ্ঞতাফলপ্রসূ তাহাই প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

এত তর্কবিতর্কের পরও যাহাদের মনের ধাঁধা অন্তর্হিত হইল না, তাহারা অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সরাসরি বাড়ীর মালিকের সমক্ষে আবেদন করিল, মহারাজ বাহাদুরের বিকৃত মস্তিষ্কের ফলে যে অহেতুকী উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য আসিয়া তাহাদের উৎপীড়িত করিতেছে তাহা অচিরকাল মধ্যে অপনীত করা হউক এবং ইত্যাদি—।

দুইদিন মধ্যেই তাহার উত্তর আসিল, মহারাজ সম্বন্ধে উক্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ মহারাজ যাহা জানাইয়া আসিয়াছে তাহা অলীক মনে করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এতদিনে স্বয়ং বাড়ীর মালিকের নিকট হইতে উত্তর পাইয়া সকলের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু আর এক নূতন দুশ্চিন্তা আসিয়া সকলের মনকে ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিল, সহসা মনিবের এরূপ সুমতি হইবার কারণ কি?

চিন্তার অন্ত নাই। কারণ-আবিষ্কারে বাড়ীর সর্ব্বনিম্নতল হইতে ঊর্দ্ধতম তলের প্রত্যেক অধিবাসীটী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল, কিন্তু সফলতার জয়টীকা কাহার ভাগ্যে আছে কে জানে?

সত্যসন্ধিৎসু সত্যশরণ অনেক গবেষণার পর ঠিক করিল, হয়ত মনিব কোন গুপ্ত মহাপাপ করিয়া বসিয়াছেন। তাই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এখন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সৎকর্ম্মে মন দিয়াছেন।

শুনিয়া ধর্ম্মভীরু বিষ্ণুবান্ধব বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ বল কি? তা হলে অতবড় অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠের বাড়ী ভাড়া থাকিয়া আমাদেরও ত পাপ হইতেছে?

বিজ্ঞান-শিক্ষক হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের সমাধান কিন্তু অন্য প্রকারের। দীর্ঘকাল মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে তিনি যে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা এই—বাড়ীখানি নিশ্চয়ই অপক্কভাবে প্রস্তুত। শীঘ্রই কোন ঝড়ঝাপটায় হয় ত ভূমিসাৎ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই মনিবের এই সংকল্প।

বাঞ্ছারাম আজন্মকাল এই বাড়ীতেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে এক কথায় সায় দিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়, বাড়ীটা ত কম দিনের নয়; আমার এই এতটা বয়স এই বাড়ীতেই কাটিয়েছি। জীর্ণও ত কম হয়নি বাড়ীটা।

অপর একব্যক্তি মত প্রকাশ করিল, তা কি আর হতে পারে? কত বাড়ীই ত রয়েছে সহরের মাঝে—সবই কি আর একেবারে নতুন, পাকা গাঁথুনি?

—হয় ত বাড়ীটার মাথা ভারী—পঞ্চম তলের এক বাসিন্দা ভয়ে ভয়ে বলিল।

নীচের তলার অন্ধকূপবাসী কৃষ্ণকান্ত বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই বাড়ীর নীচে চোরা কুঠরী আছে। তাতে নোট জালের কারখানা। রাত দুপুরে চারদিক নিঝঝুম হলে আমি কতদিন আওয়াজ পেয়েছি তার।

সহসা এক নূতন বিভীষিকায় সকলের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাই ত, এত কাল ধরিয়া এই রহস্য লুক্কায়িত ছিল এই বাড়ীর মধ্যে? কী ভীষণ! শেষে কিনা পুলিশের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে!

কিন্তু মহা-ধড়ীবাজ চঞ্চলকুমার যখন আর এক অদ্ভুত কারণ আবিষ্কার করিয়া মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার পরিচয় দিল তখন সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া পড়িল। চঞ্চল কুমারের মত,—মনিব বোধ হয় রাতারাতি বাড়ীটায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চান। নিশ্চয় ইন্‌সিওর করা আছে বাড়ীখানা—লোকসানের ভয় নেই চাই কি একটা মস্ত দাঁও মারতেও পারেন এর থেকে।

কী সর্ব্বনাশ! বাড়ী হইতে বাস উঠাইতেই বা হয় বুঝি!

সেই দিন নিশীথ রাত্রিতে বামাচরণ ছয়তলার বিশাল-বপু পান্নালালের সঙ্গে গল্প সল্প শেষ করিয়া নিজের নিম্নতলের ঘরে ফিরিবার পথে সিঁড়িতে কাহার যেন বস্ত্রাঞ্চল প্রত্যক্ষ করিল। ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে আর এক দৃশ্য নয়নগোচর হইল, নিতাই খানসামা রাত্রি ত্রিযামায় প্রয়োজনানুরোধে ঘরের বাহির হইয়া কোনও অপরিচিতের কল্পিত পদশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে সকলের ঘরেই রাত্রিকালে ছোটখাট রকমের উপদ্রব চলিতে লাগিল। কুস্বপ্নের ফলে কাহারও আর নির্ভরে নিদ্রা হয় না।

কিন্তু এ সকল বীভৎস ব্যাপারের মূলে কি? মনিবের গুপ্ত অধর্ম্মাচরণ, না নিজেদেরই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল?

কোনও 'হদিস' মিলিল না।

যজ্ঞেশ্বর নিয়োগীর ঘর রাস্তার দিকে। অগ্নিসংযোগে তাহার ঘরই অগ্রে ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা। তাই পরদিনই ঘরের আসবাবপত্রাদি স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল।

যথাকালে মহারাজ বাহাদুর অধিকারী মহাশয়কে জানাইল, যজ্ঞেশ্বর নিয়োগী বাড়ী পরিত্যাগ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ। অধিকারী মহাশয় সুস্থ-চিত্তে মৃদু হাস্যসহকারে সম্মতি দিলেন,—মূর্খকে যাইতে দাও।

হরেকেষ্ট বাবু এখানে একাকীই থাকেন। স্ত্রী পুত্রপরিবারাদি সব দেশে। ঘরে জিনিষপত্রেরও বিশেষ আধিক্য নাই। তথাপি তাঁহারও অগ্নি-বিভীষিকা অন্তর্হিত হইল না। তিনিও বাড়ী পরিত্যাগের 'নোটীশ' দিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্যারিষ্টার সেন, অধ্যাপক বিশ্বম্ভর বসু হইতে আরম্ভ করিয়া পরাণ অধিকারী মায় রাজ খুড়ো পর্য্যন্ত সকলেই একে একে গৃহত্যাগ করা সমীচীন বোধ করিল। যাহারা দুই এক জন রহিল, বন্দুকাদি সংগ্রহ করিয়া সদা সশঙ্কিত চিত্তে কি হয় কি হয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় মাস খানেক অতীত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, গোলক বিহারীর স্বর্গীয় খুল্লতাতের প্রাসাদগাত্রে প্রায় খান ত্রিশেক 'বাড়ী ভাড়া' দোদুল্যমান অবস্থায় পথিকের কৌতুহল উৎপাদন করিতেছে।

কলিকাতার মত মহানগরীতে কোন বাড়ীই শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকা একান্ত দুর্লভ। তদুপরি ভাড়া যদি নিম্ন হারে হয়।

এ বাড়ীরও ভাড়াটিয়া জুটিতে বিলম্ব হয় না।

দেওয়ান বাহাদুর আগন্তুকগণকে পরিত্যক্ত ঘরগুলি প্রদর্শন করাইয়া বেড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানির রহস্যাবৃত অতীত ইতিহাস কিছু কিছু বুঝাইতে চেষ্টা পায়।

এত বড় বাড়ী অথচ জনমানবের চিহ্ন নাই! সকলেই একযোগে বাড়ী ছাড়িবার মানে কি?—এ রহস্যের আর সন্ধান মেলে না তাহাদের নিকট। তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া যে যাহার নিজের পথ দেখিতে লাগিল।

প্রাসাদোপম অট্টালিকা—এককালে যে স্থান শত মানবের হাস্য পরিহাসে মুখর ছিল,—আজ তাহা নিস্তব্ধ, নিঝুম, শান্ত! চারিদিকে চিরবিষাদভরা নিরানন্দের শরীরী প্রতিচ্ছবি; ইঁদুরগুলি পর্য্যন্ত খাদ্যাভাবে স্থানান্তরে পলাইয়াছে।

শুধু একমাত্র প্রাণী সমস্ত বাড়ীখানায় বাস করে, সে দেওয়ান মহারাজ বাহাদুর। খুল্লতাতের সাধের ঐশ্বর্য্যের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই এখনও। স্ত্রী অনেক দিনই চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, কন্যারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে; একাকী সে পারের খেয়ার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

কিন্তু তাহাও বেশী দিন নহে। নিত্যই ভৌতিক উপদ্রব লাগিয়া আছে। অবশেষে একদিন মহারাজের চক্ষু ফুটিল। বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া বাবুর কাছে গিয়া সে বিদায় চাহিল।

হায়! গোলকবিহারীর বড় আশা ছিল, গরীব গৃহস্থগণের দুঃখমোচন করিবেন। কিন্তু মূর্খ গৃহস্থেরা সে উদারতার কি বুঝিবে? সেই শাশ্বত কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত কেহ বাড়ীভাড়া কমানোর কথা কল্পনাও করিতে পারিয়াছে কি? এ যে অলৌকিক, অভূতপূর্ব্ব!*

---

* ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবে, কোন্ অতীতের পুণ্য শুভ-ক্ষণে
আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত প্রথম বর্ষণে,
মেঘ-মন্দ্র শ্লোকে অভিনব মেঘদূত
ছন্দে গন্ধে অপরূপ বিচিত্র অদ্ভুত,
লিখেছিলে সুললিত হে কবি সম্রাট্ !
বিরহীর অন্তর্গূঢ় বিপুল বিরাট
বিচ্ছেদ বেদনা যত হয়ে স্তূপাকার,
সঘনে তোমার গানে করিছে ঝঙ্কার,—
কোথা বন্ধু, কোথা প্রিয়, কোথা প্রিয়তম,
দেখা দাও—এ ব্যথার করো উপশম।
অশ্রু-বাষ্প ভরা যত রুদ্ধ মহাশোক
রচেছে জমাট্ বাঁধি মেঘ-দূত শ্লোক।
যত কান্না যত ব্যথা, যত হাহাকার
প্রিয়-হারা গৃহ-হারা প্রবাসী সবার,
স্তরে স্তরে পরে পরে জমি' সমুদায়
গড়িয়াছে রুদ্ধ-বাক্ হিমাচল প্রায়
বেদনার মহা-স্তূপ তোমার সঙ্গীতে।—
শব্দ-হীন গানে যাহা বিচিত্র ভঙ্গীতে
কাঙাল-নয়নে চাহি' ঊর্দ্ধে মেঘ পানে,
গুমরিয়া অনুক্ষণ সকরুণ তানে,
লাঞ্ছিত হিয়ার অতৃপ্ত কামনা সম
গাহিতেছে,—কোথা বন্ধু ! কোথা প্রিয়তম !

বর্ষকের অকরুণ দগ্ধ অভিশাপে
কামী যক্ষ দেবযোনী, আপনার পাপে
অলকা নগর হতে আসি' নির্ব্বাসনে,
অবসন্ন আশাহত মূর্চ্ছাতুর মনে
ফেলেছিল মুহুর্মুহুঃ যত দীর্ঘশ্বাস ;
নেহারিয়া আষাঢ়ের ধূসর আকাশ
কেঁদেছিল মূর্ত্তিমতী হতাশ-প্রণয়
যত কান্না, চারিদিক হেরি' শূন্যময়,
পিয়া বিনা অন্ধকার অন্তরের মাঝে ;
নিয়ত নীরবে তাহা মেঘ-দূতে বাজে
গুপ্ত-করা হৃদয়ের রুদ্ধ প্রেম সম,—
কোথা বন্ধু, কোথা প্রিয়, কোথা প্রিয়তম !

না জানি সে উজ্জয়িনী আষাঢ়-গগনে
হয়েছিল সেই দিন নীল-নব-ঘনে
কী যেন ঘন ঘোর মেলা, তাণ্ডব উৎসব,
সুগম্ভীর বজ্রতানে রাগিনী ভৈরব !
উন্মাদ ঝটিকা বায়ু না জানি কী বেগে
করেছিল দাপাদাপি ! উঠেছিল জেগে
অসহন গুপ্ত-ব্যথা, ক্ষুব্ধ-হাহাকার
বিশ্বের বিরহী যত বুকে সবাকার
সেই দিন—সেই পুণ্য বিগত বরষে,
আষাঢ়ের বারি-ঝরা প্রথম দিবসে।
সে-দিন কি ছিল যত সুদূর প্রবাসী
প্রিয়ার দর্শন লাগি' হয়ে অভিলাষী,
কাটাতে নারিয়া দীর্ঘ আষাঢ়ের বেলা,
অন্ধকার গৃহ-কোণে বসিয়া একেলা

গেয়েছিল বেদনার মহা ঐক্যতানে
বিরহের শ্লোক ? কিম্বা চাহি' মেঘপানে
জানাইয়াছিল শুধু মূক হাহাকারে
অন্তরের ক্ষত-ব্যথা ? অশ্রু বাষ্পাকারে
ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠি' ঊর্দ্ধে নভ-পথে,
সমারূঢ় হয়ে শেষে জলদের রথে
গিয়েছিল ছুটে কিগো প্রেয়সীর পাশে ?—
বিরহিনী প্রিয়া যথা মিলন-হুতাশে,
রুক্ষ কেশে, তিক্ত ক্লেশে, সজল নয়নে
কাঁদিতেছে বিষাদিনী বিনিদ্র শয়নে ;
সমুন্নত হৃদিখানি চাপি' দুই করে
যাপিতেছে দীর্ঘবেলা অন্ধকার ঘরে।
কাজল নয়ন দুটী জলভরা তার
নিরাশায় ফিরে ফিরে আসে বারবার
দ্বার হতে। কবিবর ! তোমার সঙ্গীতে
সে বিরহ অহরহ বিচিত্র ভঙ্গীতে
তরঙ্গিছে স্তরে স্তরে ছন্দেঅনুপম ,—
কোথা বন্ধু, কোথা প্রিয়, কোথা প্রিয়তম !

মেঘ-দূতে তুমি কিগো করিয়া জমাট্
বিশ্বের বিরহ যত, হে কবি-সম্রাট ,
পাঠাইলে শব্দহীন অনুদাত্ত তানে
দূরে—বহুদূরে সেই অলকার পানে
প্রণয়ের লিপি রূপে বিরহী যক্ষের ?
বাঁচাইতে ক্ষীণ আশা প্রিয়ার বক্ষের
কিম্বা নিজে নবোদিত কালো মেঘ রূপে
অলকা নগরে আসি অতি চুপে চুপে ,
মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া
বুকে মুখে চোখে তার পড়িলে ঝরিয়া
মৃত্যু—সঞ্জীবনী স্নিগ্ধ সুধা বরিষনে ?
কানে কানে ক'য়ে এলে মধুর নিঃস্বনে
তার—যাদুকরী আশার কুহক বাণী ,—
ভয় নাই, এ দুর্দ্দিন কেটে যাবে রাণী !

তারপর, কতদিন সে-দিনের পরে
কেটে গেছে ; ডুবে গেছে অতীত-সাগরে
কতশতবার কত বিগত বরষ ,
আষাঢ়ের বারি-ঝরা প্রথম দিবস।
প্রতি বর্ষা স্নিগ্ধ নব বৃষ্টি বরষিয়া
তোমার ছন্দের বেগ গেছে প্রসারিয়া
দিগন্তের পানে। দিয়ে গেছে নবপ্রাণ,
নব নব হাহাকার, বিরহের তান
সঘন সঙ্গীত মাঝে। কতশত জনা
উন্মুক্ত গবাক্ষ তলে বসি' আনমনা ,
উচ্চারিয়া ধীরে ধীরে ওই মহাশ্লোক,
নিমগ্ন করিয়া গেছে বাষ্পাকুল শোক
অন্তরের ; ছিন্ন করি ধৈর্য্যের বন্ধন
পুঞ্জীভূত করি' গেছে অসহ—ক্রন্দন
প্রতি স্তরে স্তরে তার।—মেঘধ্বনি সম
আজো শুনি সেই কান্না,—কোথা প্রিয়তম ॥

তীর্থপথ—

যোহান বয়ার

অনুবাদক—শ্রীঅরিন্দম বসু

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

না, আর নয়, কি লাভ এই চিন্তায়? সুপ্তি চাই, সুপ্তি, সুপ্তি!

সাতচল্লিশ নম্বর মেয়েটি দুটি চোখই মুদিত করিল। কিন্তু অবিরাম চিত্ত-বিক্ষোভে সুস্থির থাকিতে পারিল না।

মধ্য-রজনী অতিক্রান্ত। চতুষ্পার্শ্বের শয্যাগুলি হইতে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। একজনের বিশ্রি নাসিকাধ্বনিও তার সঙ্গে।

সদ্য-জাগ্রত একটি শিশু অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল। তারপরই কিন্তু আবার শান্ত।

বাহিরের ঐ রাস্তাটিও নিঃশব্দ, নির্জ্জন। সমস্ত কিছুই তখন রজনীর নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন।

এমনই নিশুতি। কিন্তু একজনের বিনিদ্র-নয়নে সুপ্তি যেন ক্লান্ত হইয়া সরিয়া গেছে। কি দুর্ব্বিসহ সেই চিন্তা! সে দুর্নিবার স্মৃতির বুঝি কোন অন্তই নাই। গত দুই রাত্রিতে যেমন জাগর-স্বপ্ন, আজও বুঝি তেমনই……

সমস্ত স্মৃতি অন্ধকারেই শুধু ফুটিয়া উঠে, আবার সরিয়াও যায় কখন।

সে যেন একটা গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া। একটু দূরে কোথায় সূর্য্যালোকিত সুন্দর স্থান। একদিন সে তেমনই একটা সুদৃশ্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজ কত তার প্রভেদ।

অতীতের কত রমণীয় দৃশ্য! সিনেমার চিত্রের মত ভাসিয়া আসে, যায়। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সেই অপরূপ স্মৃতিগুলি—একটার পরই আর একটা। তার বর্ণ-বিচিত্র রূপ-সম্ভারের মধ্য মণিটি যেন সে-ই।

অতি প্রথমে মনে পড়ে সমুদ্র-বেলার অনতিদূরে সেই মনোরম ক্ষুদ্র দ্বীপটির কথা। তাহার মাঝখানে আলোস্তম্ভ রক্ষকের ক্ষুদ্র গৃহখানি। সেখানকারই মুক্ত আলো-বাতাসে তার শৈশব হারাইয়া কৈশোর ফুটিয়াছিল।

তারপর পূর্ব্বপ্রদেশের রমণীয় সেই দৃশ্যরাজি। সেখানেও কত কাল! তাহার কত স্মৃতিই না আজ মনে ব্যপিয়া আছে।

ক্রিশ্চিয়ানার অন্ধকার কক্ষও আসিল একদিন; সে যেন বন্দীশালা—নিগড়-বদ্ধ হইয়াই যেন সে ছিল! সেখান কার কত জনকেই না মনে পড়ে! কত মেয়ে, কত পুরুষ, বন্ধু-বান্ধবও কত, তাহা ছাড়াও তো কত জন! কিন্তু আজ তাহাদের উপর ঘৃণার অবধি নাই তার।

মেয়েটি অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল। অদূরেই পার্শ্ববর্ত্তিনী স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র ঘড়ীটি পড়িয়াছিল, নিশি-প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে তাহা তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, রাত্রি তখন দুইটা।

'আজকের রাতটা কি শেষ হবে না? আশ্চর্য্য!'

পুনরায় সে শয়ন করিল, চক্ষুও মুদিল। গাত্রাবরণখানি মাথার উপর টানিয়া দিয়া ভাবিল,—আর নয়, এখন নিদ্রা।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু আবারও অতীতের সেই স্মৃতির প্রবাহ। সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ, আলোস্তম্ভ রক্ষকের সেই ক্ষুদ্র আবাস—আজও তার পিতা মাতা সেই আশ্রয়েই রহিয়াছেন। তার এতবড় অন্যায়ের বিন্দুমাত্র সন্দেহও তাঁহাদের মনে হয় তো জাগে নাই।

মেয়েটির কণ্ঠে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ অস্পষ্ট হইয়া গেল। সে তখনই পাশ ফিরিল। কিন্তু মুহূর্ত্তপরে আবারও সেই চিন্তা,—অতীতের সেই স্মৃতি……

সে তখন চৌদ্দ বৎসরের চঞ্চলা একটি কিশোরী,—ধীবর বালক বালিকাদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ছুটাছুটিই শুধু!... ক্ষুদ্র সেই দ্বীপখানি যেন তাহাদের এক অপূর্ব্ব খেলাঘর। চারিপাশে সমুদ্রের অপরূপ নিঃস্বন! একদিকে পশ্চিম দিগন্তে অসীম নীলাম্বুরাশি আকাশের সঙ্গে মিশিয়া আছে, আর বহুদূরে পূর্ব্ব প্রান্তে ভূখণ্ড রেখার কালো মেখলাটিও লুপ্ত, অস্পষ্ট।

চতুষ্পার্শে পাহাড়ের শিখড়ে সমুদ্রচারী বিহঙ্গের অগণ্য নীড়......ঐ বিচিত্র পাখীগুলিও তাহাদের কতই না আদরের—কতদিন ছোট ছোট পাথরের টুকরা লইয়া তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়াছে,—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তাহারা ভয়চকিত হয় নাই।

অদূরে একটা ছোট গির্জ্জা। যার সঙ্গে প্রায়ই সে সেখানে যাইত।

ক্ষুদ্র তরু-মূল-বিদীর্ণ জলাভূমি এবং বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে চলিতে তাহার কষ্টের যেন অবধি থাকিত না।

অতবড় দ্বীপ,—আশ্চর্য্য একটি মাত্র বার্চ্চ বৃক্ষই শুধু;—তাহাদের বাগানে যে-টি আছে, সে তো খুবই ছোট। তার বেশি আর একটিও কোথাও চোখে পড়ে না।

সে নিজে আর তার দুইটি ভাই,—এই তিন জনকে তাহাদের পিতাই শিক্ষা দিতেন।

তাহাদের গৃহে একটি বৃহৎ পুস্তকাগার ছিল—বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় সমস্ত বইই সে পড়িতে শিখিয়াছিল।

পিতা মাতা ছিলেন একটু বিভিন্ন প্রকৃতির।—মাতা ধর্ম্ম প্রবণা। কিন্তু পিতা কিছু মদ্যাসক্ত।

এককালে তিনি নৌবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন,—কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সে পদমর্য্যাদা হইতে অপসারিত হ'ন,—সে কথা তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

অতঃপর কিন্তু পুত্র দুইটিও কুপথগামী হয়। বড়টি জাল-করা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আর ছোটটি থাকিত ক্রিশ্চিয়ানায়—একদিন সার্কসের ঘোড় সোয়ারের সঙ্গে পলায়ন করে।

তাহার মাতা এ সমস্তই ভগবানের অভিসম্পাত বলিয়া গ্রহণ করেন,—আর কিইবা উপায়?

পিতার মাথার চুলগুলি দেখিতে দেখিতে একদিন শুভ্রতা লাভ করিল! তারপর তাহাদের সঙ্গে সে একাই ছিল।—অসমর্থ স্থবির পিতামাতার সমস্ত সেবা যত্নও তাহাকে করিত হইত। সে ভাবিত, সারা পৃথিবীতে এই টুকুই হইতেছে তাহার একমাত্র স্বাভাবিক কর্ত্তব্য যে পিতামাতাকে অতঃপর সে শান্তি দান করিবে। তাহার ভাই দুইটি বাপমায়ের মনে যে বেদনা রাখিয়া গেছে তাহাই অপনোদন করিয়া চলিবে।

তাহার জীবন তখন দ্বাবিংশতি বৎসরের—তখনও বাপমায়ের সব যত্ন সে-ই করিত,—সমস্ত রকম দেখা শোনাও......

তাহার ভবিষ্যত জীবন যে কি হইবে—মাঝে মাঝে সে চিন্তা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। এমন কেহই কি নাই যে তাহাদের সঙ্গে আসিয়া কিছু দিন থাকে। তাহার মনে হইত—এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতা যেন জীবন ব্যাপি একটা নির্ব্বাসন।

অতঃপর একদিন মোজেন প্রদেশের এক সম্ভ্রান্তা, ধনবতী মাসী তাহাকে আমন্ত্রণ করিলেন, গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাইবার জন্য।

পিতা পাইপটি দাঁতের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন—এ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের পানে একটি বারও কি ফিরিয়া দেখিয়াছে?—কখনও তো নয়। তবে, আজ কেন?......

মেয়েটির কিন্তু মনে হইল—এই একটি সুযোগ,—এই পিঞ্জর হইতে কিছু কালের জন্য সে হয় তো মুক্ত হইতে পারিবে।

অবশেষে পিতাও সম্মতি দিলেন।......

হাঁ, সে একবৎসর পূর্ব্বের ঘটনা—গত বসন্ত কালে।

মেয়েটি বিছানার উপর পুনরায় উঠিয়া বসিল,—দুই

হাতে মুখ খানি ঢাকিয়া আর্ত্তনাদ করিল—হায়, ভগবান, আমার চোখে আজ একটিবারও কি ঘুম আসবে না ?

আবারও সে শয়ন করিল,—চক্ষু দুইটি কিন্তু কিছুতেই বুজিতে চায় না, কেমন অর্দ্ধস্তিমিত।—চোখের সামনে যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে—ক্রিশ্চিয়ানার সেই বিস্তৃত কৃষি উদ্যান, —সেখান-কারই দুই এক দিনের স্মৃতি……

একটা ঢালু জমির উপর উদ্যান এবং তৎ-সংলগ্ন দালান গুলি অবস্থিত। চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া একটি বৃহদাকার হ্রদ—তাহারই জলে অপরূপ প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে। ওপারে,—উর্ব্বরা জমি এবং ঝরঝরে অরণ্য রাজি।

জুন মাস।

উদ্যানে মুকুলিত আপেল বৃক্ষ—তৃণাচ্ছাদিত মাঠও যেন গ্রীষ্মের মৃদু মলয় হিল্লোলে ঢেউ খেলিয়া চলে।

এতদিন সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাসই সে অনুভব করিয়া আসিয়াছে। বিচিত্র তৃণ পুষ্প পত্রদলের গন্ধ ভরা বাতাস যেন এখানে নতুন হইয়া ঠেকিল। তাহার ক্ষুদ্র কক্ষের উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কাটাইয়া দিত।—উষ্ণ সান্ধ্যসমীর যেন সারা দেহে মনকে স্নিগ্ধ করিয়া যায়।

স্বর্ণ বর্ণা চন্দ্রের ছায়া পড়িত হ্রদের উপরে।—রজনী তেমন গহন কৃষ্ণ নয় বলিয়া, তেমন আলোও ঝরিত না।

এখানে আসিয়া কেন যেন সে প্রথম থেকেই তাহার মাসী ও তাহার দুই মেয়েকেই একটু বিতৃষ্ণার চোখে দেখিত। হয়তো সে ভাবিত তাহার পিতা ও ভাইদের জন্য ইহারা তাহাকে হীন চোখে দেখিবে। তাহাদের স্মৃতি যেন তাহার কাছে একটা দুর্ব্বল কলঙ্ক রেখা—তাহাকে গ্রহণ করিবার মত শক্তিও তাহার ছিল না।

অবশেষে কিন্তু সে স্থির নিশ্চয় হইল,—ইহারা তাহাকে সহানুভূতিই জানায়। তাহাদের সেই কলঙ্কে সকলের, চাহনি, কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিত খুব সম্ভব তাহার বেশ ভূষা এবং চাল চলনটিকে বিদ্রূপের চোখে দেখে।

মেয়েটি কিন্তু সমস্ত অবজ্ঞাই সহ্য করিত। কেন না বাড়ী ফিরিবার মত ইচ্ছা তখন তাহার একটুও ছিল না। কিন্তু এই গোপন অমর্য্যাদাটুকুই অবশেষে একদিন বিতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত হইল।

ক্রমে ক্রমে এমন করিয়া নিজের মনকে গোপনের ফলে সে প্রতারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

পিতা মাতাকে কোনরূপ আঘাত দিবার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই সে শুধু তাহাদিগকে আনন্দ জানাইয়া চিঠি লিখিত,—এমন করিয়া সে মিথ্যা জিনিশটাকে একদিন নিজের কাছে সহজ করিয়া তুলিল।

তাহার মাসীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রচুর বন্ধু বান্ধব আসিত। ক্রমশঃ সে নিজেও জানিতে পারিল যে তাহারা তাহার সৌন্দর্য্যের প্রসংশা করে—তাহার সমবয়সী দুইটি বোনের চেয়েও নাকি সে সুন্দর।

একদা একজন সঙ্গতিশালী কৃষক তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে,অতঃপর একজন পশু চিকিৎসক ও...

কিন্তু উভয়কেই সে প্রত্যাখান করিল।

তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও উঁচুতে। শুধু যে তাহার বাপ মাকেই সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহা নহে, সে তাহার মাসীর মেয়ে দুইজনের চেয়েও উপরে থাকিতে চায়—হয়তো তাহাতে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগও সে পাইবে।

তারপর দেখা হইল তার সঙ্গে। মাসীরই মৃত স্বামীর একটা আত্মীয় সে। শুনিতে পাইল—লোকটী নাকি চিকিৎসকের উচ্চ খেতাব পাইয়াছে—এবং নিজেও একজন সমৃদ্ধিশালী।

তাহারই বোনের একজনের প্রতি লোকটির বিশিষ্ট ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া সে কিন্তু হঠাৎ-ই তাহাকে উপযুক্ত বলিয়া ভাবিল। এবং নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—'বোনের নিকট হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইতে হইবে কিন্তু সেজন্য আমি সতর্কও হইব খুব।'

ক্রমশঃ

ঘরে বাইরে

—শ্রীগ্রহাচার্য্য

রামানন্দ বাবু আর যাই হোক্, এবারে কিন্তু সৎসাহস দেখিয়েছেন স্বীকার করতেই হবে। সুরমা সাহিত্য সভায় পথের দাবী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে ও সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ আলোচিত হইতে দেন নি। যুক্তি দেখিয়েছিলেন সাহিত্য সভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনাবশ্যক। এখন তাঁর ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে। ভোট প্রদানের সময় সরকারী কর্ম্মচারীদের সভা থেকে বার করে দিয়ে—বাকী সকলকে নিয়ে কাজ চালান যেতেও পারত!

প্রবীণ সম্পাদক আরও একটুখানি বলতে পারতেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে সরকারকে হুমকি দেখান, ওটাও যে রাজনৈতিক আলোচনা, আগে বুঝতে পারেন নি, এবং প্রবাসী মডার্ণরিভিউ এবং শনিবারের চিঠির মারফতে সজ্ঞানে কখনই রাজনীতি-বিষয়ক কোনও প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামান নি। দেশবন্ধু এবং সুভাষ বসু সম্বন্ধে যদি কখনও কিছু লিখে থাকেন—সেটা ভুলে অজ্ঞাতেই হয়ে গেছে!

সাহিত্যিক হয়ে রাজনৈতিক আলোচনা উনি করেন নি কখনো, কেউ করে সেটাও সইতে পারতেন না, সেই জন্যেই পথের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা হতে দেন নি। ওটা শরৎবাবুর বই বলেই রামানন্দবাবুর ও রকম যুক্তি মনে জেগেছিল, একথাটা যদি কেহ বলেন, তিনি ভুল বুঝেছেন 'হয়তো'!

রামানন্দবাবু 'বোধ হয়' এবং 'হইতে পারে' বলে অনেক যায়গাতেই দায় এড়িয়ে কাজ সেরে এসেছেন, এক্ষেত্রেও বেশ মনোরম একটা গোঁজামিল লাগালেন!

শরৎবাবুর কোনও রচনা প্রবাসীতে স্থান পাবার যোগ্যতা না পাক, তাঁর কোনও পুস্তকের অথবা প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচনাও প্রবাসীতে না প্রকাশিত হোক, এমন কি প্রবাসীর দলের কেহই তাঁর পথের দাবী অথবা অন্য কোনও লেখা কষ্ট করে পড়ে তাঁকে কৃতার্থ না করলেও রামানন্দবাবুরই কলম থেকে এই আলোচনা এবং ভ্রম সংশোধনের ফলে তাঁর নামটা অন্ততঃ বার চার পাঁচ ছাপা হয়ে গেল—জন্মের সুফল বুঝতে হবে।—

অন্ততঃ প্রবাসীর পাঠকেরা এটুকু জান্‌লেন যে শরৎবাবু বলে একজন লেখক আছেন, তিনি বই লেখেন, এবং পথের দাবীটা তাঁরই লেখা!

রবীন্দ্রনাথ খদ্দর পরেন না কেন এ সম্বন্ধে ওঁকে অনেক অনেকবার কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনিও অনেকে রকমেই নজির এবং যুক্তি দেখিয়ে নিজের সাফাই গেয়েছেন।

ওঁর এবারকার অভিমতটীর মধ্যে সত্যিকার অনুভূতি কিছু থাক বা না থাক, মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন যথেষ্ট একথা বলতেই হ'বে।

খদ্দরে কোন দোষ আছে বা গুণ নেই অথবা বেশভূষায় তিনি সৌখীন এরকম কিছুই তিনি বলেন নি। রাজনৈতিক ভয় আছে সে কথাও স্বীকার করেন না। তিনি কারণ দেখিয়েছেন, ওটা সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

মুখে আমরা বর্ণভেদকে অগ্রাহ্য করতে পারি, এবং মুসলমানের রান্না মুর্গীর ঝোল গ্রাহ্যও করে থাকি অথচ মেথরকে এক সঙ্গে মোটরে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারি না—স্নান করে সে ধোপ দেওয়া কাপড় পড়লেও। এই উপমাটীর দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, স্বদেশকে আমরা ভালবাসা

উচিত ভেবে নিলেও মেথরের মতই খদ্দরকে অঙ্গে ধারণ করা যায় না—এর মূলে আছে আমাদের চিরপ্রচলিত সংস্কার!

রবীন্দ্রনাথ এত কথা বলেন কিন্তু সত্যিকার কারণ যে কি বলতে নিশ্চয়ই মুখে বাধে!

এবারে শনিবারের কর্তারা মণিমুক্তোর আগে কাঁদুনি গেয়ে একটু আসর জমাতে চেষ্টা করেছেন—লোকের কাছে করযোড়ে ভিক্ষা চেয়েছেন। আহা, আবর্জ্জনা কুড়িয়ে বেড়ান কি ওঁরা এতই অবজ্ঞেয় যে কেহই তাঁদের প্রতি দয়া করে হুপিস্ কটিও ছুঁড়ে মারেন নি!

যখন শত্রু না থাকে ওঁরা হাওয়ার সঙ্গেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পথের মাঝখানে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করতে থাকলে লোকের ভিড়ও জমে ওঠে। ওঁরাও চান হয়ত শ্রদ্ধায় যদিই বা কেউ অনুকম্পা দেখিয়ে যান!

মাঝে মাঝে ভাণ করে শোনাতে চান ওঁরা মস্ত সাধুপুরুষ। ওঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। দেশের লোককে সজাগ করে তুলেছেন। এমনি কত কি!

নিজে অসৎ হলে সাহিত্য পড়ে লোকে নষ্ট হয়ে যায় এরকম দৃষ্টান্ত একেবারেই বিরল।

কোন এক তরুণের লেখা পড়ে নাকি কোন বাড়ীর কোন মেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—এ ধরণের অভিযোগের মূলে সত্য কিছুই থাকে না।

যেমন রামানন্দ বাবু 'হয়তো' এবং 'হতে পারে'র অন্তরালে অনেক সত্য কথাই অপ্রকাশ রাখেন, অথচ মিথ্যার ও প্রশ্রয় নেন না, ওঁর সাকরেদ শনিবারের চিঠির ডুবুরীটীও তেমনি 'প্রভৃতি'র দোহাই নিয়েছেন।

যে কয়টী পত্রিকার নাম ওঁরা মুখপাতে জানিয়েছেন, তাদের একটী থেকেও মণিমুক্তা আহরণ না করলেও ক্ষতি নেই, ঐ প্রভৃতিটার পেছনে অনেককেই আনা যায়, যাঁরা তরুণ বা অতরুণ কিছুই নন, এমন কি সাহিত্যের কোন ধারই ধারেন না।

পচা নর্দ্দমা থেকে জিনিষ কুড়িয়ে এনেও ওঁরা জাহির করেন—এগুলি কল্লোল, ধূপছায়া, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় পড়েছি। লেখকের নাম না দিন, পত্রিকার নাম প্রকাশ করাটা ভদ্রতা হিসাবেও দরকার। 'দাদা এ মেয়ে যে তোমারই,' 'যেমন ঘেন্না করে', অথবা' ফঁচকে ছুঁড়ি,' নাম দিয়ে ওঁরা যা ছাপিয়েছেন, লোকে প্রভৃতিটা ভুলে গিয়ে কল্লোল ধূপছায়া কালিকলম প্রগতিকেই ওর জন্য দায়ী করতে পারে। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই শনিদেবতার আবির্ভাব হয়ে থাকে, অন্ততঃ এটুকু ওঁদের দেখা উচিত, যে লেখা যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে তার দোষ বা গুণের জন্য শুধু তিনিই নিন্দিত বা প্রশংসিত হোন। সৎ সাহসের অভাবটা কি ওঁদের বংশগত অধিকার?

মৃত্যুর পরে কোনও মানুষ এপর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসায় যে সকল তথ্য মীমাংসিত হয় নাই, আজ হসন্তিকার প্রেতাত্মার লম্বা কান, ও সূক্ষ্ম অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া, কোনান ডয়েল সে সম্বন্ধে কয়েকটা থিসিস্ লিখিতেছেন। আমরা সময়মত তাহা প্রকাশ করিব। হসন্তিকা তরুণের যে বিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, ওটা ওঁর নিজেরই বিকৃত নয়নের দোষ।

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শ্রীঅরিন্দম বসু।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। বার্ষিক৩।৵০ আনা

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ভ্রম সংশোধন

"আবার আসিব ফিরে" কবিতায় ১৭৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইনে—'শিশির সিক্তিত ধারা মণি-তারকায় শিহরিবে গগনের পুষ্পিত সভায়—' হইবে।

ধূপছায়া

সম্পাদক—
শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি,
শ্রীঅরিন্দম বসু।
আষাঢ়, ১৩৩৫
দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।



মুক্তির বাণী—

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

বেকন যখন পাশ্চাত্য দর্শনে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রধান উপকারটা করিয়াছিলেন এই যে তিনি যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে যুক্তির চেয়ে আপ্তবচনের প্রাধান্য বেশী ছিল, আর আপ্তবচনের চেয়েও বেশী ছিল কতকগুলি বদ্ধ সংস্কার, এ গুলিকে তিনি idola বলিয়াছিলেন। তাঁর মত এই সব idola ভাঙ্গিয়া সমস্ত জিনিষ পরখ করিয়া দেখিতে হইবে নিরপেক্ষ যুক্তির মাপকাটিতে—আর সে বিচারের উপায় প্রত্যক্ষ (observation) ও পরীক্ষা (experiment).

তার পর হইতে পশ্চিম দেশে যুক্তির যুগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে। জড় বিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাকে প্রধান উপায় স্বীকার করিয়া আজ যে কি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে তাহা বলিবার নহে।

কিন্তু বেকন যে কয়টি সংস্কার দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিচারের পথে যে সুধু সেই গুলিই একমাত্র অন্তরায় নয়, সেটা আবিষ্কার হইয়াছে পরবর্ত্তী কালে। প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া বিজ্ঞানবিৎ নিত্যই চারিদিকে অপূর্ব্ব পরিজ্ঞাত সংস্কারের প্রাচীরে ঘা খাইয়া সে গুলি চিনিতে লাগিলেন। পদে পদে বিজ্ঞানকে এই সব প্রাচীর ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

যতদিন বিজ্ঞান জড় ও পশু জগৎ লইয়া ব্যস্ত ছিল ততদিন তাকে বাধা পাইতে হইয়াছিল শুধু ধর্ম্ম সংস্কারের হাতে। কিন্তু যখন পশুকে ছাড়িয়া সে মানুষে অগ্রসর হইল, তখনই তার আরও একটা বৃহৎ সংস্কারের বাধার সঙ্গে পরিচয় হইল—সে মানুষের কৌলিন্য বুদ্ধি। মানুষ মানুষ, পশু নয়, তার সত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই বিশ্বাস হইতে মানুষের নিজ কৌলিন্যের একটা যে দৃঢ় সংস্কার আছে তাহা আবিষ্কৃত হইল। যখন ডারউইন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা প্রণালীতে নির্ণয় করিলেন যে মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ ও বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক। অমনি ক্ষেপিয়া উঠিল খৃষ্টান পাদরীর দল, কেন না তাদের আদম হবার মনোরম উপন্যাস তাতে মারা পড়ে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষেপিয়া উঠিল মানুষের কৌলিন্য বোধ।

তার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, অনেক নূতন প্রমাণ জড় হইয়াছে। এই প্রমাণের ফল সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Arthur Keith, British Association এর বিগত অধিবেশনে বলিয়াছেন যে এই সব প্রমাণের দ্বারা মোটের উপর ডারউইনের তত্ত্ব আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবু আজও দেখিতে পাই, অজ্ঞ ও অর্দ্ধজ্ঞানী বহুলোক কেবল মাত্র তাঁদের কৌলীন্যবোধ সম্বল করিয়া এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া

প্রচার করিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন। ডারউইন যে কথা বলিয়াছেন তার মানে ইহা নয় যে মানুষ ও বানরের যে প্রভেদ আমরা সবাই জানি সেটা সত্য নয়—তিনি শুধু বলিয়াছেন যে এ প্রভেদের একটা ইতিহাস আছে। লক্ষ যুগের বিবর্ত্তনের ফলে এ প্রভেদ হইয়াছে। তাতে মানুষের প্রকৃত কৌলীন্যের এক ফোঁটাও হানি হয় নাই, কেন না, ডারউইনীয় মতবাদ সত্ত্বেও আজ মানুষ মোটর চড়িতেছে, বিমানযানে উড়িতেছে আর বানর ঠিক পূর্ব্বের মতই গাছে গাছে ফিরিতেছে। তবু এই সত্যটা আমাদের সংস্কার পুষ্ট মিথ্যা আত্মাদরে এত বড় একটা ঘা দিয়াছে যে ডারউইনের সমালোচকেরা এখন পর্য্যন্ত সংযম রক্ষা করিয়া তাঁর মতের আলোচনা করিতে পারেন না।

ডারউইনের সমসাময়িক ও সমধর্ম্মী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই বিবর্ত্তনবাদকে যখন আরও বিস্তৃত করিয়া কেবল মানবের দেহ নয়, তার সমাজকে পর্য্যন্ত এই বিবর্ত্তনের প্রবাহের ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সংস্কারের বাধা এত তীব্র বা অসহিষ্ণু হইয়া উঠে নাই। কেন না পশু হইতে মানুষ হয় এ কথাটা সংস্কারে যত প্রচণ্ড আঘাত করে, মানুষের সমাজে যে একটা ক্রমোন্নতির ধারা আছে এ কথায় তেমন কোনও আঘাত করে না। কিন্তু স্পেন্সারের এই উদ্যমের ভিতর যে পরবর্ত্তী যুগের যে বিপ্লবের বীজ লুকান ছিল তাহাতে আজ অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে—আর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সর্ব্বত্র সংস্কারবদ্ধ মানবসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে!

কোমৎ ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সার খাল কাটিয়া এ কুমীর আনিয়াছেন। কোমৎ পথ দেখাইয়াছিলেন আর স্পেন্সার সেই পথ একেবারে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মতামত যাই হউক, সমাজের আলোচনায় তাঁরা প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেই বিচার প্রণালী যাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বেকন এবং কার্য্য ইঁহাদের পূর্ব্বে জড় ও পশুজগতে নিবদ্ধ ছিল! সংস্কার বর্জ্জন করিয়া অবীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সমাজের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করা যায় এবং তাই করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁদের সমগ্র চেষ্টার মূলসূত্র।

মানুষ যখন প্রথম সমাজ গড়ে তখন হইতে সে ইহার অন্ধি সন্ধি সব ধর্ম্মে বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ জগতের অতিবিক্ত একটা অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত জীব অধ্যুষিত একটা জগৎ আছে ইহা ছিল তার একটা মৌলিক সংস্কার। এই সব অতীন্দ্রিয় জীবগণের অদ্ভুত শক্তিতে আদিম যুগের মানুষের অচলা আস্থা ছিল। তারা মানুষকে পদে পদে মারিবার জন্য প্রস্তুত—এবং মারিবার শক্তি তাদের আছে। কিন্তু রক্ষা এই যে, যে মারিতে পারে সে রাখিতেও পারে—যদি তাকে প্রসন্ন করা যায়। আদিম যুগের মানব বিশ্বাস করিত যে কতকগুলি অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের এমন শক্তি আছে যে এই সব অতিপ্রাকৃত শক্তিকে তাহার দ্বারা বশীভূত করা যায়। এই বশীকরণ শক্তিরই magic শাস্ত্রই ছিল আদিম যুগের ধর্ম্ম।

এই তন্ত্রবহুল আদিম ধর্ম্মই ছিল সেকালের সমাজের বন্ধনরজ্জু। এই তন্ত্র আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল রাশি রাশি বিধিনিষেধ যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক সম্পর্ক নিরূপিত হইত। সে সব বিধি নিষেধের অধিকাংশই ছিল অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাদের অধিকারের আশ্রয় ছিল এই ম্যাজিক। এ কাজ করিও না কেন না তাহাতে অমুক প্রেতযোনি রুষ্ট হইয়া অনিষ্ট করিবে, ও কাজ করিও তাতে অমুক দেবতা তুষ্ট হইয়া মঙ্গল করিবেন। ইহাই ছিল আদিম সমাজের বিধিনিষেধের মূল। এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আদিম মানব সমাজের সব নিষেধ যাদের সাধারণ নাম আজকাল হইয়াছে tabu.

ইহার ফলে এ ধারণাটা প্রাচীন সমাজে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল যে সমাজ দেবাধিষ্ঠিত, সমাজের বিধিব্যবস্থা দেবশাসনে নিয়ন্ত্রিত। দৈব শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ব্যতীত কেহ সমাজের বিধিব্যবস্থার ভাঙ্গন গড়নে হাত দিতে পারেন না এ সংস্কার দীর্ঘযুগ ধরিয়া জগতে প্রচলিতছিল। যখন

আদিম যুগের প্রেতপূজা ক্রমে বিবর্ত্তন মুখে উন্নত ধর্ম্মমতে পরিবর্ত্তিত হইল, আদিমযুগের tabu গুলি হইতে ক্রমে বহুপরিমাণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত সমাজবন্ধন গঠিত হইলে, তখনও এ সংস্কার রহিয়া গেল যে সমাজ দেবাধিষ্ঠিত দৈব বিধি নির্দ্দিষ্ট।

পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক যুগে এ সংস্কারের অনেকগুলিই বহুদিন হইল দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁরা অতি বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই না করিয়া কোনও সত্যকেই স্বীকার করেন না, তাঁরা যদিও সমাজের দৈববিধানে বিশ্বাসবান নন, তবু তাঁদের ভিতরেও সমাজ সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অলৌকিকত্বের সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। সকলের মনেই সমাজ সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ সঙ্কোচ ও ভীতি মজ্জাগত হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

যখন স্পেন্সার বিভিন্ন সমাজের আচার অনুষ্ঠান বিধি-নিষেধাদির আলোচনা করিয়া সেগুলির ক্রমপরিণতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাতে বিশেষ তীব্র আপত্তির কোনও হেতু দেখা যায় নাই। তার পর এতদিন ধরিয়া বহু পণ্ডিতের গবেষণায় অন্বীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা যে সমাজ বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে তার প্রতিও কোনও তীব্র বিদ্বেষের হেতু হয় নাই। ফ্যারাডে বা ভল্টা যখন তাঁদের পরীক্ষাগারে বসিয়া বিদ্যুতের আকৃতি প্রকৃতি ও ধর্ম্ম আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন সে ছিল এক জিনিষ, আর সেই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া যখন বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইবার আয়োজন হইল সে আর এক জিনিষ। ভল্টা বা ফ্যারাডে করিয়াছিলেন শুধু তত্ত্বসন্ধান, তাতে বাহিরের জগতে কোনও বিপর্য্যয় হয় নাই, কিন্তু আজ তাঁদের তত্ত্ব পরীক্ষাগার ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে সে এক প্রকাণ্ড বিপ্লব। সে বিপ্লবে অনেক মানুষ মরিয়াছে, অনেক অর্থনষ্ট হইয়াছে, সমাজগঠনের অনেক ওলট পালট হইয়াছে, কিন্তু তাহা লোকের সহিয়াছে—আজ সকলেই বিজলী পাখার তলায় বসিয়া বিজলী বাতিতে লেখাপড়া করিতে আরাম বোধ করিতেছেন।

স্পেন্সার যে গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন তার একটা ফল হইয়াছে এই যে সমাজ বস্তুটা যে কোনও দেবাধিষ্ঠিত বা দেবনির্দ্দিষ্ট বিষয় নয়, ইহার অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ যে সমাজে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার গঠন ও সংস্কার বিষয়ে বিচারশক্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত করা যাইতে পারে এধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাই ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য জগৎ এই তত্ত্বমূলক সমাজশাস্ত্রকে প্রয়োগশাস্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের আচার অনুষ্ঠান বিধি নিষেধ সব পরীক্ষা ও অন্বীক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এ কাজ অনেকদিন হইল প্রচ্ছন্নভাবে চলিতেছে। রামমোহনের সময়ে বেন্থাম ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন—কিন্তু আজ বিদ্রোহীর দল সমাজের গোড়া ধরিয়া নাড়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন এমন আমূল সংস্কারের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এই চেষ্টায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহীর দল তাদের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে সংস্কারের একটা নূতন বিরাট প্রাচীর যার গণ্ডির বাহিরে গিয়া স্বাধীন বিচার দ্বারা বিষয়টা নিরূপণ করিতে বেশীরভাগ লোক রাজী নন।

এই নূতন সমাজবিদ্রোহী দলের দাবী এই যে সমাজের প্রচলিত কোনও আচার অনুষ্ঠান বা কোনও বিধি-নিষেধকেই বিনা বিচারে মানিয়া লইব না। সব বিষয়ের হিতাহিত সংস্কারবিযুক্ত বিচারবুদ্ধিতে যাচাই করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইব। সে পরীক্ষায় যাহা টিঁকিবে তাহা থাকুক, তাতে যাহা না টিঁকিবে তাহা আমরা উড়াইয়া দিব। তাই আজ রব উঠিয়াছে, "গেল গেল হায় হায়!" সংস্কারবদ্ধ সমাজগুলি দল পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছে বিজ্ঞান ও স্বাধীনচিন্তার এই নূতন অভিযানের প্রতিরোধ করিবার।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া যাঁরা যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁদের দল ক্ষীণ। বেশীর ভাগ লোক ক্ষেপিয়া

উঠিয়াছেন এইজন্য যে এ অভিযানের ফলে সমাজ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই সমাজকে বেষ্টন করিয়া তাঁদের সংস্কার আজও একটা দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে যার তলা পর্য্যন্ত সন্ধান করিলে দেখা যায় তাঁদের অন্তর্নিহিত সেই আদিম মানবের tabuর প্রতি আস্থা।

যুগে যুগে মানব একটা কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে যে মানুষকে সমাজের বাঁধনে রাখিতে হইলে একটা state বা রাষ্ট্রশক্তি, চাই। না হইলে হইবে মাৎস্য ন্যায় Hobes এর state of warre—মানুষ পরস্পরকে খাওয়া খাওয়ি করিয়া মরিবে। তাই রাষ্ট্র সৃষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ মানব রাষ্ট্রকে অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। আজকার বিদ্রোহী সমাজের এই মৌলিক সংস্কারটিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। তারা বলে রাষ্ট্র জিনিষটা অপরিহার্য্য নয়, তার অস্তিত্ব অনেক বিষয়ে সমাজের মঙ্গলের বিরোধী। অতএব কেহ বলিতেছেন রাষ্ট্র উঠাইয়া দিয়া সমাজকে ভাঙ্গিয়া ছোট কর, কেহ বলিতেছেন রাষ্ট্রের উপর এক অতিরাষ্ট্র সমাজ সৃষ্টি কর, কেহ বা এক বিশ্ব মহারাষ্ট্র সৃষ্টি চাহিতেছেন। রক্ষণশীল সমাজ এ সব কথায় যে চঞ্চলতা ও উদ্বেগ দেখাইতেছেন তার সবটাই কিছু যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার ভিতর বেশীর ভাগই সংস্কার জাত জুজুর ভয় হইতে ভয় হইতে আর কতকটা স্বার্থ-হানির কল্পনায় জন্মিয়াছে। আজ সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা যে রুষের বিরুদ্ধে একটা একটা ব্যস্ত ও শঙ্কাপূর্ণ বিদ্বেষ লইয়া দল বাঁধিতেছে তার মূলে এই সংস্কারের দৌরাত্ম্য যথেষ্ট আছে। কোপার নিকাস ও গালিলিও যখন সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁদের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সংস্কারবদ্ধ মানব যে ভয়ানক ভয় ও চঞ্চলতার পরিচয় দিয়াছিল, আজ আমাদের কাছে সেটা হাস্যাস্পদ। রুষরাষ্ট্রে সমাজ সম্বন্ধে মতবাদে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে তাহা অনেকটা কোপার্ণিকাসের মতবাদে জ্যোতিষের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। আজ তার প্রতিক্রিয়ায় যে ভীষণ বিরুদ্ধতা সমস্ত জগতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যুক্তি হিসাবে তার মূল্য হয় তো কোপার নিকস বিরোধীদের চেয়ে অধিক সংস্কারমুক্ত নয়।

তেমনি কথা উঠিয়াছে ধনবাদ লইয়া। এতদিন ধরিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এই মতবাদের উপর যে কতকগুলি বিশিষ্ট বস্তুতে বিশিষ্ট উপায়ে লোকের স্বত্ব জন্মে—সে স্বত্ব অপরিমিত—সমাজ তাকে রক্ষা করে। আমি যা অর্জ্জন করিলাম সেটাতে আমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অধিকার আছে, এবং তাহার যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা আমি করিতে পারি। এই ধনবাদ আজ পরিপুষ্ট হইয়া সমাজের অঙ্গে, অঙ্গে সহস্র শিকড় ঢুকাইয়া তাকে জড়াইয়া রহিয়াছে। ধনস্বামিত্ব না থাকিলে যে সমাজ থাকিতে পারে একথা বেশীর ভাগ লোক কল্পনাই করিতে পারে না।

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার ফলে এখন দেখা যায় যে এই Property জিনিষটা কোনও একটা অলৌকিক নিত্য বস্তু নয়। সমাজের একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন Property ছিল না। তারপর এমন দিন ছিল যখন স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির উপর যথেষ্ট বিনিয়োগ মূলক Propertyর স্বত্ব ছিল—তারপর মানুষের উপর মানুষের ধনস্বামিত্ব চলিয়া গিয়াছে। অনেক বস্তুতেই আগে স্বত্ব ছিল না এখন হইয়াছে, যথা, ভূমিতে Property এক কালে ছিল না। ফলতঃ দেখা যায় যে Property একটা বিশিষ্ট সমাজিক অনুষ্ঠান যাহা দেশকাল গত হেতুতে একদিন উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সব হেতুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইহা বিচিত্র ধারায় পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং আজকালকার দিনে ইহা সমাজের বন্ধনের একটা খুব গোড়ার কথা দাঁড়াইয়াছে।

আজকালকার বিদ্রোহী সমাজতত্ত্ববাদীগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, Propertyটা অনিষ্টকারক, ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। অনেকদিন আগে Proudhon বলিয়াছিলেন "Proporty—সে তো ডাকাতি!" আজ এই Property জিনিষটাকে অস্বীকার কিম্বা তার পরিসর সঙ্কোচ করিবার বিবিধ চেষ্টা হইতেছে। সমস্ত সমাজ

তাতে ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে—তার কারণ যুগ যুগান্তরপুষ্ট সংস্কার আছে এই Propertyর পশ্চাতে।

আর একটা এমনি মৌলিক সংস্কার নারী ও পুরুষের অধিকার ও সম্পর্ক লইয়া। যারা সমাজকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিয়া তাকে ঢালিয়া সাজিতে চান তারা এ বিষয়ে সমাজের প্রচলিত সংস্কারকে কঠোর আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে পরম্পরাগত যে সংস্কার তাহা লোকে সনাতন বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু নৃ-তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ফলে লোকে দেখিতে পাইল যে এ ব্যবস্থা সনাতনও নয় চিরস্থায়ীও নয়। মানব সমাজে ইহা ছাড়া আরও অনেকরূপ ব্যবস্থা সেকালে ছিল এখনও আছে এবং বর্ত্তমান অবস্থাটা একটা ক্রমবিবর্ত্তনের ফল মাত্র। এই বিবর্ত্তনটা হইয়াছে প্রধানতঃ পুরুষের আধিপত্যের যুগে এবং ইহাতে নারীর মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। তাই আজকালকার বিদ্রোহীর দল এ ব্যবস্থাটাকে মৌলিক বা চিরস্থায়ী বলিয়া মানিতে চান না, তাঁরা চান ইহার এমন একটা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে যাতে নারী পুরুষেরই মত আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ অবসর পাইবে।

এমনি করিয়া বর্ত্তমান যুগে যুক্তিতন্ত্রের বিদ্রোহ চলিতেছে। সকল বিদ্রোহেরই স্বভাব এই যে তার মধ্যে অনেকটা অত্যুক্তি অনেকটা অবিচার থাকে—এ বিদ্রোহেও যে তাহা নাই এমন কথা কেহ বলিবে না। অভিজ্ঞতার ফলে হয় তো দেখা যাইবে যে পুরাণকে ভাঙ্গিয়া ইঁহারা যে নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন তাতে অমঙ্গলের যথেষ্ট অবসর আছে। সেই সব অনিষ্টের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এই সব বিদ্রোহী মতবাদকে সংস্কৃত করিয়া মানব সমাজের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া লইতেই হইবে।

কিন্তু তবু এ বিদ্রোহের গোড়ার কথাটা একটা প্রকাণ্ড সত্য এবং তার ভিতরই ইহার সার্থকতা। কথাটা এই যে সমাজে যেটা আছে সেটাকে আছে বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে—কেবলমাত্র সংস্কারের খাতিরে এ কথা চলিবে না। সমস্ত সংস্কার-হইতে-মুক্ত যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া সমাজের আচার অনুষ্ঠান বিধি ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে হইবে! সংস্কারের দোহাই বা জুজুর ভয়ে সমাজের কোনও ব্যাপারেই হাত দিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

এইটাই বর্ত্তমান যুগের প্রধান দান। বেকন যুক্তিকে সংস্কারের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর শিক্ষার প্রধান ফল হইয়াছিল জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও কতকটা মনোবিজ্ঞানে। আজ সেই মুক্তির বাণী পৌছিয়াছে সমাজ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে—শুধু তত্ত্বমূলক শাস্ত্রে নয়, ব্যবহারিক ও প্রয়োগ শাস্ত্রেও। লোকে তাই একটা প্রচণ্ড উৎসাহ লইয়া সংস্কার বর্জ্জন করিয়া সমাজের আমূল সংস্কারে ব্রতী হইয়াছে। ফলে ইউরোপেও সংস্কারের বিপুল শক্তির পরিচয় পাইতেছি স্থিতিস্থাপক সমাজের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ায় —আমাদের দেশের তো কথাই নাই। এ দেশে সে বার্ত্তার সামান্য আভাসমাত্রে আমাদের সনাতন সমাজের অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে। যাঁরা আধুনিক জগতের ও বিজ্ঞানের কোনও সংবাদ রাখেন না তাঁরা সনাতন সমাজের নিধন সম্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠেন। এমন কি বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁরাও এই সব তত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাচীন সংস্কারের সব সূত্র অম্লান বদনে অবিসম্বাদী বলিয়া প্রচার করিয়া যান। *

কিন্তু বিজ্ঞানের মুক্তির বাণী যুগে যুগে সংস্কারের এমনি বাধা বহুবার অতিক্রম করিয়াছে আজও করিবে। সংস্কার মাত্র সম্বল করিয়া এই নবীন অভিযানের প্রতিরোধ অসম্ভব। যুক্তির দ্বারা যুক্তির খণ্ডন করিতে পারি ভাল, নহিলে আজ হোক কাল হোক এই সব নবাবিষ্কৃত idola —এই অন্ধ সংস্কার ভাসিয়া যাইবেই।

* যথা শ্রাবণের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়

আবার আসিব ফিরে—

—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আবার আসিব ফিরে

জীবনের অশ্রু-হাসি-আলো-ছায়াভরা এই দূর সিন্ধুতীরে,
নিখিলের মর্ম্মে যেথা নিত্য ওঠে রণি,—
বাসনা-বহ্নির সুরে আলোকের উচ্ছ্বলিত রূপ-তরঙ্গিমা ! পথচারী বৈরাগীর ক্লান্ত বেণুধ্বনি
ধরণীর মধুস্বরা ছন্দের ঝঙ্কারে,—বহে যেথা অন্তরের আনন্দ-মূর্চ্ছনা
বিদায়-পূরবী যেথা গোধূলির ব্যগ্রবুকে সঞ্চারিছে রজনীর প্রসন্ন-অর্চ্চনা।

অচঞ্চল তীব্রপ্রেমে চেয়ে রবো নীলাঞ্জন-মাখা দূর প্রশান্ত গগনে ;—
গভীর সজল স্নেহে,-ছায়া যেথা ফেলে নীল, শ্যাম বনাঙ্গনে ;—
বনতরুশাখে যেথা গাহে গান, নীড়ে ফেরা-ব্যথাতুর পাখী
অন্তহীন রুদ্র বেদনায় ; সেথা বসি শ্যামলীর শ্যামাঞ্চলে আঁকি
জীবনের ব্যর্থ যত অস্ফুট কামনা ;—গেয়ে যাবো ধরণীর বিরহ সঙ্গীত
বাসনামূর্চ্ছিতসুরে ভ'রি লবো বিধুরার অপূর্ণ ইঙ্গিত।

তার সাথে গাবো গান তাহাদের—
জীবনের যাত্রাপথে যারা আসি স্বপ্নজালে দিয়েছিলো ঘের,
পিপাসিনী পথচ্ছায়া যাহাদের পদভরে উঠিলো শিহরি'
পথের পরাণ-তলে, নিবিড় কামনা তার কুসুম-রেণুর গন্ধে দিয়েছিলো ভ'রি
রজনীর প্রেম-সম, তারকার পুলকাশ্রুনীরে !
যাহারা ফিরিয়া গেছে মর্ম্মকোষে বেদনার হোমানল জ্বালি'
তমসার কালোতটে, উদাসীন বেনুবনচ্ছায়ে ! বন্দনা সভায় যেথা তারার দেয়ালি

দীর্ণ করি রুদ্রবাণে জীবনের অন্ধ-যবনিকা,
মাতিয়াছে সাজাইতে গোধূলি-বধূরে !—
সন্ধ্যার তারাটি দিয়া আঁকিতেছে সীমন্তের স্নিগ্ধ ভীরুশিখা !
—কভু ভীরু; কভু বা সে ভৈরবের চির-সহচর,
আমি জাগি তাহাদের নিশীথের ছায়ার দোসর।

তপোমগ্ন মানসের অর্ঘ্য দিয়া পূজি' যাবো নর-দেবতারে।—
প্রস্ফুটিত পুষ্পসম জেগেছিলো যারা এই ধরণীর শ্যামল কান্তারে,
বেসেছিলো জননী ও ধরণীরে ভালো
জীবনের মধ্যদিনে পথের সঙ্গিনী তারে যে মায়া বিলালো,
ভীরু সে হরিণ-চোখে যারা আসি কাজল বুলালো,—
মধুপের সিক্ত-ওষ্ঠে মাধবী সে আপনার রভসিনী যৌবন-সম্ভার,
সুতীব্র আনন্দবেগে দিলো উপহার।
যে সুরভি ফিরে যায় দক্ষিণের বাতায়ন হতে
বহি' তার কামনার উদ্দীপ্ত সে নিশ্বাসের স্রোতে
তারে আমি আপনার নাসারন্ধ্রে করিব আঘ্রাণ,
—মিটাইব ইন্দ্রিয়ের তপ্ত অভিমান !
আঁধারের রোমকূপে আলোকের নিঃশব্দসঞ্চার,—
শিহরি তুলিবে মোর তনু-বীণা-তানের ঝঙ্কার !
যৌবনের রক্তরাগে লীলামগ্ন তরুণের অরুণপতাকা
বিচিত্র পুষ্পের বর্ণে,—পরাগের গন্ধ রেণু মাখা
উড়াইব সুদূরের সুন্দর সীমায়। বিধুরা প্রিয়ার লাগি
আমি রবো চির-নিশি জাগি
নিদ্রাহীন আঁখির সৌরভে !......বন্দী সে সিন্ধুর ছন্দে আনন্দের অশান্ত-হিন্দোল,
মর্ম্মের মন্দির-মাঝে বাজাইবে উগ্র উতরোল !

অসমাপ্ত সঙ্গীতের পুষ্পপাত্রখানি অন্তরের মর্ম্মপুটে রাখি
চলে যাবো অলক-মেঘের রথে, বন্ধুহীন, বিরহী একাকী
অলকার নবনীল মেঘের আড়ালে !—শিশিরসিঞ্চিত মণি-তারকায় ধারা শিহরিবে গগনের পুষ্পিত সভায়—
—বাসনার বহ্নিশিখা স্বপন-বনের ছায়ে বিমরিবে চরণ মঞ্জীরে :—
আনন্দের জয়ধ্বনি গুঞ্জরিয়া বাজিবে পরাণে ।

আবার আসিব ফিরে,—

পুষ্পবনে, ছন্দে, গানে বনান্তের কেতকী, করবী
গন্ধ-ভারে গুমরিবে যবে । বসন্তের প্রভাতী-ভৈরবী
শিহরিবে অরণ্যের দক্ষিণ-মর্ম্মর । কিম্বা কোনো যূথীর জীবনে,
ফিরে পাবো জনমের অসমাপ্ত. বিরহিনী ডাকা ! উপল-ব্যথিত বনে,
অক্ষমসঞ্চারে মোর আরবার পরশিব অনুরাগে রক্ত-কর মোর ।
যারা দিয়েছিলো মোরে গভীর বেদনা,—প্রসারিব ব্যগ্র-বাহু, আনন্দ বিভোর
তাহাদের দীর্ণ বক্ষোমাঝে ;—ভুলে যাবো জীবনের দীনতার গ্লানি,

অমৃতের মরশিশু, আমি কবি আনন্দ-সন্ধানী—

বিকাশ-বেদনা মোর, উতলিত নীপশাখে উঠিবে চঞ্চলি'
আনন্দনির্ঝর তীরে । ধন্য হবে রিক্ত মোর বাণী হারা বেণুর অঞ্জলি ।

পরদেশী চিঠি

—শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

—তিন—

গেণ্ডেরিয়া,
১২ই ডিসেম্বর।

ভাই মিনি,

তোর ৯ই তারিখের চিঠি খানি পেয়ে খুবই খুসী হয়েছি। তুই লিখেছিস্ যে যতই সেই জাপান ফেরতা মহিলাটির কথা শুন্‌ছিস্, ততই আমার প্রতি তোর হিংসে হচ্ছে এবং শেষ অবধি জান্‌বার আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু এত অধৈর্য্য হলে চলবে কেন ভাই, আমি ত আগেই বলে রেখেছি যে দু'এক চিঠি'তে সব শেষ হবে না। তবে যতটুকু যেমন মনে আসে ক্রমশঃ লিখ্‌ব, তার জন্য তোকে অত করে অনুরোধ করতে হবে না।

তিনি বলেন—জাপানীরা যেমন সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সে দেশের বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাটও তেমনি—কোথাও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য্য প্রিয়তা জাপানের সর্ব্ব শ্রেণীর নর-নারীরই মজ্জাগত। বনে জঙ্গলে কোথাও সামান্য দু' একটি ফুল ফুটেছে জান্‌তে পার্‌লে দলে দলে লোক তা দেখতে ছোটে। কেউ তা' ছিঁড়ে নেয় না, কারণ তারা বলে,—ভগবানের এমন একটি দান সকলেরই উপভোগ্য—কারো একার জন্য নয়। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাদের দৈনন্দিন জীবনেও বেশ পরিস্ফুট। গৃহ প্রাঙ্গনের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা গৃহিণী ও পরিবার বর্গের যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তার সহজ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাও তেমনি। কাজেই, দেখেছি যে সাধারণ গৃহস্থের বধূও তার সঙ্কীর্ণ অবসরটুকু প্রায়ই গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক কোন কাজে ব্যয় করেন। আমাদের সঙ্গে জাপানীদের যে ভীষণ পার্থক্য, তার প্রধান কারণ—জীবনটাকে তারা, আমাদের মত একটা মিথ্যা মায়া বলে বিশ্বাস করে না, তাই জীবনের দিন গুলি চোখ্ বুজে কাটিয়ে কোন এক অজ্ঞাত লোকে চলে যেতে তারা ব্যস্ত নয়। এ জীবনে তারা সুখ, সমৃদ্ধি ও যশ চায় এবং তার মূল্য দিতে অর্থাৎ সেজন্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে শ্রম করতে সতত‌ই প্রস্তুত।

জাপানের কোন সহরে কোন রাস্তার উপরেই কখনো নোংরা কিছু পড়ে থাকতে দেখিনি কারণ গৃহসম্মুখে অপরিচ্ছন্নতা কেউ তারা সহ্য করে না। সহরের প্রতি অংশের প্রত্যেক নরনারীই নিজেদের পল্লী সম্বন্ধে একটা বিশেষ গর্ব্বানুভব করে। অন্য পল্লীর তুলনায় তাদের পল্লী নিকৃষ্ট বিবেচিত হবে, সে যায়গার স্বাস্থ্য খারাপ হবে, এ কেউই সহ্য করতে পারে না। সেজন্য জাপানে রাস্তায় চল্‌তে গেলে উপর থেকে থুথু, বড় জোর দেখা ধূলো। কিন্তু তার চেয়ে নোংরা কোন কিছু গায়ে এসে পড়বার আশঙ্কা নেই। বিশেষতঃ রোগী পরিত্যক্ত নিষ্ঠিবন ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রোগ সংক্রামিত করে, পরে তারা তাকে অদৃষ্টের দোষ বলে মানতে চায় না। মোট কথা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এহেন ঐকান্তিক চেষ্টাই যে জাপানে আপামর সাধারণের স্বাস্থ্য এতদূর উন্নীত করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি আরও বলেন,—এদেশে আজ কাল সকলের মুখেই "অধীকার অধীকার" বলে একটা রব উঠেছে। চিরবঞ্চিতের এই অধৈর্য্য, এই অধিকার-উন্মত্ততা অস্বাভাবিক নয় বটে, তবে কি না এর দ্বারা কখনো

ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয় না—উন্মত্ততাই সার হয় শুধু। আমাদের ন্যায্য অধীকার লাভ করাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে উন্মত্ততা থেকে মুক্ত হ'য়ে শান্ত চিত্তে ভেবে দেখ্‌তে হবে কি কি অধিকারে আমরা বঞ্চিত এবং তার কতটা থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছি; আর বিদেশী শাসক সম্প্রদায় দ্বারাই বা কতটা বঞ্চিত হয়েছি। সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশাচারের নামে যে সকল মনুষ্যোচিত অধীকার থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা বঞ্চিত, তা' অর্জ্জন কর্‌বার মত মনুষ্যত্ব যদি আজও আমাদের না জন্মে থাকে, তবে বিদেশীর হাত হতে স্বরাজ লাভ সুদূরপরাহত। মহাত্মা গান্ধি এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ কর্‌বেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় নি। কারণ আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা এতকাল মানুষের স্বাধীনতার প্রতিকূল শিক্ষা দিয়ে যে দুর্গতি ডেকে এনেছে, তার পরিবর্ত্তন না করে'—অর্থাৎ সমাজ যে সকল স্বাভাবিক অধীকার থেকে বহুকাল মানুষকে বঞ্চিত করে তার স্বাধীনতা লাভের ক্ষমতা ও স্পৃহা হরণ করেছে,—তা' কি ফিরিয়ে না দিয়ে, তাকে সুস্থ সবল না করে, প্রবল বিদেশীর করায়ত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে ব্যগ্র হয়েছে। তাই সে চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ। যতদিন আমরা মনুষ্যত্বের অধিকার ও মানবোচিত বিচার শক্তি গতানুগতিক ভাবে তথাকথিত সমাজ নামক অন্ধকূপে আহুতি দিতে থাকব, ততদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতার এই কৃত্রিম প্রয়াস ব্যর্থ হবেই হবে। যে পাপে ভারতের বিপুল শক্তি শিথিল ও বিক্ষিপ্ত, সে পাপ ক্ষালন না করে স্বরাজ লাভের এই উন্মত্ত প্রয়াস যে কত বড় ভ্রান্তি—এদেশ হতে দূরে গিয়ে না দাঁড়ালে, বিশেষতঃ আধুনিক কোন স্বাধীন দেশের হাওয়া গায়ে না লাগ্‌লে বুঝি বা তা' হৃদয়ঙ্গম হয় না। বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার ন্যায্য মূল্য সংগ্রহ না করে তা' দাবী করতে গেলে দুনিয়ার আসরে হাস্যাস্পদ হতে হয়। ন্যায়ের যুক্তিতে, ধর্ম্মের কথায় কোনও ফল হয় না। এই তথ্যটি জাপানীরা ঠিক সময়ে বুঝেছিল বলে এত বড় হতে পেরেছে। তথাপি এখনো তাদের স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই ভাবে—আমি জন্মে আমার দেশের কি কাজে লাগ্‌লাম্? আমাদ্বারা সমাজ ও জাতির কি উপকার হল? আমিও ত এই দেশের সন্তান—সন্তানের যোগ্য কাজ কি করেছি—কি কর্‌ছি? আর তা না কর্‌তে পারলে জীবনের শান্তি, সার্থকতা ও গৌরব কোথায়?

জাপানীরা স্বাধীন জাতি বটে তথাপি মার্কিন ও শ্বেত-দ্বীপ বাসীদিগের তুলনায় অনেক অধীকারেই বঞ্চিত। সে অধীকার গুলি তারাও যে না চায় তা নয় কিন্তু তার জন্য চেঁচিয়ে বেড়ায় না। তারা জানে যে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, শক্তি, সাহস, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি যে সকল গুণের অভাবে পরাধীনতা বা অধীকার চ্যুতি ঘটে, একে একে তা' দূর করলেই আকাঙ্খিত অধীকার লাভ করা যায়। কেন না যোগ্য ব্যক্তি বা জাতিকে তার ন্যায্য অধীকার হতে কখনো বেশীদিন বঞ্চিত করে' রাখা যায় না। হ্যাঁ, অনেকেই বলে থাকেন বটে যে জাপান স্বাধীন দেশ, তার সঙ্গে ভারতের তুলনা করাই ভুল। কিন্তু পরাধীন হলে কি কর্ত্তব্য করা চলে না—উন্নতির পথে চলা যায় না? তাই যদি হ'ত, তবে যে জাতি অনুন্নত, পরাধীন, সে চিরদিন অনুন্নত, পরাধীনই থেকে যেত—তার উদ্ধারের কোন আশাই থাক্‌ত না।

স্বাধীন হলেই যে উন্নত হয়, তা' নয়। চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ স্বাধীন বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা এমন নয় যা' দেখে পরাধীন ভারতেরও ঈর্ষার উদ্রেক হতে পারে।

যাট, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জাপানেও গলদ ছিল। তখন তারাও এসিয়ার অন্যান্য জাতির মতই আত্ম গরিমায় বিভোর হয়ে বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে আস্‌তে উদাসীন ছিল। কিন্তু সেই অজানা জগতের অবাঞ্ছিত লোক, জাপানীদের নিষেধ না মেনে দম্ভ ভরে যখন জাপানের রুদ্ধ দ্বার ভেঙ্গে আঙ্গিনায় প্রবেশ করলো, তখন সেই দেশ ব্যাপি শোকোচ্ছ্বাস এবং ক্রোধোন্মত্ততার মধ্যেও এমন

কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষ সে দেশে ছিলেন, যাঁরা ঐ বিপদের বার্তাবাহি বিদেশীদিগের অন্তরালেই আবার মুক্তির ইঙ্গিতও দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন—যে মন্ত্রে, যে দীক্ষায় এই বিদেশীগণ শক্তিমান হয়ে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছে, সেই মন্ত্র, সেই দীক্ষা লাভ কর্‌তে না পার্‌লে পরিত্রাণের অন্য কোন পন্থা নাই। ফলে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যখন সেই নব জ্ঞান লব্ধ মুক্তির পথে অগ্রসর হন, যখন ঐ পথে সকলকে আহ্বান করেন, তখন প্রচুর বিদ্রুপ, ধীক্কার, কুৎসা—এমনি কি, গুরুজনের ভৎর্সনা, ধার্ম্মিকের অভিশাপ ও সমাজের নির্য্যাতন সমস্তই তাঁদের সহ্য কর্‌তে হয়েছিল। তবুও সেই মুষ্টিমেয় দেশপ্রাণ দেশসেবকগণ বিচলিত হ'ন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন, দেশ ও জাতির দুরবস্থা অনুভব কর্‌বার শক্তি ভগবান যাদের দিয়েছেন, মুক্তির নির্দ্দেশ যাদের কাছে করেছেন, তমসাচ্ছন্ন সেই জাতিকে উদ্ধারের গুরুভার একমাত্র তাদেরই উপর। অধিকন্তু, জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনায় যারা প্রবৃত্ত, স্বদেশসেবার অপার তৃপ্তির, অসীম সৌভাগ্যের তারাই শুধু অধিকারী। এই অনুপ্রেরণায় তাঁরা শত বাধা-বিঘ্ন বিপদ আপদ উপেক্ষা করে, বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীগণ দেশদ্রোহি, সমাজদ্রোহি' ভেবে প্রাণপণে যাদের নির্য্যাতন করেছিল তাঁরাই আজ জাপানের প্রতি ঘরে, প্রতি অন্তরে পূজ্য। কেন না তাঁদেরই ঐকান্তিক সাধনার ফলে জাপান আজ মুক্তির আলোকে আলোকিত—জ্ঞানে, গুণে, শক্তিতে জগতে সম্মানিত।

তারপর সেই মহিলাটি বলেন—বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কোনও কাজ করে জেলে যাওয়াই দেশসেবার চরম পন্থা বলে ইদানীং অনেকেই বিশ্বাস করেন। কেননা চারিদিক হতে প্রশংসা লাভ ঘটে। কিন্তু হায়, কোথায় আমরা নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জাতীয় শক্তির অপচয় রোধ কর্‌ব, বিক্ষিপ্ত, অবহেলিত জাতিকে একতা সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা কর্‌ব, তা না হয়ে হুজুগে মেতে কারা-বরণের প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়ে, জাতি গড়ে তোল্‌বার প্রকৃত কাজের সম্ভাবনাই নষ্ট কর্‌ছি। জেলে যেতে সাহস ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গড়ে তোলবার কাজে ঐ সকল গুণের পরিচয় দিলে যে, জাতি তার থেকে লাভবান হ'তে পারে—উন্নত হতে পারে। জাপানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদেরই দেশে রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতি কখনো জেলে যান নি, কিন্তু বীরত্বের ও একনিষ্ঠ স্বদেশ প্রীতির যে পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, তাতেই না আজ ভারতের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার কিঞ্চিৎ কেটে গিয়েছে। তাতেই না এদেশে আজ জাতি গঠনের সূত্রপাত ও স্বরাজ সাধনার প্রবৃত্তি! কিন্তু বহু শতাব্দীর সঞ্চিত পুঞ্জীভূত পাপ-পঙ্কিলতা অধিকাংশই যে এখনো রয়ে গিয়েছে এবং তাতেই না আমাদের বহু কল্যাণচেষ্টা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত ও ব্যর্থ হয়ে চলেছে! এখনও অস্পৃশ্যতা, বাল্য-বিবাহ, পণ প্রথা চলেছে! এদেশে এখনও প্রবঞ্চনা বা পুরুষের চরিত্র হীনতার জন্য জাতি চ্যুতি ঘটে না—কিন্তু বিদেশ গমনে ঘটে। এখনও ব্রাহ্মণ অতি অসত্য জীবন যাপন করেও তার ব্রাহ্মণত্ব হারায় না, অথচ কোন অ-ব্রাহ্মণ আমরণ আদর্শ জীবন যাপন করে' শত মহৎ কাজ করেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে না। স্বাধীনতা লাভে অধৈর্য্য আমরা অবনত মস্তকে এই সকল অসঙ্গত ব্যবস্থা মেনে চলেছি। জেলে যেতে সর্ব্বদাই যারা প্রস্তুত, তারাও বাল্য বিবাহ ও পণ প্রথার সহায়তা কর্‌ছেন। সমাজের এই সকল পাপ দূর কর্‌তে, জাতীয় দুর্ব্বলতার এই সকল উৎস রুদ্ধ করে দিতে অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, আর ইংরাজও এতে বাধা দিতে পারে না। শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা আর সুচিন্তা ও চেষ্টার অভাবেই আমরা তা' করে উঠ্‌তে পারি না। তারই ফলে প্রকৃতি দেবীর অজস্র দান সত্ত্বেও আমরা মহা দরিদ্র, বহু শক্তি থাক্‌তেও নিতান্ত অসহায়,—দুর্ব্বল॥

তাঁর মুখে শুনেছি—জাপানে অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই

কোন না কোন নারী সমিতির সভ্যা। তাদের উদ্দেশ্য পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, বিপন্নের সহায়তা, সৎ জ্ঞানের প্রচার করা ইত্যাদি। আর এই সকল নারী-সমিতির চেষ্টায় সহরের কোন অঞ্চলেই ব্যবসায়ীর পক্ষে ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করাও যেমন অসম্ভব,—সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত লোকের পক্ষে ভিক্ষার ছলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাধি-বিস্তার করাও তেমনি দুরূহ।

দুস্থের প্রতি তাদের যথেষ্ট দয়া আছে বটে, কিন্তু সুস্থের জীবন বিপন্ন করে তারা সে দয়া প্রকাশ করে না। তাই কুষ্ঠ বা অন্যান্য দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে জাপানের বিভিন্ন প্রদেশ হতে দলে দলে আসতে দিয়ে তোকিও কি ওসাকার জনাকীর্ণ রাস্তায় চলে বেড়াতে দেওয়া হয় না। এই প্রকারের দুস্থদিগের প্রতি জাপানীদের দয়া আছে কিন্তু সে দয়াও বিচার বুদ্ধি পরিচালিত, কাজেই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদিগকে ঈশ্বরের গুপ্তচর বলে বিশ্বাস করে' জাপানীরা ভীত বা অতিরিক্ত করুণাপরবশ হয় না, বা উহাদের সংস্পর্শে সর্ব্বসাধারণের যে বিপদ তাও বিস্মৃত হয় না তাদের জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়,—উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানেই তারা রোগী হিসেবে বসবাস করে

মাসিক সামান্য চাঁদা তুলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে সমষ্টিবদ্ধ করে' কত কল্যাণকর, কত বৃহৎ কাজ যে হতে পারে জাপানে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দেখা যায়। সে দৃষ্টান্ত যে দেখেছে তার প্রাণে আর কোনও নৈরাশ্যই থাকতে পারে না; কারণ তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে অর্থ বা অন্য কিছুর অভাব কোনও জাতির উন্নতি বা স্বাধীনতার অন্তরায় হতে পারে না—একনিষ্ঠ সাধনার অভাবই তার একমাত্র অন্তরায়।

আজকের মত এই থাক্। দেখ্‌লিতো, এবার কত বড় চিঠি তোকে লিখলাম। এখন তোর ভাল লাগলে হয়। একটি সুসংবাদ শেষের জন্য রেখেছি। কাল মিঃ ও মিসেস্ রায় চাঁদপুর মেলে এখানে এসে পৌঁছবেন। আমিও বাবার সঙ্গে ষ্টেশনে যাব তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে। তারপর তিন চার দিন অনেক কথাই হয়তো শোনা যাবে এবং জাপানের সুন্দর সুন্দর ছবি গুলিও আর একবার দেখ্‌তে পাবো।—কিরে, তোর বুঝি হিংসে হচ্ছে,—না? তা তুই ভাল ভাল সিনেমা দেখে তার শোধ নিস্—হিংসে করিস্‌নে যেন। আশাকরি তোরা ভাল আছিস্। ভালবাসা নিস্। ইতি

তোর সুধীরা।

গেণ্ডেরিয়া,
২৪শে ডিসেম্বর।

—চার—

ভাই মিনি,

আগের চিঠিতেই তোকে লিখেছি মিঃ ও মিসেস্ রায় তিন চার দিনের জন্য অতিথি হয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌ছেন। তাঁরা এসেছিলেন ঠিকই, তবে এক দিনের বেশি তারা থাকেন নি। কিন্তু ঐ একটি দিনই তাদের নিয়ে যে কি আমোদেই কেটেছে তা' আর কি বলব। আরো দু'দিন থাক্‌তে তাঁরা রাজী ছিলেন, কিন্তু পরদিন ভোরে চা খেতে বসে বল্লেন, সে দিনই মেলে কলকাতা যেতে হবে তাদের। তারপর জিনিষ পত্র গুছিয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে, সত্যি সত্যিই চলে যান। আমার এত অনুনয় অনুরোধ কিছুতেই কিছু হয় নি। তাদের এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় মনে যে কি কষ্ট হয়েছিল তা' জানাতে পারি নে। কত কথা জিজ্ঞেস্ করব, কত গল্প শুন্‌বো আরো কত কি আশা করেছিলাম—তা আর কিছুই হল না—একটি দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে গেল। সব সময় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে কত আনন্দ পেয়েছিলাম, সে কথা তুই বুঝবিনে। এখন মনে হচ্ছে—ঐ একটি দিন যেন একটি নিমেষই শুধু। কি যে তিনি চমৎকার মেয়ে তা' তাকে ভাল করে না জানলে বোঝ্‌বার যো নেই।

তিনি আমার চেয়ে কত বড় আর কত, সুশিক্ষিতা—তার ওপর আবার দেশ বিদেশ বেড়িয়ে এসেছেন কত কিন্তু তা' বলে এতটুকুও অহঙ্কার নেই। ঐ একটী দিনের মধ্যেই তিনি আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছেন। এর মধ্যেই তার সঙ্গে আমার মাসীমা সম্পর্কও পাতান হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে যে কেবল একটি দিনের জন্য কে তা' আগে ভেবেছিল! এখনো কিন্তু তা' বিশ্বাস করতে পারিনে।

আমি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেম—তা কিন্তু বলেন নি। শুনলাম বিশেষ আপত্তি আছে। চলে যাওয়ার সময় ঠিকানা চেয়েছিলাম—তাও দিলেন না, বল্লেন,অত মায়া বাড়ান কি ভালো! তাছাড়া তাদের নাকি থাকবারও নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নেই। কলিকাতায় গিয়ে কোনও একটা হোটেলে উঠবেন, তারপর আরো কোথায় কোথায় যাবেন; কাজেই আমি আর কিছুই বলতে পারি নি।

ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠবার সময় আমি তাকে নমস্কার করতেই আমাকে বুকে চেপে ধরে অতি করুণস্বরে তিনি বল্লেন—আমি যেন তাদের কথা ভেবে কোন রকম কষ্ট মনে না করি—মন দিয়ে যেন লেখা পড়া করি এবং জাপানীদের দেশ-সেবার যে সব কাহিনী তিনি বলেছেন তা' যেন ভুলে না যাই। আমার প্রতি তার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ,—দেশের সেবা ও জাতীয় উন্নতির চেষ্টাই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়। তারপর মুহূর্ত্ত খানিক থেমে আবার বল্লেন—যাদের অন্তরে সহানুভূতি ও উদারতার মহা সম্পদ রয়েছে, জাতীয় দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করবার তারাই তো শুধু অধিকারী। তোমাকেও ভগবান সে সম্পদ দিয়েছেন, বড় হয়ে তুমি তার অপব্যবহার করো না!

কেন জানিনা ভাই, তার ঐ সব কথা শুনে আমার বড়ই কান্না পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমার কত বড় আপনার—যেন সত্যিকারেরই মাসীমা। তাই যদি হ'ত! তবে আর এম্নি করে তিনি চলে যেতে পারতেন না। মার কথা এখন আর স্পষ্ট মনে হয় না, কিন্তু বড় হয়ে অবধি আমার উপর এমন ভালবাসা, এমন কল্যান কামনা আর কারো কাছেই পাইনি। বাবার স্নেহ-যত্ন-ভালবাসাই এতদিন আমার যথেষ্ট মনে হ'ত, কিন্তু এখন যেন—থাক্ ভাই দুঃখের কথা আর বাড়াব না।

মাসীমার নাম কি জানিস্—শ্রীনিষ্কৃতি দেবী। বয়স চব্বিশ বৎসরের বেশি নয়,—খুব ফর্শা রং, দেখতে বেশ সুন্দর। সব চেয়ে চমৎকার তাঁর দুটি চোখ। কিন্তু কেন জানিনা তার মুখখানিতে বিষাদের ছাপ লেগেই আছে। তাই একটুখানি হাসলেই তাঁকে ভারি সুন্দর দেখায়। মেসো-মশাইর নাম মিঃ বি, রায়। আমার বাবার বয়সী হবেন হয় তো—চল্লিশের বেশি বলে মনে হয় না। ইনিও দেখতে ভালই কিন্তু মাসীমার মত অত সুন্দর নয়। তাছাড়া একটু গম্ভীর। ইনি এসিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন। খুব বিদ্বানও নাকি—বাবা বলেছিলেন।

ভেবেছিলাম এবার তাঁদের কাছে জাপানের অনেক খবরই জানতে পারব তা আর হলনা। কে জানত যে এমনি করে হঠাৎ তাঁরা চলে যাবেন! তবু যতটুকু জানতে পেরেছি ক্রমে তোকে লিখব, তবে সে খুব বেশী নয়।

মাসীমা বলেছিলেন যে সুমিমতোদের সঙ্গে আলাপ হবার পর তাদের বাড়ী যাতায়াত মাসীমাদের প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুদিন না গেলেই সুমিমতোদের কেউ না কেউ মাসীমাদের হোটেলে এসে তাদের গ্রেপ্তার করে আসাকুসায় নিয়ে যেতেন। ক্রমে তাঁদের বাড়ীতে দুপুর বেলায় আহারও সারতে হতো—তারপর সারাটা দিনও কাটাতে হতো তাঁদেরই সঙ্গে—ওরা কিছুতেই ছাড়তেন না। তোকিওর প্রসিদ্ধ উদ্যান, মন্দির, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, আশ্রম, কারখানা ইত্যাদি দেখে বেড়াবার পালা সুরু হয় এমনি করেই।

মাসীমা বলেন—সবখানেই তাঁরা যে সমাদর, যে সম্ভ্রম পেয়েছেন জীবনে কখনো তা ভুলতে পারবেন না। তাছাড়া সুমিমতোদের মারফতে তোকিওর বহু গণ্যমান্য ও প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে তাঁদের আলাপ ও বন্ধুত্ব

হয়। ফলে সকলের বাড়ীতেই চা-পান এবং কারো গৃহে সায়াহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিতও হয়ে ছিলেন। জাপানী নারীদের সযত্নে প্রস্তুত খাদ্যাদি তাঁদের অনভ্যস্ত রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর না হলেও, ঐ অতিথি পরায়ণ জাপানীদের আদর-যত্নে, তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনায় এবং সর্ব্বোপরি কয়েকজন বিশিষ্ট জাপানীর পারিবারিক জীবনের ইতিহাস শুনে তাঁরা পরম প্রীতিলাভ করেন। মাসীমা বলেন—জাপান ভ্রমণ কালে তাঁরা যে কেবল তোকিও, কামাকুরা, নিক্কো, কিওতো, ফুজিয়ামা প্রভৃতি স্থানের মনমুগ্ধকর দৃশ্যাবলীই দেখেছেন তা নয়, পরন্তু জাপানীদের দৈনন্দিন জীবনের এমন অনেক দৃশ্য দেখেছেন যার সৌন্দর্য্য আমাদের মত আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে, প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভার চেয়ে কম উপভোগ্য নয়।

তাঁরা প্রথম যে দিন নিমন্ত্রিত হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সুমিমতোদের বাড়ী যান, সে দিনই আহারাদির পর সকলে উপরের একটাঘরে বসে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেই অবসরে সুমিমতোর নাতিটি সকলের অলক্ষ্যে তার মায়ের সেলায়ের সাজি হতে রেশমী সুতার একটি বল্ নিয়ে সুতার একদিক নিজের একটি আঙ্গুলে জড়িয়ে বলটি জানালাদিয়ে নীচে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করছিল, হঠাৎ তার মার দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন—তারোসান্, ওটানিয়ে আমার কাছে একটিবার এস।

তারোসান তখনই মার দিকে একবার ফিরে তাকালো কিন্তু বল নিক্ষেপের অভিপ্রায় ত্যাগ কর্ব্বার ইচ্ছা তার বিশেষ দেখা গেল না।

মা পুনরায় ডাক্‌লেন—তারো!

তারো কিন্তু এবার মার দিকে দৃষ্টিপাতও করলো না, মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মা তখন ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্লেন—বেশ তারোসান্, আজ থেকে তুমি আর তোমার মার কথা শুনো না। নিজের যা ভালো মনে হয় তাই করো—সেই ভালো—বুঝলে?

একটুপরেই ছেলে ধীরে ধীরে মায়ের খুব কাছে এসে আস্তে ডাক্‌লো—মা।

মা তখন সেলায়ে মন দিয়ে ছিলেন, মুখ তুলে একটিবারও চাইলেননা, কোনরূপ সাড়াওদিলেন না। ছেলে আবারও ডাক্‌লো। মা এবার তার ম্লান দৃষ্টি অপরাধী সন্তানের প্রতি স্থাপন করে বল্লেন—মাকে কেন তারো! তুমি ত আর তোমার এই দুষ্টু মা-টীকে ভালবাস না।

এই নিদারুণ কথা যেন শিশুর কোমল প্রাণে কঠিন আঘাত করলে, তার দুটি চোখে অশ্রুর উৎস ছুটলো। মা তখন ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে বল্লেন—তুমি কি জানো না তারো, ছেলে অবাধ্য হলে মার প্রাণে কত বড় আঘাত লাগে?

তারোসান তখনই তেমনি অশ্রু উচ্ছল চোখে প্রতিজ্ঞা করলো—সে আর কখনো মার অবাধ্য হবে না—আর কখনো মার প্রাণে আঘাত দিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য,—মাও প্রতিজ্ঞা করলেন, অন্যায় না করলে তিনিও কখনো আর তারোকে বক্‌বেন না।

মাতা পুত্রে এইরূপেই সেদিন সন্ধি স্থাপিত হয়। বিনা শাস্তিতে, বিনা শাসনে,—শুধু স্নেহ ও অভিমানের দ্বারা যে পর্ব্বটি শেষ হয়ে গেল,—আমাদের দেশে তা' যে কত বেশী আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হ'ত তা বলাই বাহুল্য। মাসীমা এই দৃশ্যটি নাকি 'সিনেমা'র ছবির মত দেখ্‌ছিলেন। মেসো মশাই পরে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বলেন, নইলে এমন মর্ম্মস্পর্শী একটি দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বোধে তিনি বঞ্চিত হতেন হয়তো!

তিন দুঃখ করে বলেছিলেন—এর সঙ্গে আমাদের সন্তান 'মানুষ' কর্‌বার চিরন্তন প্রণালীর তুলনা করাই ধৃষ্টতা। কারণ মানুষেই মানুষ গড়তে পারে, অন্যে তা পারে না। আমরা মানুষ গড়তে জানি না বলেই এদেশে সত্যিকারের মানুষের এত অভাব। তাই আমাদের সকল উদ্যম পণ্ড হয়ে যায়। জাপানও যতদিন প্রাচীনের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, স্বদেশী মোহে আচ্ছন্ন ছিল,

ততদিন সেও এই সুচিন্তিত অপূর্ব্ব আধুনিক শাসন প্রথার সন্ধান পায় নি। সেই সন্ধান কেউ দিতে এলেও দেশদ্রোহী বলে তাকে ধিক্কার দিয়েছে। দেশের সেবা করতে গিয়েও আমাদের মত বদ্ধমূল ধারণা ও চিরাভ্যস্ত কুপ্রথার বশবর্ত্তী হয়ে, জাতীয় কল্যাণকে, ভগবানের আশীর্ব্বাদকেই প্রত্যাখান করতো; তাই জাপানের অবস্থা তখন অত হীন ছিল। কিন্তু যে দিন থেকে তার সেই মোহ ঘুচেছে, সেইদিন থেকেই তার দুর্গতিরও অবসান হয়েছে। জাপানে তাই আজ অত মানুষের সমাবেশ, তাই সেদিনকার ক্ষুদ্র অসভ্য জাপান আজ জ্ঞানে-গুণে, বীর্য্যে বড়, জগতের সভ্য সমাজে সম্মানিত।—আর আমাদের বিশাল ভারত?

আজ ভাই এখানেই শেষ করি। তারা হঠাৎ চলে যাওয়ায় মনের অবস্থা ভাল নেই। তিন দিন থাকতে তারা রাজী ছিলেন, কিন্তু আসবার পরদিনই যে কোনরূপ চিঠি বা টেলিগ্রাফ্ না পেয়েও কেন তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় চলে গেলেন, তা' কিছুই বুঝতে পারছি নে। আমার অত অনুনয়, অনুরোধ যখন বারে বারেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন এবং অন্য কথা বলে চাপা দিতে লাগলেন, তখন আমি বাবাকে বলেছিলাম আর একটি দিন থাক্‌বার জন্য তাদের বলতে। কিন্তু বাবা একটি কথাও বল্লেন না তাদের। পিসীমা যে অমন লোক, তিনিও কত বল্লেন কিন্তু বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। বাবার এমন ব্যবহার আর কখনো দেখি নি। যাক্ ভাই, সে সব ভেবে এখন আর কি হবে!

আশা করি তোরা ভাল আছিস্। চিঠির উত্তর দিতে দেরী করিস্ নে যেন। ইতি—

তোর সুধীরা।

—ক্রমশঃ—

—:*:—

বর্ষা বোধন—

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী দত্ত

শ্রাবণ-দিনের আঁধার আলোয় কে এলো তোর দ্বারে
সাঁঝের ছায়ায় এই অবেলায় ডেকে নে তা'রে।
দেখিস্ নাকি শিকলে তোর
যায় বা ছিঁড়ে ডোর,
তবে কাজ কি থাকা অকাজ নিয়ে ভাঙ্‌ল যদি ঘোর।
বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা তাহার গলার হার,
শ্রাবণ রাতির আশীর্ব্বাণী ঝর্‌ল গো এবার,
আকাশ সাগর দুল্‌ল যদি,
ঝরিল জল নিরবধি,
তবে, কাজ কি হেলায় বাধগো ভেলায়—হোতেই হবে পার।

সে যে, নীপের ডালে ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দিয়েছে,
ঘন বেণুরবনে আচম্‌কা আজ শিউরে উঠেছে।
সজল শাখে কোকিল শিখী
কে জানে তা'রা কহিছে কি,
হরিণ নয়ন কোন বা সেজন আকুল হয়েছে।
কান্না হাসির মাল্য গেঁথে এলো শ্রাবণরাত,
আঁখির প'রে মাগ্‌ছে কে বা আঁখির পরসাদ !
কে সে সখি, মরি মরি—
আঁখিতে তা'র কি লহরী
বুঝি, চোখের জলে চোখের হাসি হোলবা একসাথ !

বন্ধু সে যে ঝড়ের রাতের বার্ত্তা এনেছে
ঘন বরিষণে চোখের চমক হেনেছে।
চোখের চাওয়া চুলের ছায়া
নিশীথ রাতের মায়া,
এই বাদলের সজল ছায়ে ঘনিয়ে এসেছে।
ঘুলিয়ে নয়ন ফুলিয়ে বেণী প্রাসাদ শিখরে—
হঠাৎ কেন উঠ্‌ল ক্ষেপে জানব কি ক'রে !
দম্‌কা হাওয়ার চুম্‌কুরি দে'
আবার কেন চল্‌ল নেচে
কেশ ওড়ে তা'র বেশ ওড়ে তা'র ঘাঘরী ওড়ে।

মিথ্যে তোরা ভয় পেয়েছিস বন্ধু এসেছে,—
অন্ধকারের গুম্‌ট ভেঙ্গে হঠাৎ হেসেছে।
তা'রি চোখের কান্নাহাসি
ভালবাসি ভালবাসি
তা'রি চোখের ইসারা যে বক্ষে বেজেছে।
চিরদিনের চিররাতের
চিরনীরব পদপাতের
দুরন্ত দুর্দ্দিনের আমার বন্ধু এসেছে—।
চির চমৎকারের আমার বন্ধু হেসেছে ॥

———

বহ্নিরাগ

—শ্রীলীনা মিত্র

বহু দূরের যাত্রী আমি।

কতকাল যে আর এই বিরাট বিপুল পৃথিবীর বুকে এই লক্ষহীন জীর্ণ জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলতে হবে কে জানে! ওগো অজানা, ওগো নিরক্ষ সুদূর—এর কি কোন অন্তই নেই।

সবাই বলে আমি পাগল। কিন্তু আমার এই বাইরের উন্মত্ততার উৎস যে কোথায় সে তো কেউই ওরা জানে না। এই অভিশপ্ত হতভাগ্যের দেহের প্রতি রক্ত-বিন্দুতে সে যে কি অনুশোচনা-বহ্নি,—এ জীবনে হয় তো তার নির্ব্বাণ নেই। অতীতের সে স্মৃতি আজ দুঃসহ, দুর্নিবার।

একদিন এই পৃথিবী আমার চোখে কী মায়াই না বুলিয়ে গেছে—কিন্তু আজ?

......বর্ষার সজল সন্ধ্যা, হেমন্তের কুহেলি-গুণ্ঠিত প্রভাত শীতের স্তব্ধ জমাট রাত্রি, বসন্তের পূর্ণিত জ্যোৎস্না—কোন অনুভূতিই আজ জাগিয়ে তোলেনা। সমস্তই মিথ্যা, অর্থহীন।

এই অকাল বিশীর্ণ লোল দেহ, বিবর্ণ শ্রী, স্তিমিত দৃষ্টি, উদ্দেশ্যহীন নির্লিপ্ত, অটল গাম্ভীর্য্য—সকলের মনে শুধু কৌতুক ও ঘৃণারই ইন্ধন জোগায়।

একদিন দুষ্কৃতির যেমন আমার সীমা ছিলনা, তাই আজ দুঃখেরও তেমন অন্ত নাই! বুক চিরে দেখাবার হলে দেখাতাম, আমারই বিচারের ভার সেই অন্তর্যামী দেবতাটী কেমন করেই গ্রহণ করেছেন!

শৈশব হারিয়ে জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, আমাকে জগতের ভেতর সর্ব্বরকমে রিক্ত নিঃস্ব করে আত্মীয় স্বজনেরা সবাই যে যার মত অলক্ষ্যে সরে গেছেন। ঝঞ্ঝা তাড়িত নীড়হারা পাখীর মত একদিন ছিট্‌কে এসে যেখানে পড়লাম, সেখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁই আর দেহরক্ষার জিনিষটি যেমনই থাক, স্নেহ দয়া মায়া যে একরত্তিও ছিলনা সে কথা মনে হলে আজও বুকটা অসহ্য ক্ষোভে দুঃখে ভরে ওঠে। শুধু পরগাছার মতই যেন জড়িয়ে বেড়ে উঠেছিলাম। দেবী সরস্বতীর ওপর আমার তত ভক্তি ছিলনা। তাই উনিশ কুড়ি বছর বয়সেও যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর গণ্ডী পার হতে পারিনি, সেই সময় একদিন হঠাৎ স্কুলের ওপর বীতস্পৃহ হয়ে তার মায়া কাটিয়ে চলে আসি।

কিছুদিন আগে থেকেই জমীদার বাবুর ছেলে খোকাবাবুর সঙ্গী হয়েছিলাম। কারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভাল না লাগলেও সঙ্গীতে কলা লক্ষ্মীর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলাম। গান বাজনা পেলে আর কিছুই তখন চাইনি, ভালোও লাগেনি। খোকাবাবুও পিতৃ-বিয়োগের পর সাবালক হয়ে গান বাজনার এক আসর সৃষ্টি করেছিলেন। দুজন ওস্তাদ তাঁকে শেখাত। আমারও এতে বিনিষ্ট আগ্রহ দেখে, তিনি আমাকেও তাঁর দলে ভিড়িয়ে নিলেন। গৃহের সেই হতশ্রদ্ধার সূক্ষ্ম শৃঙ্খলটুকুও তারই সাথে কেটে গেল। তাতে দুঃখ ছিলনা। মহা উল্লাসে চির ঈপ্সিত সাধনায় ব্রতী হলাম।

সেবার গ্রামের সখের দলের থিয়েটারে আর খোকা-বাবুর মন উঠতে চাইল না। পূজার সময় সহর থেকে খুব নামজাদা এক থিয়েটারের দল এল। তিন দিন ভরে সেই অপূর্ব্ব মোহময় উন্মাদনায় মেতে রইলাম। সে এক অপরূপ দৃশ্য—আমার মনে আর চোখে যেন রঙ্গীন নেশার অপূর্ব্ব আবেশ। খোকাবাবুর মত নিয়ে তাঁরই সুপারিশে সেই

দলে ভর্ত্তি হয়ে পড়ি। সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা আমার বরাবরই একটা আলোচনার বিষয় ছিল, তার উপর সুকণ্ঠের খাতিরে তারাও বেশ আগ্রহের সাথেই আমায় দলে ভিড়িয়ে নিলে। তারপর তাদের সাথেই সহরে চলে যাই।

অভিনয়ে ও সঙ্গীতে বেশই কৃতিত্ব লাভ হয়েছিল এবং তার সঙ্গে যশও···ফলে উপার্জ্জনও বেশ কিছু দাঁড়াল। কিন্তু যৌবনের সাথে মনের ভেতরেও কেমন করে উশৃঙ্খলতার বীজ নিক্ষিপ্ত হল—হঠাৎ। চারিদিকে ভোগ-বিলাসের শত উপকরণ ; অল্পবুদ্ধি—অর্থও সচ্ছল।

আমায় একটু একটু করে একদিন পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়ে নিয়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে এক দিন গুরুতর কোন অপরাধে চাকরীটিও গেল সে কাহিনী আর বলে কাজ নেই। তারপর যে কয়টা মাস—সে আমার অভিশপ্ত জীবনের সব চেয়ে ঘৃণ্য কলঙ্কিত ইতিহাস।

দুরন্ত প্রলোভনের মোহে ভদ্রবেশধারী জীবন্ত শয়তানের দলে মিশে নৈতিক চরিত্রের এতদূর অবনতি লাভ হল—যেন পৃথিবীর কোন দুষ্কার্য্যেই আর আমার দ্বিধা নেই। আমার সেই উদ্দাম প্রচণ্ড গতি রোধ কর্ব্বার জন্য এক ফোঁটা স্নেহের বাঁধনও ত ছিলনা, সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ কোন কিছুই আর সে মনকে বিরুদ্ধ করতে পারেনি।

তারপর একদিন দুঃসহ ব্যাধি আক্রান্ত হয়ে হাঁসপাতালে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'তে হয়।

সেই রোগে সুদীর্ঘ একটি বৎসর। ধরণীর বুকের ওপর দুর্ব্বল, অনুতপ্ত মন নিয়ে আবারও এক দিন ফিরে আসি—অসহায়, নির্ব্বান্ধব। মনে পড়ে সেইদিনই জীবনে প্রথম ভগবানকে স্মরণ করি—সে কি দুশ্চিন্তা !···বলেছিলাম ওগো বিধাতা, আর নয়, সমস্ত অতীত আমার চিরদিনের মতই অতীতে ডুবিয়ে দাও। আবার আমায় নতুন জীবন দিয়ে নতুন করে গড়ে তোল।'

সেই দুর্দ্দিনে—আমার সেই আশৈশবের বন্ধু তরুণ জমীদার খোকাবাবুর কথা মনে পড়ে। অতি সঙ্কোচ ও লজ্জার সঙ্গে আবার তাঁর গৃহে, আমার সেই চির অনাদরের মাতৃ ভূমিতে এসে উপস্থিত হোলাম। খোকাবাবু তখন বয়ঃ প্রাপ্ত উদ্ধত যুবক। কিন্তু তবুও তিনি আমার অবস্থায় দুঃখিত হলেন। অবশেষে তাঁহারই দয়ায় একটা ছোট মহালের নায়েবী পদ পাই। আশাতীত সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হয়ে বহু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কর্ম্মস্থলে যাত্রা করি।

শিশুকাল থেকেই বেদনাহত জীবনে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছি ! আজ সেই জীবনের পঁচিশটি বৎসর অতিক্রম করে এক পল্লী জননীর স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চলে, শান্তির আশ্রয় পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হল। এই খানেই আমার জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু···

খুব সকালে উঠে খানিকটা বেড়িয়ে আসতাম রোজই। সেদিনও তাই—সবে বাড়ী ফিরেছি।

অগ্রহায়ণ মাস, কুহেলি কুণ্ঠায় অনুদিত সূর্য্যের আড়ষ্ট আভায় তখন সুপ্রকাশ, সুস্পষ্ট।—হিম-নিশ্চিহ্ন প্রভাত-রবি-রশ্মি দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে। তরুণ অরুণ স্পর্শে হরিৎ ধান্য শীর্ষগুলি সোনালী আভায় উজ্জ্বল হয়ে হেসে উঠেছিল। নতুন জীবনের নতুন আনন্দে, প্রকৃতির এই চির নবীন, চির-শাশ্বত নগ্ন সৌন্দর্য্যের অভূত পূর্ব্ব অনুভূতিতে, সমস্ত দেহ মনে যেন এক অজানা পুলকের উন্মাদনা জাগিয়ে যায়। ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু হিল্লোলের সাথে হৃদয়ের আবেগে গান ধরেছিলাম—

'আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও,
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।'

আমার কণ্ঠস্বর যে কখন পরদায় পরদায় উঠে আকাশে বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে গেছে টের পাইনি, হঠাৎ সম্মুখে দুটি চোখ পড়তেই দেখি, পাশেই পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে আসছে একটী তরুণী,—সদ্যস্নাতা—কক্ষে পরিপূর্ণ জলের কলসী। সেই একটিনিমিষেই কি যে দেখেছিলাম, তা ভাষায় বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। সহরে বহু সুন্দরী আমার সুকণ্ঠ সঙ্গীতে—সুচারু সৌন্দর্য্যে

আকৃষ্ট হয়ে সেধে ধরা দিয়েছে, তাদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনিও খেলেছি। নারী মাত্রেরই ওপর আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিলনা, কিন্তু এমেয়েটি যেন অপরূপ—পল্লীর শ্যামলতা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সুশ্রী, নিটোল দেহ-সৌষ্ঠব, সেই ঋজু দেহখানি ঘিরে একটা করুণ কমণীয়তা,—পরণের শুভ্র বসনখানির অনারম্বর শ্রী—শান্ত স্নিগ্ধ এই পুণ্য পূত প্রভাতে যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা একটি। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিতে আমার মনে মুগ্ধ সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠল। দেখলাম, তারও কৃষ্ণায়ত সরল শিশুর মত কোমল দুটি চোখে যেন বিস্মিত, বিমুগ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে। তারপরই চকিতে সে কখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে মন্থর পদে চলে গেল।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে পথ চলা সুরু করলাম। কে এই মেয়েটি ?—বয়স্থা, অথচ সর্ব্বাঙ্গে এয়োতীর চিহ্ন মাত্র নেই। সর্ব্বহারার মৌন স্তব্ধতা সর্ব্বাঙ্গের শুভ্রতা ভেদ করে ফুটে উঠেছে। কে এ তরুণী ?

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম—চোখে পড়লো—সে আমারই কাছারী বাড়ীর পিছনের বাড়ীটায় অন্তরাল হল। আমার ঐ প্রতিবেশী গৃহস্বামীকে আমি চিনতাম—এসেই আলাপ হয়েছিল। এ অঞ্চলে তার অর্থ সচ্ছলতার খ্যাতি আছে।

একদিন কিন্তু দ্বিধা মাত্র না করে তার গৃহে উপস্থিত হলাম। হয়তো বাইরের দিক থেকে নিতান্তই অকারণ,—তবুওতো প্রতিবেশী!

দিনে দিনে সে বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতাও বেড়ে চললো। বিশ্বনাথ বাবুর সংসারে এক বৃদ্ধা ভগিনী আর একমাত্র মেয়ে সুরমা ছাড়া কেউ ছিলেন না। সুরমাকেও বিয়ের ছ' মাসের ভিতরেই জীবনের সব সুখ, সাধ, আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে ভবিষ্যতের দুশ্চেদ্য আঁধারেই সারা জীবন খানি উৎসর্গ করতে হয়েছে। মাকে হারিয়েছিল শৈশবে ;—বৃদ্ধ পিতা ও পিসীমার স্নেহ নির্ভরতায় তার ক্ষুদ্র আশাহীন জীবনখানি বেড়ে উঠেছে। এই দুটী অজানা পথের যাত্রীই প্রাণপণে তার আজন্মের স্নেহ বুভুক্ষা দূর কর্ব্বার চেষ্টা করে চলেছেন ;—সে তো জানেনা নিয়তির কঠোর দণ্ডের আঘাতে যাদের হৃদয় ভগ্ন, শ্মশান—নিজের জীবনকাহিনী বলতে গিয়ে অতীত ব্যথার স্মৃতির দংশনে তাদের স্তিমিত চোখ দুটি যে শুধু অশ্রু-সজল হয়ে উঠে। সেদিন অনেক কথাই বিশ্বনাথ বাবু বলেছিলেন।...

সহানুভূতির সুরে আমি শুধু বলেছিলাম, 'আপনার মেয়ে যখন কচি বয়সেই বিধবা, তখন আবার বিয়ে দেননি কেন ? আপনার ত অর্থের অভাব নেই—'

ম্লান করুণ হাসি হেসে তিনি বলেছিলেন—'অদৃষ্টে যদি সুখই থাকবে তবে বিধবাই বা হবে কেন বাবা ! হিন্দুধর্ম্মটা মেনেই চলি কিনা, তাই কুসংস্কার গুলো, আর অদৃষ্টবাদটা এখনো ছাড়তে পারিনি। অর্থের কথা বলছ ? হাঁ লোকে বলে আমি কৃপণতা করে বহু অর্থই সঞ্চয় করেছি অমিত-ব্যয়ীতা আর বিলাসিতার সংস্রব থেকে দূরে থাকাই, যদি কৃপণতা হয় তবে আমি সত্যই কৃপণ। কিন্তু তারা ত' জানেনা, অতটুকু কচি মেয়েকে সংসারের সব আবিলতা, কলুষতা থেকে দূরে রাখতে হলে, মা বাপকে কতখানি সইতে হয়—,তাকেও কতখানি সওয়াতে হয়। বিয়ের কথা বলছ ? কিন্তু এই অর্থ সঞ্চিত করেছি কি অপরের হাতে তুলে দিয়ে তাদের ভোগ লালসার ইন্ধন জোগাতে ? অর্থের মোহে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই ওকে বিয়ে করতে চায় বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নেই। সংসারে স্ত্রী ও জননী হয়ে, আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করে যাওয়াই কি নারীর একমাত্র কাজ ? আমার মেয়েকে গ্রামের সহস্র লালসার দৃষ্টির ভেতরেও এমন ভাবে গড়ে তুলেছি যে বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমার প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সে-ই পারবে। তার হাতে অর্থের অসদ্গতি হবেনা। মা যে আমার দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্য—'

কন্যার প্রতি স্নেহে, শ্রদ্ধায় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বিগলিত হয়ে গেল। আমি শুধু অবাক হয়ে চেয়েছিলাম—বোধ হয় মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত।...

বৃদ্ধ আমাকে কেন জানিনা খুবই স্নেহ করতে লাগলেন। আমি যে একজন সত্যই অতি সচ্চরিত্র, সরল ও অমায়িক সেটা নাকি তাঁর লোক চরিত্রের অভিজ্ঞতা দ্বারা টের পেয়ে ছিলেন। শুনে হাসব না কাঁদব ঠিক পাইনে। আমার কাজ খুব বেশী ছিল না। অবসর হলেই তিনি আমায় ডেকে নিতেন, ক্রমে আমাদের আলাপ খুবই জমে উঠল। আমার একা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হ'তে দেখে, তাঁরা আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ সত্বেও সে ভার অনেকটা গ্রহণ করেন। তিনি কন্যার সাথেই নিরামিষ খেতেন, কিন্তু আমার জন্য আমিষ রান্না হতো। পিসীমা সম্মুখে বসে থেকে আমায় খাওয়াতেন। কিন্তু ভোক্তার আহারের তারতম্য অনুসারে, আন্তরিকতায় ও আস্বাদে মধুর আহার্য্যগুলি যে একখানি সেবাব্যাকুল কোমল প্রাণ থেকে অতি আগ্রহেই প্রস্তুত হ'ত, হয়তো অলক্ষ্যে দুটী স্নেহার্দ্র চোখ উন্মুখ হয়ে আছে, এইটুকু আশায় খেতে বসে, একটা অজানা, অসম্ভাবিত পুলক ও তৃপ্তিতে বাইরের সব কিছুই ভুলে যেতাম। পিসীমার কথার উত্তরও সব সময় দিতে পারতাম না। কিসের আকর্ষণে দুটী চোখ যেন আপনা থেকেই ইতস্তত চঞ্চল হয়ে বেড়াত। হয়তো বা অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যাশিত দুটী চোখের ওপরও কখন থমকে থেমে পড়ত. সর্ব্বদা দেখতাম চকিতে সুরমার মুখখানা লজ্জায় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে—তার পরিপুষ্ট দুটি কপোলপ্রান্তে যেন রক্তের উচ্ছলতা। নিমিষে সে সরে যেত। নিজের ওপরে রাগ করতে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু হায়রে দুর্ব্বল চিত্ত! তখনও বুঝতে পারিনি এই পাপ-পঙ্কিল মনটি নিজেকেই শুধু নয়—আরো একজনকে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। এমনি করে আমার চির বুভুক্ষু হৃদয় অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত, স্নেহ প্রীতির রূপসায়রে অবগাহন করে, মুগ্ধ তৃপ্ত—হয়তো বা আরও লোলুপ হয়ে চলেছে। নতুন উত্তেজনায় অপূর্ব্ব মোহাবেশে, পুর্ব্বেকার সেই অত্যাচারপীড়িত দেহখানিও, স্বাস্থ্য-শোভায় ভরে গেছে। অতীতের বিষাক্ত স্মৃতিও বোধকরি কোন বিস্মৃতির তলায় ডুবে ছিল। এমনি করেই কয়টা মাস,—যেন একটা বিরামহীন আনন্দানুভূতির স্বপ্ন লোক।

কিছুদিন পরই বুঝতে পারলাম নিজের পরিবর্ত্তনের কথা। এই উচ্ছৃঙ্খল চিত্তে আবারও যেন বিপর্য্যয় সুরু হয়েছে। সুরমাকে আমি ভালবাসি,—তাকে আমার চাই। তার পিতা যাই বলুন, সে পাষাণ প্রতিমা নয়, তার ভেতরে প্রাণ আছে। এত নীরব প্রাণঢালা যত্ন, আগ্রহ তার সবই অন্তঃসারশূন্য নয়। নিজের বিশ্বজয়ী রূপের কথা মনে হ'ল। আমায় সে কি ভালবাসতে পারেনা? আমার হৃদয়ের তীব্র আকর্ষণ কি তার দুর্লভ মনটীকে আমার দিকে টেনে আনতে পারেনা? প্রত্যেক নরনারীরই জীবনে এমন একটী সময় আসে যখন তাদের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আর একটী তরুণ বুকে তুলে দিয়ে পরিপূর্ণ সার্থকতায় বিলিয়ে দেওয়ার সুখে বিভোর হয়ে পড়ে। বিনিময়েও তাই চায়। আমিও তাই আমার সর্ব্বস্বই বুঝি দিয়েছি, কিন্তু প্রতিদানে কিকিছুই পাইনি? বুঝতে পারতাম তার প্রথমদিনকার দেখা সেই শিশুর মত সরল অবাধ দৃষ্টি, অসঙ্কুচিত ভাব যেন আর নেই, যেন এই কয়দিনেই সহসা কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছে। প্রতিপদে লজ্জার জড়িমা, দৃষ্টিটুকুও আবেশ আকুল। তারও মনে নিশ্চয়ই ভাবান্তর সুরু হয়েছে। হৃদয়ের বিরাট রিক্ততা, সুপ্ত আকাঙ্খা বুঝিবা আজ সবাই একসঙ্গে জেগে উঠে তার হৃদয়ে প্রলয়ের তুফান তুলেছে। তখনও জানিনা সে সমস্ত আমারই কল্পনা মাত্র কিনা? সারাদিনরাতই, হৃদয়ের নিভৃতে একটা প্রেমের আগারে, কল্পনার কুঞ্জবনে, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর মত একটা কল্যাণী বধূকে এই চিরনিঃস্ব স্নেহাকাঙ্ক্ষী লোকটার একান্ত আপনার মনে করে উন্মাদের মত আকাশ কুসুম রচনা করতাম। মনে হ'ত একে না পেলে হয়তো উন্মাদ হব। কিন্তু তার পিতার বিরুদ্ধ-মতের কথা মনে হলেই হতাশা ও ব্যর্থ কামনার রুদ্ধ বেদনায় অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

তাই বিবেকের তাড়নায় এখান থেকে দূরে সরে যাওয়াই শ্রেয়স্কর মনে হলেও, দুর্জ্জয় প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলাম। আজ মনে হয় সেই ভালবাসায় আমার ভেতরে সত্য কতটুকু ছিল? যেখানে প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে না পারলাম! ত্যাগের ভেতর দিয়েই না প্রেম সার্থক হয়ে উঠতো!

সেদিন শুক্লা দ্বাদশী, চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। কি একটা কাজ সেরে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরছিলাম। গ্রামের খালের ধার দিয়ে, উন্মুক্ত প্রান্তর আর বিশাল সবুজ শস্যক্ষেত্রের মাঝে সরু পথের ওপর দিয়ে আসতে আসতে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

বিশ্বের এই অপরূপ আলোক-সমুদ্রের মাঝে আজ কেবলি মনে হতে লাগল, আমি একা! শূন্য বুকখানা জুড়ে আছে শুধুই একটা বিরাট হাহাকার। জীবনটার আগাগোড়া একবার তলিয়ে দেখতে লাগলাম। এর ওপর দিয়ে কত মর্ম্মান্তিক অত্যাচারই না গিয়েছে, নিজেকে শুধু ফাঁকি দিয়েই এসেছি। অশান্ত আত্মা বাধাহীন উদ্দাম গতিতে চলে ঘা খেয়ে খেয়ে আজ একটু শান্তির আশ্রয় চায়!—এই অবসন্ন মন, কারও পরিপূর্ণ প্রেমভরা স্নিগ্ধবক্ষে আশ্রয় নিয়ে সব দুচিন্তা দুর্ভাবনার বোঝা দূরে ফেলে নিশ্চিন্ত হতে চায়! কিন্তু কোথায় সে সান্ত্বনা। অস্থির ভাবে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। কোন রকমে খাওয়া দাওয়া সেরে অন্যমনস্ক ভাবে আবার হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বনাথবাবুর বাড়ীর দিকে চললাম। পল্লীগ্রাম, চারিদিকে তখন গভীর নিস্তব্ধতা। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর শয়নকক্ষের দ্বার থেকে তখনও মৃদু আলোর রশ্মি চোখে পড়ে।

আমি গিয়ে দরজা ঠেলে দাঁড়ালাম। ভিতরে বিস্তৃত শয্যার ওপর তিনি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়।—সম্মুখে কয়েকখানা বই ছড়ানো, পাশেই সুরমাও গভীর ভাবে কি একখানা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, বোঝা গেল, পিতা কন্যাকে কি একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অদূরে পিসীমাও মালার ঝুলিটি হাতে নিয়ে নিবিষ্ট-চিত্তে শুনছিলেন, আমি অপ্রস্তুত ভাবে কি বলতেই, সুরমা সরম কুণ্ঠিত ভাবে অন্য ঘরে চলে গেল। বিশ্বনাথবাবু ও পিসীমা দুজনেই বলে উঠলেন 'এই যে, এই এলে নাকি? খাওয়া দাওয়া সেরেছ?

আমি বিছানার এক পাশে বসতে বসতে বললুম—'হাঁ।' বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন—'রোজই সন্ধের পর তোমার গান শোনা একটা অভ্যাসের ভেতর দাঁড়িয়েছে হেমেনবাবু, তাই আজকের সময়টা বড্ডই ফাঁকা ঠেকছিল,' বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হাসলেন। যাঁর ভেতরে কোন কিছুরই কালি জমতে পায় নি, এমনি হাসি তাঁরই সম্ভব। আমার অন্তরের গ্লানি আমার মনকে অন্ধকারের মতই জমাট বাঁধিয়ে তুলেছিল, কিছুই বললাম না। পিসীমা বললেন—'সুরমা ত' অন্ততঃ দশবারও তোমার কথা বলেছে। তোমার গান শোনা ওরও একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাস্তবিকই হেমেন, বড্ড চমৎকার তুমি গাও। মনে হয় যদি তোমায় একবারে আপনার করে কাছেই ধরে রাখতে পার্ত্তুম!' বলে তিনি কেন জানিনা এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমি সহসা গম্ভীর হয়ে বললাম, 'পিসীমা, এই যে স্নেহ, যত্ন আপনাদের কাছ থেকে অযাচিত ভাবে পাচ্ছি, এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য তা মুখে বলতে গিয়ে তার অমর্য্যাদা করতে চাইনে, আমি ত আপনাদেরই হয়ে গেছি, আমার ত এ পৃথিবীর ভেতর কেউই নেই, কোন দিনও বুঝি ছিলনা,'—আমার শেষের কথা গুলি কান্না ভরা হয়ে উঠল। সেই সাথে ঐ দুটী প্রাচীন চিত্তও দ্রব হয়ে গেল। পিসীমা ধরাগলায় বল্লেন 'কিই বা তোমার করতে পাই হেমেন?'

বিশ্বনাথবাবু বল্লেন 'হেমেনবাবু আমি তোমার কাছে একটী প্রস্তাব করতে চাই শুনবে কি তুমি?'

শশব্যস্তে বললাম "আপনার আদেশ যথাসাধ্য পালন

কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্ব!'

তিনি বললেন 'আমাদের যোগেশ রায়কে তুমি চেন, তাঁর একটী অবিবাহিত মেয়ে আছে, সুন্দরী, যতদূর জানি, মেয়েটী বড়ই সুশীলা, কিন্তু যোগেশ দরিদ্র, তুমি যদি কথা দাও, আমার বিশ্বাস দরিদ্র্যকে তুমি ঘৃণা কর্ব্বে না, এ মহত্ব নিশ্চয়ই তোমার আছে, আমি কি তাকে এ বিষয়ে বলব? বিপদে পড়েছে সে, আর তুমিও সুখী হবে, এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস। হেমেনবাবু, তোমায় ছেলের মত স্নেহ করি, তোমায় সুখী হয়ে সংসারী হতে দেখলে বড়ই সুখী হব—কি বল দিদি? আমি রুদ্ধশ্বাসে তাঁর মন্তব্য শুনছিলাম, বাধা দিয়ে আর্ত্তস্বরে বলে উঠলাম, 'না না, আমি আপনার কথা রাখতে পার্ব্বনা, আর কোনখানে বিয়ে কর্ব্বার উপায় আমার নেই, মাপ কর্ব্বেন, বলতে বলতে আমি দ্রুতপদে চলে এলাম। তাঁরা বোধ হয় আমার ব্যবহারে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পাগলের মত পথে পথে ঘুরে সেই কাছারীর বাঁধান পুকুরের ঘাটে এসে ক্লান্ত ভাবে বসে পড়লাম। দূরে অনন্ত নীলাকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের স্তরের ভেতর থেকে চন্দ্রমার কলঙ্কিত আননখানি বড় মধুর হাসিই হাসছিল। বাতাসের মৃদু হিল্লোলে, চতুর্দ্দিকের গাছপালায় তারই মৃদু কম্পন, পুকুরের স্থির গভীর কালো জলে—ধীরে, অতি ধীরে একটু চাঞ্চল্য এসে অনাবিল জ্যোৎস্না রাশি ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে যাচ্ছিল। একা বসে বসে আমারও তপ্ত বুকখানা আশা ও হতাশার আলোড়নে বিধ্বস্ত হচ্ছিল।

কতক্ষণ অন্যমনে ছিলাম জানি না, সহসা কোন গুরু দ্রব্য পতনের শব্দে চমকে উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুতপদে নিকটে গিয়ে দাঁড়াতেই, অসংবৃত বসন যথাস্থানে ন্যস্ত করতে করতে কলসীটী ভর দিয়ে সুরমা উঠে দাঁড়াল। ব্যথিত হ'য়ে বললাম,—'আপনি-তুমি, এত রাত্রে জল নিতে এসেছিলে কেন?'

দারুণ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে মৃদু স্বরে কম্পিত কণ্ঠে সে বললে,—রোজই ত প্রায় এমনি সময়েই আমি গা ধুয়ে, জল নিতে আসি। আজকে এমনি ভয় পেয়েছিলুম—বলতে বলতে আবার যেন প্রবল লজ্জায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আমি বুঝতে পারলুম, এই নির্ম্মল ঘাটে সুস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে, স্থাণুর ন্যায় আমায় বসে থাকতে দেখেই সে বোধ হয় ভয় পেয়েছে। ক্ষোভে ও লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—'আমারই অন্যায় হয়েছে। বেশী কি লেগেছে? ব্যস্ত হয়ে সে বললে—'না' একটুও নয়। আমি যাই——'বলেই সে জল না নিয়েই চলে যেতে উদ্যত হ'ল! আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সহসা ধীর কম্পিতকণ্ঠে ডাকলুম—'সুরমা—'

তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় সে ফিরে দাঁড়াল। 'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি শীঘ্রই—' সে নিমিষে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বললে—'কেন?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—'শুনবে কি তুমি? এই ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া জীবনটার আগা গোড়া যে আমার তোমাকেই শোনানো চাই, দয়া করে শুনবে?' সে মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বললে—'বলুন'

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কি বলেছিলুম মনে নেই, আমার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এসেছিল। আমার হাতের ভেতর কখন যে তার হাত দুখানা এসে পড়েছিল, টের পাই নি, বোধ হয় সেও না। শুধু অশ্রু সজল, গভীর বেদনাময় দৃষ্টি তুলে মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে ছিল; সহসা তড়িতে হাত দু'খানা ছাড়িয়ে কাতর আর্ত্তনাদের সুরে বলে উঠল—'আসুন—আসুন ছিঃ' বলেই আঁচলে মুখ ঢাকলে। তার থর থর কম্পিত পা দুখানা যেন আর নিজের ভার বইতে পার্চ্ছিল না। আমি একটু সরে গিয়ে বললাম,—'তাইতেই আমি চলে যেতে চাই সুরমা, এ দুর্জ্জয় বাসনার হাত থেকে মুক্তি পেতে। নইলে প্রাণে যে নরকের আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন নিভবে না। আমি যাব, কিন্তু তার আগে শুনতে চাই, এ অভাগার জন্য এক বিন্দু প্রেম কি এখানে সঞ্চিত থাকবে? এখানকার শত দুঃখময় স্মৃতির সঙ্গে

এ কথাটুকুও কি মনে কর্ত্তে পার্ব্বো ? এখানে একখানি পবিত্র স্নিগ্ধ বুকে আমারও একটু স্থান আছে—'

আর্ত্তস্বরে সে বলে উঠল—'আছে, আছে, আমি চিরদিন আপনাকে মনে রাখব কিন্তু আর আপনি এখানে থাকবেন না ; চলে যান, শীঘ্র চলে যান—আমিও আর পাচ্ছি না।' বলে স্বভাববিরুদ্ধ দ্রুতপদে ভয় চকিতা হরিণীর মত বাগানের পথে চলে গেল।

আমি একটা অভাবনীয় পুলকব্যথায় উদ্বেলিত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বনাথ বাবুর জলদ গম্ভীর স্বরে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি বিস্ফারিত দুই চোখে আমার দিকে তাকিয়ে উৎকট ঘৃণাভরে বললেন—'হেমেন বাবু,—আমি সব শুনেছি। তোমায় আমি ভাল বলেই জানতুম ; কিন্তু ছিঃ, মনের ভেতর এত পাপের কালি জমিয়ে রেখেছ ? এ ত ভালবাসা বা নিঃস্বার্থ প্রেম নয়, এ যে উৎকট লালসার মোহ, তার যৌবনের তীব্র আসক্তি ! যে মেয়ে আমার সংসারের সব আবিলতা, কলুষতা থেকে দূরে ছিল, তার ভেতরে তুমি পঙ্কিল লালসার বিষ প্রবেশ করাতে চাইছ। জাননা কি, শিশুর মত সরল বিকারহীন চিত্ত অল্পেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ? আমি তোমায় স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি, যদি সংসারী হয়ে ভদ্র ভাবে থাকতে পার, তবেই আবার আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ থাকবে, নইলে এই শেষ। তোমায় আমি আন্তরিক স্নেহ করি, কিন্তু মেয়ের মঙ্গলের জন্য এও আমি সহ্য করব।, বলেই তিনি ধীর পদে চলে গেলেন। আমি কম্পিত পদে বসে পড়লাম।

সুরমাকে আমি ভালবাসি, সেও বাসে ; তবে কেন এ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ! তার যৌবনের মোহ, তার পিতার অর্থের লিপ্সা যে আমার মোটেই নেই তা নয় কিন্তু ভালও ত প্রকৃতই বাসি। তবে কেন এসব আশা ছেড়ে দিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে জলন্ত উল্কার মত অলক্ষ্যের সন্ধানে কোন শূন্য পথে ছুটে যাব ? কেন ? না না ত্যাগ নয়, ভোগের দুঃসহ লালসা উন্মত্ত গতিতে আমার শিরায় প্রবহমান হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তের ভিতর আমার অবসন্ন মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে, বৃদ্ধের অটল বিশ্বাস, অযাচিত করুণার প্রতিদানে একটা দারুণ প্রতিহিংসায় পাপ মন ভরে উঠল। সঙ্কল্প ঠিক করে পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হয়ে হিংস্রের মত ছুটে বাড়ীতে এলাম। সেই রাত্রেই আমার লোকেরা জন কয়েক বিশ্বস্ত বাগ্দী প্রজাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে এল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে নিভৃতে পরামর্শ করে পরের দিনই সে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম

দিন দশ পনেরোর ভেতরেই পশ্চিমের একটা সহরে তাকে নিয়ে যেতে পেরে নারকীয় কাজের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আমি সে গ্রাম ছাড়বার পরই আমার লোকেরা একটী ষ্টেসনের পশ্চিমগামী ট্রেণে তাকে এনে ওঠালো। ট্রেনে উঠেই সে আপনার, অসহায় ভীষণ বিপদের অবস্থা অনুভব করে ভীত অবসন্ন হয়ে স্তব্ধ বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু যখনই অদূরস্থিত আমার দিকে তার দৃষ্টি পতিত হ'ল, তখনই বিকৃত স্বরে বলে উঠল 'একি আপনি ?' বলেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে আমার পদ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। আমি ব্যস্ত হয়ে সাদরে তাকে উঠিয়ে শুইয়ে দিয়ে তার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হোলাম। বহুক্ষণ পর তার জ্ঞান হ'ল। মুহূর্ত্তে আপনার অবস্থা স্মরণ করে আমার কোলের ভেতর থেকে মাথা উঠিয়ে সবেগে উঠে বসল। তার পর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল—'ওগো একি করলে ? কেন এ জঘন্য প্রতারণা করে আমায় বাবার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে ? আমরা কাশী যাচ্ছিলুম, বাবা হয়ত এখনও ও গাড়ীতে ঘুমিয়েই আছেন। হরে বাগ্দী যে তোমারই লোক তা ত স্বপ্নেও ভাবিনি। আমায় নিয়ে তুমি কি করবে ? কেন এ কলঙ্কের ডালি আমার মাথায় তুলে দিলে ? কোন পাপে গো ? আমার যে মরণই ভাল—' বিদ্যুতের আলোয় তার সুন্দর মুখের ওপরকার অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তোর মত

ফুটে উঠছিল, শোকের উচ্ছ্বাসে, অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আশঙ্কায় দেহখানি কেঁপে কেঁপে উঠছিল, রক্তিম মুখমণ্ডলের সে মাধুর্য্য টুকু উপভোগ করে আমি ধীরে ধীরে তার পৃষ্ঠে হাত খানি রেখে সস্নেহ স্বরে বললাম—"কলঙ্ক নয় সুরমা, আমায় অত হীন মনে করোনা। আমি তোমায় বিয়ে কর্ব্ব। শিশুকালে মাত্র দুদিনের সে স্মৃতি ত তোমার মন থেকে মুছেই গেছে। তোমায় ছেড়ে বেঁচে থাকা আমার অসম্ভব। তোমার বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাতেই এই কৌশলটুকু করতে হয়েছে। তোমাদের গ্রামের ত একথা কেউ জানতে পার্ব্বেনা সুরমা! বিয়ের পরই আমরা তোমার বাবার কাছে যাব, তিনি কি আমাদের ত্যাগ করতে পার্ব্বেন? কখনই নয়। আমাদের মিলন যে ভগবানেরই অভিপ্রেত। সুরমা তুমিও কি আমায় ভালবাসতে পার্ব্বেনা? আমার দুঃখটা তুমিও কি বুঝবেনা? তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি যে কোন কাজ কর্ত্তে পারি তা কি বোঝনি? তবুও কি দূরে ঠেলে রাখবে?"

তরুণ জীবনের অনাস্বাদিত সুধা পাত্র যদি কেউ মুখের কাছে তুলে ধরে তাহলে কেউই বুঝি চিত্তের বিরাগে, সবটুকু দৃঢ়তা স্থির রাখতে পারে না। সুরমাও তাই আমার অজস্র সান্ত্বনা সপ্রেম মিনতিতে একটু শান্ত হ'ল। আমি একহাতে তাকে বেষ্টন করে অন্যহাতে তার আলোক বিধৌত অশ্রুলাঞ্ছিত, সুকৃষ্ণ কেশরাশিবেষ্টিত, পরম আকাঙ্ক্ষিত মুখখানি মুছিয়ে দিতেই সে শিউরে উঠল। তারপর অদূরে স'রে বসল। কিন্তু বেশীক্ষণ এই উত্তেজিত অবসন্ন শরীরে বসে থাকতে না পেরে মূর্চ্ছিতের মত আসনের ওপর শুয়ে পড়ল। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় একটু অনুতাপের তীব্র কষাঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু অদূর বর্ত্তিনী তরুণীর দিকে চেয়েই চিত্তে দৃঢ়তা এল। বাসায় গিয়ে উঠবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। যদিও অনেকে নানা সন্দেহ করেছিল কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য্যেই সব বিঘ দূর হয়ে গেল।

বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত কয়টা দিন, সে যতদূর সম্ভব আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফিরত, কিন্তু তার ভেতরেই ঝির সাহায্যে আমার সেবা যত্নটুকু সবই করত।

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যের পর ঘুরতে ঘুরতে ছাদে এলাম। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, সে ছাদের আলিসায় ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার আকাশের বুকে অসংখ্য হীরক খণ্ডের অনৈসর্গিক দ্যুতির সাথে নীচের গাছ পালার ভেতরকার জমাট বাঁধা আঁধারের ভেতর জোনাকী গুলো মিট মিট করে জ্বলে যেন পাল্লা দিতে চাইছিল। অদূরে জনবিরল রাজ পথের ধারে ধারে দুই একটী গ্যাসপোষ্ট এই বিশ্বজোড়া আঁধারের জাল ভেদ করে অগ্নিময় মুখ গুলি তুলে গর্ব্বিতের মত দাঁড়িয়ে! সে অন্য মনস্ক হয়ে উদাস দৃষ্টিতে কোন শূন্য পথে চেয়েছিল জানিনা, কিন্তু আমি কাছে গিয়ে তার হাত খানি ধরতেই সে চমকে ফিরে তাকাল। আমার তপ্ত নিঃশ্বাস বোধ হয় তার কপোলে পরশ বুলিয়েছিল, তাই আমি তার হাত খানা ধরে একটু কাছে টেনে যখন বলেছিলাম 'এখনও তোমার এতটা সঙ্কোচ সুরমা?

সে ত্রস্তে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলেছিল, আমার দেবতাকে তুমি টেনে ধূলায় নামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তোমার ভালবাসায় আমার মনে যেন গ্লানি না আসতে পায়, আগে তাই হোক্ তারপর, আমি ত'— বলতে বলতে দ্রুতপদে নীচে ঝির কাছে চলে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে তার দর্পিত গতি ভঙ্গীর দিকে চেয়ে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিয়ের দুদিন পরই সে শিশুর মত অসহায় দুটী চোখে কাতরতা ভরে আমায় বললে—'এইবার আমায় বাবার পায়ের গোড়ায়ফেলে রেখে আসবে বল, আমার যে বড্ডই ভয় করছে,' বলতে বলতে বর্ষার আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘের মত তার মুখখানি একটা অজানা ভয়ে কালো হয়ে এল। আমি তার সম্মুখ থেকে পালিয়ে

আসতে আসতে কেবল জবাব দিলাম—'হ্যাঁ এইবারই যাব'। বাইরে এসে মনে হল—মুখে বললুম বটে, যাবো, আমার কিন্তু ততখানি সাহস ত নেই! যদিও গোপনে অনুসন্ধান নিয়ে তাঁর কাশীর বাড়ীর ঠিকানা আমি জানতে পেরেছি, কিন্তু তাঁর আদেশ না পেয়ে কি করেই বা যাই? অনেক ভেবে বহু অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা ভিক্ষা করে তার কাছে একখান চিঠি লিখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, মনে হোল, অপরাধের গুরুত্ব যেন অনেকটা লঘু হয়ে এসেছে। সুরমাকেও সে কথা বললাম। বহুদিন পর তার মুখে একটু যেন নিশ্চিন্ত আনন্দের আভাষ জেগে উঠল। কয়টা দিন কেবল সুখ স্বপ্নের ভেতরেই কেটে গেল। কিন্তু কিছু দিন পর তাঁর উত্তর পেলাম সে চিঠিখানি পেয়ে আমার মনে হোল যেন মাথার ওপর এককালে শত বজ্র গর্জ্জন করে উঠল। সেই কন্যাগত প্রাণা সদানন্দ বৃদ্ধের ভেতর যে এতটা অগ্নিগর্ভ বজ্র লুকিয়ে ছিল তা কে জানত? তাঁর তীক্ষ্ণ জ্বালা ভরা তিরস্কার পেয়ে মনটা বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। আমার সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল।

চিঠিতে ছিল, "তোমাকে কোন কথা লিখতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমার বুকে থেকে, আমার অস্থি মজ্জায় মেশানো, আমার অতি সাধনার, অতি আশার কন্যাকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে আমার দেবীমাকে তুমি কৌশলে স্ত্রীরূপে লাভ করেছ। আমার একান্ত বিশ্বাসের বেশ প্রতিদান দিলে। জানতে না কি যে সেই একটা মাত্র বালিকাকে অবলম্বন করেই এই দুটো শোকজর্জ্জরিত বৃদ্ধের জীবন দীপ জ্বলছিল, তাই এই মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েই দিদি আমার বিশ্বনাথের দয়ায় বুঝিবা অনন্ত শান্তিধামেই চলে গেছেন, আর আমিও ভগ্ন মনে সেই দিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। তোমার চিঠি পাওয়ার পূর্ব্বেই আমি আমার সর্ব্বস্ব বিধবা আশ্রমে দান করেছি। আর আমায় পত্র দিয়ে বিরক্ত করোনা। এখানে আসবার ধৃষ্টতাও করোনা। আমি মনে কর্ব্ব আমার কোনদিন মেয়ে ছিল না।...কিন্তু হেমেন বাবু—আজ তোমার ওপর আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে জ্বলন্ত হৃদয় থেকে কঠিন অভিশাপই বেরিয়ে আসতে চায়, তুমিও যেন একদিন আমার এ দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা কিছুমাত্রও উপলব্ধি করতে পার—আর কিছু নয়—"

অসহ্য ক্ষোভে ও ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলাম। চিঠি খানা লুকিয়ে ফেলা সত্বেও কি করে যেন সুরমা সে খানা পড়লে,—পড়েই বিবর্ণ মুখে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে বসে পড়ল, বহুক্ষণ পরেও যেয়ে দেখি, সে সেইভাবে, কোন নিষ্ঠুর তপস্বীর অভিশাপে পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসে আছে। আমার ক্রুদ্ধ মনটা আর্দ্র হয়ে গেল। কাছে বসে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'এতটা আমি ভাবতে পারিনি সুরমা। যাক্ আজ থেকে আমরা পরস্পরকে নিয়েই সংসারের নতুন পথ চলা সুরু কর্ব্ব কেমন?'

কিন্তু সে কথাটিও বললে না বা এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললে না। জীবনে যে কয়টা দিন বেঁচে ছিল, অতীতের একটা বাণীও আর সে উচ্চারণ করেনি বা কোনদিন কোনরূপ অধৈর্য্যতাও প্রকাশ করেনি, শুধু সেই একটা দিনেই তার মুখের সে বিমল হাসিটুকু জন্মের মতই মিলিয়ে গেল। পিতার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে সে যেন একটা ভীষণ আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তারপর কালের দীর্ঘ সময়ক্ষেপে সবই সহনীয় হয়ে না উঠলেও কথঞ্চিৎ শান্তি সে পেতে চেষ্টা করেছিল। অতীতকে বিস্মৃতির তলায় ডুবিয়ে দিয়ে বর্ত্তমানের ভেতরেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

একদিন নিঃশেষে নিজেকে সে বিলিয়ে দিলে। আমারই ভালোবাসায় এই ক্ষুদ্র সংসারটার ভেতরেই ডুবে রইল যেন। আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি। যে টাকা পুঁজি ছিল, তা ফুরিয়ে এসেছিল, চাকরীও দুর্লভ, চারিদিকে যেন অন্ধকারই দেখলাম। সংসারে যে অর্থই প্রেমিকের একনিষ্ঠ প্রেম, কবির শ্রেষ্ঠ কল্পনা, সে কথার সত্যতা সেই সময় প্রকৃত উপলব্ধি

করেছিলাম। যাকে লাভ কর্ব্বার জন্ত উন্মত্ত হয়ে পৈশাচিক অভিনয় কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হইনি, আজ সেই আয়াস-লব্ধ রত্ন বুকে পেয়ে যেন দুর্ব্বহ মনে হোতে লাগল। তার পিতার বিপুল অর্থ সবটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে, এ চিন্তা যেন অসহ্য। সুরমার নিপুণ গৃহস্থালীতে যদিও অভাবকে তখনও অনুভব করতে পারিনি, তবুও সেই দরিদ্রতা আমার অসহ্য হয়ে উঠল। বৎসর না ঘুরতেই তার রূপ যৌবনের সবটুকু মাধুর্য্য সুঠাম দেহের লালিত্য যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। দিনরাত অভাব ও রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে সে যেন এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জীর্ণ দেহ, জ্যোতিহীন, শুষ্ক, পাণ্ডুর আনন সবই যেন মৃত্যুর বিভীষিকা। সেই সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম বাড়ীতে একটা নতুন অথিতির আসবার সম্ভাবনা হয়েছে। তার অসুস্থতায় অভাব যেন তার বিকট মূর্ত্তি প্রকাশ করেছিল, তাই আমিও বিব্রত হয়ে পড়লাম। সে একটী দিনের জন্তও আমায় বিন্দুমাত্র অনুযোগ দেয়নি। তবুও তার কৃশ দেহখানির দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল। ম্লান মুখে বললাম 'সুরমা, আমারই জন্ত তোমায় কতই না সইতে হচ্ছে? আমায় তুমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারনা নয়?' তার অস্বাভাবিক বড় চোখ দুটী ভাদ্রের কুল প্লাবী তটিনীর মত দুকুল ছেপে উঠল। আঁচলে তা মুছে ফেলে ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না, না, অমন কথা বলোনা, সবই আমারই অদৃষ্ট।'

তারপর একদিন 'ফুল'কে পেলাম। সে যেন অমরা বাঞ্ছিত এক ছড়া পারিজাত মালা। অপটুহস্তে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে শত চুমায় আচ্ছন্ন করেও আমার আশা মিটতনা। সেই একরত্তি মেয়ের হাসি কান্নাতে আমি যে কি স্বর্গীয় সুষমাই দেখতে পেলাম, যা আমায় আত্মহারা করে ফেললে। সুরমারও শীর্ণ মুখখানি মাতৃত্বের গৌরবে মহিমান্বিত হয়ে উঠে একটা অনাবিল তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। সেই সময়ই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে রেলওয়ের ভেতর একটা চাকরী পেলাম। কয়েকদিন পরই ষ্টেসনের কম্পাউণ্ডের ভেতর ছোট বাসা খানিতে উঠে যেতে হয়।

নাম রেখেছিলুম তার 'ফুল'। সেই যেন আমার এই সৌভাগ্যের কারণ। 'ফুল' এ নিরানন্দ গৃহে হর্ষের দেউটী জালিয়ে দিলে। তাকে বুকে চেপে ধরে তার অমিয় পরশ অনুভব কর্ব্বার সঙ্গে ভাবতাম, গত বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ দিন গুলির কথা। অধীর হয়ে সময় সময় ভাবতাম 'হায়রে! স্বর্গের ধন তুমি, কি দিয়ে তোমায় এ কুটীরে বেঁধে রাখি বল? তাকে হারাব বলেই না সে অমন করে মন কেড়ে নিয়েছিল! সুরমা কিন্তু আমার মত এত আত্মহারা হয়নি। তার স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই গোপনেই বয়ে যেত। কচিৎ দেখতে পেতাম, মেয়েকে কোলে নিয়ে তার মুখে একটা যন্ত্রনাময় বেদনার কালো ছায়া ফুটেউঠেছে, তাকে বুকে চেপে ধরে অজস্র ধারায় কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কাছে যেতে সাহস হয়নাই। বুঝতে পারি এ আনন্দেও পিতার স্মৃতি মর্ম্মের ভেতর থেকে বৃশ্চিক দংশনে তাকে জর্জ্জরিত করে তোলে। যাক্ তবুও বৎসর খানেক একটা পরিপূর্ণ শান্তির ভেতর কেটে যাবার পর একদিন সহসা বিধাতার বড় কঠিন আঘাতেই যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে আর্ত্তস্বরে হাহাকার করে উঠলাম। আমাদের এই সৌভাগ্য, অভিশাপ গ্রস্ত দুটী নর নারীর এমন সুখ বুঝি তাঁর সহ্য হোলনা, তিনি তাঁর পূজার ফুল সাগ্রহে নিয়ে গেলেন। শুধু তাঁর ক্রূর ক্রীড়া-ক্রীড়নক অমরা যন্ত্রনায় চীৎকার করে উঠলাম। সেই একফোঁটা রক্ত মাংসের ডেলা স্নেহের পুতুল নিয়ে সংসারের খেলাঘরটাতে বড় আশাতেই খেলতে বসে ছিলাম, কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর। তুমি তা তোমার নিষ্ঠুর চরণাঘাতে ভেঙ্গে ফেলে অট্টহাস্তে চলে গেলে! বিশ্বের যাবতীয় প্রাণগুলি নিয়ে আবহমান কাল থেকে তুমি যে এই খেলাই খেলছ! কিন্তু তোমার এই আঘাত

সহ্যকর্বার ক্ষমতা দাওনি কেন? আমি যেন উন্মাদ হয়ে পড়লাম। সুরমা নিজে প্রাণ পণে আত্মসংবরণ করে আমায় সান্ত্বনা দিত। যে চির সহিষ্ণু; অল্পভাষী, সংযতমনা, ধরিত্রীর মতই সর্ব্বংসহা, তার অন্তরের বিপ্লব বাইরের কজনেই বা বুঝতে পারে? কিন্তু সেই যত্নে পাষাণ চাপান গুপ্ত বেদনা, তিলে তিলে তাকে তুষানলে পুড়িয়ে মরণের কোলে ঠেলে দিয়েছিল। শুধু অনন্ত যন্ত্রনা ভোগ কর্ব্বার জন্ত আমিই পড়ে আছি! তখনও কিন্তু একবারও মনে হয়নি সেই কন্তাহারা বৃদ্ধের অভিশাপ কত বড় নিষ্ঠুরতা! হায়রে! যাক্ তারপর আবারও কাজে ভর্ত্তি হোলামবটে, কিন্তু গৃহের সে আকর্ষণ আর আমার রইল না। বাইরেই বেশীর ভাগ কাটাতে লাগলাম। তার পর ক্রমে ক্রমে অন্তরের দুর্ব্বিসহ জ্বালা জুড়াবার জন্ত বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে মদও ধরে বসি। সুরমা টের পেলে কিনা জানিনা কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভব করতাম, যেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ব্যবধান প্রাচীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, একটা বিরাট ঔদাসীন্ত তার দেহমনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় নাই।

সেবার বোধহয় নেশার বিহ্বলতায় উপরি উপরি তিন চার দিন বাসায় আসতে পারিনাই। শেষের দিন জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে বাসায় ছুটলাম। ঝি এসে দরজা খুলে দিয়েই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—'একি আক্কেল গা বাবু! এই রুগীকে আমি কদিন বসে পাহারা দেব?' বিস্মিত হয়ে ধমক দিয়ে বললাম—'চেঁচিওনা। কার অসুখ?' সে স্বর নীচু করে বললে—'কেন বৌমার! কদিন উপোসের পরও কাল বাড়ী আসবে ভেবে রান্না কচ্ছিল, সেই সময় দুর্ব্বল শরীরে ভিরমি দিয়ে পড়ে গেছে। তারপরই জ্বর, অচৈতন্ত। আমি একলা রুগীকে নিয়ে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি—'অপ্রসন্ন মুখে সে চলে গেল। নিজের ওপরকার অত্যাচারের ফলে মাথায় আগুন জ্বলছিল, তবুও ক্রতপদে ঘরে গিয়ে [illegible]। দেখলাম, ছিন্ন লতার মত সুরমা শয্যায় লুটিয়ে আছে। কষ্টে আত্মসংবরণ করে তার কাছে গিয়ে বসে, ঝিকে ডাক্তারের কাছে পাঠালাম। সুরমা একবার যন্ত্রনায় ছটফট করে আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'মাগো ওঃ'

'সুরমা সুরমা—' আমার শত ব্যাকুল আহ্বানেও সে সাড়া দিলে না। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে বলে গেলেন—'অবস্থা খারাপ। সাবধানে থাকতে হবে।' ওষুধ লিখে দিলেন। কিন্তু সে ওষুধটুকু খাওয়াবার সামর্থ্যও আর আমার ছিলনা। দুপুর রাত্রিতে সে বোধকরি ওষুধের গুণেই একবার তাকালো। আমার চোখে তখন শ্রাবণেই ধারা নেমেছে। আমার কম্পিত ওষ্ঠ তার শ্বেত ললাটে স্পর্শ পড়তেই, ঐ মৃত্যুপথ যাত্রিটীর বিবর্ণ ওষ্ঠ দুখানিতে বড় মধুর হাসিই ফুটে উঠল, 'তুমি এসেছো? বাঁচলাম, এইবার নিশ্চিন্তহয়ে যেতে পার্ব্ব।' আমি ব্যাকুল হয়ে তার শয্যালীন দেহখানি জড়িয়ে ধরে বললাম—'সুরমা—আমার একটীবারের ভুলের মার্জ্জনা না করে প্রায়শ্চিত্তের অবসর না দিয়েই এমনি শাস্তি দিলে? আমায় সর্ব্বহারা করে চলে গেলে দুই জনেই? আমি কি নিয়ে বাঁচব বল?

'সে শ্লথ হাতখানি আমার কোলে রাখলে। নিমীলিত নেত্রহতে তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ছিল। বহু কষ্টে ধীরে বললে—'কেঁদোনা, খুকুর কাছে যাচ্চি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকব আশীর্ব্বাদ করো; যেন পর জন্মে আর এমন করে গুরুজনের অভিশাপ মাথায় নিয়ে তোমায় পেয়ে আর না হারাতে হয়।'

শেষ রাত্রিতেই সে চলে গেল—

তারপর কত যুগ অতীত হয়ে গেছে, তার হিসাবও রাখিনি। সেই রূপের জৌলস, কিন্নর কণ্ঠ, উৎসাহময় তরুণ জীবন, ভোগ লালসা, জানিনা তারা আজ কোথায়? শুধু জানি গ্লানিময় জীবনের জ্বালাভরা স্মৃতি আর তুষানলে অহর্নিশি দহন।

এতেও শেষ হবে কিনা কে জানে!

উদাসিনী নিশি কাঁদে—

—শ্রীঅরিন্দম বসু

কামনার পলিতায় রূপের প্রদীপ জ্বেলে প্রথম তোমারে আমি হেরেছিনু যবে—
যৌবন মদির গন্ধে বসন্ত চুম্বনরত আনম্র আনন,
নীলাম্বরে আবরিত কোমল কিংশুক কান্তি তনুর ব্রততী,
—বাসনার স্বপ্নলোকে সেইদিন,
সঙ্গোপনে রচিয়াছি তোমার পরশ-তৃষ্ণ মাধবী বাসর।

তারপর প্রতিদিন—
প্রভাতে সন্ধ্যায় বিনিদ্র নিশীথে কত—
রক্তরাগ আঁখি দুটি মোর,
অকারণ প্রতীক্ষায় রূপে রসে করিয়াছে ধ্যান মুহূর্ত্তের রভস লালসা।
হেরি মোর চারিদিকে তৃপ্তিহীন প্রমত্ত লীলায় মগ্ন শত মুগ্ধ নরনারী—
অসহ শিহর সুখে এলায়িত তনু।
—প্রিয় পাশে নাই,
বিরহ-বিলাপী কেহ তামসী ধরণীতলে বিছায়েছে কণ্টক শয়ন,
উদাসিনী নিশি কাঁদে রুদ্ধ বেদনায়—
যৌবন জর্জ্জর তনু আকুল আবেগে শুধু ওঠে বিমথিয়া।
সুখসুপ্তা কুমারীর স্বপ্নের কামনা তটে অলখিতে দেখা দেয় মিলনের সলজ্জ আভাষ
নিমেষে চমকি' ওঠে;
শিথিল কবরী দিয়া স্বেদসিক্ত লজ্জারুণ স্মিত মুখখানি,
মুছে ফেলে অনাহূত অসীম বিস্ময়ে।
—নিস্তব্ধ তামসী নিশি নির্লজ্জ ধরণীতলে কাঁদে গুমরিয়া।

নয়ন আচ্ছন্ন করি নিদ্রা যবে নেমে আসে ধীরে—
সহসা চমকি' জাগি;
রুদ্ধকণ্ঠে ফোটে সুর—'আসিলেনা ওগো প্রিয়া—আসিলে না তুমি!'

নিশান্তের নিদ্রাহারা অলস শয়নে মোর,
মিলন ব্যাকুল তব বিস্মৃত স্বপন—
মরীচিকা বহ্নি মোহে প্রতি অঙ্গ দ'লে যায় কাম-দগ্ধ বেদনার দুঃসহ দহনে॥

মধুরেণ সমাপয়েৎ—

—শ্রীপ্রণব রায়

পাড়া-গাঁ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রমেন যখন সহরের কলেজে পড়িতে আসিল, তখন পথে পথে ট্রাম-মোটরের ভিড়, হরেক-রকমের সৌখীন-জিনিষ সাজানো বিপনি-শ্রেণী ও সিনেমা থিয়েটারের রঙ-চঙে বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার তাক্ লাগিয়া গ্যালো।

কিন্তু কিছুদিন পরে কোনোই নূতনত্ব রহিল না।

ক্রমে রমেনের পাড়াগেঁয়ে চাল-চলন, হাব-ভাব, বেশ ভূষা পুরা-দস্তুর সহুরে ঢঙে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। সে সিগারেট টানিতে শিখিল, বায়স্কোপের নেশা ধরিল, আর 'শতদল সাহিত্য সিরিজের'—রাশি রাশি সস্তা নভেল পড়িতে সুরু করিল। মজাদারী প্রেমের কাহিনী পড়িতে পড়িতে মদির আমেজে মন তাহার একেবারে মস্‌গুল হইয়া উঠিল।

মধু-পিয়াসী ভ্রমর যেমন নিশিদিন সুরভি কুসুমের সন্ধানে উড়িয়া বেড়ায়, তেম্‌নি রমেনেরও তরুণ হৃদয় সারাক্ষণ মধুর রোম্যান্সের সন্ধানে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। পথ দিয়া মেয়ে-ইস্কুলের 'বাস্' যাইতে দেখিলে, সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া প্রসাধন-উজ্জ্বল মুখখানি মুছিতে থাকে। বাতায়নের ফাঁকে কোন সুন্দর মুখ দেখিলে, অম্‌নি চকিত চোখে বিলোল কটাক্ষ হানে। ট্রামে কোনো তরুণী উঠিলে, আশে-পাশে বসিবার যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া 'মহিলার সম্মান' আগে রাখে। অবশ্য, তাহার এই অযাচিত পরোপকারের পুরস্কার স্বরূপ কৃতজ্ঞতার নীরব চাহনি তাহার ভাগ্যে কদাচিৎ জুটিলেও, অধিকাংশ দিনই জোটে বিরক্তির ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমা।

এম্‌নি করিয়া, পথে-দেখা কত অপরিচিতা সুন্দরী রমেনের কোমল হৃদয়কে নয়ন-শরে জর্জ্জরিত করিয়াছে, তাহা গুনিয়া ওঠা যায় না।

প্রেমে পড়া যেন পিছল্-পথে আছাড় খাওয়ার মতোই সহজ হইয়া আসিয়াছে।

সেদিন নিরালা দুপুর বেলায় পাশের বাড়ীতে অমুকে অতর্কিত ভাবে দেখার পর হইতেই, রমেনের হৃদ্-যন্ত্রটা সহসা বিকল হইয়া গ্যালো। পঞ্চশরের অশোক-কুসুমে গড়া প্রথম-শরটি বেচারীর বুকের ঠিক মাঝখানেই বিঁধিল।

দুপুর বেলা—

কর্ম্ম-ক্লান্ত পাড়াটা অবসাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দম্‌কা বসন্ত-বাতাস আসিয়া নিম-গাছের কচি কিশলয়-গুচ্ছকে দোলাইয়া যাইতেছে। সেই মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনিটুকু চৈত্রী দুপুরের নিস্তব্ধ বুকে প্রাণের অস্ফুট সাড়া জাগাইতেছে।

হোষ্টেল প্রায় ফাঁকা।

কয়েকজন ছাড়া সকল ছাত্রই কলেজে গিয়াছে। কেবল সুরেশ, অনিল ও পরিমল—এই তিনটি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তে-তলার একটি ঘরে আসন্ন পরীক্ষার পড়ায় ব্যাপৃত।

দো-তলার একটি নিভৃত ঘরে রমেন একলাটি চুপ করিয়া শুইয়া আছে। পাশে একখানা খোলা-নভেল। মুখ তাহার শুষ্ক, চুলগুলি রুক্ষ। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সে। সর্দ্দি কাসির দরুণ সামান্য জ্বর-ভাব হওয়ায় আজ সে কলেজে যায় নাই।

কিন্তু এই কর্ম্ম-বিহীন দুপুর বেলাটি বড় এক ঘেয়ে।

আসন্ন পরীক্ষার তাড়াও নাই, গল্প গুজব করিবার কোনো সঙ্গীও নাই। কাজেই একখানা নভেল যোগাড় করিয়া, সে সময় কাটাইবার মৎলব স্থির করিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটা পরিচ্ছেদ পড়িবার পর আর আগ্রহ রহিল না—

খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর রমেন আস্তে আস্তে উঠিল। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, ঘরের কোনে কুঁজো হইতে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল গড়াইয়া লইল। তারপর খানিকটা পান করিয়া বাকীটা বাহিরে ফেলিয়া দিবার জন্ম জানলার ধারে যাইতেই সহসা সে মুগ্ধ বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল—

তাহাদের হোষ্টেল ও পাশের বাড়ীর মধ্যে একটি শীর্ণ গলি মাত্র তফাৎ। বাড়ীর জানলা খোলা থাকিলে, রমেনের ঘর হইতে সবই স্পষ্ট দেখা যায়। এমন কি, কথা-বার্ত্তাও শোনা যায়।

রমেন দেখিল, সুমুখের ঘরে শীতলপাটি বিছাইয়া একটি সুন্দরী মেয়ে বসিয়া, একমনে সেলাই করিতেছে। পরণে লালপাড় সাদা শাড়ী, গায়ে সাদা সেমিজ। পিঠের ওপর স্নান-সিক্ত এলোচুল—নব বর্ষার মেঘ-স্তূপের মতোই নিবিড়। সীমন্তে এয়োতির ক্ষীণ রক্ত-রেখা।

সাদাসিধা সাজ, অথচ কী মাধুরী-মণ্ডিত!

নব-স্ফুট যৌবন-সোহাগে তাহার তনুখানি লাবণ্য-ললিত—যেন পল্লী পুকুরের পাশের চিক্কণ-শ্যাম কল্মী লতাটি।

মুখখানি অতি মনোরম—

দেখিলে, পটু-পটুয়ার আঁকা চিত্র-লেখা বোধ হয়।

ওই হঠাৎ-দেখা অপরিচিতাকে রমেনের ভারি ভালো লাগিল। শাড়ীর লাল-পাড়ের তলায় মেয়েটির সুগঠিত দু'খানি পা'কে তাহার মুগ্ধ-হৃদয় পদ্মাসন হইয়া অভ্যর্থনা করিল। অবাক্ হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, কই এর আগে কোনোদিনও সে ওই মেয়েটিকে দেখিতে পায় নাই তো?

কি করিয়াই বা দেখিবে?

রোজ দুপুরে সেযে কলেজে চলিয়া যায়—

গলির মোড়ে ফিরি-ওয়ালার হাঁক শোনা গ্যালো, চুড়ি চাই—ই, খেল্না চাই—ই।

এম্নি সময় সেই ঘরে আর একজন তরুণী বধূ প্রবেশ করিল। কোলে শশী-লেখার মতো ফুটফুটে একটি খুকী।

তরুণী সীবণ-রতা মেয়েটিকে শুধাইল, চুড়ি পরবি অনু?

অনু সেলাই ফেলিয়া, হাসিয়া বলিল, পরব দিদি। ডাক না—

খুকী কচি কচি শুভ্র হাত দু'খানি ঘুরাইয়া, আধো আধো সুরে বলিয়া উঠিল, আমিও চুলি পল্‌ব মাচি—

রমেন একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

—হায়রে, সে যদি আজ চুড়িওয়ালা হইত!

অনুর ওই কোমল কমনীয় দু'খানি হাত······

চুড়িওয়ালার প্রতি তাহার হিংসা হইল।

চুড়ি-ওয়ালাকে ডাকিবার জন্ম অনু জানলার ধারে আসিতেই, রমেনের সহিত তাহার চোখাচোখী ঘটিয়া গ্যালো। পর ক্ষণেই লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া ছুট্—

এত লাজুক্!

মৃদু হাসিয়া, রমেন সরিয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা রোমান্সের সন্ধান পাইয়া মনটা ওর উৎফুল্ল। চৈত্রের অলস অবসরটুকুও এখন যেন কতো মধুর!

রমেন হৃদ্-রোগে আক্রান্ত!

অর্থাৎ—মীন-কেতনের কুসুম-শরের ক্ষত বেচারীর হৃদয়ে ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

সেদিন হইতে প্রায় রোজই দুপুরে রমেনের মাথা ধরে; এবং Proxyর ব্যবস্থা করিয়া সে কলেজ হইতে হোষ্টেলে ফিরিয়া আসে। তারপর একখানা পাঠ্য পুঁথি সুমুখে খুলিয়া ঠায় বসিয়া থাকে।

—যেন ধ্যান-মৌন ভক্ত!

অবাধ্য আঁখি-আসামীও শাসনের বাহিরে। ফাঁক পাইলেই পুঁথির কারাগার হইতে পলাইয়া, পাশের বাড়ীর পানে ফেরার হয়।

অম্বু কোনদিন হয়তো সেলাই করে, কিম্বা আলস্য-শিথিল ভঙ্গিমায় শুইয়া নভেল পড়ে, অথবা ঘরের খুঁটি-নাটি কাজ করে। রমেনকে দেখিলেই, চকিতা বন-হরিনীর মতো ছুটিয়া পালায়।

একে বাঙালী-ঘরের বউ, তা'য় নব-যৌবনা!

অবগুণ্ঠিতা অম্বুকে দেখিয়া, একটি বিস্মৃত-প্রায় ঘটনা রমেনের মনে প'ড়ে।

গত বছরের কথা—

বিবাহ রমেনের হইয়াছিল, কিন্তু বউকে সে পায় নাই। গোলযোগ বাধিল বিবাহের রাত্রেই। রমেনের পিতা কড়া-মেজাজের রাশভারি হাকিম। দেনা পাওনা উপলক্ষ্য করিয়া, কন্যার পিতার সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; এবং সেই বিসম্বাদের অশুভ ছায়াপাতে শুভ-উৎসবের মঙ্গল দীপালোক ম্লান হইয়া ওঠে।

ফলে, শ্বশুরালয়ে বধূর 'প্রবেশ নিষেধ'!

রমেনের পরিণয় হইল, কিন্তু পরিণীতাকে সে পাইল না। অসমাপ্ত-বাসরের মধু-স্মৃতিটুকু তাহার পিয়াসী প্রাণে চিরন্তন কামনা-শিখা জ্বালাইয়া রাখিল। অম্বুকে দেখিলে, তাই অমনিই আর একখানি বধূ-মুখ তাহার মানস-বাতায়নে উঁকি দ্যায়—কতক চোখে দ্যাখা কতক কল্পনায় গড়া অপরূপ সে মুখখানি—ললাটে শ্বেত-চন্দন-লেখা, নির্ভরশীল আয়ত আঁখিতে সলজ্জ চাহনি, রক্তাধর-তটে স্মিত হাসি—

অম্বু অন্তঃপুরিকা—পর-স্ত্রী। তাহার প্রতি রমেনের এই অকারণ ভালো'লাগা—এই গোপন মোহ লোকের চোখে হয় তো পাপ।

কিন্তু রমেনের তরুণ মন বলে, না—

পরের কুঞ্জে কুসুম দেখিয়া, কাহার না ভালো লাগে? ক্ষতি কি? ভালো-লাগা পাপ নয়।

হোষ্টেলের যে ঘরে রমেনের পাত্তাই পাওয়া যাইত না, সে ঘর আজকাল যেন তাহার তপস্যা-মন্দির!

সারা প্রহর শুধু খোলা পুঁথি হাতে জান্‌লার সুমুখে বসিয়া থাকে—

যেন নেশা!

তবে পুঁথির অতি পরিচিত আখরগুলি তাহার নিকট যে চীনা ভাষার মতেই দুর্বোধ্য ঠেকে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কখনো বা পুঁথির পাতায় ফুটিয়া ওঠে—কমল-কোমল একখানি মুখ!

মুখখানি অম্বুর।

বেলা পড়িয়া আসে। সন্ধ্যা-ছায়া ঘনায়। বন্ধু বান্ধবেরা বিকালে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহাকেও সঙ্গী হইবার জন্য ডাকিতে আসে। গম্ভীর মুখে রমেন জানায়, যে যাইবার অবসর তাহার আদৌ নাই। এই অধ্যায়টা তাহাকে আজ শেষ করিতেই হইবে—

বন্ধুরা রীতিমত অবাক্।

ভাবে, রমেন অকস্মাৎ এত 'ভালো ছেলে' হইয়া পড়িল কিরূপে? অথচ, প্রোফেসরের চোখে ধুলো দিয়া ক্লাস হইতে চম্পট দিতে, Proxyর বন্দোবস্ত করিয়া চায়ের দোকানে আড্ডা মারিতে—ক্লাসে তাহার জুড়ি মিলিত না!

ক্রমে রমেনের আহারে রুচি রহিল না, রাত্রিতে সুপ্তি দূর হইল, নিঃসঙ্গ অবসরে তাহার কেবলই দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল।

শোচনীয় অবস্থা!

শিশির সেদিন রমেনের ইকনমিক্স্ এর নোট-খাতার পাতা উল্টাইয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল ইউরেকা! ইউরেকা!

তাহার উল্লাস-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া, আরো কয়েকটি সহপাঠী আসিয়া জুটিল।

আবিস্কৃত বস্তু আর কিছুই নয়—

একটি অসমাপ্ত কবিতা!

চকোর যেমন চন্দ্রের তরে
সারা নিশি রহে জাগি;

তেমনি, মুক্ত বাতায়ন পানে,
না-জানি সে কোন্ পরাণের টানে
অপরিচিতা গো! চেয়ে থাকি আমি
তব মুখ-শশী লাগি'।
আলেয়ার মতো ক্ষণিকা তুমি গো—

সম্ভবতঃ, এই পর্য্যন্ত আসিয়াই কাব্যের খেই হারাইয়া গ্যাছে।

পড়া শেষ হইতেই, ঘরে হাসির তুবড়ি ফাটিল। 'বটে, রমেনের পেটে পেটে এতো—' 'আহা, হতাশ প্রেমিক' 'ব্যথা—ব্যথা' ইত্যাদি নানারূপ বিদ্রূপ-বানে রমেন বেচারী জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

শিশির কিন্তু নাছোড়বান্দা।

শুধায়, বল্ না ভাই, তোর সেই অপরিচিতাটি কে!

শিশির রমেনের শুধু সহপাঠী নয়— অন্তরঙ্গ সখাও।

বিব্রত হইয়া, রমেন অবশেষে তাহার 'গোপন কথাটি' খুলিয়া বলিল। বলিল, তাহার 'অপরিচিতা' পাশের বাড়ীরই অন্তঃপুরচারিণী একটি কিশোরী বধূ। নামটিও বেশ মিষ্টি—অনু।

শুনিয়া, শিশিরের ওষ্ঠ প্রান্তে রহস্যময় একটু চাপা হাসি বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো খেলিয়া গ্যালো—রমেনের অলক্ষ্যেই।

দিন যায়—

পরিবর্ত্তনও চোখে পড়ে।

আগে রমেনকে দেখিলে, অনু লজ্জা-ত্রস্ত পায়ে অন্তর্হিতা হইত। আজকাল কিন্তু পালায় না। ললাটের ওপর অবধি অবগুণ্ঠন টানিয়া ষায়।

কুণ্ঠার আড়াল যেন অতি সংসাই খসিয়া গ্যাছে।

শুধু তাই নয়—

অনুরও চটুল চোখদুটি ফাঁকে পাইলেই চুরী করে। মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভা অনু রাঙা হইয়া ওঠে।

রমেন ভাবে, সুলক্ষণ!

চকোরের পিয়াসা একদিন মেটে—অপ্রত্যাশিত ভাবেই। আকাশের সুদূরিকা শশী আপনিই আসিয়া ধরা দ্যায়।

নিত্যকারের মতো সেদিনও রমেন জান্‌লার পাশে বসিয়া Political Scienceএর পৃষ্ঠায় স্নিগ্ধ-কান্তি একটি কিশোরী-মুখ দেখিতেছে। এমন সময়, আস্‌মানী রঙের একটুক্‌রো কাগজ বাণ-বিদ্ধ বিহগের মতোই তাহার কোলের ওপর লুটাইয়া পড়িল।

……চিঠি!

মুখ তুলিয়া চাহিতেই পাশের বাড়ীর জান্‌লার পাশ হইতে অপস্রিয়মান অঞ্চল প্রান্ত চোখে পড়িল।

বিস্ময়-আনন্দ-কম্পিত হাতে রমেন চিঠিখানি খুলিল।—সবে ফোটা হাস্নাহেনার মৃদু সুবাসে ভরপুর! যেন অনুরই সুবাসিত অঞ্চলের সোহাগ স্পর্শ—তেমনি মদির, তেম্‌নি মধুর!

মেয়েলি আখরে লেখা—

'কাল—সন্ধ্যা সাতটা। পুবদিকের দরজায় এসো। প্রতীক্ষায় থাক্‌ব।'

'অ'

ছোট্ট কয়টি কথা!

কিন্তু রমেনের কাছে ওই ছোট্ট কথা-কয়টি যেন নন্দনের আনন্দ সম্ভার বহন করিয়া আনিল। রমেন চিঠিখানি দু'বার পড়িল—পাঁচবার পড়িল—দশবার পড়িল—

সন্ধ্যা সাতটা।

পুবদিকের নির্জ্জন দ্বারে রমেন উপস্থিত।

বুকে—উদ্বেলিত উদ্বেগ।

চোখে—আকুল অপেক্ষা।

এক একটি পল-বিপল যেন অনন্ত যুগ!

হাত-ঘড়ির পানে রমেন চাহিয়া দেখিল—সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট! অভিসারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবু অভিসারিকার দেখা নাই!

কী দুঃসহ এই প্রতীক্ষা!

মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাসে নিমের শাখার পত্র পুঞ্জ মর্ম্মরিয়া ওঠে। অধীর রমেন অম্‌নি চকিত চোখে চাহিয়া ছাখে—ওই বুঝি অভিসারিকার মৃদু পদশব্দ!

······বৃথা!

অকস্মাৎ—

—আরে, রমেন যে! কি মনে কোরে এখানে!

চাহিয়া ছাখে—হাস্য-মুখ শিশির!

রমেনকে কেহ হিমালয়ের শিখর হইতে খামোকা ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেও, সে বোধহয় এতটা চম্‌কাইয়া উঠিত না।

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যে জবাব দিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

শিশির দুষ্টুমির হাসি চাপিয়া বলিল, তোকে কিন্তু আজ চা না খাইয়ে ছাড়্‌চিনে—তুই বোধহয় জানিস্‌নে, এটা আমার মাসির বাড়ী। এঁরা দেশথেকে সম্প্রতি কল্‌কাতায় এসেচেন। আয়, ভেতরে বস্‌বি চল্‌—

রমেন হয় তো তখন মনে মনে মিনতি করিতেছিল মা বসুমতী দ্বিধা হও!

তাহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, শিশির চায়ের যোগাড়ে ভেতরে চলিয়া গেল। অল্পকাল পরেই খুকী কোলে একটি তরুণী সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ করিল। রমেন চিনিল—সে অনুর দিদি।

অনুর দিদি তাহাকে দেখিয়াই বিস্মোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওমা, কি ভাগ্যি! এতদিন পরে অনিতাকে মনে পড়ল নাকি রমেন?

অনিতা!······তাহার সেই বিবাহিতা প্রত্যাখ্যাতা বউ কি এই অনু! রমেন আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল।

দিদি ডাকিল, কই রে অনু, চা নিয়ে আয়।

এক হাতে চায়ের কাপ্‌, অপর হাতে মিষ্টান্নের প্লেট্‌ লইয়া অবগুণ্ঠনা অনিতা লজ্জা জড়িত পায়ে ঘরে আসিল।

বিস্ময় বিমূঢ় রমেন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল।······স্বপ্ন, না সত্য?

—নাও ভাই তোমার অভিসারিকাকে। বলিয়া, দিদি ত্বরিৎ গতিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। শিকল টানার শব্দ হইল—ঝনাৎ।

ঢোঁক গিলিয়া রমেন শুধাইল, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারচি না অনু—

মৃদুকণ্ঠে নতমুখী অনিতা বলিল, সবই শিশিরদার আর দিদির ষড়যন্ত্র। আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে—

ব্যাপারটা দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ হইয়া আসিল। শিশিরেরা রমেনকে আগেই চিনিয়াছিল, রমেন কিন্তু আদৌ চিনিতে পারে নাই।—রমেনের হাসি পাইল। নিজের স্ত্রীর সহিত পরকীয়া প্রেম—অভিনব রোম্যান্স বটে—।

—চা টা যে জুড়িয়ে যাচ্চে।

রমেন চাহিয়া দেখিল, স্বল্পাবগুণ্ঠনের ফাঁকে অনুর অধরতটে কৌতুক হাসি ঝিক্‌ মিক্‌ করিতেছে।

চুলোয় যাক্‌ চা—

তারপর—?

চপল চোখের কুটিল কটাক্ষ—

আর, অরুণ অধরের মধুর মদিরা—

চাতুরী

(Thomas Hardy's Arch deceiver হইতে)

শ্রীঅরিন্দম বসু

আপার লংপাডল্ পল্লীর বৃদ্ধ মিঃ কীট্‌স্ চাষ আবাদ করতো—অবস্থা অসচ্ছল নয় মোটেই। তার তেইশ বৎসরের ছেলেটির নাম টনি কীট্‌স্। ট্যাপাটোপা ছোট্ট সুদৃঢ় মুখ—বসন্তের ক্ষত চিহ্নে এককালে হয়তো বাঁদরের মতই দেখাত। আজ পরিণত যৌবনে তার অস্পষ্ট আভাষটুকু শুধু আছে। ষোড়শী মেয়েদের রূপতৃষ্ণ চোখে একটুও তা' বিতৃষ্ণা জাগায়না।

তীক্ষ্ণ, স্থির দৃষ্টি—তারই অন্তরালে স্ফূর্তির উৎসটি রুদ্ধ বলে মনে হয়। তার ক্ষুদ্র দুটি ঠোঁটের হাসি যেন কত দুর্লভ—অনুভূতির তীব্র চেতনা ছাড়া সে হয়তো হাসতে জানেনা। বাইরের রূপটি তার এন্‌নিই…

কিন্তু আশ্চর্য্য তার কাথা বার্ত্তার ধরণ—মুহূর্ত্তের পরিচয়েই চিরকাল মনে রাখা চলে।

একটা বহুদিনের অভ্যাস দাঁড়িয়েছিল। মুখে যেন গান লেগেই আছে—

'O the petticoats went off, and the breeches they went on !'

এই ধরণের গান গুলি যেন তার শিব মন্ত্র। সুকণ্ঠের খ্যাতি অবশ্য ছিল কিন্তু সুরের সঙ্গে নাকি একেবারে নিঃসম্পর্কিত।

তাতে কিছুই এসে যায়না। গ্রামের তন্বী মেয়েদের কাছে সে একটি আদরের বস্তু। নিজেও সে অনুদার নয়—তাদের আদরের প্রতিদানে কোনদিনই নির্ব্বিকার হয়ে বসে থাকেনি, সকলকেই সম-দৃষ্টিতে ভালোবেসেছিল।

তখন প্রথম যৌবন।

একদিন কিন্তু টনির মনের টান সংযত হয়ে বিশেষ একটি মেয়ের দিকে ন্যস্ত হয়।

হাল্কা ছিপছিপে সুগৌর চেহারা—যৌবনের নবনীত দেহ প্রদীপে যেন আগুনের শিখা একটি। রাঙা আপেলের মত দুটি গালের আভা—এক জোড়া চারুচোখের চপল চাউনিতে যেন উন্মুখ ভালোবাসার হাতছানি।

মেয়েটির নাম মিলি রিচার্ডস্—চকোলেটের স্বাদের মতই মিষ্টি, সকলসময়েই মুখে লেগে থাকতে চায়—যেন ওতে কত মধু, কত মোহ !

পড়শীরা বলাবলি করতো ওরা বাকদত্ত—কথাটা নাকি মিথ্যা একটুও নয়।

সেদিন শনিবার। গীর্জ্জার ঘড়ীতে তিনটে বেজে গেছে।

আবাদ ভাল হয়নি বলে সঞ্চিত শস্য এর মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে ছিল। বৃদ্ধ কীট্‌স্ ডেকে বল্লেন, কিছু শস্য কিনে না আনলে নাকি চলছেনা আর। গাড়ী তৈরী ছিল, টনি তখনই সহরে রওনা হয়ে যায়।

ফেরবার পথে ছোট ধূসর পাহাড়টার অন্তরালে পশ্চিম যাত্রী সূর্য্য অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল—তারই ধার দিয়ে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ।

টনি আপন মনে গান গেয়ে চলছে—The tailor's breeches—'

মুগ্ধ অশ্বটিও ঢিমে তেতালায় পদনিক্ষেপ করছে। তার মনেও হয়তো প্রভুপুত্রের সুকণ্ঠ নিঃসৃত সুর-আবেশ।

পাহাড়ের চূড়ায় রঙিণ পতাকার মতই একটা দৃশ্য।

হঠাৎ নজর পড়তেই টনি তার মুগ্ধ শ্রোতার শাসন-রজ্জুটি আকর্ষণ করে বলে উঠ্‌লে—'এই নির্ব্বোধ জন্তু—দাঁড়া দেখি।'

আশ্চর্য্য, ইউনিটি সাল্লেট;—রূপসী তন্বী তরুণী একটি। এই কুমারীটির ইতিহাস, সেও টনির পূর্ব্ব-প্রিয়তমা একজন!

ডেকে বল্লে, 'টমি, তোমার গাড়ীতে আমায় নিয়ে চলনা,—বাড়ী অব্‌ধি পৌঁছে দেবে—দেবে না?'

'নিশ্চয় ইউনিটি, তুমি মোটেও মনে করো না, আমি তোমাকে কখনো প্রত্যাখ্যান করতে পারি, কখ্‌খনো না।'

মেয়েটির পাতলা ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি হাসি যেন উপ্‌চে পড়ে। লাফিয়ে টনির পাশটিতে উঠে, ভালো করে বসে বল্লে, 'বেশ চলো—'

মুহূর্ত্ত খানিক নীরবে কেটে গেল। তারপর ইউনিটিই প্রথমে সুরু করলে। ওর কথায় যেন মৃদু তিরস্কারের আভাস। জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা টনি, ওর জন্যই কি তুমি আমায় ত্যাগ করলে? কিসে আমার চেয়ে সে ভালো? তোমার চোখে আমি খুব ভালো স্ত্রী-ই হতে পারতুম, ভালোবাসার জিনিসও হতাম হয়তো। এত সহজে দুদিনেই যাকে জয় করেছো, সে-ই যে সব চেয়ে খাঁটি হবে, কি করে তা' জানলে? ভেবে ছাখো, কতদিন আমরা পরস্পরকে জেনে আসচি, খুবই ছেলে বেলা থেকে, আর আজও তার শেষ হয় নি—তা' নয় টনি?'

কথাটা যেন কত বড় সত্য, এমনি সুরেই টনি জবাব দিলে, 'সে তো নিশ্চয়ই ইউনিটি, সেই থেকে আজও আমরা তেমনিই আছি।'

'আমার ভেতর দোষের কিছু কোনদিন দেখেছো টনি? আজ সত্যি কথাই তোমার মুখে আমি শুনতে চাই।'

'দিব্যি করে বলতে পারি, কোনদিনই তা' দেখিনি।'

'তবে কি তুমি বলতে চাও আমি সুন্দরী নই! আমার পানে একটি বার চেয়ে ছাখো তো?'

টনি সুবোধ ছেলের মত তখনই তার মুখের পানে চাইলে,—অনেকক্ষণ চোখের পলকও তার পড়লো না।

তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, 'না, আমি তা কক্ষনো বলতে পারিনে। সত্যি, তুমি যে এত সুন্দর, এর আগে কোনদিনই তা' বুঝিনি।'

'তার চেয়েও সুন্দর?'

এ প্রশ্নের পর টনি কি বলতো, কে জানে। সম্মুখের কাঁটা গাছের বেড়ার আড়ালে এক গুচ্ছ সাদা ধবধবে পালক চোখে পড়তেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঐ পালক শোভিত টুপির অধিকারিনী তার অপরিচিতা মোটেই নয়,—সে তারই বাক্‌দত্তা প্রিয়তমা—মিলি রিচার্ডস্‌।

মৃদুকণ্ঠে সে বল্লে, 'ইউনিটি, সামনের দিকে চেয়ে ছাখো, মিলি এই দিকেই আসছে। আমার পাশে যদি তুমি বসে থাকো, তবে নিশ্চয়ই সে দেখতে পাবে। আর যদি নেমে পড়ো, তাহলেও সে ভেবে বসবে, আমরা দুজনে একই সঙ্গে চলেছি। প্রিয় ইউনিটি আমার, তুমি কি এই অস্বস্তিকর ব্যাপারটিকে ঘটতে দেবে?…আমি জানি আমার মত তুমি তা' সইতে পারবে না কখনো। একটা কাজ যদি করো, তবেই সব দিকে সুবিধে হয়—কি বল!……শুধু একটু খানির জন্য—পার্ব্বে না?'

'কি, বলই না আগে, আমি কি অস্বীকার কর্‌ছি!'

'তুমি শুধু গাড়ীর পেছনের দিকটায় লুকিয়ে থাকবে; তোমার ওপর ঐ তারপলিনটা দিয়ে বেশ করে ঢেকে দেবো। তারপর মিলি সরে গেলেই আবার পাশে এসে বসবে—কি বলো? এক মিনিটেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। নাও, শিগ্‌গির্‌ উঠে পড়ো।—তারপর এতক্ষণ যে বিষয়ে আমাদের আলাপ চলছিল, তাতে আমারও কিছু ভাব্‌বার আছে। হয়তো এরূপর মিলির পরিবর্ত্তে তোমাকেই ভালবাসা সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করতে হবে আমার। একথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমার ও মিলির ভেতরে এখনও কিছু সুস্থির হয়নি।'

ইউনিটি তখনই সম্মত হল।

গাড়ীর একেবারে পেছনের দিকে উঠে গিয়ে তখনই শুয়ে

পড়লো। টনি তারপলিনটা তার সারা গায়ের উপর বিছিয়ে দিল—যেন তারপলিনটা স্তূপ হয়ে এককোণে পড়ে আছে।

মিলি তখন কাঁটা গাছের বেড়ার আড়াল থেকে রাস্তার দিকে এগিয়ে এসেছে। গাড়ীখানি সেই দিকেই এগিয়ে গেল।

অনেকটা কাছাকাছি—স্পষ্ট চেনা যায়।

'টনি, প্রিয়তম—' উল্লসিত কল-কণ্ঠের সোহাগ ধ্বনি।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কেমন একটা পরিবর্ত্তন প্রকাশ হয়, —অভিমান যেন মিলির দুটী চঞ্চল অধরকে সঙ্কুচিত করে তোলে, হৃদয়ের উৎস-উচ্ছ্বাস যেন হটাৎ-ই রুদ্ধ হয়ে যায়।

নিমেষের নীরবতার পর ক্ষুব্ধস্বরে বল্লে, 'এতক্ষনে তুমি বাড়ী ফিরছো বুঝি—মনে থাকে না তোমার—না? আমি যেন এখানে নেই!...তুমিই তো আমায় ডেকেছিলে। বলেছিলে, ফিরে যাবার পথে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ভাবী জীবনের অনেক কথা হবে। আরও কত কি তোমার শোন্‌বার আছে আমার কাছে, আমিও বলবো বলেছিলাম কিন্তু তোমার দেখাই নেই—ভারি বিশ্রি লোক তুমি? এমনটি হলে আর কখনো আমি আসবোনা বলে দিচ্ছি।'

'লক্ষ্মিটি, সত্যি আমি বলেছিলাম, জানতেও চেয়েছিলাম অনেক কথা। কিন্তু একটুও আমার মনে ছিলনা, সত্যি বল্‌ছি। বেশ তো এখন নাহয় আমার সঙ্গে ফিরে চলো, —কি বলো মিলি, যাবে?'

'সে তো যেতেই হবে, তা'ছাড়া আর কি কর্ব্বো! এতখানি পথ চলে এসেছি বলে তুমি বুঝি আমাকে নিতে চাইছোনা?'

'না গো তা' নয়! আমি ভাব্‌ছি, তুমি বুঝি মার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত তাড়াতাড়ি ফিরে চলেছো। আমি তাঁকে দেখেও এসেছি সহরে। দেখে কিন্তু মনে হ'ল, তোমার জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করছেন যেন।'

'না হে, তিনি বাড়ী ফিরেছেন অনেকক্ষন—মাঠের ভেতর দিয়ে সোজা পথে তোমার অনেক আগেই তিনি এসে পৌঁছেচেন—বুঝলে?'

'হবে হয়তো, আমি তা' মোটেই জনতাম না।'—টনি খুব মৃদু জবাব দিলে। অতঃপর মিলিকে পাশে উঠিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না।

মানুষের মন যাচাই করবার কোন উপায় নেই—ঐটুকুই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম রহস্য হয়তো।

গাড়ী চলতে থাকে তেম্নিই ঢিমে তেতালায়।

রাস্তাটিও বন্ধুর। দুধারে নানা জাতীয় বৃক্ষ, গৃহ-উদ্যান, শস্য-প্রান্তর, কর্ষিত জমী,—তাছাড়াও অনেক কিছু। অদূরে চোখে পড়ে দীর্ঘায়িত তরু-শ্যামলতার অন্তরালে ধব্‌ধবে সাদা একটি বাড়ী। তারই পথমুখী একটি কক্ষের বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে একটি গোলাপী মেয়ে—সুবেশা, সুন্দরী।

টনির অপরিচিতা সে নয়,—তারই প্রথম যৌবনের প্রথমা প্রিয়া—হান্না জলিভার। ওর সঙ্গে যখন প্রেম বিনিময় হয়েছিল, ইউনিটি ও মিলি তখনও তার চোখের সম্মুখে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' হয়ে অকস্মাৎ ফুটে ওঠেনি—তার দুটি চোখে মায়াও ছড়ায়নি।

পরে কিন্তু মিলির পরবর্ত্তে ঐ হান্না কুমারীটিকে বিয়ে কর্ব্বার ইচ্ছাও জানায়;—এমন কি তার জন্ত বন্দোবস্তও চলেছিল তখন। হয়ে ওঠেনি, তাই......। আজকাল হয়তো সে আর তার কথা তেমন ভাবে না; কিন্তু তাই বলে একবারেই যে উদাসীন সে কথা বুকে হাত দিয়ে সে অস্বীকার করতে পারে না। রূপ পিয়াসী সন্ধানীমনের সঠিক সংবাদ কেই বা রাখে! নিজেও সে জানতো না হয়তো।

মিলির চেয়ে কোন অংশে হান্না খাটো,—এ অপবাদ তার পরম শত্রুও দিতে পারতো না। রূপে তো নয়ই, গুনেও নয়। সদা-সপ্রতিভ চোখে মুখের ভঙ্গীটুকু তার চিরলোভনীয়ই যেন। মিলি ও ইউনিটির সঙ্গে এই সুশোভনা মেয়েটির তুলনা হয় না।

ঐ সুশ্রী বাড়ীটির অধিকারিণী কিন্তু হান্নার পিসিমা, মাঝে মাঝে সে বেড়াতে আসে শুধু।

'মিলি, প্রিয়তমা আমার,—তুমি যে আমার ভাবী স্ত্রী,

সে কথা ভুলে যেতে কোনদিনই আমি পারিনে, তুমি তা' বিশ্বাস করো'

টনির কথার ভঙ্গীটি যেন কতবড় সোহাগের। স্বরটি কিন্তু অতি ধীর ও অস্পষ্ট। ইউনিটির অস্তিত্বের কথা সে ভোলেনি, তার শ্রুতি যে নিরাপদ মোটেই নয় এ খেয়ালটুকু তার খুবই ছিল। মিলির কাছে অতখানি আকস্মিক উচ্ছ্বাসেরও অর্থ আছে।—

টনি আবার সুরু করলে—কণ্ঠস্বর তেমনই ধীর। 'মিলি, জানালার পাশে ঐ তরুণীটিকে দেখ্‌ছো, ঐ যে মাঠের পানে চেয়ে আছে। আমার মনে হয়, আমাকে ও ডেকে বসবে। কথা কি জানো, ওর ধারণা ছিল আমি ওকে বিয়ে কর্বো। কিন্তু যখন ও শুন্‌লো ওর চেয়েও রূপসী কোন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চলেছি, আর সে মেয়েটি স্বয়ং তুমি, তখন এমনি পাশাপাশি বসে ওর সামনে দিয়ে চলে গেলে বেচারী হয়তো মনে খুব কষ্ট পাবে—তা কি করা উচিত! তাই বলি, বিয়ে না হলেও অন্ততঃ আমরা দুজনে জানি তুমি আমারই স্ত্রী—নয় কি? তুমি কি আমার একটি উপকার করতে পার্বে না?

'টনি, প্রিয়তম আমার,—নিশ্চয়ই পার্বো, কি শুনি?'

'গাড়ীর মাঝখানে ঐ শূন্য শস্য থলি গুলির নীচে লুকিয়ে নিজেকে গোপন রাখতে পার্বে না? বেশিক্ষণ তো নয়—ঐ মেয়েটিকে ছাড়িয়ে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে! তারপরই আবার বসবে এসে। মেয়েটা এখনো আমাদের দেখতে পায় নি।......ছাখো আমাদের সঙ্গে তো সদ্ভাব কারোই তেমন নেই, তুমি যদি দু' মিনিটের জন্য এই কষ্টটুকু স্বীকার করতে রাজী হও,—সামনেই বড়দিন, সে সময়টা এই সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে সরে গিয়ে আমরা মনের সুখে কাটাতে পার্বো—কেমন?'

'বেশ, তাই হবে; তোমার স্বস্তির জন্য এ কষ্টটুকুকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি নে।'

শস্য থলির নীচে মিলি তখনই অন্তরাল হল। একটু দূরে তারপত্রিনের নীচে ইউনিটিও আনত-দেহে আচ্ছাদিতা। কিন্তু কেউই কারো এমন অস্বাভাবিক অস্তিত্বের কথা জানতে পারলো না।

টনির গাড়ী তখন হান্নার প্রায় বাতায়ন সম্মুখে। মেয়েটির নির্নিমেষ দৃষ্টিটুকু তারই পানে উন্মুখ—দুটি ঠোঁটেও অপরূপ স্মিত রেখা।

'আচ্ছা টনি, একদিনও কি তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাওনা আমায়—তোমার পাশে তো জায়গা আছে, নিয়ে চলনা আজ?'

'সে কথা যে আমি ভাবতে পারি নে কুমারী অলিভার। এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে? তা' বেশতো, চল না! কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পিসীমার কাছেই থাক্‌ছো এখন—না?'

'কক্ষনো না, বাড়ী ফেরবার পথে আমি শুধু পিসিকে একবার দেখতে এসেছি। আমার টুপি ও সাজসজ্জা দেখে কি তুমি বুঝতে পাচ্ছো না? আচ্ছা বোকা তো তুমি!'

'ও, তা' হলে তুমি নিশ্চয়ই আসতে পারো।'

অশ্বগতি সংযত হল। একটু পরেই হান্না নীচে নেমে এল। তাকে পাশে তুলে নিয়ে টনির গাড়ী আবার চল্লো। তার মুখে স্ফূর্তির জ্যোতি—সুন্দর, সুস্পষ্ট।

দুধারের অপস্রিয়মান দৃশ্যগুলি সতৃষ্ণ নয়নে লক্ষ্য করতে করতে হান্না অকস্মাৎ-ই যেন বলে উঠলে, 'ভারি সুন্দর—না টনি? সত্যি, তোমার সঙ্গে গাড়ীতে যেতেও ভালো লাগে যেন।'

মুহূর্তের জন্যই টনি পেছন পানে ফিরে চেয়ে দেখলে একবার,—তারপর মৃদু স্বরে বল্লে, 'আমারও কিন্তু তাই।'

এবার টনির চোখ দুটি বারে বারেই হান্নার মুখের পানে কি একটা যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। অপলক চাউনি—তার তৃপ্তিরও হয়তো শেষ নেই কোথাও। এই তরুণীর টাট্‌কা যৌবনের রূপটি মুগ্ধ করে তোলে শুধু,—আকর্ষণও বেড়ে যায়।

টনির মনে হল, ইউনিটি বা মিলির কাছে কেন অত

করে বিয়ের কথা জানাতে গেলাম—এ মেয়েটিকে যতই দেখি—বিস্ময়ও ততই বেড়ে চলে।

পাশাপাশি দুটি তরুণ তরুণী—দুখানি বাহু পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে,—নীচে পা-দানিতেও দু' জোড়া পদপল্লব পরস্পরের পুলকস্পন্দন অনুভব করছে।—টনির মনে বিরাট আন্দোলন,—কি চমৎকার এই মেয়েটি!

মৃদু, কোমল, অস্ফুটস্বরে অবশেষে টনি বললে, 'হান্না, তোমাকে প্রিয়তমা বলে সম্বোধন করবার অধীকারটুকু পেতে পারি কি?'

'কেন, আমি তো জানি মিলিই সে অধিকার তোমায় দিয়েছে।'

'না হান্না, সত্যি কথা তা' নয়।'

'কি?...অত আস্তে বলছো কেন?'

'হ্যাঁ, আমার গলাটা ভেঙ্গে গেছে একটু।...বলছিলাম, তুমি যা' শুনেছো তা' সত্যি নয়।'

'তবে? আর কিছু কি তুমি বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, সে কথাই আমি—'

টনি শুধু তার মুখের পানে একভাবে চেয়ে রইলো। হান্নার চোখ দুটিতেও বিস্ময়দৃষ্টি—টনির পানে চেয়ে তার চোখও অনিমেষ। টনির মনে হল, সে কি নির্বোধ, এত ক্ষণেও সে এই মেয়েটিকে বুঝতে পারে নি—আশ্চর্য্য!

'প্রাণের হান্না'

মুহূর্ত্তে তার নবনীত হাতখানি নিজের হাতের ভেতরে টেনে নিয়ে, টনির কমনীয় সোহাগ সুরটি শুধু ঐ দুটি কথাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বিস্মৃতির অতল সাগরে পৃথিবী যেন লুপ্ত,—মিলি ও ইউনিটি বলে দুটি মেয়ে যেন তার অতিকাছে লুকিয়ে নেই,—তার সঙ্গে একটুখানি পরিচয়ও তাদের কোনদিন ছিল না যেন।

'তুমি বুঝি ভাবছো, সব কিছুই ঠিক হয়ে গেছে—আমাকে বিশ্বাস করতে পারো এখনো কিছুই হয়নি।'

'চুপ, শোনো দেখি—'

'কি?'

'ঐ শস্যথলির নীচে কেমন যেন কিচ্ কিচ্ শব্দ হচ্ছিল, আমি ঠিকই শুনেছি টনি। ঐ শস্যগুলি নিয়ে আসছো কেন? এ গাড়ীতে ইঁদুর না থেকেই যায় না—বুঝলে?'

হান্না তার গাউনের প্রান্তটি তাড়াতাড়ি টেনে তুলে নিল—কি জানি, যদি......

টনি কিন্তু সান্ত্বনা জানালে, 'না, না, ও চাকার আলের শব্দ। এমনি খরাদিনে অমন প্রায়ই হয়।'

'তাই হবে হয়তো......আচ্ছা টনি, ঠিককরে বলতো লক্ষ্মি, আমার চেয়ে ওকেই তোমার বেশি ভালো লাগে কি না! আমি তো ইচ্ছা করেই অনেকটা দূরে থাকতাম।...শেষ অবধি আমিই হয়তো পাবো তোমায়—জানি। তোমাকে ভালোই লাগে কিন্তু সত্যি করে বল দেখি সে কথাটা? নইলে তোমার সে কথারও আমি জবাব দেবনা—বুঝতে পারলে তো—কি?'

এতটা চমৎকার ও মিষ্টিকথা যে টনি শুনবে তা সে আশাও করেনি বরং উল্টা কিছুই শুনবে ভেবেছিল। খুসীর উল্লাসে চকিতে পেছনে একবার সতর্কদৃষ্টি দিয়েই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, 'এখনো আমি ঠিক কথা দিইনি তাকে, শুধু আভাষ দিয়েছিলাম। ওতে কিছু এসে যাবে না—বুঝলে? এখন বলত সেকথাটা কি—একটু আগেই যে বলছিলে?'

'তবে মিলিকে তুমি চাওনা?—আমাকেই বিয়ে করবে। কি সুখেরই না হবে তা'হলে।'—হান্নার মুখর কণ্ঠ ও চঞ্চল করতালি বাতাসে স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

শস্যথলির মৃদু আন্দোলন—তার সঙ্গে বিচিত্র অস্ফুট শব্দ—গুমট, ক্ষুব্ধ কাৎরানির মতই যেন অনেকটা। ক্রোধে, হিংসায় মিলি জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছিল।

'ওখানটায় নিশ্চয়ই কিছু আছে—দাঁড়াও'—অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল নিয়ে হান্না উঠতে গেল। টনি কিন্তু মুহূর্ত্তে তাকে

নিরস্ত করে অনেকটা নিশ্চিন্ত সুরেই বললো, 'ও সত্যি করেই কিছু নয় হান্না, তুমি ভয় পাবে বলে আগে কিছু বলিনি—ওর ভেতরে দুটো বেজী আছে, শীকারের জন্য নিয়ে চলেছি। নিজেরাই ওরা ঝগড়া করছে, তারই শব্দ!......ও দুটোকে অনেকটা চুরি করে এনেছি, কাজেই জানতে দিতে চাইনি। যাক্, তোমার সৌভাগ্য যে ওরা বেরিয়ে আসতে পার্কেনা—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আর, আর—হ্যাঁ; দেখো হান্না, সারা বছরে এই দিনগুলি কত চমৎকার—নয় কি?...আসচে শনিবারে কি তুমি মার্কেটে যাবে? পিসিমা কেমন আছেন এখন—বলত?'

টনি নির্ব্বোধ নয়। মিলির কানের কাছে প্রেম গুঞ্জন মোটেই সুখের হবে না, কাজেই বিষয়ান্তরেই সে কথা সুরু করে দিল।

সামনেই টনির গৃহ। অদূরে উদ্যান সীমায় বৃদ্ধ মিঃ কীট্স্ আবাদী জমী তদারক করছিলেন। তার উত্তোলিত হাতের ইঙ্গিতে টনির মনে হল পিতা তাকে ডাকছেন হয়তো।

'একটা কাজ করতে পার্কে হান্না, ঘোড়ার বল্গাটা একটু খানি ধরে থাকোনা লক্ষ্মিটি। বাবা ডাকছেন কেন, শুনে আস্ছি আমি।

হান্না তৎক্ষণাৎ রাজী—এতে আর মনে করবার কি আছে?

'টনি, শোন—'

'কেন বাবা?'

'এ সব কি হচ্ছে, শুনি?'

'কি?'

'কি?—তুমি যদি মিলিকে বিয়ে করতে চাও তো করে ফেল—একটা হাঙ্গামা চুকে যাক্। অলিভারকে নিয়ে সারা গ্রামটা ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন নেই—শেষে যে একটা কলঙ্ক সৃষ্টি করবে সে আমি হতে দেবনা'

'আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম এই, এই—ও আমায় বল্লে কিনা বাড়ী নিয়ে আসতে।'

'কেন সে বল্লে? মিলি ছাড়া আর কারো তা' বলবার দাবী নেই। তোমরা দুজনে নিজেদের খেয়ালখুসীই চলেছো শুধু।'

'মিলিও তো সেখানে আছে।'

'মিলি! কোথায়?'

'শস্যথলির নীচে। শুধু তাই নয় বাবা, ইউনিটি সালেটও—গাড়ীর পেছন দিকটায় তারপলিনের ভেতরে। এই তিনজনকে নিয়ে যে আমি কি কর্কো কিছুই ভেবে পাইনি। সব চেয়ে ভাল উপায় হল, আমি মনে করছি ওদের একজনকে লক্ষ্য করে বাকী দুজনকে সত্যি কথাটি জানিয়ে দেওয়া। তা হলে সব সুস্থির হবে হয়তো। আচ্ছা বাবা, এমনি অবস্থায় তুমি যদি পড়তে তবে কাকে বিয়ে করতে, বলত?

'যে মেয়েটি তোমার সঙ্গে বেড়াবার জন্য মোটেই অনুরোধ করতো না—তাকে।'

'তাহলে সে একমাত্র মিলি,—আমি তাকে নিজে থেকে ডেকে এনেছিলাম বলেই সে উঠেছে—কিন্তু সে—'

'তবে মিলিকেই তোমার গ্রহণ করা উচিত,—সে-ই সব চেয়ে ভালো..... কিন্তু দেখ ঐ যে—'

মিঃ কীট্স্ গাড়ীর পানে ইঙ্গিত করলেন।

'ও কক্ষনো ঘোড়াকে ঠিক রাখতে পার্কে না, ওর হাতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি। শিগ্গির যাও, ঘোড়ার মুখটি চেপে ধরগে, নইলে ঐ মেয়েদের দুর্ঘটনা কিছু ঘটতে পারে।'

টনির ঘোড়াটি দুরন্ত তেমন নয়। কিন্তু সারাটা দিন বাইরে থাকাতে আস্তাবলমুখী মনটি তার অস্থির হয়ে উঠেছিল। হান্নার অত্যধিক বল্গা-সংযম সত্ত্বেও তার আস্ফালন বন্ধ হল না। অতঃপর আর কোন কথা না বলে

টনি গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলো।

টনি নিজের মনে ভাবতে লাগলো, মিলিকে ত্যাগ করবার বিপক্ষে এমন কোন বড় আকর্ষণ নেই যে আমাকে দিয়ে তা অসম্ভব হবে।—কিন্তু বাবার কথাও উপেক্ষার নয় একটুও—তিনি অত করে বলছেনও যখন। না, কক্ষনো সে মিলিকে স্ত্রী করতে পার্ব্বে না। তিনজনকে বিয়ে কর্ব্বার উপায় নেই—কাজেই হান্না তার কাম্য।

এদিকে কিন্তু গাড়ীর ভেতরে অনেক কিছুই চলছে তখন। শস্য থলির নীচে নিদারুণ লজ্জায়, দুঃসহ ঘৃণার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতই মিলি ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল। টনির উপহাসে, তার ছলনায় সে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। নিস্ফল আক্রোশে সাপের মত কাৎরাতে কাৎরাতে সে এগিয়ে যেতেই হটাৎ দেখে, তারই মাথার কাছে কার যেন দুটি পা—সাদা মোজায় আবৃত। নির্ব্বাক আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে সে শুম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু ক্ষণপরে চিনতে পারল—সে ইউনিটি সালেট। নিজের দুর্ভাগ্যের মত তারও অবস্থা দেখে সে তেমনি সাপের ভঙ্গিমার মত এগিয়ে গিয়ে একবারে তার মুখোমুখী হল।

অস্ফুট রোষ-রুক্ষস্বরে বল্লে, 'একি একটুও কলঙ্কের কথা নয় তোমার কাছে?'

'নিশ্চয়ই! একটি যুবকের গাড়ীর ভেতরে এমন করে তোমার লুকিয়ে থাকায় কেউই এ ছাড়া ভাবতে পার্ব্বো না কিছু!'

'একথা তুমি কক্ষনো বলতে পারো না! টনির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি,—এভাবে এখানে থাকবার অধীকার নিশ্চয়ই আমার আছে। কিন্তু তোমার কি দাবী —শুনি? তোমার কাছে সে কি কথা দিয়েছে? আমি জানি তুমি বাজে কথা বলবে। ও মেয়েটিকেও টনি যে কথা বলেছে, সেও কিছুই না।

'কিন্তু নিজেও তুমি নিশ্চিত আশা করো না। নিজের কানেই আমি শুনেছি,—আমাকেও নয়, তোমাকেও নয়—সে হান্নাকেই পেতে চায়।

তারপলিন ও শস্যথলির অন্তরালে নারীকণ্ঠের এহেন কলহ গুঞ্জনে হান্না শুম্ভিত হয়ে উঠলো। সেই মুহূর্ত্তে ঘোড়াটিও অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে গেল। আকস্মিক ভয়ে বিস্ময়ে হান্না প্রাণপণে বল্গা সংযত রাখতে চেষ্টা করেও পারলে না।

কলহের যেন বিরাম নেই,—দুটি কাকলী কণ্ঠের মুখরতায় ভয়ার্ত্তা হান্না বিদ্রোহী অশ্বের শাসন রজ্জু শ্লথ করে দিল—নিজেও সে তখন জানতোনা কি ঘটতে চলেছে।

সেই মুহূর্ত্তেই কিন্তু অভাবনীয় কাণ্ড। ঘোড়াটি যেন অন্ধ হয়ে গেছে—মত্ত গতিতে সে ছুটে চললো। কোন দিকেই খেয়াল নেই।

তারপর লোয়ার লংপাড্লের পাহাড়ের ধারে রাস্তার নীচে একটী খাদে সামনের চাকা ঠেকে—গাড়ীখানা কাত হয়ে পড়লো।

রাস্তার উপরে দুর্ভাগা তরুণী তিনটিও ছিটকে পরস্পরের গায়ে লুণ্ঠিত হল—যেন অসংখ্য গাউনের একটা স্তূপ।

একটু পরে টনিও ছুটে এল। ভয়ে তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। তার প্রিয়তমা ত্রয়ার কেউই আহত হয়নি,—কিন্তু তাদের শুভ্র নিটোল বাহুতে আঁচড় পড়েছে। তা ছাড়া আর কোথাও কিছু হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

এতক্ষণ টনি স্তব্ধ হয়েই ছিল, কিন্তু সহসা ওদের তীক্ষ্ণ স্বর-শরজালে চমকে উঠে বল্লে, 'তোমরা ঝগড়া করছো কেন—ছিঃ!'

মুক্ত টুপিটি তুলে ধরে সম্ভ্রমও জ্ঞাপন করলো। মেয়েরা তখন বচসা-অন্তে বেশ-বিন্যাসে তৎপর।

'দেখো, আমি খুব ভাল মানুষটির মত কথা কইছি,—কওয়াও উচিত, কি বল তোমরা?......আমি হান্নাকে বিয়ে করতে চাই, সে নিজেও তাতে রাজী—কাজেই তাকেই আমি গ্রহণ কর্ব্বো—এই আসচে—'

কিন্তু কথা শেষ হল না। সেই পথে তাদের দিকেই হান্নার বাবা আসছিলেন। তার পানে চোখ পড়তেই টনি নির্ব্বাক হয়ে গেল।

হান্নার মুখে আঁচড়ের আলা ভালোই ছিল—বাবাকে দেখে সে তো তখনই ছুট—আহ্লাদী মেয়ের মতই অনেকটা যেন। তারপরই বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে কি বিশ্রি আর্ত্তনাদ!

'আমার মেয়ে তাতে মোটেই রাজী নয় মশাই—'সদ্য-আগত পিতাটি অগ্নিশর্ম্মার মতই বলে উঠলেন—'কি বলো হান্নু, তুমি রাজী? ওকে প্রত্যাখ্যান কর্ব্বার মত তোমার ভেতরে তেজস্বীতা আছে নিশ্চয়ই। তোমার নারীত্বের মর্য্যাদাকে যদি ভুলে না যাও, তা'হলে কোন বিপদই তোমার কাছে ঘেঁসতে পার্ব্বে না কোনদিন।'

টনিও নীরব থাকবার ছেলে নয়। উগ্রস্বরেই বল্লে, 'আমি শপথ ক'রে বলতে পারি আমার প্রত্যাশায় হান্না ঘণ্টাধ্বনির মতই কলকণ্ঠা।

'না কখ্খনো না, ওকে প্রত্যাখান করবার শক্তি আমার খুবই আছে। প্রথম যখন ওর সঙ্গে মিশে ছিলাম কিছুই জানতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, একটি প্রতারকের সঙ্গে আমার কথা কইতে হচ্ছে।'

'কি? আমাকে তুমি পেতে চাওনা হান্না?'

'কক্ষনো না, আমি এখন কাউকে বিয়ে কর্ব্বো না, কাউকেই নয়?' পিতার উপস্থিতির জন্যই হান্নার মুখ দিয়ে সত্যি কথা বার হল না হয়তো। নইলে টনির এতখানি প্রেম-নিবেদনে সে তেমন অমত জানাতে পারতো না কখনো।

তার বুকে যেন বেদনা গুমরে ওঠে—অধরে ও কণ্ঠে যেন আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা উৎস হয়ে ঝরে পড়তে চায়। অন্তরায় শুধু নিরর্থক দুর্ব্বলতা।

বাবা কিন্তু তাকে সঙ্গে করে প্রফুল্লচিত্তে চলে গেলেন।—হান্নার শেষ আশা টনি তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করবে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

টনি মুহূর্ত্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো—আর কার কাছে কি-ই-বা সে বলবে? কোন কিছুই তার মনে এল না। পাশেই অধীর আকুলতা বুকে চেপে মিলি দাঁড়িয়ে—বুকের স্পন্দনেও যেন তার প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। শুধু এর জন্যই পিতা নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তে আশা করে আছেন।—তার এ আগ্রহে টনি যেন কোন মতেই সায় দিতে পারলো না। ইউনিটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—

'প্রিয় ইউনিটি, তুমিও কি আমার হতে পারো না?'

'না, ওর কাছেই যাও, আমি একে তুচ্ছ মনে করি।'

যেন কত বড় গর্ব্ব—ইউনিটিও চলে গেল,—কিছু দূর গিয়ে একবার ফিরে তাকালো—মনে আশার স্বপ্ন,—টনি হয় তো তাকে অনুসরণ করে আসছে!

এমন ভুল যৌবনেই হয় শুধু।

আর একজনই মাত্র। ইউনিটি চলে গেল, হান্না গেছে, মিলিও যাবে।

নয়ন-নতা সুচারু তরুণী—দুটি চোখে তার অশ্রুর অস্থিরতা—জল-নির্ঝরের মতই যেন বাধাহীন। তারই পানে চেয়ে টনির দৃষ্টি বিস্মিত, মুগ্ধ, হয়তো বা সজাগও—

বজ্রদগ্ধ তরুর মতই যেন সে সহসা নির্ব্বাক, নিশ্চল।

'মিলি, প্রিয়তমা—আমাদের অদৃষ্টই আজ এমনি করে দুজনকে একখানে রেখে গেল, সেখানে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউই নয়। তাই যদি ঠিক হয়, তবে তারই আভাষ তোমার মুখে আজ শুনতে চাই—একটিবার বলো—বলবেনা মিলি?

'সে তোমারই ইচ্ছা টনি। আমি শুধু জানতে চাই ওদের তুমি যে কথা বলেছো, তা শুধুই মুখের কথা, অর্থহীন—তাই কি?'

'আমার শেষ কথাটি বিশ্বাস করতে পারো মিলি—সে কথা সত্যি একটুও নয়।'

তারপর........

মিলির সুখশিহরিত কোমল করপল্লব খানি নিজের হাতের ভেতরে তুলে ধরে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে গেল।

মদির আবেশে মিলির মাথাটিও কখন টনির বুকের উপর নির্ভর হয়ে গেছে। আস্তে তার চিবুকটি তুলে ধরে

অপূর্ব্ব বিস্ময়ে টনির দুটি চোখ অনিমেষ হয়ে রইল।— তারপরই দুটি পরশতৃষ্ণ অধরে অতি মৃদু চুম্বন-রেখা একটি।

টনির গাড়ী ঠিক করে নিতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় সেদিন লাগেনি।

বুকের বিষ—

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়া ও সন্ন্যাসী।

(বিজয়া সন্ন্যাসীর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল)

সন্ন্যাসী। মা!

(বিজয়া চমকাইয়া উঠিয়া তিন পা পিছাইয়া গেল)

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া গাহিল)

গান

কত রূপ ধর মাগো,
মায়াময়ী মা শঙ্করী
মা হ'য়ে মা কোলে ধর
কন্যা হ'য়ে স্নেহ কর
প্রিয়া রূপে সেবা কর
(আবার) কখনও অরাতি রূপে
হও মা প্রলয়ঙ্করী।
যখন যে ভাবে এসো
পরাণ জুড়িয়া ব'সো
কিঙ্করেরে ভালবাস
হয়ে শ্যামা ক্ষেমঙ্করী।

(বিজয়ার চমক ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল, সে মুগ্ধ তন্ময় ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সন্ন্যাসীও স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিলেন।)

সন্ন্যাসী। বিজয়া!

বি। কি আজ্ঞা প্রভু!

স। গুরুর আদেশে আমার গাঁয় ফিরতে হ'য়েছে। আবার বুঝি চলে যেতে হ'বে।

বি। সে কি? কেন প্রভু?

স। আমার এখানে থাকা না থাকা তোমার হাত।

বি! আমার হাত? কি ক'রতে হ'বে আমায়?

স। মায়া এখানে আমায় হাজার দিক থেকে ছোবল মারছে! বিষে শরীর জর্জ্জর হ'য়ে যাচ্ছে! এই মায়ার হাত থেকে যদি আমায় মুক্তি দিতে পার তো থাকবো, নইলে চ'লে যেতে হবে।

বি। আমি কেমন ক'রে মুক্তি দেব?

স। তুমি যদি শপথ কর যে তুমি আমাকে কেবার

জন্য কোনও চেষ্টা ক'রবে না, আমার কাছে আসবে না, আমার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হ'য়ে আমার ধর্ম্মের সহায় হবে—তবেই আমি থাকি।

বি। তাই যদি আদেশ কর তাই হবে প্রভু, কিন্তু একবার যদি দয়া ক'রেছ, আর ফিরে যেও না। (চক্ষু মুছিল)

স। তারা! তারা! আচ্ছা তবে তাই কথা রইল, তুমি আমার কাছে আসবে না।

বি। কিন্তু—দিনান্তে একটি বার শুধু দেখা—তাও কি পাব না?

স। না, সে হবে না। আমার দেখা পাবে, যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও তুমি—তার আগে নয়।

বি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) বেশ তাই হ'বে

স। শুধু তাই নয়, সহধর্ম্মিণীর কাজ ক'রতে হ'বে তোমার—আমার ভার বইতে হবে!

বি। তোমার সেবা ক'রবো সে আর ভয় কি? সে তো—

স। না আমার সেবা ক'রতে তুমি পাবে না—তোমাকে বইতে হ'বে আমার একটা বোঝা। এখানে আমার ভক্তের দল আমায় বড় বিব্রত ক'রে তুলেছে, ওরা আমার সাধনায় বড় বিঘ্ন ক'রছে, ওদের তুমি নিয়ে যাও।

বি। আমার কথায় ওরা যাবে কেন? ওরা যে তোমাকে চায়।

স। ওরা আমাকে চায় না, ভক্তি চায় না, বৈরাগ্য চায় না। ওরা চায় সুধু লাভ—সুধু তুচ্ছ সুখ সম্পদ! তুমি ওদের তাই দিলেই ওরা তোমার সঙ্গে যাবে।

বি। আমি কোথা থেকে দেব তা', আমার সে শক্তি কোথায়?

স। কাছে এস তুমি—(বিজয়া কাছে আসিয়া বসিল, সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তারপর বলিলেন) যাও—আমার আশীর্ব্বাদে লোকের মঙ্গল করবার শক্তি তোমার হবে। যাও।

(বিজয়া সন্ন্যাসীর পা বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইল)

২য় দৃশ্য

বিজয়ার ঘর

[বহুমূল্য পালঙ্কের উপর মূল্যবান বিছানা পাতা রহিয়াছে, একখানা আসনের উপর পুরু গালিচা পাতা, তার সম্মুখে পূজার উপকরণ, ফুলমালা ও পরাতে পরাতে খাদ্য দ্রব্য সাড়ী কাপড় প্রভৃতি। বিজয়া লাল পেড়ে গরদের সাড়ী ও গহনা পরিয়া, কপালে চন্দনের প্রলেপ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়া গালিচার উপর বসিয়া আছে। সম্মুখে দুইটী ভক্ত গলবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছে। ঘরের জানালার ভিতর দিয়া নদী দেখা যাইতেছে।]

বিজয়া। এত সব নিয়ে এসেছ কেন বাছা, এত কি হ'বে?

১ম ভক্ত। (প্রণাম করিয়া) এ আর কি মা? এতো তুচ্ছ! গরীব আমি কিই বা দিতে পারি! (একটি পাত্রে জল লইয়া বিজয়ার পায়ে ঠেকাইল) এই পাদোদকটুকু নিয়ে ঘরে দেব তবে আমার স্ত্রী জলগ্রহণ ক'রবে।

[প্রস্থান]

বি। কি বাবা, কি চাই?

২য় ভক্ত। শুধু দর্শন ক'রতে এলাম মা। (প্রণাম করিয়া একখানা মোহর পায় রাখিল। বিজয়া উঠাইয়া লইল।

(পাঁচু এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে পা টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পিছু পিছু পাঁচুর মাও ছুটিয়া আসিয়া খপ করিয়া ধরিল)

কান্ত। ফের এখানে এসেছিস মুখ পোড়া! জানিস নে কর্ত্তা দেখলে মাথা ভেঙ্গে দেবে। ডাইনে পেয়েছে মাগীকে, এত বোঝাই তাও যদি হতভাগা বুঝবে?

(পাঁচুকে লইয়া প্রস্থান)

(বিজয়া তৃষিত নয়নে তাদের দিকে চাহিয়া রহিল,

একবার দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল। তারপর অবসন্ন ভাবে হাত ছাড়িয়া দিয়া গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া রহিল।)

মধু সাধুর প্রবেশ

মধু। (প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে) মা এত লোকের উপর এত দয়া হ'চ্ছে, আমার উপর দয়া হ'বে না মা? দশখানা ডিঙ্গা নিয়ে আমার ছেলে বাণিজ্যে গেছে, এক বৎসর ঘুরে গেল তার কোনও সংবাদ নেই। এত ক'রে মাথা খুঁড়ছি তোমার পায় মা, দয়া কি হবে না।

বি। (খানিকক্ষণ নীরবে ধ্যানস্থ থাকিয়া) কোনও দুঃখ কারো না মধু, এই নাও মায়ের নির্ম্মাল্য! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে। (নির্ম্মাল্য প্রদান)

ম। এমনি তো বলছো আজ ক'দিন থেকে মা, কিন্তু —হ'চ্ছে কই? দিনের পর দিন আমি নদীর ধারে হাঁ ক'রে পড়ে থাকি, কিন্তু কোনও সন্ধান পাই না কিছুর। মা, আমায় ছলনা ক'রো না!

বি। না বাবা মিথ্যা বলছি না, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

নবকিশোরের প্রবেশ

নব। তোমার দয়ায় আমি আমার ছেলে ফিরে পেয়েছি মা। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী নিয়ে এলাম তাই। (উপহার রাখিল, বিজয়া স্মিতমুখে স্পর্শ করিল।)

রামকুমারের প্রবেশ

রাম। মা গো রক্ষা কর মা—আমার বাছাকে রক্ষা কর!

বি। কি হ'য়েছে বাবা।

রাম। আমার ছেলেটি আজ সকাল থেকে দাঁত লেগে পড়ে আছে। বদ্যিরা হাল ছেড়ে দিয়েছে—এখন তুমি না রাখলে মা আমার আর গতি নেই!—

বি। (একটা কমণ্ডলু লইয়া) এই নাও বাবা এই জল নিয়ে ছেলের মাথায় ছিটিয়ে দেও গে—সে ভাল হ'বে।

রাম। সে হ'বে না মা! দয়া যদি কর মা তবে একবার তুমি এসো—তুমি এসে আমার বাছাকে বাঁচাও, নইলে আর তাকে পাব না।

বি। তুমি কিছু ভেবো না, এই শান্তি জল নিয়ে যাও।

রাম। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) দোহাই মা, পায়ে পড়ি মা, দয়া কর। আমি পাল্কী নিয়ে এসেছি। এই দশ পা' বইতো নয় আমার বাড়ী—একবার পায়ের ধুলো দে মা! রক্ষা কর আমায়—আমি তোমার খাট সোনায় মুড়ে দেবো মা।

বি। (অন্যমনা ভাবে) কোন ছেলেটি তোমার, ওই যে যাকে সেদিন নিয়ে এসেছিলে মোটা সোটা ফরসা, ফুলের মত ছেলেটি—

রাম। হাঁ মা সেই। সেই ছেলে আমার আজ ছেড়ে যাচ্ছে মা—দয়া কর মা—

বি যেতেই হবে আমায়? যদি যাই তবে আমি যা চাইবো দেবে?

রাম। যা চাও মা—যা আমার সাধ্য।

বি। আমি যদি তাকে বাঁচাতে পারি তবে সে ছেলে আমায় দেবে।

রাম। সে আর বেশী কথা কি মা! সে ছেলে তোমার পায় ঠাঁই পাবে সেতো তার সৌভাগ্য।

বি। বেশ তবে চল। তোমরা একটু ব'স বাবা আমি এই এলাম ব'লে।

বিজয়ার ও রাম কুমারের প্রস্থান।

কাত্যায়নীর প্রবেশ।

কা। বেশ আছে, দিব্যি আছে! রাজভোগ খাচ্ছে, খাট গদীতে শুচ্ছে, রাজ্যের পুরুষ মানুষ নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি ক'রছে। বেশ আছে! কোনও দুঃখ নেই! কেন থাকবে? বাছা আমার গাছের তলায় পড়ে রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে—তাতে ওর কি? ওতো মা নয়। বুক ছেঁড়া ধন তো নয় ওর! ও কেন তার জন্য কষ্ট পাবে।

বাছারে, কি ডাইনী এনে তোর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম বাবা। তুই বুঝি তাই বুঝেই বিবাগী হ'য়েছিস। কিন্তু—কিন্তু তোর অভাগী মার দিকে তুই একবার ফিরে চাইলি না।

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

(নদীতে নৌকা দেখা গেল। মাঝিরা 'বদর বদর, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মধু সাধু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল।)

মধু। একি? এ কার বহর—আমারইতো মনে হ'চ্ছে।

(একজন লোক ছুটিয়া আসিল)

লোক। কর্ত্তা, কর্ত্তা, আমাদের ডিঙ্গা সব ফিরে এসেছে।

মধু। অ্যাঁ, চল চল—জয় মা!

নব। মা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি। ঠাকুর মিথ্যা বলেন নি। সাক্ষাৎ শিবের অংশ তিনি, তাঁর মুখ দিয়ে কি মিথ্যা বেরোয়। মা যার উপর দয়া করেন সেই ধন্য হয়। মা! মা!

(একটি বালককে লইয়া বিজয়ার প্রবেশ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামকুমার এক থালা টাকা লইয়া প্রবেশ করিল।)

রাম। জয় মা!

নব। অ্যাঁ, তোমার ছেলে ভাল হ'য়েছে!

রাম। এ আর না হ'য়ে যায়। মা আমার গিয়েই ছেলেকে কোলে নিয়ে ব'সলেন, তার পর এক ফোঁটা শান্তিজল গায় দিতেই বাছা আমার চোখ মেললে!

নব। (বিজয়ার পায় লুটাইয়া পড়িয়া) মা! মা!

(বিজয়া হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া, শিশুকে মাটির উপর বসাইয়া তার সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল।)

(বহুলোক সওগাৎ লইয়া আসিল—একখানা সোনার খাটিয়া ও বিছানা আনিয়া পাতিল। পশ্চাতে মধু সাধুর প্রবেশ।)

বিজ। এসব কি?

মধু। (বিজয়ার পায় লুটাইয়া) সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি মা তুমি, তোমার দয়ায় আমার সব ফিরে এসেছে। তাই যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী নিয়ে এলাম।

বিজ। বেশ, রেখে দেও বাবা!

মধু। না মা, সুধু রেখে যাব না। তুমি একবার এই সাড়ী আর গয়না প'রে রাজরাণী হ'য়ে আমার খাটের উপর ব'স, আমি দেখে চোখ সার্থক ক'রে যাই।

বিজয়া। পাগল তুমি! এ নইলে হ'বে না? আচ্ছা দেও।

(সাড়ী লইয়া শিশুক্রোড়ে প্রস্থান)

নব। হাঁ সাধু ভাই, সব ডিঙ্গা তোমার ফিরে এয়েছে?

মধু। সুধু সব ডিঙ্গা ফিরেছে—ছেলে আমার এক রাজার সম্পদ বাণিজ্য করে এনেছে। আর আশ্চর্য্য বলবো কি ভাই, যে দিন আমি প্রথম এলাম মায়ের কাছে, ঠিক সেই দিনই ওরা একটা ভয়ানক ঝড়ে প'ড়েছিল—সব যায় আর কি! তার পর হঠাৎ ঝড় কেটে গেল। এ তো কেবল মায়েরই করা।

নব। তা' আর ব'লতে।

মধু। তোমার এই ছেলেরই কি অসুখ ক'রেছিল?

রাম। হাঁ ভাই, মায়ের দয়ায় একে ফিরে পেয়েছি—নইলে বদ্যিরা সব তো জবাব দিয়ে গিয়েছিল।

সাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়া, এবং শিশুকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া বিজয়ার প্রবেশ। বিজয়া সোনার খাটে শিশুকে লইয়া বসিল, সকলে তাহাকে প্রণাম করিল।

সকলে। জয় মা।

বিজয়া। (শিশুর প্রতি) কি বাবা? এখন মাকে পছন্দ হ'ল তোর? দেখ মধু, কেমন সুন্দর ছেলে পেয়েছি আমি।

মধু। তোমার ছেলের অভাব কি মা?

বি। আমার অভাব কি? তোমরা কি বুঝবে?

(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

(বিজয়া ছেলেটিকে অলঙ্কার খেলনা প্রভৃতি দিতে লাগিল)

মধু। তবে যাই মা, পেন্নাম হই।

বি। এসো বাবা!

(মধুর প্রস্থান—

নব ছাড়া আর সকলে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল)

ক্রমশঃ

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার মধ্যে এরকম বুদ্ধিহীন স্বদেশপ্রেমের মত্ততা দেখ্‌ব তা জানতুম না। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পে যেহেতু বিদেশী পশ্চিমের নামমাত্র শিল্পসাদৃশ্য পাওয়া যায়, সেই হেতুই তা খারাপ—এ আর যাই হোক্ নতুন যুক্তি বটে। বলতে পারো আধুনিক কোন্ শিল্পীর শিল্প অল্পবিস্তর মিশ্রজাত নয়? এমন কি প্রাচীন কোন্ শিল্প?

যদি এখন বলি যে ইম্প্রেস্যানিস্ট্ গগনবাবুর ছবি (তোমায় মানতেই হবে য়ুরোপও আর্টের দেশ) য়ুরোপের ছায়ায় বাড়েনি, তাহ'লে তো নিশ্চয়ই তাঁর 'দ্বিতীয় স্তরের শিল্প' 'প্রথম স্তরের' হয়ে যাবে? কিন্তু তুমি বিদেশের ওপর যে রকম চটা—'ইম্প্রেস্যানিস্ট্' মানে জানোত? ফোটগ্রাফির একেবারে উল্টো জিনিষ ইম্প্রেস্যানিস্‌ম্—বা ইম্প্রেস্যানিস্ট্ আর্ট। ফোটোতে যা' থাকে খুঁটিনাটীর মাপজোক করা যথাযথ নিখুঁত ছবি, তা' এতে না থাকলেও এ ঢঙের ছবির দাম কম নয়। তবে ভালো ছবিমাত্রেই যা থাকা দরকার—atmosphere বা আবহাওয়া—ইম্প্রেস্যানিস্ট্ ছবিতেও তা বিশেষ করে' থাকা চাই। ইম্প্রেস্যন কথাটাই ত মানস-ছবি বা ধারণা বোঝায়। 'জাপানযাত্রী'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই আমির প্রকাশই আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।.........রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।'—একথা বা ওয়াইল্ডের 'It is the spectator and not life that art really mirrors' অর্থাৎ যা দেখি তা আঁকার চেয়ে, দেখার পর যে ছবি মনে ফুট্‌ল, যে ধারণা বা impression হল সেইটাকে ফোটানোই হচ্ছে বড়োদরের আর্ট। বলতে পারো তাহ'লে সাধারণ আর্ট আর ইম্প্রেস্যানিস্‌ম্ অন্ততঃ হুইসল্যরের ইম্প্রেসিনিস্যম্‌এ তফাৎ কি? তফাৎটুকু হচ্ছে (হুইসলার, করো, পিসারো মোনের) ইম্প্রেস্যানিস্ট্ ছবিতে দৃষ্টবস্তু না এঁকে তার ইম্প্রেস্যন ফোটানোর ওপরেই যে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হয় তাইতে হুইসলার, মোনে প্রভৃতির দ্বারা তখন য়ুরোপে ফোটগ্রাফীর পূর্ব্বরাগ সুরু হয়েছে। শিল্পীর আবশ্যকীয়তা ও দাম কমতে আরম্ভ

হয়েছে। এই ফোটগ্রাফীর বিরুদ্ধে reaction বা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল—ফোটোগ্রাফীর আয়ত্তের বাইরে যেটা সেইটুকু বিশেষ করে'ই ছবিতে ফোটানো হতে লাগল—হুইসল্যার জাপান থেকে প্রেরণা পেয়ে ও ঢঙটা নিয়ে অস্পষ্ট, ঝাপ্সা, মনোরম, নয়নাভিরাম Nocturne আর Symphony আঁক্তে লাগলেন। গগনবাবুও হয়ত প্রাচ্য দেশ থেকেই রং বাছা ও লাগানোর পদ্ধতিটুকু নিয়েছেন।

তানাতো ইম্প্রেস্যনিষ্টিক্ বা মোনের যে বিশেষ technique বা কলাকৌশল গগনবাবুর ছবি সে কৌশলে বোধ হয় আঁকা নয়। (হুইসল্যার বা করো যদি ইম্প্রেস্যনিক নাম পান, সেই হিসেবে গগনবাবুও ইম্প্রেস্যনিষ্ট্ নামে অবিহিত হতে পারেন)। তুমিই নিজেই দেখেছ বোধ হয় যে কোনো কিছু দেখার পরে মনে তার যে ছবিটা থাকে সেটা হয় ঝাপ্সা, স্বপ্নের মতো সুন্দর, মোলায়েম রঙে under-toneএ আঁকা—স্নিগ্ধ হয় আর না হয়ত মনে শুধু একটা রঙের প্রখর দীপ্তি ও কলাকৌশলের তৃপ্তিটুকুই শুধু জেগে থাকে। হুইসল্যার ও করো হচ্ছেন প্রথমদলের আর মানেও দেগা হচ্ছেন শেষের। গগনবাবুর ইম্প্রেস্যনিসম্ হচ্ছে প্রথম দলের—অর্থাৎ তাঁর ছবি দীপ্তি ও স্থূলরসের ফরাসী আর্ট নয়। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর আঁকা ছবিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। এমনি মনোরম, স্বপ্নেভরা ছবিগুলি! যেন অতীন্দ্রিয়ের আভাস আছে।

আমার সাম্নে একটা ছবি রয়েছে—পুরীর মন্দির। অসাবৃত বিস্তর কিন্তু শিল্পীর মনের যে ছবি কাগজে দেখ্ছি তাতে আমারও মনে পুরীর মন্দিরই ফুটে উঠ্ছে। কেবল তাই নয়—মনে সেই পুরীর আবহাওয়াটাও অনুভব করছি—ঐ ছবির একটা মানুষের মূর্ত্তিই তা জাগিয়ে দেয়—ভক্তের ভাব, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত একটা ভাব। কিম্বা ধরো তাঁর 'দীপালি,' কি 'প্রতিমা বিসর্জ্জন' এ আলোর খেলা, আলোকাবলীর লীলা কী চমৎকার ফুটেছে এবং মনে কী চমৎকার সেই 'দীপালি' কি 'প্রতিমা বিসর্জ্জন'এর ছবিও ভাবটা ফোটায়। কিন্তু দৃশ্যবস্তু আঁকাতেই তাঁর কৃতিত্ব নয়—গগনবাবুর ইম্প্রেস্যনিসম্ খাঁটী ভাববস্তুকেও abstract ideaকেও স্বপ্নের কুজ্ঝটিতে অলোক সুন্দর করে' অনুপম করে' ফোটায়। 'দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো' বা 'জীবনস্মৃতি'র শেষ দুটো ছবি কবির আইডিয়াকে অসামান্য কলাকৌশলে আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্ত করে' তোলে। অথচ আইডিয়ার ধরাছোঁয়া যায়না ভাবটা—রহস্যটা পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। আর্টে বা সাহিত্যে বলার চেয়ে না বলাটুকুই খোলসা করার চেয়ে আভাষে দর্শক বা পাঠকের মনকে উতলা করে' জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে চরম গুণ। গগনবাবুর তা আশ্চর্য্য ভাবেই আছে।

কিন্তু কেবল দৃশ্য বা ভাব মূলক ছবিতেই গগনবাবুর ইম্প্রেস্যনিসম্ তৃপ্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের যে কটা পোর্ট্রেট ছাপা দেখেছি তাতে তাঁর বড়োদরের—হুইসল্যারের মতোই প্রতি চিত্র আঁকবার ক্ষমতাও সুপ্রকাশ। কিন্তু আর কোথাও না হোক্ একজায়গায় তিনি হুইসল্যারের চেয়ে বড়ো—সে হচ্ছে তাঁর অরিজিন্যালিটি। হুইসল্যারের ছবিতে শুধু যে আসবাব পত্র, বা স্থান—তা সে লণ্ডনের কোন পল্লী হলেও—জাপানী হয়ে যেত তা নয়—হুইসল্যারের নারীমূর্ত্তির পোষাক এমন কি মুখও অনেক সময় জাপানী হয়ে যেত। গগনবাবুর ছবি পুরো বাংলার ছবি। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা হচ্ছে ঐ সৌম্য, শান্ত মানুষটা যত নব নব পথে চল্তে থাক্বেন। এবং কেবল চল্বেন না প্রতি পথেই বিশিষ্ট কিছু দিয়ে যাবেন। কিউবিষ্ট গগনবাবুর ছবির মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে দুটো বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমের কিউবিসম্ থেকে দুটো স্বাতন্ত্র্য একটা হচ্ছে তাঁর ছবির মধ্যের গতিশীলতা—এটা শুধুই গগনবাবুর এবং শিল্প জগতে এটা তাঁর সৃষ্টি ও দান। য়ুরোপের কিউবিষ্ট্রা শুধু স্থিতিশীল পদার্থের ছবিই আঁক্তে পারতেন। কিন্তু গগনবাবু কিউবিসমে গতি ফোটাতে পারেন। ধরো য়ুরোপীয় কিউবিষ্ট যেন আঁকেন নিশ্চল বাড়ীর ছবি—গগনবাবু তারওপর গতিশীল মেঘও ফোটাতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত তাঁর আরো

জটিল অঙ্কনভঙ্গী—হয়ত এই গতিশীলতার জন্যেই। তিনি কিউবিসম্ আরো প্রসারিত করে, develop করে' দিয়েছেন। কিউবিসম্ কথাটা হচ্ছে কি জানো—তিন কোণা পদ্ধতি। দেখেছ ত বাড়ী করে চারকোণা ইঁটের পরে ইঁট দিয়ে, তেমনি ধরো তিনকোণা টালি দিয়ে একটা দেওয়াল করা হয়েছে। কিউবিসম্ হচ্ছে ছোট ছোট তিন-কোণার সমষ্টিতে একটা পুরো অর্থপূর্ণ ছবি। কিউবিসম্ এর সার্থকতা একটা আভাসে মনোবৃত্তিকে, কল্পনাকে দৃষ্টিবান করায়। সেই জন্যেই হয়ত কিউবিসমে বস্তুর চেয়ে ভাবই, abstract জিনিষই ফোটে ভালো।

গগনবাবুর কিউবিসম্ তাঁর ইম্প্রেশনিসমের মতোই পরিপূর্ণরূপে সার্থক ও মূল্যবান। তাঁর কিউবিসম্ যে কি রকম জোরালো ও জটিল তা তাঁর রক্তকরবীর ছবিতে কি Light's dream Darkness প্রভৃতিতে, কি রকম গতিশীল তা তাঁর Flight of Light, Laughter কি Gliding Down প্রভৃতিতে এবং কি রকম মনোরম ও ভাবগভীর তা তাঁর The poet বা The Reverie, Chaos, The Vision প্রভৃতি দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে। তাঁর ছবি প্রাণহীন বাংলার আর্টে কতখানি প্রাণ এনেছে এবং তাঁর দানের কতখানি মূল্য তা তোমাকে বোঝাবার মতো আমার জ্ঞান নেই। কিন্তু আমার মতো অশিল্পী, সাধারণ ব্যক্তিকেও যে তাঁর ছবি কত আনন্দ দিয়েছে তা ত এই এতখানি চিঠিতেই বুঝ্‌ছ। এবং বোঝো যে তাঁর শিল্প কত উঁচুদরের যে আমার মতো নীচুদরের মানুষকেও এত উচ্ছসিত করতে পারে।

কিন্তু কিউবিসম্ ও হয় ত পুরো য়ুরোপীয় নয়। ইম্প্রেস্যনিসম ও পোষ্ট ইম্প্রেস্যনিসমেও তৃপ্ত হতে না পেরে মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে অর্থাৎ টেক্‌নিক্ আর একটু develop করে' কিউবিসম আবিষ্কার করে' ফেল্ল। আশ্চর্য্যের কথা কিউবসম্ নাকি নিগ্রোআর্টের আওতায় হয়। এবং ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ ত বলেন যে কিউবিসম ভারতীয় শিল্পেও ছিল। অজন্তার ব্যাকগ্রাউণ্ড্ আঁকায়, সাঁচী বারহুতের নানা জিনিষে, রাজপুত ছবির মধ্যের ঘর বাড়ীর গড়নে, কিউবিসম্ দেখা যায়।

ভারতে যা ছিল তা যখন তোমার প্রিয় হবেই তখন গগনবাবুর কিউবিষ্ট্ ঢঙের ছবি তোমার প্রিয় হতে বাধ্য। আর জানোইত, এক মোগল যুগ ছাড়া ভারত শিল্পে যথার্থ কিছু আঁকার চেয়ে তার ভাবটা ফোটান বা তার আবহাওয়া সৃষ্টি করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কাজে কাজেই ইম্প্রেস্যনিসম্ ও তোমার প্রিয় হল। তায় আবার প্রাচ্যের গৌরব স্বাধীন জাপানের—যে জাপানের আবার প্রাচীন ভারতই দীক্ষাগুরু—আর্টের সঙ্গে তার সাদৃশ্য।

কিন্তু এরওপর আবার গগনবাবুর ব্যঙ্গচিত্র আছে। বল্‌তে গেলে এতেও তিনি বাংলার তথা ভারতের পথপ্রদর্শক এবং এতেও তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা সুপ্রকাশ। কিন্তু আজ আসি। এত বাজে বক্‌লুম। ভরসা এই তোমার স্বদেশ প্রেমের তাড়ায় এ সব বিষয়ে আমার চেয়েও কম জ্ঞান। অবনীবাবু কোথায় বলেছিলেন, আর্ট্ যখন কেবল চোখকে তৃপ্ত না করে' মনের চোখ জাগিয়ে তৃপ্তি দেয় তখনই তা পূর্ণ, সার্থক—সেও আমার একটা যুক্তি। গগনবাবুর ছবি আমার মনকে জাগিয়ে তুলে' তৃপ্তি দেয়। ইতি—

শ্রীশ্যামল রায়

ছোট গল্পের জন্য—

প্রথম পুরস্কার ২৫ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ২০ টাকা

৩০শে আশ্বিনের ভিতরে সম্পাদকের নিকট পৌঁছানো চাই।

তীর্থ-পথ

যোহান বয়ার

অনুবাদক—শ্রীঅরিন্দম বসু

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

নবাগত লোকটি যেন সে-গৃহে উচ্ছল আনন্দের সাড়া আনিয়া দিল।......পাহাড়ে পাহাড়ে দল বেঁধে নিত্য নতুন অভিযান, শ্যামল বনানী ছায়ায় বিচিত্র বহ্নি-উৎসব, পান-পাত্রের কত স্পর্শ-ঝঙ্কার, কত সুস্বর কলকণ্ঠ,—প্রতি চাহনিতে পর্য্যন্ত খুসীর উচ্ছ্বাস—অপরূপ সে বসন্ত-বিহার—দিনের পর দিন।

সেদিন কমনীয় রাত্রি—বাড়ীতে আর কেহই তখন ছিলেন না, শুধু তার দুটী বোন। একটিবারও কিন্তু লোকটি তাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল না। সে যে অতি সাধারণ ঘরেরই একটি মেয়ে, একথা নিশ্চিত জানিয়াও, তারই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কত মুহূর্ত্ত!—আলাপের শেষও তাদের ছিল না সেদিন।

পরদিন মনে হইল শুধু বাকদত্তই তারা নয়। কখন তারা পরস্পরের একান্তই আপনার হইয়া গেছে সেই একটি রাতে। বিবাহ যে তাদের সত্যসত্যই হয় নাই, এ সন্দেহটুকুও মনে জাগে না একটুও। বোনদের উপর সামান্য ঈর্ষাও আর নাই। সে যে বিজয়িনী এইটুকুই শুধু যথেষ্ট, আর কোন প্রতিশোধই নয়।

অরণ্যের কুঞ্জছায়ায় অপরূপ সে অভিসার—কত উৎফুল্ল সপ্তাহই না কাটিয়া গেল! তার চোখে মুখ তৃপ্তির পরিপূর্ণতা, খুসীরও উচ্ছলতা—

এক অনাগত শুভ সৌভাগ্যের কল্পনায় সারা মনটি যেন বিভোর। সেদিন তাদের সে সুখ নীড়ে মা-বাবাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। হয়তো তাঁদের মনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। তার অতীতের সমস্ত দুঃখের সার্থকতা শুধু সেইখানেই.........

একদিন কিন্তু লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেল—অকস্মাৎ।

বিদায় মুহূর্ত্তে একটা কথাও সে তাকে বলিতে পারিল না,—অনন্ত অস্বস্তি তার সারা মনে গুমরিয়া উঠিল যেন। তারপর থেকে কি দুঃসহ প্রতীক্ষা! ছোট্ট একটু চিঠির প্রত্যাশায় কত দিনই না কাটিয়া গেল—কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ। অবশেষে একদিন নিজেই সে চিঠি দিল, দিনের পর দিন, তারপর মাস—আশ্চর্য্য! তার কোন উত্তরই আসিল না।

কি মর্ম্মান্তিকই না সে দিনটি!—প্রাতঃরাশের টেবিলে বসিয়া শুনিল—ডাক্তার ফোল্ডেনের শিগ্‌গীরই নাকি বিবাহ,—ক্রিশ্চিয়ানার কোন এক সম্ভ্রান্ত তরুণীর সঙ্গে অনেকদিন থেকেই তিনি বাকদত্ত হয়ে ছিলেন। সেদিন—উঃ, কি সে দুঃসহ অনুশোচনা!

অতঃপর তীব্র উত্তেজনায় মেয়েটি উঠিয়া বসিল। দুখানি হাতের উপর ললাট নির্ভর করিয়া অস্পষ্টস্বরে আর্ত্তনাদ করিল—'নাঃ, ঘুম না এলে নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়ে যাবো'

পার্শ্ববর্ত্তিনী ধূসর কুন্তলা স্ত্রীলোকটির দুটি চোখও কখন বিনিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকটা প্রত্যুত্তরের মতই সে বলিয়া উঠিল—'তুমি কি মনে করো একা তোমারই তা মনে হচ্ছে—আর কারো নয়?'

সে কিন্তু কোন সাড়াই দিল না; করতল-নির্ভর-ললাটে তেমনই বসিয়া রহিল। আবারও সেই দুর্নিবার চিন্তা—মনে পড়িল শরত-সায়াহ্নের একটি নির্ম্মম স্মৃতি! চারিদিকে স্তব্ধ অন্ধকারের যবনিকা, পায়ের নীচে হরিৎ তৃণ-ভূমিতেও

শিশিরের সজলতা। তারই মাঝখানে উদ্‌ভ্রান্তার মত সে সারা রাত্রিটি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল অধীর উদ্বেগে। সেই-দিনই প্রথম মনে জাগিল—যেন এক অনাগত নিদারুণ অশঙ্কার পূর্ব্বাভাষ—

তাহা যেন একটুও মিথ্যা নয়, সত্য, নির্ম্মম সত্য!

প্রভাতের উদয় উন্মেষে সে গৃহে ফিরিল। প্রতিদিন যেমন কাটে সেদিনও তেমনই......হাসি তার অধর অন্তরালে সুপ্ত ছিল না, সঙ্গীতের গুঞ্জন ধ্বনিও নয়। সকলের চোখে নিজেকে সে ধরা দিতে চায় না,—তাদের সে আত্মগরিমাকে একটুও সে জাগিতে দেবে না, কখনই না।

তারপর একদিন কোন সন্দেহই আর রহিল না—তার আশঙ্কা একটুও মিথ্যা নয়; সারা দেহ মনে মাতৃত্বের প্রস্ফুট চেতনা সঙ্গোপনে ছাইয়া গেছে। কিন্তু সে বেদনায় সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে সে ম্লান করিয়া রাখিল না, উৎফুল্ল আনন্দকেই জোর করিয়া গ্রহণ করিল। একটু সন্দেহের আভাষও যেন কারও মনে জাগিয়া না ওঠে।

অন্তরের ক্রন্দন যখন উতরোল হইয়া আসে, প্রয়োজনীয়তা তখন তার অধর সীমায় উৎফুল্ল হাসি আনিয়া দিল—মুক্তির প্রত্যাশায় সে যেন তখন উন্মুখ, উদাসী।

হয়তো পরিত্রাণের উপায় কিছু না কিছু আছে; না থাকিলেও তাকে তাহা উদ্ভাবন করিতে হইবে, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

কিন্তু এরূপস্থানই বা তার কোথায়? গৃহে?

সেখানেও কি এ কলঙ্ক মা-বাবার বুকে শেল নিক্ষেপ করিবেনা? তবে?

অবশেষে সে একদিন বাড়ীতে চিঠি লিখিল। সে চিঠির প্রতিবর্ণে পরিপূর্ণ খুসীর উচ্ছ্বাস;—সে এখন ক্রিশ্চিয়ানায় যাইবে, সেখানকার গার্হস্থ্য-বিধান-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবে, কিছু অর্থের তার প্রয়োজন।

পিতা কিন্তু তেমন খুসী হইতে পারিলেন না, কিন্তু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন।

মাসীর আশ্রয় ত্যাগ করিবার কিছু আগে মাসী ও বোনদের সঙ্গে সে কিইনা কলহ! দোষ কিন্তু তার নিজের, গায়ে পড়িয়াই সে ঝগড়া করিয়াছিল। পাছে সহরে গিয়া তারা তার খোঁজ করে, সেই আশঙ্কাতেই এই বিচ্ছেদ সৃষ্টি। তারপরই সে চলিয়া যায়।

সহরের বুকে নিজেকে সে এমন করিয়াই গোপন রাখিল—যেন আহত একটি পশু। গার্হস্থ্য-বিধান-বিদ্যালয়ে মাসখানেকের মত যাতায়াতও সুরু হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই!—বিদ্যালয়ের সান্নিধ্যটুকুও যেন তার চোখে বিভীষিকা—পাছে, সন্দেহকেই সে নিঃসংশয় করিয়া ফেলে।

স্যাঁৎসেঁতে সঙ্কীর্ণ একটি ঘর—তারই ভিতরে জনৈকা দর্জ্জী-রমণীর সঙ্গে আস্তানা পাতিয়াছিল। জীর্ণ পরিচ্ছদের সংস্কারে সারাটি দিন কাটিয়া যাইত বটে, কিন্তু পারি-শ্রমিক যাহা মিলিত, তা'তে তার আবাস ও আহার ব্যয় তেমন সঙ্কুলান হইত না। ফলে, তা'র সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ ভাটা পড়িল। গ্রামের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে পাছে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে সে বাহিরে যাইতেও নারাজ। তবুও মা-বাবার কাছে যে সকল চিঠি লিখিত—আনন্দের উচ্ছলতা তার কোনটাতেই কম থাকিত না। এম্‌নি করিয়াই মিথ্যার পর মিথ্যাকে সে অবলম্বন করিতে শিখিল।

সুদীর্ঘ শীতকাল আসন্ন। পরিস্ফুট বেদনা তার সারা-দেহে জমাট হইয়া গেছে—এক ধূসর-সন্ধ্যায় প্রসূতি-ভবনের পরামর্শাগারে নিজেকে সে দেখা দিল। তারপর সহকারী চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপও চলিল অনেকক্ষণ। গৃহ-প্রবেশের নিয়ম-কানুনও দেখিয়া লইল। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সে জানাইল না—নামটি তো নয়ই, ঠিকানাও নয়।

প্রসূতি-ভবনে প্রবেশ করিয়া, স্নানান্তে সে যখন তা'র নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইল—ভেতরে তখন নোংরা কঠিন শয্যার উগ্র গন্ধ পরিপূরিত।

এমন নির্জ্জন অস্বস্তিকর জীবন যে কেহ যাপন করিতে পারে, এ কথা যেন স্বপ্নেরও অগোচর।

জীবনে এমনটি সে ভাবিতেও পারে নাই—।

-ক্রমশঃ-

ঘরে-বাইরে

গত দু'মাস থেকে 'ধূপছায়া' অনিয়মিত বার হয়েছে বলে আমরা লজ্জিত। আমাদের গ্রাহক ও পাঠকদের অনেকেই সেজন্য অনুযোগ জানিয়েছেন। প্রেসের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও অন্যান্য কারণে আমাদের এই ত্রুটি সম্ভবপর হয়েছে! এরপর এ বিষয়ে আমরা বিশেষ করে সতর্ক হ'ব। মাসের প্রথম সপ্তাহেই যাতে 'ধূপছায়া' বার হয়, তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলবে। এই অনিচ্ছাকৃত অনিয়মিতা আশা করি তাঁরা ক্ষমা কর্বেন।

'ধূপছায়ার' সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যাঁরা আমাদের সহায়তা করছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে শ্রীসৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণব রায়, শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যেন্দ্র দাস, শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীরাসগৌর ঘোষাল এঁদের সহানুভূতিতেই 'ধূপছায়ার' পরিচালনা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আধুনিক সাহিত্যের যাঁরা প্রবর্ত্তক, তাঁদের লেখা দিয়ে যে তাঁরা 'ধূপছায়ার' প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ। সে সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবনা আশা করি।

আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই আন্দোলন সুরু হয়েছে এবং এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র এবং আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সমাধান কিছুই হয়নি তাতে। এই সাহিত্যে যে শক্তি, বৈচিত্র ও নতুনত্ব আছে এবং সর্ব্বোপরি যে তা' সৃষ্টি মূলক সেকথা তাঁরাও স্বীকার করেছেন।

কিন্তু সম্প্রতি গোলযোগ বেঁধেছে এই স্বীকার করা নিয়ে। তারই ফলে একদল যশলিপ্সু সাহিত্যিক ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছেন এবং সেই আক্রোশে তাঁরা আধুনিক সাহিত্যের অসারত্ব প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের সকাতর অভিযোগ আধুনিক সাহিত্য কিছুই নয়, বিদেশী সাহিত্যের হীন, ব্যর্থ অনুকরণ,—অশ্লীল, নোংরা জিনিশ। অতএব পাঠক সমাজ সাবধান হবেন—এই সমস্ত আধুনিক কুরুচি মূলক পত্রিকার প্রচারে প্রশ্রয় না দেন—তাহলে বাংলা সাহিত্য ও সমাজ ছাড়খারে যাবে।

তাদের এই আপ্রাণ চেষ্টা দেখে মনে হয়, যেন বাঙ্গালী পাঠক সমাজ বিচার বুদ্ধিহীন,—তাঁদের উপদেশের প্রত্যাশায় তাঁরা উন্মুখ হয়ে আছেন।

ঈর্ষায় কতদূর অন্ধ হলে যে মানুষ এত বড় হীনতার আশ্রয় নিতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল 'শনিবারের চিঠি' নামক 'প্রবাসীর' আঁস্তাকুড়ে বর্দ্ধিত একখানি কদর্য্য মাসিক আর তার পরিচালকগণ!

দোষ করেছিলেন শরৎচন্দ্র——কুক্ষণে তিনি বাংলা সাহিত্যে 'শৈলজা-প্রেমেন্দ্র' প্রভৃতির নবযুগ প্রবর্ত্তনের

প্রশংসা করেছিলেন। আর দোষ করেছিলেন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়—শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেন, জগদীশ গুপ্ত প্রভৃতির শক্তিতে তিনিও সাহিত্যের নবগৌরব কীর্ত্তন করেছিলেন।

বাংলাদেশে কি সাহিত্যিকের অভাব ছিল? আশ্চর্য্য! 'শনিবারের চিঠি' স্পষ্টবক্তা—নাহয় হলেনই তিনি শরৎচন্দ্র! কাজেই তারা তাঁর উপযুক্ত বিশেষণ দিলেন—'বিগলিত দন্ত ব্যাঘ্র'

নরেশ চন্দ্রের ভাগ্যেও ঘটেছিল—তিনি 'ধূর্ত্ত শৃগাল' আর আজ শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর ভাগ্যে ঘটেছে—তিনি ধাপ্পাবাজ, তিনি মূর্খ।

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—জনকয়েক স্বার্থান্ধ লোক বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের এমন অবমাননা করুতেও কিছু মাত্র সঙ্কোচ মনে করেনা।

যারা মনে করেন 'শনিবারের চিঠি' সাহিত্যে অশ্লীলতার জন্যই আন্দোলন সুরু করেছেন—সমাজ ও সাহিত্যের কল্যাণের জন্যই শুধু,—তাঁরা ভুল করেন। সাহিত্যের এই আন্দোলন নবীনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের নয়,—নবীনের বিরুদ্ধে নবীনের; এবং তা' অক্ষম সৃষ্টি কিংবা অশ্লীলতার জন্যও নয় —এশুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব—পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণুতার আক্রোশ। একটু চিন্তা করে দেখলেই একথার সত্যতা স্পষ্ট মনে হয়।

বিশ্বমানবতার বিভিন্ন রূপসৃষ্টিই যে উঁচুদরের সাহিত্যের আদর্শ;—তুচ্ছ গণ্ডী নির্দ্দেশ করে যে তাকে সংযত করা চলে না—সে বিচার-বুদ্ধি আজও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শাস্ত্রের বিধি এবং সাহিত্যের রসসৃষ্টি—এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। সাহিত্য, সমাজে বিপ্লব আনে কিন্তু সে বিপ্লব অনাগত সৌন্দর্য্যসৃষ্টির। আধুনিক সাহিত্য যদি সমাজের সঙ্গে বিরোধ জাগিয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সমাজের পরিবর্ত্তনই তার লক্ষ্য।

আমাদের সামাজিক জীবন অত্যন্ত জড়তা-পূর্ণ। এবং এই সামাজিক আবহাওয়ার (social atmosphere) উপর নির্ভর করেই এদেশের সাহিত্য। সামাজিক জীবনের গণ্ডী যত ব্যাপক হবে সাহিত্যেও ততখানি ব্যাপকতা আসবে—একথা স্বাভাবিক। আজ যদি Flaubert এর 'Madame Bovary' এদেশে অনূদিত হয়,—Emma কে রমা, আর Leonকে মোহিত নামে ছাপমারা যায়, এবং স্থান কালও যথাসম্ভব এদেশেরই উপযোগী করে নেওয়া হয়, তবুও যে সে বইখানি আমাদের সমাজমনের পক্ষে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অথচ ম্যাডাম বোভারি বিশ্বসাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। এম্‌মা ও লিঁওর কামনার নগ্ন দৃশ্যটি এদেশের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার। GautieraMlle De Maupin —বইখানির নায়ক Chevaler D' Albert আর নায়িকা Mlle De Maupin—এদের কাহিনী কি এদেশের পক্ষে চূড়ান্ত অশ্লীল নয়? আর ঋষি টলষ্টয়ের 'Resurrection'? Maslova মেয়েটিকে এদেশের কোন উপন্যাসের নায়িকা রূপে দেখলে কি এরা আঁৎকে উঠতেন না?—টুর্গেনিভের ব্যাজারভ্,—ইব্‌সেনের 'পীয়ার গিণ্ট',—গোটা হামসুন সাহিত্য,—এদের প্রচণ্ড অশ্লীলতায় সাহিত্য ও সমাজ কি নষ্ট হয়ে পড়েছে?—মোঁপাসা ও বালজাক পড়ে পড়ে ফরাসী সমাজটা কি বিগড়ে গেছে?

অবশ্য এ সব বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে কোন নজীর তুলে সাহিত্যের তুলনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আমাদের দেশের Social atmosphere ও সে দেশের atmosphere এক নয়—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে হিসেবে সাহিত্যও বিভিন্ন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে অশ্লীলতা নিয়ে,—সাহিত্যের তুলনা করবার ধৃষ্টতা নিয়ে নয়। লালসাকে তাঁরা আনন্দের বলে গ্রহণ করেন, তাই তার নগ্নতাকে তারা অসুন্দর বলে ভাবতে চান না। সে দেশের লোক গল্প, উপন্যাস পড়ে intelectual দিকে থেকে—

নিজেদের reasoningএ উপন্যাসের theme টিকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে শিখে। আর এদেশে পড়ে উৎকট ভাবপ্রবণতা নিয়ে—কাজেই এদেশের পক্ষে অশ্লীলতা মারাত্মক ব্যাপার।

কথা উঠতে পারে এদেশের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে কথা মানি, কিন্তু এদেশের নতুন সাহিত্যে এ চিন্তাও জাগতে পারে, এ আদর্শের পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার—জাতীয় জীবনকে তা জড়তা দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছে। যুগে যুগে আদর্শের পরিবর্ত্তন হয়,—সাহিত্যেরও। কিন্তু বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তন যে নিছক অশ্লীলতা নিয়ে এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা হয় আধুনিক সাহিত্যের বাছা বাছা খুসী মাফিক কয়েকটা লেখা পড়েছেন, নাহয় মিছে কথা বলেন।

আধুনিক সাহিত্যে, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীজগদীশ গুপ্ত, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির এমন লেখাই বেশি যা' তথাকথিত অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট নয় এবং তার অধিকাংশই বাংলা সাহিত্যের গৌরবের জিনিষ।

আধুনিক সাহিত্য যদি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়াতো তবে বাংলাদেশে সুধীজনপরিচালিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজের অভাব নেই—তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতেন না। সে আলোচনা তারা আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নিঃবিসম্বাদী হয়ে যোগ দিতেন—'শনিবারের চিঠির' নতুন করে প্রয়োজন হতনা এবং তারই আড়ালে জন কয়েক ব্যক্তি তুচ্ছ মনোবৃত্তি নিয়ে হীন আনন্দে আস্ফালনও করতেন না।

তাঁরা শনিবারের চিঠিকে আশ্রয় করে শোনাতে চান—আধুনিক সাহিত্য কিছুই নয়, তা' শুধু তরুণ লেখকদের অক্ষম কামনার রূপ মাত্র। তাই তাঁরা মাসের পর মাস 'মণিমুক্তার' হীন আশ্রয় নিয়ে সর্ব্বসাধারণের কাছে নিজেদের সত্যতা ও তার সমর্থন দাবী করে চলেছেন।

আধুনিক সাহিত্য বিচারের পক্ষে ঐ 'মণিমুক্তার' উদ্ধৃত অংশগুলিই কি কষ্টি পাথর ?

আধুনিক সাহিত্যের প্রচার কম সেকথা মানি—যাঁরা তা' পড়বার সুযোগ পাননি অথচ 'শনিবারের চিঠির' ঐ হীন বিদ্রূপ ও তাঁদেরই খুসীবিক্ষিপ্ত উদ্ধৃত অংশগুলি পড়েছেন, তাদের পক্ষে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁদের শুধু আমরা এইটুকুই বলতে চাই—কয়েকটি গল্প কিংবা শনিবারের চিঠির 'মণিমুক্তায়' অনুকরণ-প্রবণ লেখকের কতিপয় আহৃত অংশ চোখে দেখেই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে না ফেলেন। লেখকের সৃষ্টির সমগ্রতা নিয়েই তাঁর সাহিত্যের রূপ, তার মূল্য। এবং সে হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য-তুচ্ছ তো নয়ই বরং গৌরবের। যৌনবিজ্ঞান কিংবা যৌন সমস্যা নিয়ে গল্প কিংবা উপন্যাস লিখলেই যা তা' অশ্লীল হবে তা' আমরা স্বীকার করিনে। সাহিত্যে দৈহিক কামনা অসুন্দর নয়—অসুন্দর হয় তখনই যখন তার নির্লজ্জ প্রকাশটুকুই শুধু একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে যা সুন্দর হয়ে ফোটে,—বিশেষ উদ্দেশ্য দেখাতে গিয়ে যেখানে দৈহিক কামনার প্রয়োজন হয়, সেখানে অশ্লীলতা বড় জিনিষ নয়—বড় জিনিষ তাঁর রচনার theme, তার বিশ্লেষণ। সেখানে অশ্লীলতা চাপা পড়ে' তার সৃষ্টির নতুনত্বটাই বিচার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটিকে পৃথক করে যদি সেই লালসার অংশটুকুই শুধু চোখের সামনে তুলে ধরা যায়, তখন তাকে পঙ্কিলতাদুষ্ট বলে গ্রহণ করা কারও পক্ষে কঠিন হয় না। এবং এই পঙ্কিলতার জন্য সমাজমনের যে অকল্যাণ হয় তার জন্য দায়ী—যে নোংরা কাগজে তা' আহৃত হয় সেই কাগজ। বিশেষ করে তাঁরাই যখন বলেন, তাঁদের কাগজের প্রচার অনেক বেশি।

'শনিবারের চিঠির' অশ্লীল বিদ্রূপে উদ্ধত (obstinate)

হয়ে যারা অশ্লীলতার জন্যই উদ্দেশ্যহীন গল্প লেখেন তার জন্য দায়ীও সেই লেখক একা এবং 'শনিবারের চিঠি',—সমগ্র আধুনিক সাহিত্য নয়। অশ্লীলতা মূলক গল্প লিখলেই লেখকের গায়ে আধুনিকতার ছাপ পড়েনা,—সেজন্য অনেক কিছুরই প্রয়োজন।

অশ্লীলতা সব দেশের সাহিত্যেই আছে যদি কিনা অশ্লীলতা অর্থ দৈহিক লালসা হয়। তবে যে দেশে শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গার বহুদিন থেকে সমাজ মনের উপর আধিপত্য ছড়িয়ে আছে, সেখানে কবি মোহিতলালের 'মোহমুদ্গারের' নবরূপটি যে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। ইহলৌকিক ভোগসুখকেই চরম বলে আমাদের দেশের কারো বিশ্বাস নেই—কেননা যুগান্তের সংস্কার। কাজেই বিবর্তনশীল মনোজ্ঞান যদি সে সংস্কারে বাধা প্রাপ্ত হয়ে নতুন পন্থা নির্দেশ করে এবং পৃথিবীর ভোগলালসাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তার গন্ধ এদেশের পক্ষে সুসহ মোটেই নয়। বরং তীব্র আন্দোলন হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে লালসা এদেশে চিরকাল লজ্জার বস্তু—আনন্দের নয়। সাহিত্যেও তাই লালসার প্রকাশটুকু ঘৃণ্য ঠেকে আজ।

তবে যা' সাহিত্য নয়, যা' সৃষ্টি নয়, তার কোন মূল্য নেই, সার্থকতাও না। অশ্লীল গল্পের প্রচার বন্ধের জন্য 'মণি-মুক্তার' প্রয়োজন হয় না—বেচারা ডুবুরির জন্যও কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। সাহিত্যে সাহিত্যের জন্যই যদি তথাকথিত অশ্লীলতার প্রয়োজন হয় তবে তা' প্রকাশ হবেই, এবং তা' এই আধুনিক সাহিত্যে নয়,—প্রতি যুগের প্রতি নতুন সাহিত্যে।

'শনিবারের চিঠি' দুঃখ করে জানিয়েছেন, 'মণিমুক্তা' প্রকাশ কর্বার জন্য তাঁদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবৃন্দ আপত্তি তুলেছেন—কেননা তাঁদের মার্জ্জিত রুচিতে আঘাত লাগে। হতে পারে এ অভিযোগ তাঁদের সত্য। কিন্তু তার জন্য শনিবারের চিঠি যে উত্তর দিয়েছেন তা' যে কত বড় মিথ্যা এবং এই মিথ্যার দোহাই দিয়ে সাহিত্য ও সমাজের যে অপকার তারা করে চলেছেন তার জন্য শনি-বারের চিঠির মার্জ্জিতরুচি-শুভাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর কি একটুও পীড়িত হয় না ?

সম্পূর্ণ গল্পটী পড়ে যে তথাকথিত অশ্লীল অংশটুকু নিরর্থক বলে মনে হয় না, বরং উদ্দেশ্য হিসেবে সে অংশটুকু প্রয়োজনের ভিতরে স্থান পায়,—তাকেই বিচ্ছিন্ন করে, তার সমস্ত উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে নিছক অশ্লীলতা প্রচারের জন্যই অশ্লীল অংশ আহৃত করা,—দশের কাছে কতখানি অকল্যাণকর, কত বড় নির্লজ্জতা, তাকি সেই মার্জ্জিত রুচির শুভাকাঙ্ক্ষীদের অন্তরে আঘাত করে না ?

'শনিবারের চিঠি' অল্পদিনের কাগজ নয়—মাঝখানে সে লুপ্ত হয়েও পড়েছিল—তার কারণ কি এই নয় যে তখন 'মণিমুক্তার' হীন উদ্দেশ্যটুকু পরিচালনার দিক থেকে অজ্ঞাত-সন্ধান হয়ে ছিল ?

আজ 'শনিবারের চিঠির' প্রচারাধিক্য কি মণিমুক্তার জন্যই নয় ? 'মণিমুক্তা' ছাড়া অবশিষ্ট অংশ শুধু সাহিত্য-রসিকের জন্যই লেখা হয়—সাধারণের জন্য নয় কখনই। এবং তার প্রচারের কারণটিও এই নয়—যে ঐ চিঠির ক্রেতা মাত্রই সাহিত্য রসিক!

অশ্লীলতাকে বড় করে দেখাবার জন্য কত বড় হীনতার আশ্রয় নিতে হয়, যারা সম্পূর্ণ গল্পটী না পড়েন তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন।—তারা বলেন 'সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমরা অবনত মস্তকে অপরাধ স্বীকার করিব।' —দৃষ্টান্ত অনেকেই দেওয়া চলে, কিন্তু উদ্দেশ্যই (principle) যাঁদের হীন, তাঁদের চোখে আঙুল দিয়েই শুধু তা দেখান যায়—দূর থেকে বলাটা পণ্ড শ্রম মাত্র।

নরেশচন্দ্রের উপন্যাস থেকে আহৃত নির্দোষ অংশও

রিক্তভাবে মণিমুক্তায় স্থান পেয়েছে। অথচ তাঁরাই আধ্যাত্মবাদী প্রবাসীর পবিত্র দেহে 'অচল পথের যাত্রীর' কাম কদর্য্যতাটুকু সপ্রশংস গৌরবে লেপন করেছেন। যে দোষে নরেশচন্দ্রের উপন্যাসের অংশটুকু 'মণি-মুক্তায়' স্থান পেয়েছে, তার চেয়েও অধিকতর দোষে 'অচল পথের যাত্রীর' স্থান প্রবাসীর বুকে প্রশংসিত হয়—এইটুকুই শুধু আশ্চর্য্যের বিষয়।

I propose nothing, I impose nothing, I am only settingforth; 'মণিমুক্তার' এই 'I' এর জন্ম শনিবারের চিঠির শুভাকাঙ্ক্ষীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন আশা করি।

সাহিত্য সমালোচনায় যে ভণ্ডামির স্থান নেই, একথা আজও তাঁদের বলতে হয়—আশ্চর্য্য। নইলে অশ্লীলতা হয় না মোহিতলালের কবিতায়—

যিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলেছিলেন—'আমারও খেলেনা আছে প্রেয়সীর সুচারু চুচুক।' তারপর—'উঠে যাই সম্ভোগের শেষে রক্তহীন পাংশু মুখে, বুকে তবু জেগে রয় ক্ষুধা সর্ব্বনেশে।'

এই যে হীন লালসার রূপ, কবি-মনের এই যে দম্ভ, এই যে সঙ্কীর্ণতা, যেখানে সৌন্দর্য্য নেই, ভাবের তেমন গভীরতা নেই, আছে শুধু অর্থহীন নগ্ন কামনার তীব্র প্রকাশ—তার রূপটি শনিগওলের কাছে অশ্লীলতা হয়না; অথচ অশ্লীলতা হয় শুধু শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনের—অশ্লীলতা হয় শুধু শ্রীবুদ্ধদেব বসুর!

'পুরুষ পীড়ন তলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান
যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নর,—দম্ভদৃপ্ত, নির্ভিক বর্ব্বর
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে, কুন্দ কান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জ্জর'
কিংবা—
শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা—'

যাঁদের কবিতায় সৌন্দর্য্য আছে লালসার অন্তরালে যেখানে মনের পঙ্কিলতাকে চোখে পড়েনা, কবি মনের সুষ্ঠু উদার রুচিটুকুই নানা রূপে দেখা দেয়,—লালসায় বেদনা বোধ আছে অথচ ঘৃণ্য মনোভাব নেই।—'শনিবারের চিঠির' কাছে এ সমস্তই হয় কিনা অশ্লীলতা। তাঁরা বলেন এ গুলো সাহিত্য নয়—কেন নয়? আক্রোশ চাপা পড়ে বলে?

মোহিতলাল ভোগসর্ব্বস্ব কবি,—তার কাব্যের সমগ্রতা বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ—সে কথা অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারও হয়তো নেই। সে কথা সহস্র বার স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করিনে—যেখানে মোহিতলালের কবিতা মোটেই অশ্লীল নয়, সেখানে এদের কবিতা অশ্লীল হয় কেন? তাঁর কামনা যদি সাবলীল হয়, সাহিত্যেও স্থান পায়, এদেরটাই বা পাবে না কেন? যেহেতু মোহিতলাল শনিমণ্ডলের অন্যতম একটি গ্রহ বলে। শুনতে পাই তিনি ওদের কারো মাষ্টার মশাই, আর কারো পরম প্রীতিভাজন বন্ধু! ভক্তি ও প্রীতির মর্য্যাদা বোধ না থাকাটাই অন্যায়—

আজ 'চিত্রবহার' প্রশংসাও এরা করছেন—কেননা চিত্রবহা একখানি খাঁটি সৎ-উপন্যাস, তার ভেতরে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি নেই, নগ্ন কাম-কেলিও নেই। হস্তিনীর বিশেষণ যুক্তা কোন কামক্লিষ্টা নারীর অস্তিত্বও দেখা দেয়নি তাতে—আশ্চর্য্য!

অশ্লীল হত—যদি 'চিত্রবহার' লেখক আর কেউ হতেন। তবুও আশ্চর্য্য 'মণিমুক্তায়' তার স্থান হয়নি।—এর চেয়ে আর ভণ্ডামি হয় না কিছু। হয়তো মনে মনে শনিবারের চিঠির কেউ কেউ বলবেন—তাঁরা তো লেখেন নাই—'কি লাল দেখিয়া মোহিত হয়েছো হে মোর সজনি ধনি!' কিংবা—'পচা গেঁদেলের ঝাড় তুমি হায়, অশোক যুঁথীর বনে।'

তাই কি?

* * *

দন্ত-বিগলিতা 'হসন্তিকার' মুখে যারা অগ্নিসঞ্চার করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। ব্যঙ্গ করবার অক্ষমতা বন্ধু বৈঠকে চলতে পারে, তাতে বলবার কিছু থাকে না, নীরবেই সওয়া যায় হয় তো। কিন্তু সাহিত্যের আসরে তার স্থান হয় না এটুকু জোর করে বলতে পারি।

অনুরূপ কোন পত্রিকার অনুকরণে ব্যর্থ ব্যঙ্গ সৃষ্টি করবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য যদি হটাৎ এসে থাকে, তবে তাকে ঈর্ষা মূলক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

'হসন্তিকায়' অগ্নিসঞ্চার করেছেন—শ্রীঅমল হোম, শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। হোম মহাশয় গোটা আধুনিক সাহিত্যকে 'কামায়ন' আখ্যা দিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি এই কামায়ণের প্রলেপ মেখে 'হসন্তিকা' নাকি অপবিত্র হয়ে পড়েছে,—শিগ্‌গিরই একটি বিরাট হোমের আয়োজন করে 'হসন্তিকা'কে শুদ্ধ করে নেওয়া হবে। আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় আছি।

যে সে কথা নয়, একবারে অগ্নিসঞ্চার—বইয়ের দোকানের আনাচে কানাচে কত 'নিধিরাম সর্দারই' যে দেখা দেন,—তাই শুধু ভাবি।

'হসন্তিকার' জনৈক অগ্নিসঞ্চারক নাকি ঢাকার 'চ্যাংড়া' সাহিত্যিকের কোন লেখা পড়েন নাই,—সম্প্রতি তার 'টান' গল্পটি তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ পড়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন এককালে তাঁর এক বন্ধু নাকি খুব সুন্দর লিখতে পারতেন। কিন্তু তা' এতখানি অশ্লীল যে একা একা পড়লেও লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠতো—এ লেখাটি নাকি তাকেও হার মানিয়েছে।

তবুও এতদিন একটা সান্ত্বনা ছিল 'চ্যাংড়া সাহিত্যিকের লেখা তিনি পড়েন নাই। তা'ও নষ্ট হ'ল দেখ্‌ছি। 'হসন্তিকায়' অগ্নি সঞ্চার করবার মত উপযুক্ত লোক কি বাংলা দেশে একান্তই বিরল ?

হায়রে অন্ধ গৌরব !

অ. ব.

সওদা

'বসুমতী'তে দেখলাম, ব্যবসাদারের সচিত্র ক্যাটলগগুলি মূল্যবান সাহিত্য নয়।

আসছে মাস থেকে ওঁদের মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক এবং বার্ষিক সব কয়টী সংস্করণই কি অমনি বিতরণ করা হবে ? শ্রীমতীর হটাৎ এই উদারতার অন্তরালে গোপন উদ্দেশ্য কিছু আছে ? অথবা শুধুই খেয়াল—

সাহিত্যের একটা নূতন সংজ্ঞা পাওয়া গেছে।—সাহিত্য, কাহারও ফটোগ্রাফ নয়, চিত্র ;—ইতিহাস নহে, সঙ্গীত ; ডাইরি বা জমাখরচের খাতা নহে, একটু হাসি একটু আলাপ একটু মধু। সাহিত্যে কল্পনার মিথ্যা আছে কিন্তু সে মিথ্যারও পরপারে অদ্বৈত সত্য।

এবং লেখকের মগজে মধুর পরপারে যা আছে, সেটুকুর উৎপত্তি মহুয়ার রস থেকে।

বসন্তবাবু কয়েকটা প্রত্নতাত্বিক গবেষণায় এবারে নাম করে ফেলেছেন। এঁর মতে "অনশ্লীল শৃঙ্গাররস ও অকৃত্রিম আদিরিরসই একমাত্র নিত্যকালের সাহিত্যের উপাদান। যে প্রকৃত রসস্রষ্টা সে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু অকারণে আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া কেবলি সৃষ্টি (?) করিয়া যায়!" সাবাস!

অনেকে আছেন, তাঁদের আধুনিক বা তরুণ বলা চলে না, আবার বুড়ো বললেও ক্ষেপে যান।

কিন্তু সখ আছে পুরোমাত্রাতেই।

এঁদের একজন 'সতীর পতি'কে নিয়ে যে কেলেঙ্কারীটা করছেন,—তার আর সীমা পরিসীমা নেই।

হয়তো বা আত্মসমর্থন করবেন এই বলে যে এর আলাদা দার্শনিক মানে আছে। কাজেই চোখ বুজে ভগবৎপ্রেম ভেবে সয়ে থাকতেই হবে।

নাচঘর রেগে গিয়ে নোটিস্ জারি করেছেন, শত্রুর শেষ রাখব না, হয় এস্পার না হয় ওস্পার।

যুদ্ধটা চলবে কি শুধু কাগজে কলমেই, না, রক্তারক্তিও ঘটবে !

ঢাল তরোয়াল যদি কিছু দরকার হয় 'হসন্তিকা' মাসির সুযোগ্য ভাগিনেয় সাতজনকে ঠিকেদার নিযুক্ত করতে পারেন। সুবিধা হবে।

র. প.

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

ধূপছায়ার বিজ্ঞাপনের হার

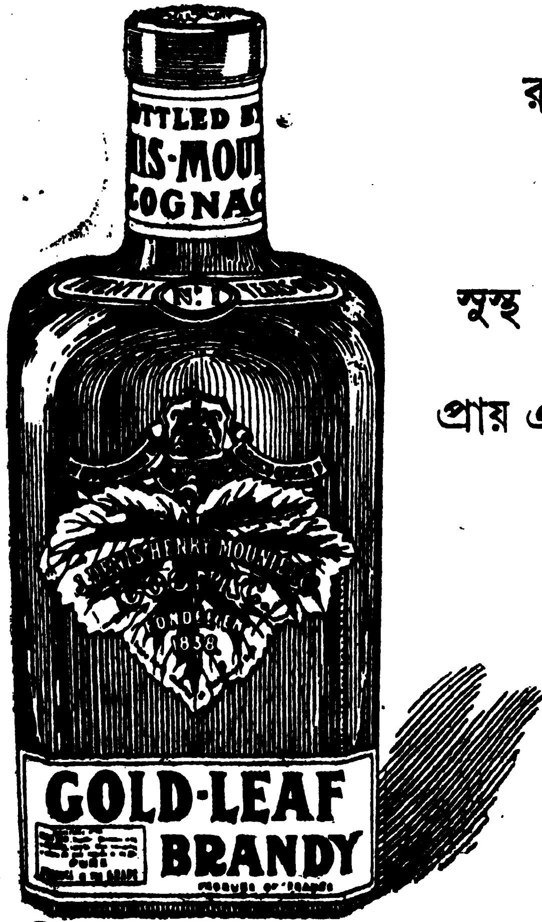
প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৩০৲ টাকা	সাধারণ কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,, ...	৩০৲ টাকা	,, ,, সিকি ,, ...	৫৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,, ...	১৬৲ টাকা	সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,, ...	১০৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,, ...	৩০৲ টাকা	,, ,, সিকি ,, ...	৬৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,, ...	১৬৲ টাকা	টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,, ...	৫০৲ টাকা	আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	১৬৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,, ...	১৫৲ টাকা		

কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

ডেনিস মউনির

গোল্ড লিফ নং ১ ব্রাণ্ডি

বিশ বৎসরের পুরাতনের গারাণ্টি



রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে

ও

সুস্থ দেহ সবল করিতে অদ্বিতীয়!!!

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীতে

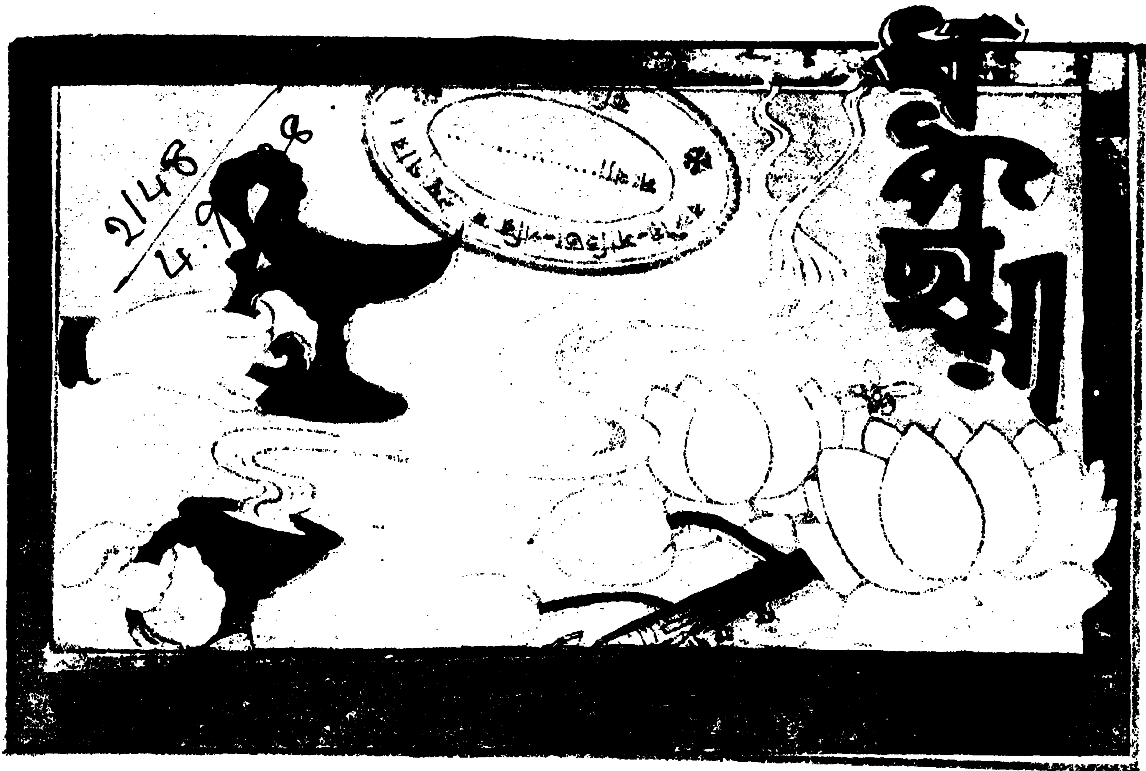
ডেনিসমউনি

পরীক্ষিত ও সমাদৃত।

সোল এজেণ্টস্—এন্, সি, সাহা এণ্ড কোং

কলিকাতা মাদ্রাজ।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।



সম্পাদক—শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শ্রীঅরিন্দম বসু।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



পূজার

যাবতীয় রকম পোষাক ও বস্ত্রের জন্য

একমাত্র

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

সস্তা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

একমাত্র স্বদেশী বস্ত্র বিক্রেতা

১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট; ব্রাঞ্চ—আশুতোষ মুখার্জি রোড় (জগুবাবু বাজার)

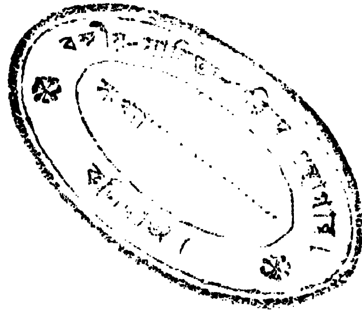
কলিকাতা

বিষয় সূচী



বিষয় সূচী

ধূপছায়া



সম্পাদক—
শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি,
শ্রীঅরিন্দম বসু।

ভাদ্র, ১৩৩৫
দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যালয়—৭৯।২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।



তোমারে পড়িছে মনে

—নজরুল ইস্‌লাম

তোমারে পড়িছে মনে
আজি নীপ-বালিকার ভীরু শিহরণে,
যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছল ছল মুখে
কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে—
তোমারি পড়িছে মনে।
হয়ত তেমনি আজি দূর বাতায়নে
ঝিলিমিলি তলে
ম্লান লুলিত অঞ্চলে
চাহিয়া বসিয়া আছ একা,
বারে বারে মুছে যায় আঁখি জল লেখা।
বারে বারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,
তুমি জাগ, জাগে সাথে বরষার রাতি।
সিক্ত পক্ষ পাখী
তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী
হয়ত তেমনি করি' ডাকিছে সাথীরে,
তুমি চাহি আছ শুধু দূর শৈল-শিরে।
তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন ছায়া
গগনে গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া।.....

আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা—
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে !—জানি আমি জানি
তোমারে পাবনা আমি। এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরি কণ্ঠে—যাহাদেরে কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মত জড়ায়ে রহিল যারা তবু।
আজি হায় দিশাহারা শ্রাবণের অশান্ত পবন,
তারি মত ছুটে ফেরে দিকে দিকে উচাটন মন,
খুঁজে যায় মোর গীত-সুর
কোথা কোন্ বাতায়নে বসি তুমি বিরহ-বিধুর।

তোমার গগনে নেভে বারে বারে বিজলির দীপ
আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝ'রে যায় নীপ।
তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল
আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।
আমার বেদনা আজি রূপ ধরি' শত গীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে—বিরহিনী—তব তরে ঝুরে !

এপারে ওপারে মোরা, নাই নাই কূল !
তুমি দাও আঁখি জল, আমি দিই ফুল।

——:০:——

ধোঁয়া

—শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

মানুষের জীবনের সুখের ক্ষণগুলি ভীড় ক'রে আসে না। যখন আসে, তারা তখন নিজেকে নিয়েই বেশী রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই ব্যস্ততার এক ফাঁকে দুর্লভ মুহূর্ত্তটুকু কোন অদৃশ্য-পথে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সবার আগে এই কথাটাই মনে হোলো।

সেদিন মনের কোন্ অন্তর্নিহিত গভীর বেদনার প্রেরণায় জীবনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, এই ছন্নছাড়া জীবনকে পৃথিবীর রাজপথে টেনে নিয়ে বেড়াতে হবে দিনের পর দিন। আকাশকে আড়াল করে মানুষ যে নীড় রচনা করে হাসি দিয়ে, অশ্রু দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, বেদনা দিয়ে—সে নীড়ে তোমার স্থান নেই। জীবনকে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলার ব্রত তোমার।

কিন্তু আজ মনে হয়, সেদিন জীবনকে শুধু ভুল ব্যাখ্যাই করেছি, গুরুতর ভুল। তাই এতদিন ধরে পৃথিবীর দুয়ারে ঘুরেও মনের স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম না। আমার ভেতরকার অতি সাধারণ মানুষটি আজো তার সহস্র আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে আছে। আজো সে নীড় বাঁধ্‌তে চায়। জীবনকে ফুরিয়ে ফেল্‌তে নয়, ভরে তুল্‌তে চায়।

আমার এ ছন্নছাড়া জীবন সুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মিনতিকে বলেছিলাম, পুরুষ আর নারীর সম্বন্ধ খুব নিকটতম। সেই জন্যেই বোধ হয় পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে চিন্‌তে পারে না। দেখ্‌ছ না, এতদিন পরে তুমি আমায় কাছে ডাক্‌লে, আমায় চাইলে—আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমার পথের জীবন সুরু হলো। অথচ তোমায় আমি পাব, এই আশাতেই তোমার কাছ থেকে কত অপমান মাথা পেতে নিয়েছি, কত বিদ্রুপের তীক্ষ্ণবান সহ্য করেছি এতদিন। তুমি তখন ফিরেও চাও নি আমার দিকে। ভালবাসাকে কসাইয়ের মতো ছুরি দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করাই যেন তোমার আনন্দের খেলা ছিল।

মিনতির চোখের জলে বান ডাকিয়েই আমি সেদিন পথে বেরিয়েছিলাম।

সেদিন মনের ভেতর ছিল প্রতিঘাত দেওয়ার একটা নিষ্ঠুর আগ্রহ—একটা নির্ম্মম উল্লাস। বুকের রক্ত-রাঙা ক্ষত স্থানটার উপর সেদিন যেন অমৃত-প্রলেপ পড়েছিল। মনকে অহঙ্কারে চোখ রাঙিয়েছি—ফুল যদি তোর ফুটলোই না, তাকে চোখের জল দিয়ে আর ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা কেন? মুকুলের ব্যথাকে বুকে চেপেই তোর যাত্রা পথের চলা সুরু হোক্।

তারপর কতদিন কেটেছে। পৃথিবীর পথে-বিপথে কত দীর্ঘ রজনী কত সোনার প্রভাতের মাঝে নিঃশেষ হয়েছে,—কত দীর্ঘ দিনের আলো কত রাত্রির কালো মায়ায় ডুবে গেছে। কত নদ-নদী পাহাড় কান্তার আমায় সান্ত্বনার হাতছানি দিলে, অম্‌নি ঝড়ের মতো উড়ে চল্‌লাম। কিন্তু সান্ত্বনা সত্য কিছু পেয়েছি কি? মোটেই নয়। মরীচিকা ভ্রান্ত মরু-পথিকের মতো আমায় কেবল ছুটিয়েই নিয়ে চলেছে।

আজ কদিন হয় পশ্চিমের এই পার্ব্বত্য পল্লীটিতে এসে আস্তানা পেতেছি। আর এক পা-ও নড়্‌তে সাধ যায় না। পৃথিবীর আকাশ বাতাস গাছপালা—সবই যেন আজ নেহাৎ পুরানো বলে মনে হচ্ছে। বড় ক্লান্ত, বড় অসহায়—

আকাশে আজ নীড় ভাঙার মহোৎসব লেগেছে। ছেঁড়া মেঘের টুক্‌রোগুলি লক্ষ্যহীন গতিতে ছুটে চলেছে

অনন্ত আকাশ-যাত্রায়। পলকহীন চোখে তাই দেখ্‌ছি।…… আজ্‌কের দিনে পেছনে ফেলে-আসা দিন গুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সাধ যায়। বুকের মণি-কোঠায় যে কথাগুলিকে পৃথিবীর চোখের আড়াল করে তুলে রেখেছিলাম, সেখান থেকে আজ তাদের টেনে বের করতে একটুও বেদনা হয় না। অনেক কথাই আজ হয়তো নির্ব্বিকার ভাবে বলতে পারি। আজ আর মনের সেই বিরাট অহঙ্কার নেই, কারো উপর এতটুকু অভিমান নেই—অভিযোগ নেই।

* * * *

আমার জীবনে বোধ হয় মায়ের পরেই পলাশকে আপনার করে পেয়েছিলাম। তাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে আমার মন উঠ্‌তো না—আজো নয়। সংসারের এই একটি লোকের কাছেই আমি আমার দারিদ্র গর্ব্বকে বাঁচিয়ে চল্‌তে পারিনি। আমার প্রয়োজনের কথাটা যদি আমার মুখ দিয়ে কোনদিন না বেরোয়, এই ভয়ে সে মেসে আমাদের দুজনের জন্য একখানা সম্পূর্ণ আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে আমাদের সাংসারিক জগৎটিকে এক সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল। সেখানে অভাব বলে কোনো কথা উঠ্‌তো না কোনোদিন, আর সেই স্বচ্ছলতায় আমার সংকোচ এলে সে মুখ ভার করে থাকতো। তার মনের চারদিকে এই গুমোট্‌ জমিয়ে রাখাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না।

এই নিবিড়তার মাঝ খানদিয়ে আমরা উভয়ে বি,-এ পাশ করি। তখন দীর্ঘ ছুটি। উভয়েই বাড়ী এলাম। মনের ভেতর অদম্য জ্ঞান স্পৃহা, সেখানে বিরাট জগতের সৃষ্টির কাজ চল্‌ছে। দিনের পর দিন ধরে তারই অশ্রান্ত আলো-চনায় আমাদের দুজনের দিন কাটতে লাগ্‌লো।

মিনতি তখন মিশনারী স্কুলে পড়ে। স্বল্প বিদ্যা দিয়ে আমাদের আলোচনার মর্ম্মার্থটি ধরতে পারতো না সব সময়। কাজেই আমরা দু'জনে আলোচনা সুরু করলেই ও ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌তো। আমরা ওকে এড়িয়ে চল্‌তাম—কিন্তু এ অপমান কিছুতেই ও সহ্য করতে পারতো না।……

তিনজনে মিলে গল্প সুরু হোলো, হয়তো এক সময় কোন্‌ ফাঁকে আমাদের দু'জনের মাঝে সাইকোলজির তর্ক উঠে পড়্‌লো; গল্প যাক্‌ চুলোয়—বাকী জগতের অস্তিত্বটাই একেবারে ডুবে যেতো! মিনতি বেচারী মুখ ভার ক'রেই হয়তো চলে গেছে। প্রায়ই এম্‌নি হত।

একদিন এম্‌নি এক তর্কের শেষে বাড়ী ফিরবো, দরজার কাছে এসে জুতো জোরা পাওয়া যায় না। এদিক ওদিক খুঁজে পেতে শেষটায় পলাশকে বল্‌লাম। পলাশ তো বাড়ী মাথায় করে তুল্‌লো। মিনতিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে, ও এসে বল্‌লে, ও আমি ফেলে দিয়েছি সে কোন্‌ সকালে। যা না ছেঁড়া তালি দেওয়া জুতো, তায় আবার ডেলা ডেলা কাদা লেগে আছে। ধোওয়া মেঝেটাই নোংরা হয়ে গেছে একেবারে। এরকম জুতো না পায়ে দিয়ে খালি পায়ে হাঁট্‌লে অপমান হয় কারো?

আমার সমস্ত রক্ত ছুটে এসে হয়তো মুখের উপর জমা হয়েছিল, রাগে নয়, লজ্জায় নয়—আমার দারিদ্রের অপমানে। কারো দীনতাকে উপলক্ষ্য করে এরকম নিষ্ঠুর উপহাস কেউ করতে পারে—এ আমার জানা ছিল না।

পলাশ রেগে চোখ লাল করে মিনতিকে বল্‌লে, পরের জিনিষ ফেলে দেবার তোর কী অধিকার আছে—শুনি? ইষ্টুপিড্‌ মেয়ে কোথাকার?

মিনতি কিন্তু তার রাগকে মোটেই গ্রাহ্য না ক'রে আমার দিকে একটু কটাক্ষ ক'রে হেসে বল্‌লে, তা অত রাগ করছো কেন দাদা? সামারের ছুটিটা ফুরোলেই কল্‌কাতা গিয়ে বন্ধুকে এক জোড়া জুতো কিনে দিও। ওঁর এতে লাভ বই ক্ষতি তো হয়নি কিছু, তবে একটা দিন একটু অসুবিধা—তা' না হয়……

ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ওই অসভ্য মেয়েটার মাথাটা পাশের দেয়ালটার গায়ে বেশ ক'রে ঠুকে দিই। কিন্তু কিছুই না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

পলাশ নিবিড় বেদনা-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে

রইলো। সে আমাকে ভালো ক'রেই জান্‌তো—তাই কোন কথা সেদিন আমাকে বল্‌তে আর সাহস করেনি।

কদিন ধরে ওদের বাড়ীতে আর যাইনি। পলাশই এখানে আসে। জীর্ণ ঘরের ছারপোকা ভরা খালি তক্তপোষের উপর বসে আবার তর্কের আসর জম্‌তে থাকে।

একদিন পলাশ বলে, জানিস্ অলক, মিনতিটা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে এবার। ও মনে করেছিল, তোকে তাড়ালেই আমাকে ওর গল্পের আসরে পাবে। কিন্তু এখন দেখ্‌লে ঠিক উল্‌টো। বাড়ীর ভেতর এক খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া আমার টিকিটিও কারু দেখবার জো নেই—

বলি, এ তোর ভার অন্যায় পলাশ। বেচারীর একটি সঙ্গী তো নেই যে বসে দুদণ্ড আলাপ ক'রে। তোকেও যদি রোজ রোজ আমিই আট্‌কে রাখি, তা'হ'লে ও দাঁড়ায় কোথায়? কাল থেকে আর আমাদের বাড়ী আসিস্‌নে।

—একশোবার আস্‌বো। যেমন দুষ্টু মেয়ে তেমন জব্দ হোক্।

একদিন দুপুর বেলা পলাশের আশায় বসে আছি। হঠাৎ মিনতি এসে উপস্থিত। অবাকই হয়েছিলাম একটু। কিন্তু মিনতি খুব সচ্ছন্দভাবেই বল্‌লে, দাদার অসুখ করেছে। তোমাকে শীগ্‌গীর একবার যেতে হবে অলকদা—

পথে দু'জনে পাশাপাশি চলেছি।

মিনতি একটু কাছে ঘেঁষে বল্‌লে, দাদাকে খুব ভালোবাসো, না অলকদা? আজ যদি দাদার কোন অসুখ না কর্‌তো, অম্‌নি আমাদের বাড়ী যেতে বল্‌তাম—যেতে না তো?

একটু হেসে বল্‌লাম, যেতাম।

তবে এতদিন যাওনি কেন?

তুমি তো অম্‌নি করেও একদিন তোমাদের বাড়ী যেতে বলোনি—

মিনতি এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। হাস্‌লে কি সুন্দরই না ওকে দেখায়! গাল দু'টিতে ছোট্ট দুটি টোল......।

বাড়ীতে ঢুকে পলাশের ঘরে নিয়ে বসিয়ে মিনতি বল্‌লে, দাদার অসুখ করেনি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। দাদা মামার বাড়ী গেছে মাকে আন্‌তে। কয়েকটা দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে তাই—

আমার পাশের চেয়ারটাতে বসে মিনতি ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলো। তারপর বল্‌লে, তোমার কাছে কয়েকটা স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই অলকদা। তুমি আমাকে কী মনে কর বলত?

মিনতির মুখের দিকে তাকালাম। কিছুই বোঝ্‌বার উপায় নেই। এই কিশোরীটির সবই যেন একটা রহস্যের আবরণে ঢাকা। তবু সাহস করেই বলি, তোমাকে অনেক কিছুই মনে করতাম মিনতি—আজো করি। আজো আমি মনের সে দুরাশাকে বিদায় দিতে পারিনি, কোনো দিন পার্‌বো—সেকথা ভাব্‌তেও ভয় হয়।

সে ভয়েই বুঝি দাদার সঙ্গে ভাবটা খুব জমিয়ে রাখছো। দাদাকে হাতে রাখ্‌লে সেদিকে খুব মস্ত একটা সুযোগ হ'লেও হতে পারে—না? কিন্তু কতখানি দুঃসাহস তোমার—সেইটে দেখেই অবাক হয়ে যাই। তোমার ওই জীর্ণ কুঁড়ের পিঁজরায় নিয়ে পুর্‌তে চাও আমায়?—জানো, ওখানে আমার পা রাখবার মতো উপযুক্ত ঠাঁই হয়নি আজ পর্য্যন্ত......

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম, তা জানি। তোমরা এখানকার জমিদার, অগাধ তোমাদের ধনসম্পত্তি, অসীম তোমাদের প্রতাপ—সেই জন্যেই কাউকে বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান কর্‌তেও একটু বাধেনা তোমাদের। যাই হোক্—আজ থেকে তোমাকে সেই ভাবেই মেনে চল্‌বো। কিন্তু পলাশের কথা? একথা আমি জোর করেই বল্‌তে চাই—পলাশের উপর আমার যতখানি অধিকার আছে, ততখানি তোমারো নেই।

আর সেখানে এক সেকেণ্ডও দাঁড়াইনি। অপমান ফিরিয়ে দেবার একটা দুর্দ্দম আগ্রহ আমার কণ্ঠ ঠেলে

উঠ্‌তে চাইছিল, সেখানে থাকলে হয়তো মিনতিকে এমন কথা বলে ফেল্‌তাম—যার জন্ম বাকী জীবনটা শুধু অনুতাপ ক'রেই কাটাতে হতো।......

ছুটী ফুরিয়ে এলো।

একদিন পলাশ বল্‌লে, ছুটি তো ফুরিয়ে গেল অলক। এবার কল্‌কাতা রওনা হবার একটা দিন ঠিক করতে হয়।

আমি বল্‌লুম, আমি তো যাবোনা পলাশ। পড়াশুনা আর আমার চল্‌বেনা।

পলাশ একটু অবাক্ হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালে। বল্‌লে, সেকি কথা? প্রেসিডেন্সীতে আমরা দুজনেই যে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছি। মামা কল্‌কাতা ছিলেন, তাঁকে ভর্ত্তি করে রাখ্‌তে লিখে দিয়েছিলাম। এখন এ তোর অন্যায় কথা অলক।

আমি বিস্মিত হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। এর ভেতর ভর্ত্তি করা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে! বল্‌লাম, আমাকে অবাক্ কর্‌লি যে পলাশ।

কোথা থেকে ঝড়ের মতো মিনতি এসে বল্‌লে, বন্ধুর টাকায় দিয়ে এম এ পড়ার সুবিধা হলে অবাক্ হবারই কথা বটে। আমিও অবাক্ হই এই ভেবে যে, মানুষ কত খানি নির্লজ্জ হতে পারে—

পলাশ ধম্‌কে বল্‌লে, তোর বড় বাড় হয়েছে মিনতি। আর সহ্য করা চলে না, এবার আমি বাবাকে লিখ্‌বো।

যাওনা, লেখগে বাবার কাছে। আমিও বল্‌বো, দাদা যাকে তাকে টাকা দিয়ে দাতাকর্ণ সাজছেন।

বলেই আমার দিকে একবার জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিনতি ঝড়ের মতোই ছুটে গেল।

পলাশের শত অনুরোধ সত্ত্বেও আর কল্‌কাতা যাইনি। পড়াশুনা এইখানেই শেষ। দরিদ্রের এম এ পাশ হ'তে নেই। পরের অর্থ দিয়ে বি এ পাশ করাও তার উচিৎ নয়, কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। সে পথ থাক্‌লে ফিরিয়ে দিতাম হয় তো।

পলাশ কলকাতা চলে যাওয়ার পরে আর কিছুই ভালো লাগ্‌তোনা। এতদিনের এক সূত্রে বাঁধা জীবনটা কে যেন দুভাগ করে কেটে দিয়েছে। দিনে দিনে নিঃসঙ্গ জীবন দুঃসহ হ'য়ে গেলো। বাড়ীতে এক মুহূর্ত্তও থাকতে ইচ্ছে হয় না।

মিনতি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আস্‌তো। মার সঙ্গে গল্পও করতো। পড়ার ঘর থেকে বসে বসে শুনতাম। মেয়েটার ছেলেমানুষি দেখ্‌লে হাসি পেতো—একাএকাই। আমার কাছে ও বড় একটা ঘেঁষতোনা।

একদিন বিকেলের দিকে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছি। পেছনে পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি—মিনতি এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে। কিছু না বলে হাতের কাজ ক'রে যেতে লাগ্‌লাম। সমস্ত শেষ ক'রেও দেখি, ও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এসে বল্লাম, বাড়ী যাবে না মিনতি? আমিও তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি এখন।

মিনতি একবার আমার মুখের দিকে তাকালে। ঐ মুখখানা আজ কেমন যেন অস্বাভাবিক, গম্ভীর।

বল্‌লে, চলো।

পথে যেতে যেতে একবার বল্‌লে, কোথায় যাবে অলকদা, সব গুছোচ্ছিলে যে—

শুধু বলি, সে খোঁজে তোমার কী দরকার—শুনি?

থাক, শুনতে চাইনে। বলেই মুখখানি ভারি করে চল্‌তে থাকে—আমারই পাশে পাশে।

বাড়ী গিয়ে শুধোই, জেঠাই মা কোথায়?

আস্‌বে এখুনি, বোস।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটে। শেষে মিনতিই সুরু করে। বলে, জানো অলকদা, দাদার আজ চিঠি এসেছে। সেই কথাই তখন তোমাকে বলতে গেছলাম! লিখেছে—তোমাকে যেন আমি পাঠিয়ে দিই—

হঠাৎ আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন এক ঝলক গরম রক্ত বয়ে গেল। তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম আজো আমি তেম্‌নি গরীবই আছি মিনতি, আর মানুষ

কতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারে সেকথাও বেশ মনে আছে। গরীবকে নিয়ে খেলতে খুব ভালো লাগে জানি। তার মর্ম্মস্থান তীক্ষ্ণ নখে ছিঁড়ে দিয়ে তামাসা দেখতেও খুব আনন্দ হয়—

আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

জেঠাইমা দোরের কাছ থেকেই ডেকে বললেন, ওকি হচ্ছেরে? তোরা দু'টিতে একত্র থাক্‌লে ঝগড়া না করে বুঝি একদণ্ডও থাকতে পারিস না—

মুখের ভাব চেপে জোর ক'রে একটু হাসি এনে বললাম, ও কিছু নয় জেঠাইমা।

তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে জানালাম আজ বাড়ী থেকে যাচ্ছি কিনা, তাই দেখা ক'রে গেলাম। বহরমপুরে একটা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী পেয়েছি—

আর একটুও দেরী করিনি। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দু'বছর পর সেবার পূজোর ছুটিতে বাড়ী আসি। তখন মিনতিরা সবাই পাটনা চলে গেছে। সেখানে ওদের জমিদারী ছিল। পলাশও এবার প্রেফেসর হ'য়ে গেছে পাটনা কলেজে।

আরো দু'বছর পরে মার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী আসি। তার দিন কয়েক পরেই মিনতিরাও সবাই বাড়ী এল।

সেদিন একটু রাত্তিরে বাড়ী ফির্‌তেই মা বল্‌লেন, এই বুঝি তোর সন্ধ্যের আগে বাড়ী ফেরা। পলাশ আর মিনতি এসেছিল দেখা কর্‌তে। তোর জন্য এতক্ষন বসে থেকে এই তো চলে গেল।

মার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে মা। দেশে এসেছে যখন দেখা হবেই। আচ্ছা মা, পলাশ আজকাল খুব বড় হ'য়েছে দেখ্‌তে—না? চার পাঁচ বছর তো দেখিনি—

মা হেসে বল্‌লে, তোর যেমনি কথা! দেখ্‌তে আবার বড় হবে কিরে?—সে কি চার বছর আগে একেবারে খোকাটি ছিল? হ্যাঁ, তবে মিনতির চেহারা অনেক বদ্‌লে গেছে বটে। শুন্‌লাম, এবার নাকি ওর বিয়ে হবে—তারি জন্যে সবাই বাড়ী এসেছে।

মা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে রইলেন।

মার বেদনা যে কোথায়, তা হয় তো বুঝি।

কিন্তু চুপকরেই থাকি।......চার বছর আগেকার একটি গর্ব্বিতা অহঙ্কারী মেয়ের স্বাস্থ্য-নিটোল চেহারাটি চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে—

তার সমস্ত অন্তরটার মধ্যে দয়া মায়ার একটু লেশও নেই—আছে কেবল তীব্র বিদ্রূপ কর্‌বার স্পৃহা, মানুষকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত দেবার প্রবৃত্তি, আর নিজেকে সবার কাছে দুর্ব্বোধ্য ক'রে রাখার অদ্ভুত খেয়াল।......

পরদিন সকাল বেলাতেই পলাশ এসে হাজির।

একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর টেনে নিলে। তারপর এই চার বছরের জমানো সব কথা একে একে বলা সুরু হ'ল।

মাকে বল্লে, কাকীমা, এবার ভালো হলেই আপনাকে পাটনায় নিয়ে যাবো। দেখবেন খুব ভালো লাগ্‌বে আপনার—

সেই আগেকার আব্দারের সুর। সেই পলাশই আছে।

একটু হেসে বলি, এখনো তোর ছেলেমান্‌ষি গেল না, তুই ছেলেদের পড়াস্ কি করে শুনি?

ও কিছুতেই ছাড়ে না।

বলে, এখুনি যেতে হবে। মা, আর মিনতি বার বার বলে দিয়েছে। কাকীমা, এ বেলা ও আমাদের ওখানেই খাবে।

এর পরে আর আপত্তি চলে না।

মিনতিকে দেখ্‌লাম। হঠাৎ চেনা যায় না। এ যেন সে মিনতিই নয়। মাঝের এই চারটে বছরের মধ্যে এমন

করে সে বদলে গেছে যে, তাকে মিনতি না ভেবে অন্য যে-কেউ ভাবতেও একটু আশ্চর্য্য লাগে না। কিন্তু দুষ্টামি-ভরা চোখদুটো যেন ঠিক তেম্‌নিই আছে।

একটু হেসে বল্লে, সত্যি অলকদা, এ চার বছরে ঠিক মাষ্টার মশায়ের মতো চেহারা হয়ে গেছে তোমার। ছেলেদের খুব বেত মারো বুঝি? দাদা বলে, কলেজের ছেলেদের নাকি সে রীতিমত ভয় করে।

একটু হেসেই জবাব দিই—আমাদের কিন্তু ঠিক উল্টো। ছেলেদের ভয় করে চল্‌বার বয়স হবার আগেই আমরা তাদের আমাদেরই অধিকারের গণ্ডীর বাইরে পৌঁছে দিই—এর আগে পর্য্যন্ত ওই যা বল্লে, বেতের জোরেই সব আপনা থেকে ঠিক হয়ে যায়।

পলাশ কিন্তু বার বারই অন্য কথা তুলে এই স্কুল কলেজের আলোচনাটা চাপা দিতে চায়। এ বিষয়ে তার মনের ভেতরে প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা আছে—বুঝ্‌তে পারি। আমারো কি নেই? আজ আমিও কি এই ছেলে ঠেঙানো স্কুল-মাষ্টার না হয়ে কলেজের প্রোফেসর হ'তে পারতাম না? তাহলে হয়তো এই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণও একদিন লাঘব হ'য়ে আস্‌তো।

মিনতিই না আমার জীবনের অভিশাপ!

আগের মত আর ওদের সঙ্গে মিশি না—ইচ্ছে করেই। পলাশের সঙ্গেও আর সে রকম সারাদিন ধরে তর্ক চলে না। বাড়ীর ভেতরেই বেশী সময় মার কাছে বসে থাকি। মার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, কারণ বেশীদিন আর এ সুযোগ পাওয়া যাবে না—বেশ বুঝ্‌তে পারি।

পলাশ মাঝে মাঝে আসে। কী যেন একটা কথা আমার কাছ থেকে সে শুনতে চায়। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের আলোচনাটাকে ওই একটা বিশেষ দিকেই টেনে নিয়ে চলে। বুঝ্‌তে পারি সবই, কিন্তু ওই বিশেষ কথাটিকেই বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলি। আজ আর মনের সে সাহস নেই।

মিনতিও আসে। আমার পাশে বসেই মার সঙ্গে গল্প করে। তার মাথা টিপে দেয়। সেই অহঙ্কারী গর্ব্বিতা মেয়েটি যেন তার ভেতরে মরে গেছে। জীবনের পরিপূর্ণতার ভারে তার কাছে আজ পৃথিবীর রঙ্‌ও বদ্‌লে গেছে। সংসারের অনেক কিছু অভিজ্ঞতাই তার হয়তো হয়েছে আজ। তবু মনে হয়—দিন দিন সে আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য হয়েই উঠছে। ওই কাজল ভুরুর নীচে চির রাত্রির অপরূপ রহস্য ভরা স্থির দুটি চোখের তারা কী অপার বিস্ময়ই না সৃষ্টি করে চলেছে আমার মনে—বুঝতেও পারি না যেন।

মাকে আর বেশীদিন ধরে রাখতে পারিনি। এক ধূসর সন্ধ্যায় মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন। সংসারের একমাত্র বন্ধন আমার, তাও নিয়তির তীক্ষ্ণ আঘাতে ছিন্ন হলো আজ।

পলাশ এসে হাত ধরে তাদের বাড়ী টেনে নিয়ে গেল। বল্‌লে, যে কটা দিন বাড়ী আছিস্‌, আমার কাছেই থাক্‌ অলক। এই শূন্য বাড়ীটায় একাকী পড়ে পড়ে চোখের জল ফেল্‌বি—এ আমি কিছুতেই সইতে পার্‌বো না।

নির্ব্বিকার ভাবেই থেকে যাই বটে, কিন্তু মন যেন দিন দিন মুক্তির জন্যে অস্থির হয়ে উঠতে চায়। এই গৃহ-কারাগারে বন্দী হ'য়ে আর থাকতে পারিনে, হাঁপিয়ে উঠেছি। পৃথিবীর আলো বাতাসের মাঝে মুক্তি পেতে চাই—বিরাট জগতের রাজপথে বেরিয়ে পড়্‌তে চাই। ...

একদিন শুনতে পেলাম—মিনতির নাকি বিয়ের সম্বন্ধ চল্‌ছে কোন্‌ এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু একটুও আশ্চর্য্য হই না। কোনো ভিখারীর ছেলের সঙ্গে যে তার বিয়ে হবে না, এতো জানা কথাই।

রাত্তিরে পলাশ বল্‌লে, তুই কি কিছুই বল্‌বিনে অলক? আমার কাছেও কি নিজেকে দুর্ব্বোধ্য ক'রে রাখ্‌বি? মিনতির সম্বন্ধে তোর নিজের কোনো কথা আছে—এ আশা যে আমি আজো করি।

একটু অভিমান হলো। ওদিকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, আর এদিকে এখন মৌখিক ভদ্রতা —হায় রে!

সহজ ভাবেই বলি, যদি কোনোদিন কিছু ভুল মনে করে থাকো, তাহ'লে আজ তা ভুলে যাও। আমার কোনো কিছু বল্‌বার নাই—

পলাশ আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল। মনে হোলো—কতখানি বেদনাই না ওকে দিলাম আজ! ইচ্ছে হোলো, একবার ডেকে ফিরাই, জীবনকে আর পদে পদে ফাঁকি দিতে চাইনে।

কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে মিনতি এসে ঘরে ঢুক্‌লো—আশ্চর্য্য! ওর সমস্ত মুখে চোখে যেন একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। সারা দেহটিও যেন দীপশিখার মতো কাঁপছে। এসেই বল্‌লে—তোমাদের কথা আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছি। দাদার নির্লজ্জতার জন্ত তোমার কাছে আমি তার হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি। কেন যে সে তোমার কাছে এই হীনতা স্বীকার কর্‌তে এসে, নিজেকে ও আমাকে অপমান কর্‌লে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। যার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে, তার চাল আর চুলো এদুটো জিনিষ অন্ততঃ আছে কিনা সেইটে না দেখেই দাদার কোনো কথা তুল্‌তে যাওয়াই অন্যায়।

একটু রূঢ় হাসি হেসে বলি, ঠিক কথাই বলেছ তুমি। আমারো ভয়ানক অন্যায় হতো—যদি চাল এবং চুলো না থাকা সত্ত্বেও তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে জড়াবার দুঃসাহস কর্‌তাম।

রাগে দু'চোখ লাল ক'রে মিনতি বল্‌লো, দুঃসাহস কর্‌বার স্পর্দ্ধা তো বড়! তোমার মতো এক কপর্দ্দক-হীনের হাঁ-নার উপর যে-জীবনের এতবড় একটা সমস্যা নির্ভর কর্‌ছে, সে জীবনকে আমি বাঁচিয়ে রাখ্‌তেও ঘৃণা বোধ করি। পরের বাড়ীতে বসে দিনের পর দিন নিঃসঙ্কোচে কাটাতে যার এতটুকু লজ্জা হয় না, তার মুখে এসব কথা শুনলে হাসিই পায় শুধু—

বলেই সশব্দে দরজাটা ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। সাড়ীর আঁচলটাও পেছন দিয়ে লুটিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

শূন্য বাড়ীটা খা খা করে—এম্নিই নিঝুম। তাকাতে পারিনা কোনদিকে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই মার কল্যাণী হাতের স্পর্শ। চোখের জল আজ আর বাধা মান্‌তে চায় না।

অন্ধকারে ঘরের ভেতরে পাইচারী কর্‌ছি। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ শুন্‌তে পাই। মনে হয়, কোন্ বিরহিণী প্রিয়া একাকিনী অনন্ত রাত্রি ধ'রে গাছের পাতায় পাতায় এইরকম ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। আকাশের তারারা তাদের কম্পিত দৃষ্টিকে পাঠিয়ে পৃথিবীর এই রাত্রিকে অপরূপ ক'রে তুল্‌ছে। মনের অনুভূতির মাঝে সব কথা আপনা থেকেই পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে।

মিনতির কথা ভাবি। তার মনের চারিদিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো যে প্রচ্ছন্ন অটুট ব্যবধানটি সে সৃষ্টি করে রেখেছিল, সে-মনের ভেতর কি এতটুকু দুর্ব্বলতাও ছিলনা আমার জন্যে? জানি না। জান্‌লেও সে দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথে আর অভিমান করবার মতো মনের আগ্রহ নেই। নিজেকে অনেক অপমান করেছি, পলে পলে আত্মহত্যা করেছি,—আর গোপনতার পথ ধ'রে নারীর অন্তরে প্রবেশ লাভ কর্‌তে চাইনে। যে মেয়েটি আপনার অন্তরের একটা স্পর্দ্ধিত প্রবৃত্তিকে বড় ক'রে রাখ্‌বার জন্য নিজের ঈপ্সিত জিনিষকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পারে, সে তার অহঙ্কার নিয়েই বেঁচে থাকুক—

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আস্‌ছে বাইরে থেকে। রাত্রির বুকে এই উদাস গন্ধটুকু কোন্ ঘর-ছাড়া জীবনের ইঙ্গিত যেন।

বিকেলের দিকে পলাশদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে

এলাম। পলাশের চোখে আজ সত্যি জল। একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, তাকে আমি বাধা দোব না অলক, কিন্তু আমার আজো মনে হয়—তোরা দু'জনেই ভুল পথে চলেচিস্। এ ভুল না হলেই ভালো ছিল।

মিনতির সঙ্গে দেখা হয়নি। সে তখন বাড়ী ছিলনা।

সন্ধ্যারাতেই আকাশে আজ চাঁদের আলো অপরূপ মায়ায় সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর বুক যেন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আনন্দে টলমল—শিশু গাছগুলি তাদের কচি শাখাবাহু আন্দোলিত ক'রে সে আনন্দধারা আকণ্ঠ পান করছে। বাতাস যেন মাতাল।

ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আকাশের তারারা ঝিক্ ঝিক্ ক'রে হাতছানি দিলে। সুদূরবিসারী জ্যোৎস্নালোকের ধারা অনন্ত শূন্যালোকের মাঝে যেন একবার দুলে উঠলো। নিশাচারী কেন একটা পাখী আনন্দে আমার মাথার উপর দিয়ে ডেকে গেল।

সহসা দমকা বাতাসের মতো মিনতি এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখে কিছুতেই প্রকৃতিস্থা বলে মনে করা যায় না। চোখ দু'টি অস্বাভাবিক লাল, যেন ঠিক্‌রে পড়বে এখনি। আমার মুখের দিকে জলন্ত চোখদুটি তুলে বললে, কোথায় যাচ্ছ আমায় না বলে?

অন্যদিন হ'লে হয়তো বলতাম, জীবনের সবকিছু কাজই তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে, এ অধিকার আমার উপর তোমার কবে থেকে হলো মিনতি?

কিন্তু আজ সে কথা মুখে এলো না। সহজ ভাবেই জানালাম—কোথায় যাচ্ছি, তার কোনো ঠিকানা নেই মিনতি, তবে যাচ্ছি এইপর্য্যন্ত। তোমার সঙ্গে দেখা করতে তোমাদের বাড়ীও গেছলাম—তুমি তখন ছিলে না।

মুহূর্ত্তকাল চুপ করে থেকে সহসা সে বলে উঠলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

বুঝতে পারি, মিনতি নিজেকে কতখানি দমিয়ে রেখে তার মনের এতবড় দুর্ব্বলতাটাকে আমার কাছে আজ মেলে ধরছে। হায় দুর্ভাগা নারী, তোমার অধঃপতনে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। মনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের তলেও তো তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় কথাটিকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না। আজ যে এক মুহূর্ত্তেই সব বান-ভাসি হয়ে গেল।

বললাম, সে হয় না মিনতি। জীবনে অনেক ভুলচুক হয়ে গেছে। আর নয়, এবার ওসবের বাইরে যেতে চাই।

মিনতি আবেগ-কম্পিতস্বরে বলতে লাগলো, আজো তুমি সেসব কথা মনে ক'রে রাখতে চাও? আজ আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেদিকে কি একবারো চাইবেনা? আমার দেওয়া সমস্ত অপমান আর কতটুকু, আজ যদি এম্নি রাত্রে আমাকে একাকী ঘরে ফিরে যেতে হয়, সে অপমানের কি আর সীমা আছে? কেবল তুমিই সে অপমানকে আমার ঢেকে দিতে পারো আজ—

একখানি কম্পিত কোমল হাতে আমার হাতখানা ব্যাকুল ভাবে জড়িয়ে ধরলো।

যে প্রিয়া সারা জীবন ভরে নিজেকে সুদূর আকাশের তারার মতো মনে করতো,—আজ সেই দুরন্ত প্রিয়া পোষমানা পাখীর মতো আপনা থেকেই এসে ধরা দিয়েছে। কিন্তু মনের যে-ঘরে মানুষের সুখ দুঃখ সাধ আশা ভোগের স্বপ্ন রচনা ক'রে, আমার সে ঘরের দুয়ারে আজ জগদ্দল পাষাণ ভার চাপা পড়েছে।......প্রতিঘাত দিতে হবে। সমস্ত জীবন ধ'রে আঘাত সহ্য করেছি, আজ এই বিদায় বেলার শেষ মুহূর্ত্তটিকে মনে রাখবার জন্যে শুধু একটিবার তাকে সে-আঘাতের বেদনা ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

অতি সন্তর্পণে মিনতির হাতের বাঁধন থেকে নিজের হাতটিকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বললাম, পুরুষ আর নারীর সম্বন্ধ খুব নিকটতম। সেই জন্যেই বোধহয় পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে চিনতে পারে না। দেখছ না, এতদিন পরে তুমি আমায় কাছে ডাকলে, আমায় চাইলে—আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমার পথের জীবন সুরু হলো। অথচ তোমার আমি পার—এই আশাতেই তোমার কাছ থেকে

কত অপমান মাথা পেতে নিয়েছি, কত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবান সহ্য করেছি কতদিন। তুমি তখন ফিরেও চাওনি আমার দিকে। আমার ভালোবাসাকে কসাইয়ের মতো ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করাই যেন তোমার আনন্দের খেলা ছিল—

মিনতির চোখের জলে বান ডাকিয়েই আমি সেদিন বেরিয়ে পড়ি।

* * * *

আজ যৌবনের সেই দুর্দ্দম অহঙ্কার অনুতাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জীবনের অলস শ্রান্ত বেলায় আজ নিজেকে সবার চেয়ে অসহায় বলে মনে হয়। কিন্তু অপূর্ণ জীবনের ক্ষুধিত সাধ আশা এখনো অন্তরের মাঝে বেঁচে আছে। তাদের অতৃপ্তির হাহাকার শুনতে পাই—স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর।

তাই আবার নূতন ক'রে বাঁধা পড়তে চাই, নীড়ে ফিরতে চাই—নারীর অন্তর লোকে অক্ষয়-নীড় রচনা করবো বলে।—

রূপ-জীবিনী

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নহ প্রভা, নহ দীপ্তি, নহ তুমি অন্ধকার-হরা
চন্দ্রসূর্য্যকর আলো-করা,
অন্তরের মর্ম্মস্থলে তব রশ্মি পড়ে না উদ্ভাসি
নিত্য নব নব বর্ণে ; জীবনের আলস্য বিনাশি
নাহি দেয় নব শক্তি প্রসন্নতা আনন্দ আহ্লাদ
তন্ময় জাগ্রত স্বপ্ন, পরিপূর্ণ নির্ভর প্রসাদ,
হে কুৎসিতে, যৌবন গর্ব্বিতে,
দানবী মানবী-রূপে, অয়ি অলজ্জিতে,
মারী-বিষ-ভরা চাহনিতে !

নারী তুমি হৃদি হীনা, লজ্জাহীনা, মিথ্যা মূর্ত্তিমতী,
অপ্রাকৃত প্রকৃতি মহতী,
রূপ-রৌপ্য-বিনিময়ে অঘটন করিছ সাধন,
স্নেহ প্রেম চিত্ত হ'তে চির তরে দিয়া নির্ব্বাসন,
হাস, কাঁদ, নাচ, গাও, নিত্য নব তুষিয়া নাগরে
হৃদপিণ্ড উৎপাটিয়া বিসর্জ্জিয়া অতল সাগরে,
কেমনে বাঁচ' যে তুমি, নারি,
প্রাণ-পণ্যে বিকিকিনি, ধর্ম্ম আর ছাড়ি,
শুল্কদাসি, বুঝিতে না পারি !

সাজ-সজ্জা পরিপাটি দেহখানি ধরি সযতনে,
দাঁড়াইয়া আছ' বাতায়নে,
সমুজ্জল দীপশিখা, উল্কা-পিণ্ড সম ঘরে ঘরে,
পতঙ্গ ঝাঁপিছে যাহে আপনার মরণের তরে,
কে বুঝাবে—ও যে নয় দেবতার আরতির আলো,
জল নহে—মরীচিকা, প্রলয়ের পুঞ্জীভূত কালো,
তীর্থ নহে—ধ্বংশ-পথ-সেতু,
কাপালিক মন্দিরের সম্মোহন কেতু,
মৃত্যু-যাত্রী-আবাহন হেতু !

গঠিত দেউল তব সর্ব্বনাশা ভাঙ্গনের ধারে
ঘূর্ণাবর্ত্ত তমসার পারে,
নাহি আলো, নাহি বায়ু, নাহি প্রাণ, পূজা প্রীতি নতি,
স্বার্থপর ছলনায় চিরন্তন দেহের আরতি,
তনু ভরি অতনুর রোষ-দৃপ্ত ভ্রুকুটি মাখিয়া,
নিতান্ত পরের অঙ্কে নিশি নিশি রয়েছ জাগিয়া !
তুমি কারো নহ আপনার,—
বিশ্বমাঝে কেউ তাই নহেও তোমার,
বৃথা বহ' জীবনের ভার !

নিরাশ্রয়া কাঙালিনী হে কামিনী রূপোপজীবিকা,
জ্বালাময়ী দীপ্ত অগ্নি-শিখা,
ভেবেছ কি এ যাত্রার কোথা অন্ত, কোথা পরিণতি ?
এ দেহের চিতাশেষে কি রহিবে, কেমন বিরতি ?
এই রবি-শশী-তারা-মণ্ডিত মেদিনী তৃণশ্যাম
যুগে যুগে প্রেমিকের তরে,
রূপ-রস-গন্ধময়ী এ ধরণী 'পরে,—
তুমি শুধু রবে বেঁচে মরে' !

সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনে নেহারিবে দুরন্ত আঁধার
আঁখি হবে অশ্রুর পাথার,
চিত্তমাঝে অনুক্ষণ দাহিবে দারুণ হুতাশন,
একে একে জীবনের কাজ সব হইবে স্মরণ—
অতীত নেপথ্য হ'তে, হবে তারা বৃশ্চিক দংশন—
শিহরি উঠিবে ভয়ে নিরখিয়া আপন বদন;
বিলাসের অতীত কঙ্কাল,
পরিহাস করি তোমা দাঁড়াবে করাল—
বিশ্বে একা, জরায় ভয়াল।

বুকের বিষ—

—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তৃতীয় দৃশ্য

সুমতির প্রবেশ

বিজয়া। সুমতি, এসো বোন এসো! উনি ভালো আছেন?

সু। হাঁ দিদি ভাল্ আছেন।

বি। ভাগ্যবতী তুমি বোন! তাঁকে সেবা করবার অধিকার পেয়েছ তুমি!—ওঃ—

সু। হাঁ দিদি,—সৌভাগ্য আমার! আমি পেয়েছি, অধিকার তুমি পাও নি! তুমি তো পাপী নও।

বি। সে কি কথা বোন! পাপী যে—

সু। তার উপরই ভগবানের দয়া বেশী। সাক্ষাৎ শঙ্কর আমার ঠাকুর, তাই আমার উপরই তাঁর দয়া সব চেয়ে বেশী। সে যে কি স্নেহ, কি দয়া—আহা, অমৃত সাগরের মত সে সমস্ত অন্তর স্নিগ্ধ করে দেয়।

বি। সে সাগরে সবাইকে ভাসিয়ে নিচ্ছে। অনধিকারী সুধু সেই যার তাঁর উপর সব চেয়ে বেশী অধিকার।

সু। ভুল বুঝো না তাঁকে দিদি, তোমাকে দিয়েছেন তিনি সব চেয়ে বড় অধিকার, তাঁর নিজের ভার বইবার ভার।

বি। (মাথায় হাত ঠেকাইয়া) হাঁ বোন, তাঁর দয়ার অন্ত নেই! তবু বোকা মন, মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলে।

সু। বাঃ সুন্দর ছেলেটি তো! এ কার ছেলে দিদি?

বি। আমার!

(রামকমল চমকাইয়া উঠিল)

সু। (হাসিয়া) তোমার ছেলে দিদি? কোথায় পেলে?

বি। তাঁরই দয়ায় পেয়েছি। পেটে ছেলে তিনি দেন নি, তবু তিনি আমাকে বঞ্চিত করেন নি বোন। এর জন্য তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম!

সু। এখন যাই দিদি, তাঁর বোধ হয় এতক্ষণ ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে থাকবে।

বি। তবে এসো বোন, আর দেরী ক'রো না। আর দেখ, আমি যদি তাঁর জন্য কিছু মিষ্টি দি, তুমি তাঁকে তা' খাওয়াতে পারবে? আমার নাম না ক'রে—দুটো চন্দ্রপুলি আর গোটাকয়েক মণ্ডা।

সু। ও সব তো খাবেন না তিনি দিদি! তিনি যে কিছু খান না, শুধু দিনান্তে দুটি ফল আর একটু দুধ!

বি। (কষ্টে দুঃখ দমন করিয়া) তবে থাক বোন, ও সবে আর কাজ নেই।

সু। তবে আসি দিদি।

বি। এসো।

[সুমতির প্রস্থান।]

রাম। তবে মা পেন্নাম হই।

বি। এসো বাবা।

[রামকুমার দ্বারের কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—আবার চলিল, আবার থামিল। শেষে ফিরিয়া আসিল।]

বি। কি বাবা, আর কিছু কথা আছে?

রাম। আজ্ঞে না—এই—

বি। কি?

রাম। কিছু না। পেন্নাম হই মা।

(প্রস্থানোদ্যত—আবার ফিরিয়া আসিল)

রাম। এই বলছিলাম কি মা?—যদি অপরাধ না নেন, যদি গরীবের উপর দয়া করেন মা। আপনার দয়ায়ই তো বাছার প্রাণ পেয়েছি—ওতো আপনারই। আর এ তো ওর সৌভাগ্য! অপরাধ যদি না নেন মা—

(হাত কচলাইতে লাগিল)

বি। বল বাবা, কি বলতে চাও নির্ভয়ে বল। আমি কিছু রাগ করবো না।

রাম। বলছিলাম এই মা—আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী অন্তর্য্যামী—কি আর বলবো আপনাকে মা—বলছিলাম এই খোকার রাত্তিরে—এই—মায়ের বুকের কাছে না শুলে ঘুম হয় না।

বি। (মুখভার করিয়া) ওঃ এই কথা—ওকে নিয়ে যেতে চাও তুমি!

রাম। মা অন্তর্যামী, কি আর বলবো।

বি। (খোকাকে কোলে করিয়া রামকুমারের কোলে দিল) যাও নিয়ে যাও!—আহা! ওর মাকে আমি বঞ্চিত করবো না। যাও বাছা (মুখচুম্বন)

নব। কাল সকালেই আবার নিয়ে আসবো মা।

বি। আচ্ছা—এসো!

[নব খোকাকে লইয়া চলিয়া গেল বিজয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহাকে দেখিল—শেষে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

বি। ওঃ! পরের ছেলে—পেটে তো ধরিনি ওকে! মাগো! নাই যদি দেবে আমায় এ ধন তবে বার বার এমন করে ভুলিয়ে দাগা দিচ্ছ কেন মা?—(তারপর উঠিয়া।)

[নেপথ্যে সন্ন্যাসীর গান।]

গান শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বিজয়া উঠিয়া বসিল। দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। তারপর দেখিয়া চমকিত হইয়া ফিরিল।

বি। এসেছ—এসেছো তুমি—কি সর্ব্বনাশ! একি সং সেজে রয়েছি আমি। এ রাণীর বেশে ভিখারী স্বামীকে আমি কেমন ক'রে দেখা দেব? (তাড়াতাড়ি) অলঙ্কার খুলিতে গেল।

(সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া নিবৃত্ত করিলেন—বিজয়া ভূতলে লুটিয়া প্রণাম করিল)।

সন্ন্যাসী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছো বিজয়া! আমি তাই তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলাম।

বি। (উঠিয়া) আহা! দাসীর উপর দয়া যদি হ'য়েছে প্রভু তবে আর আমাকে বঞ্চিত ক'রো না। আমাকে তোমার পদ সেবার অধিকারটুকু দেও—সুমতিকে যে অধিকার দিয়েছ—

স। সে হয় না বিজয়া, তুমি যে আমার সহধর্ম্মিণী! সব চেয়ে গুরুভার যে তোমার!

বি। প্রভু!—

স। তবে কি আমি ভুল বুঝেছি বিজয়া? তুমি কি উত্তীর্ণ হও নি পরীক্ষায়?

বি। না প্রভু, সে কথা নয়। এসেছ যদি দয়া ক'রে একবার এ আসনে ব'সে আমার এ ঘর পবিত্র কর।

স। না বিজয়া—সে ভার তোমার। আমার আসন পেতেছেন সর্ব্বংসহা বসুমতী রূপে আমার মা। তা ছাড়া আমার অন্য আসন নেই, শয়ন নেই।

বি। কিছু প্রসাদ ও কি পাবো না?

(মিষ্টান্নের থালা ধরিয়া তুলিল)

স। এ লোভটাও তোমার ত্যাগ ক'রতে হ'বে।

বি। বেশ তাই হবে। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

স। আশীর্ব্বাদ করি বিজয়া তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও—সব চেয়ে গুরুভার যা তাই বইবার যোগ্যতা লাভ কর। এখন আসি বিজয়া।

[প্রস্থান]।

(বিজয়া স্তব্ধ হইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। কাত্যায়ণী ছুটিয়া আসিলেন)।

কা। কই? কই? নবীন বাবা আমার—কোথা গেল সে বউ?

বি। তিনি চলে গেছেন মা।

কা। চলে গেছে? ঘরে এসে ফিরে গেল? তাকে আটকে রাখতে পারলি নে পোড়ার মুখী। সুধুই বিধাতা তোকে এত গুলো রূপ দিয়েছিল, কোন লজ্জায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস—কোন লজ্জায় এক গা গয়না পরে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছিস। যা' যা' ছুটে যা। আছড়ে পড়গে পায়ের উপর—যা—

বি। না মা, ওঁর নিষেধ আছে।

কা। আ হা—কি পতিভক্তি রে! আর পতিভক্তি ফলাতে হবে না। যাবি নে তাই বল। কেন যাবি? রাণীর হালে আছিস—তোর সোয়ামী দিয়ে কি দরকার। পোড়ার মুখী, সাধে কি তোর কপাল এমনি ক'রে পুড়েছে। থাক—থাক তুই তোর খাটে পাটে—থাক তোর ঐশ্বর্য্যি নিয়ে। আমিই যাই—দেখি কেমন দিয়ে যায় সে ছেলে।

[বেগে প্রস্থান]।

(বিজয়া অন্তরালে গিয়া সকল অলঙ্কার ও দামী কাপড় ছাড়িয়া সুধু শাঁখা হাতে ও ময়লা একখানা কাপড় পরিয়া আসিল। কুলুঙ্গীর উপর হইতে স্বামীর খড়ম লইয়া মাথায় ঠেকাইল, ও বুকে রাখিল। তারপর প্রদীপটি কমাইয়া দিয়া খাটের আড়ালে গিয়া খড়ম বুকে করিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিল)।

কাত্যায়ণীর পুনঃ প্রবেশ

কা। গেল সে চলে! মায়ের চোখের জল সে অনায়াসে অগ্রাহ্য ক'রে গেল দশ মাস তোকে পেটে ধ'রেছি—বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ ক'রেছি—সব ভুলে গেলি। আজ তোর স্ত্রী যদি তোর পায় অমনি ক'রে লুটিয়ে পড়তো, তবে পারতিস যেতে! ওরে অভাগা, সে স্ত্রী যে তোর নেই! নইলে তোর এ দশা!

আহা মরি—কি সজ্জাই হ'য়েছে ঘরের! সোণার খাট—জরির বিছানা—ওরে অভাগী, এ বিছানায় কি তোর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা বিঁধে দেয় না। পোড়ার মুখী, তোর স্বামী

যে গাছ তলায় পড়ে থাকে ভুঁয়ের ওপর!—রাজভোগ খাচ্ছিস—সে খায় কি খবর রাখিস? রাক্ষসী—রাক্ষসী ঘরে এনেছিলাম; তাই এমনি করে আমার কপাল পুড়ে গেল।

কোথায় গেল সে রাক্ষসী? গেছেন কোনও ভক্তের বাড়ী দুপুর রাতে পুজো কুড়োতে! এমন তো রোজ যাচ্ছে! গাঁ ময় টি টিক্কার পড়ে গেছে। কিন্তু গ্রাহ্য নেই—ওঃ কি দানব মেয়ে গো—পাথরের প্রাণ কি তোর! দেবতারা কি সুধু চেয়েই দেখবে? বাজ পড়বে না তোর মাথায়?

(চাপা কান্নার শব্দ শুনিয়া)

ও কি? কে কাঁদে? (বাতি উস্কাইয়া দিয়া খাটের অন্তরালে গেলেন। দেখিয়া চমকিত হইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বিজয়াকে টানিয়া উঠাইলেন, বিজয়া মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার বুকের ভিতর হইতে খড়ম জোড়া লইয়া দেখিয়া কাত্যায়নী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর খড়ম বিজয়াকে ফিরাইয়া দিয়া তাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।)

কাত্যা। মা, মা, সতীলক্ষ্মী মা আমার। এত ব্যথা বুকে তোর মা—আর আমি জানিনে! তোকে চিনতে না পেরে কত না বলেছি, কত কথা না ভেবেছি। আহা, দুখিনী মা আমার!

[আলিঙ্গন]

যবনিকা

ক্রমশঃ

মাটির প্রদীপ

—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আজি হেরি কুঞ্জতলে প্রস্ফুটিত দোপাটির বনে,
ঝরা ফুল-পল্লবের পাশে,
নবোদ্গত তৃণদল মঞ্জরীর ব্যগ্র আশাটিরে
সংগোপনে মর্ম্মতলে রাখিছে লুকায়ে;
শেফালির শ্যামদেহে কুসুমের নব-সম্ভাবনা;
গগনে গগনে চলে সৃজনের নবীন জল্পনা,—
ক্লান্ত কায়ে পরশ বুলায়ে
নির্ম্মল শারদ-বায়ু প্রবাহিছে ধীরে। নীলাকাশে
চপল মেঘের দল;—বিকশিছে কাশ ক্ষণে ক্ষণে।

পশ্চিম গগনে আজি নব রক্ত-সন্ধ্যার সঞ্চারে,
বিমল সরসী-নীরে সদ্যস্নান-শেষে,

ফিরিছে পল্লীর বধূ, সিক্তবাসা—পূর্ণ কুম্ভ বহি’ ;—
চূর্ণালকে ছায়া-ম্লান ভঙ্গ জল-কণা ;
নয়নে স্ফুরিছে হাসি—বক্ষতল-কমল-কোরকে
জাগে কত স্বপ্ন-সাধ, কত না বাসনা,
কত হাসি, রসোৎসব, কত গান—কত না পুলকে—
উদিছে মুদিছে আশা। হেরি রহি’ রহি’
মৌনা নিশীথিনী নামে লাজনত-বেশে
আবরি’ শ্যামল-তনু ম্লান-মেঘ-বসন-সম্ভারে।

গৃহে গৃহে দীপ উঠে জ্বলি’—
মাটির প্রদীপ ;—তা’র স্নিগ্ধ দ্যুতি আলিঙ্গিছে ধীরে
পর্ণ-কুটীরের দ্বার।—নিদ্রা-শান্ত স্নেহাননগুলি ;
জীর্ণ-ম্লান কয়টি বসন, অঙ্গনের তুলসী-মন্দির,—
তা’র পরে কাঁপি’ উঠে তীব্র বায়ে ; দীপ্তি উঠি’ ঝলি’
নিবে যায় ;—শীর্ণ-ছায়া প্রাচীর বাহিরে—
নীরব কম্পনে যেন উঠিছে ব্যাকুলি ;—
ঝিল্লীর ঝঙ্কার চলে। বায়ু-শ্বাসে কাঁপে তরুশির।

বল্লভের বাহুর শিথানে,
শ্রান্তা বধূ ধীরে ধীরে পড়েছে ঘুমায়ে,—
অবিন্যস্ত কৃষ্ণ-কেশ, গাঢ়-সুপ্তি-শিথিল-বসনা,
ক্ষুদ্র নব-দেহাধার—শিখা তা’র প্রেম-আরাধনা—
রাত্রির বাসরে জ্বলি’ প্রিয়-বক্ষে আনন লুকায়ে—
বিশ্বের সকল ব্যথা ভুলে যায়। রোমাঞ্চ-কঞ্চুকে
তনু-গাত্রী মুহুর্মুহু উঠে শিহরিয়া।
শান্ত তৃপ্ত মুখে,
মৃদু প্রভাতের বায়ে জাগে সচকিয়া ;—
মাটির প্রদীপ যেন, স্নিগ্ধা শ্যামা দিবা-অবসানে।

পরদেশী চিঠি

শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

—পাঁচ—

গেণ্ডেরিয়া
২৩শে ডিসেম্বর

ভাই মিনি,

তোর একুশে তারিখের চিঠি পেলাম। তুই অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্ কেন? আমি মাসীমার কাছে জাপান সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি সবই তোকে লিখবো। সুষমার চিঠিও পেয়েছি। সে লিখেছে তোদের ওখানে একদিন বেড়াতে গিয়ে আমার চিঠিগুলি পড়ে এসেছে, আর তাকে আলাদা করে লিখিনি বলে অভিমানও করেছে। এমন বড় চিঠি ক'খানা করে লেখা যায় বল্‌তো! এবার থেকে সব চিঠী গুলিই ওকে দেখাস্—বুঝলি? কিন্তু দেখিস—অন্য মেয়েরা যেন জানতে না পারে; তা হলে কিন্তু ঠাট্টা করবে।

মাসীমা বলেছিলেন—প্রফেসর তাশিরোসান ও তাঁর বাড়ীর আর সবাইর সঙ্গে সুমিমতোদের বাড়ীতেই তাঁদের আলাপ হয়। তাশিরোসান্ জাপানের খ্যাতনামা একজন অধ্যাপক এবং তার স্ত্রীও উঁচুদরের বিদুষী মহিলা। স্বামীর সঙ্গে ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকদিন কাটিয়ে এসেছেন। ওঁরা দুজনেই ইংরেজি বেশ বল্‌তে পারেন। তাছাড়া জার্ম্মাণ ভাষাতেও নাকি বিশেষ অধিকার আছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এঁদের ধারণা নিতান্তই কল্পনা মূলক নয়। তাশিরো-গৃহিণী তোকিওর বৃহৎ অনাথাশ্রমের একজন উৎসাহী ও বিচক্ষণ কর্ম্মী।

মেসোমশাইকে একদিন ইয়াকোহামায় তাঁর এক সিন্ধুদেশীয় ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়ীতে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হয়। ফিরে আসতে রাত হবার সম্ভাবনা ছিল। সারাটা দিন মাসিমাকে একাই চুপচাপ্ হোটেলে বসে কাটাতে হবে জানতে পেরে তাশিরো গিন্নী তাঁকে তাঁদের বাড়ীতে দিবস যাপনের নিমন্ত্রণ করে পাঠান। সেদিন রবিবার, ভোরে চা খেয়েই মেসোমশাই ইয়াকোহামায় রওনা হয়ে যান। তারপর বেলা নয়টার সময় তাশিরোসানের কন্যা ওনামিসান্ রিক্স করে তাঁকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যেতে আসে। তাদের বাড়ী হঙ্গকু অঞ্চলে। কাছে ব'লে বেশীক্ষণ লাগে নি যেতে। ছুটির দিন হলেও তাশিরোসান কিন্তু তখন বাড়ী ছিলেন না, প্রবীণ অধ্যাপক দাইগক্কুর (university) লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন কর্‌তে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য্য—জ্ঞানী ব্যক্তির অফুরন্ত জ্ঞান তৃষ্ণা কিছুতেই বুঝি মেটে না!

তাশিরোদের সঙ্গে সেদিনটি যে তাঁর শুধু আমোদেই কেটেছিল তা নয়, পরন্তু শেখবার মত অনেক কিছুই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাশিরোসান বাড়ী ফিরে আসেন দুপুর বেলায়—তখনই জাপানে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। সকলেই একসঙ্গে আহারে বসেন। টেবিলে ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল—কিন্তু তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। কেননা জাপানীদের মতো কাঠ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস কিছুতেই তিনি করতে পারেন নি। পরে অন্যান্য পদের সঙ্গে যখন মুরগীর কারি এল, তখন সত্যি করেই তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তাশিরো গিন্নী বল্লেন যে লণ্ডনে কারি-ভাত খেয়ে তাদের নাকি খুব ভাল লেগেছিল এবং এ জিনিষটি ভারতীয় ডিস্ জান্‌তে পেরে তিনি ওর পাক-প্রণালীও মোটামুটি শিখে আসেন তখন; তবে তেমন ভাল করে শিখ্‌তে

পারেন নি। হয়তো সেজন্য মাসীমার কাছে ভাল নাও লাগ্‌তে পারে। কিন্তু তিনি যখন পরে রান্নার প্রশংসাই করলেন, তখন তাঁর মনে খুসীর অন্ত ছিল না।

তাশিরোসান্ ভারতীয় সভ্যতার কথা, প্রাচীন ভারতের নিকট জগতের, বিশেষতঃ জাপানীদের ঋণের কথা তুলে অবশেষে বল্লেন, কোনও জাতির উত্থান বা পতন, উন্নতি বা অবনতি, কোনও আকস্মিক ঘটনায় সঙ্ঘটিত হয় না। আকস্মিক ঘটনায় অবিশ্যি কখনো কখনো জাতিবিশেষের উপকার বা অপকার হয় বটে। যেমন গত মহাযুদ্ধে ইউরোপের কোন কোন পরাধীন জাতি ঘটনাচক্রে স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে তারা পূর্ব্বেই জাতীয়তা অর্জ্জন করেছিল ব'লে ঐ সুযোগে স্বাধীনতা লাভ করে তা বজায় রাখতে পেরেছে। পক্ষান্তরে গত ভূমিকম্পে জাপানের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এইরূপ আকস্মিক ঘটনার ফলাফলও তো সেখানে স্থায়ী হয়নি। তুরস্কের অধীন এসিয়াটিক জাতিগুলি এমন সুযোগ পেয়েও বিশেষ লাভবান হতে পারেনি। স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেই মানুষ স্বাধীন হয় না। যে জাতি প্রাণহীন অর্থাৎ কল্পনা ও অবাস্তবের উপাসক, কোন আকস্মিক শুভ ঘটনাতেই তার স্থায়ী কল্যাণ সম্ভবে না। আবার চিরজাগ্রত, চিরকর্ম্ম তৎপর জাতি, যুদ্ধে বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে মহাক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার ক্ষতিপূরণ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এত বড় বিপদে তাই জাপান তেমন অস্থির হয়ে পড়েনি; যদিও সবাই জানে, এই সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিপূরণে জাপানের অনেক সময় লাগ্‌বে, তবুও এটুকু তারা বিশ্বাস করেন—তাঁদের আত্মসংযম ও ঐকান্তিকতা, জাতীয় উন্নতির পথগুলিকে সকল অবস্থাতেই সুগম রাখ্‌বে।

তাশিরোসান্ আরও বলেছিলেন—রুসো, ভল্টেয়ারের আমলেই পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন বহুদর্শী নেতা বুঝেছিলেন যে সমগ্র জগতব্যাপী বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসছে, তাতে জাতীয় প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে—এমন কি জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে—জাতীর সকল শ্রেণীর লোক্‌কেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, সুস্থ সবল ও স্বজাতি বৎসল করে তুলতে হবে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, দারিদ্রভারে নিপেষিত, অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত, স্বজাতি বাৎসল্য তাদের কমই হয়ে থাকে। কাজেই শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে হ'লে, যারা জাতির ভার বহন করছে, তাদের জাতির সমৃদ্ধি ও গৌরবের অংশ দিয়ে দলে টেনে আনতে হবে। কিন্তু চিরপদদলিতকে হঠাৎ মানুষের আসনে তোলবার ব্যাপারটি খুব সোজা বা প্রীতিকর নয়'—তাই ইউরোপের সকল জাতিই সে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু যে কয়টি পাশ্চাত্য জাতি কিয়ৎ পরিমাণেও সে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তারাই আজ মহা বলশালী ও সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য বিধাতা। অথচ চোখের সাম্‌নে এই দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও এসিয়ার কোন কোন জাতির নেতাগণ এখনও নিজেদের আভ্যন্তরিক আভিজাত্য অক্ষুন্ন রেখে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিষম বৈষম্য বজায় রেখে, পুরাতনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান কর্‌তে ব্যস্ত। এখনও হয়ত তাঁরা বিশ্বাস করেন যে পুরাতন সভ্যতা ছিল নিখুঁৎ এবং এসিয়ার গৌরব; আর বহু-দোষে-দুষ্ট এই আধুনিক সভ্যতা য়ুরোপের গৌরব হতে পারে কিন্তু এসিয়ার নয়; কাজেই সর্ব্বতোভাবে তা পরিত্যাজ্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে দীর্ঘ-নিদ্রা ভঙ্গকারি এই আধুনিক সভ্যতা পুরাতন সভ্যতারই পরিণতি মাত্র। আর এও ভুলে থাকেন যে এতে আপত্তিকর যা কিছু আছে তার জন্য আমরাই প্রধানত দায়ী। কারণ মানব সভ্যতার এই সার্ব্বজনীন ভাণ্ডারে এসিয়াবাসী আমরা বহুদিনই আমাদের অংশ পাঠাই নাই। যে দিন থেকে তা দিতে সক্ষম হব, সেদিন থেকে এর দোষ ত্রুটী ও কমে যাবে কেননা আমাদের অর্ঘ্য এর পুষ্টির সহায়তা কর্‌বে।

আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে জাপান যে কখনও এমন গুরুতর ভ্রমে পতিত হয় নি তা নয়। তবে জাপানের কয়েকজন মহাপুরুষ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসেই পুরাতনের মোহ জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা প্রচার করেন—যে সকল প্রথা কল্যানকর তা 'বিদেশী' হলেও বরণীয়। বিদেশীর কল্যাণকর পন্থাগুলি অবলম্বন করে, সুস্থ সবল

হলে আমরাও হয়ত একদিন বিদেশীকে দান করবার মত সম্পদের সন্ধান পাব।

জাপান যে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে, এসিয়ার অন্যান্য জাতির তা না পাওয়ার কারণ এই যে, যে সন্ধিক্ষণের কার্য্যকলাপের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে, সেই সন্ধিক্ষণ, সেই শুভলগ্ন, তারা হেলায় নষ্ট করেছেন। এসিয়ার বর্ত্তমান নেতাগণও যদি নানাবিধ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সেই মহাক্ষতি পূরণের জন্য তৎপর না হয়ে আধুনিক সভ্যতার দোষান্বেষণেই বর্ত্তমান মহামূল্য সময়ের অপব্যবহার করেন, তবে প্রাচ্যের ভবিষ্যত বংশধরদের যে ক্ষতি, যে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবি, কেউ যদি আজ হিসাব নিকাশ করে তার স্বরূপ দেখিয়ে দিতে পারতো তবে বোধ হয় জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যেত।

তাশিরোসান্ একটু ভেবে আপন মনেই আবার বল্‌তে লাগলেন—প্রকৃতির নিয়মকে অনবরত লঙ্ঘন করে কোন জাতিরই কখনও মঙ্গল হয় নাই। ধর্ম্মের নামেই হোক, সনাতন প্রথার নামেই হোক, অথবা আইনের দোহাই দিয়েই হউক, যখনই যে-দেশের বিধি-ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে, তখনই সেই জাতির অধঃপতনের সূত্রপাত হয়েছে। যে ব্যবস্থা সমাজের অধিকাংশ মানুষকে হীন করে রেখে জাতীয় শক্তিকে শিথিল করে, উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করে, সে ব্যবস্থাকে সনাতন বলে, ভগবানের অনুমোদিত বলে ঘোষণা করলেও ভগবান তাতে ভোলেন না। ঐ ব্যবস্থার অপরিহার্য্য ফল,—হয় শৈথিল্য প্রসার পূর্ব্বক উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সমাজের সকল স্তরকে আড়ষ্ট ক'রে জাতিকে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করবে, নয়ত চির-নিপীড়িত শ্রেণীর ধৈর্য্যের সীমাচ্যুতি ঘটলে পরে, তারা বিপ্লব পথে মুক্তিলাভ করে নিপীড়কের বহুকালসঞ্চিত বিপুল পাপরাশির যথাসাধ্য প্রতিশোধ নেবে। এখনো ধর্ম্ম বা সামাজিক শুচিতার নামে—দুর্ব্বল অশিক্ষিত জনগণের উপর, অবলা নারী জাতির উপর, ভগবানের প্রিয়তম সন্তানদের উপর,—কুশিক্ষিত শ্রেণী বিশেষ যে সকল কঠোর বিধিব্যবস্থা চালিয়ে আসচেন, বর্ত্তমান দুর্গতিই তার জলন্ত সাক্ষী।

সৌভাগ্যের বিষয় তুরস্ক এতকাল পরে তার ভ্রম বুঝ্‌তে পেরেছে। তার মহাগৌরবের দিনে সে যেবিধি-ব্যবস্থা মেনে চল্‌তো, ভেবেছিল তা অব্যাহত রাখলেই তার সেই গৌরব-রবি চিরদিনের মত তার ভাগ্যাকাশে উদিত থাক্‌বে। কিন্তু তা হয়নি, কারণ সমাজ সজীব ও সচল, স্থায়ী নিয়ম-কানুনের বশবর্ত্তী হওয়া তার চলে না। বহুতর কঠোর, অভিজ্ঞতার ফলে, দুর্ভাগ্যের চরম প্রান্তে পৌঁছে, অবশেষে তুরস্কের চমক্ ভেঙ্গেছে। তাই সে আজ পুরাতন আবর্জ্জনা ত্যাগ করে, তার নবাবিস্কৃত বলে বলীয়ান হয়ে, নব-বেশে নূতন-গরিমায় জগতের আসরে উপস্থিত। সত্য বটে তার বিশাল সাম্রাজ্য আজ বহু পরিমাণে খর্ব্বাকৃত, পূর্ব্বের সেই বিপুল সৈনিক বলেরও এখন অল্পই অবশিষ্ট; তথাপি "বৃদ্ধ রুগ্ন" বলে এখন আর কেউ তাকে টিট্‌কারি দেয় না। কারণ, আজ আর সে পুরাতনের মোহের নিকট জাতীয় কল্যাণকে বলি দিতে প্রস্তুত নয়, আজ তার বিচার বুদ্ধি ফিরে এসেছে, সে জাতীয়তা অর্জ্জন করেছে। তাই "ক্ষুদ্র" হলেও এখন সে আর "বৃদ্ধ রুগ্ন" নয়, এখন সে বর্দ্ধনশীল, উদ্যমশীল, স্বাস্থ্যকামী।

মাসীমা সেদিন বলেছিলেন এইরূপ অনেক কথাই নাকি সেদিন হয়েছিল। অধিকন্তু যে সকল মহাপ্রাণ জাপানীদের আত্মত্যাগ ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলে, অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন, রুগ্ন ভগ্ন-মোহাচ্ছন্ন প্রাচীন জাপান নূতন জীবন ও যৌবন লাভ করে আজ গৌরবমণ্ডিত, তাঁদের কারো কারো সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিলেন। মানব জন্ম সার্থক করবার সে কি পথ নির্দ্দেশ, সে কি মহা ইঙ্গিত! শুনতে শুনতে আশায় আনন্দে ভক্তিতে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ঐ প্রসঙ্গ শেষ করতে যেয়ে তাশিরোশান বলেন—দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া দেশভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই; কিন্তু দেশের জন্য বেঁচে থাকতে যে বহুদিনব্যাপী অবিচলিত দেশপ্রেম দরকার, তা অল্প লোকের মধ্যেই দেখা

যায়, দেশের জন্ম জীবন দিতে যত লোক প্রস্তুত তার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই দেশের কল্যাণের কাছে তাদের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা, চিরাভ্যস্ত কুপ্রথা বলি দিতে রাজী। অধিকাংশ লোকের অন্তরেই প্রাচীনপ্রথার স্থান জাতীয়কল্যাণের অনেক উর্দ্ধে, ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের প্রতিই অধিক আসক্তি। কেননা যুগ-যুগান্তব্যাপি মানবের সমস্ত প্রয়াসের ফলের সঙ্গে অর্থাৎ যে অসহনীয়, অকম্পিত, অপরিসীম দুঃখ যাতনার বিনিময়ে মানব জাতি অদ্যাবধি যতটা সফলতা অর্জ্জন করেছে, সভ্যতার পথে যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তার সঙ্গে প্রাচীনপন্থীগণ নিজ নিজ সংকীর্ণ জীবনের অস্পষ্ট মুহূর্ত্তটির তুলনা করেন বলেই, আধুনিকতাকে অতীতের তুলনায়, অতি অকিঞ্চিৎকর বলে তাদের মনে হয়। কিন্তু ইতোসামা ও ওকুমাসামার (Prince Its & Count Okuma) অপূর্ব্ব দূরদর্শিতা, অসাধারণ বিচক্ষণতা, অসীম সাহস এবং সর্ব্ব-বিঘ্ন-জয়ী হবার স্থির সংকল্পের ফলে জাপানে সত্যের জয় হ'ল, স্বদেশীদলের পরাভব হ'ল—জাপান মুক্তি লাভ করলো।

একটু খানি থেমে তিনি আবার বল্‌তে লাগলেন—যে কোন জাতি অতীতের মোহ-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে জাতীয় কল্যাণকর সর্ব্ববিধ কর্ম্মে তৎপর হয়, তার দুর্গতির অবসান অবশ্যম্ভাবী। জাপান ও তুরস্ক এই বাক্যের জাজ্বল্যমান সাক্ষী। আফ্‌গানিস্থান ও মিশরদেশ যে পরিমাণে আধুনিক ভাবাপন্ন, ঠিক সেই পরিমাণেই উন্নত। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আমার মনে হয় ঐ কথাই খাটে, তথাপি এসিয়াবাসী প্রত্যক্ষ ফলকে অস্বীকার ক'রে পুরাতনেই আসক্ত। পাশ্চাত্য জাতিদিগের স্বার্থ-পরতা এসিয়ার দুর্ভাগ্যের মুখ্য কারণ নয়, ইহার প্রকৃত কারণ প্রাচীন সংস্কারের দাসত্ব। এই দাসত্ব, এই আসক্তি থেকে মুক্ত হ'তে পারলে অন্য কোন বন্ধনই আর টিক্‌বে না।

মাসীমা আক্ষেপ করে বলেছিলেন—এইরূপ কত কথাই না সে দিন তাঁদের হয়েছিল। তাঁর সব কথা যদি ঠিক মনে করে রাখতে পার্‌তেন। অপরাহ্নে বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠ্‌ল। ওনামীসান্‌ হিবিয়া পার্কে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন কিন্তু তার মা বল্লেন—আজ রবিবার সেখানে বেশী ভিড় হবে, বরং শিনগাওয়ার সমুদ্র উপকূলে তেমন জনতা হয় না এবং তার বিশ্বাস ঐ স্থানটি নাকি মাসিমার ভাল লাগ্‌বে। তখন সকলে মিলে ট্রামে চড়ে সিম্বাসী ষ্টেসনের দিকেই রওনা হলেন।

দেখলি এবারও কত বড় চিঠি লিখলাম। আজ এখানেই শেষ করি, নইলে তোর পড়বার ধৈর্য্য থাক্‌বে না। আশা করি সব ভাল আছিস্‌। স্কুলের সব খবর লিখিস্‌। ইতি তোর—সুধীরা।

—ক্রমশঃ—

—:*:—

প্রেম

—শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মত,—
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হ'য়েছে আহত
একা-হরিণের মত আমাদের হৃদয় যখন !
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হ'লে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মত শিশিরে শিশিরে ইতস্তত:
আমরা ঘুমায়ে থাকি !—ছুটি লয়ে চলে যায় মন !
—পায়ের পথের মত ঘুমন্তেরা প'ড়ে আছে কত,
—তাদের চোখের ঘুম ভেঙে' যাবে আবার কখন !—
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হ'য়ে র'য়েছে হৃদয়,—
অনেক জাগার পর এই মত ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না জানিতে ;
অনেক মেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না মানিতে ;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তারা-পৃথিবী আকাশ ধ'রে ধ'রে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখীর মত ক'রে,—
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখীর মত,—প্রবল হাওয়ার মত জোরে
মৃত্যুও উড়িয়ে যায় !—অসাড় হ'তেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে,—জীবন যেতেছে তাই ঝ'রে !—
পাখীর মতন উড়ে' পায়নি যা পৃথিবীর কোলে—
মৃত্যুর চোখের পরে চুমো দেয় তাই পাবে ব'লে !

কারণ, সাম্রাজ্য—রাজ্য—সিংহাসন—জয়—
মৃত্যুর মতন নয়,—মৃত্যুর শান্তির মত নয় !
কারণ,—অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে'
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে' !
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মত জেগে রয় !—

তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে'
মানুষের মত নয়,—নক্ষত্রের মত হ'তে হয় !
মানুষের মত হ'য়ে মানুষের মত চোখ মেলে'
মানুষের মত পায়ে চলিতেছি যতদিন,—তাই,—
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই !

কারণ, যোদ্ধার মত—আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে,—কোলাহল ক'রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মত দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মত উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মত বেজে' ওঠে হৃদয়ের বন
একবার—দুইবার—জীবনের অধীর আঘাতে,—
তবু—প্রেম—তবু তারে ছিঁড়ে' ফেঁড়ে' গিয়েছে কখন !
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু !—অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ'লে গেছে ছিঁড়ে' !—
পাতার মতন ক'রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখীরে !

তবু পাতা—তবুও পাখীর মত ব্যথা বুকে ল'য়ে,
বনের শাখার মত—শাখার পাখীর মত হ'য়ে,
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ জনার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মত ব'য়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন !—জীবনের বিহ্বলতা স'য়ে
আমাদের দিন চলে,—আমাদের রাত্রি তবু চলে ;
তার ছিঁড়ে গেছে,—তবু তাহারে বীণার মত ক'রে
বাজাই,—যে প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধ'রে !

কারণ,—সূর্য্যের চেয়ে আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশী ;—তাই রাখিয়াছে ঢেকে'
পাখীর মায়ের মত প্রেম এসে' আমাদের বুক !
সুস্থ ক'রে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ !—
পাখীর শিশুর মত যখন প্রেমেরে ডেকে' ডেকে'
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে' লুকায়েছি মুখ,—
ভোরের আলোর মত চোখের তারায় তারে দেখে' !—
প্রেম কি আসে নি তবু ?—তবে তার ইসারা আসুক !
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে' !—
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে' !

যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মত আলো নিয়ে,—
তুমি চ'লে আস প্রেম,—তুমি চ'লে আস কাছে প্রিয়ে !
নক্ষত্রের বেশী তুমি,—নক্ষত্রের আকাশের মত !
আমরা ফুরায়ে যাই,—প্রেম, তুমি হও না আহত !
বিদ্যুতের মত মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চ'লে আসি,—চ'লে যাই,—আকাশের পারে ইতস্ততঃ !—
ভেঙে যাই,—নিভে যাই,—আমরা চলিতে গিয়ে গিয়ে !
আকাশের মত তুমি ;—আকাশে নক্ষত্র আছে যত,—
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে,—
তুমিও কি ডুবে যাবে ওগো প্রেম, পশ্চিম-সাগরে !

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও র'বে জেগে',—জানি !
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি,—
ঘুমন্ত ফুলের মত নিবন্ত বাতির মত ঢেলে'
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে' যায়,—তুমি তারে জ্বেলে'
চোখের তারার পরে তুলে ল'বে সেই আলো খানি !

সময় ভাসিয়া যাবে,—দেবতা মরিবে অবহেলে,—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি'
চুমো খাবে !—মানুষের সব ক্ষুধা শেষ হ'য়ে গেলে
ওগো প্রেম, তোমার মতন ক্ষুধা আর শক্তি ল'য়ে
পূর্ব্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে ব'য়ে !

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন !
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি,—তোমার আসন
সকল স্থলের পরে,—সকল জলের পরে আছে !
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম তোমার !—যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ !—অঙ্কুরের মত তুমি,—যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে !—তুমি ঢেউ,—হাওয়ার মতন !
আগুনের মত তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে !
আশার ঠোঁটের মত নিরাশার ভিজে চোখ চুমি'
আমার বুকের পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি !

জীবন হ'য়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম,—গানের ছন্দের মত মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে !
হৃদয় গন্ধের মত—হৃদয় ধূপের মত জ্ব'লে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন !
ওগো প্রেম,—বাতাসের মত যেই দিকে যাও চ'লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !
আমি শেষ হ'ব শুধু ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে !
তুমি যদি বেঁচে থাক,—জেগে র'ব আমি এই পৃথিবীর পর,—
যদিও বুকের পরে র'বে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর !

তবুও,—সিন্ধুর জল—সিন্ধুর ঢেউয়ের মত ব'য়ে
তুমি চ'লে যাও প্রেম ;—একবার বর্ত্তমান হ'য়ে,—

তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে—অতীতে,—
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,—কার্ত্তিকের শীতে !
অগ্রসর হ'য়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ ল'য়ে—
আজো যারে দেখ নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চ'লে যাও !—দেহের ছায়ার মত তুমি যাও র'য়ে,—
আমরা ধ'রেছি ছায়া,—প্রেমেরে তো পারি নি ধরিতে !
ধ্বনি চ'লে গেছে দূরে,—প্রতিধ্বনি পিছে পড়ে আছে ;
—আমরা এসেছি সব,—আমরা এসেছি তার কাছে !

একদিন—একরাত ক'রেছি প্রেমের সাথে খেলা !
একরাত—একদিন ক'রেছি মৃত্যুরে অবহেলা ॥
একদিন—একরাত ;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলের যেতে হয় ব'লে
তাহারও ফুরাল রাত !—তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে !—একরাত আর একদিন সাঙ্গ হ'লে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হ'য়েছে সোনেলা !
আকাশে পূবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্ব'লে
একদিন ;—রয় না কিছুই তবু,—সব শেষ হয়,—
সময়ের আগে তাই কেটে' গেল প্রেমের সময় ;

একদিন—এক রাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে !—
আকাশ চ'লেছে,—তার আগে আগে প্রেম চলিয়াছে !
সকলের ঘুম আছে,—ঘুমের মত মৃত্যু বুকে
সকলের ;—নক্ষত্রও ঝ'রে যায় মনের অসুখে ;—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে !
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে'
হে প্রেম তোমারে !—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে !—
যে ব্যথা মুছিতে এসে' পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো প্রেম,—সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে !

পাটলিপুত্র

—শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া

স্থান নির্দ্দেশ—

প্রাচীন মধ্যভারতে গঙ্গার পুত্র সরযুর নদীর সঙ্গম স্থলে পাটলিপুত্র নগর অবস্থিত। 'পাটলিপুত্র' মগধের প্রাচীন রাজধানী ও রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রভূমি বলিয়া ভারত ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ।

মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসারের প্রথম পুত্র মহারাজ অজাতশত্রু কর্ত্তৃক এইস্থান রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হয়। বৃজ্জিগণ দলবদ্ধ হইয়া মহারাজ অজাতশত্রুর রাজ্য আক্রমণ করে। অজাতশত্রু বিপক্ষের আক্রমণে রাগান্বিত হইয়া, বৃজ্জিদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য 'সুনীধ ও বসসকার' নামক দুইজন সেনাপতি দ্বারা পাটলিপুত্র নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। নব নির্ম্মিত দুর্গ হইতে অজাতশত্রু বিপক্ষের দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, উক্ত নগর হস্তগত করেন। বৃজ্জিগণকে ধ্বংস করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্সের বর্ণিত বৃত্তান্তে প্রাচীন ভারতের অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

মহাবংশ নামক বৌদ্ধ সাহিত্যের মতে মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার খৃঃ পূঃ ৫৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৬০৮ অব্দে মহারাজ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কোশলাধিপতি মহারাজ প্রসেনজিত ও তৎপুত্র "বিড়ূড়ভ" এবং মহারাজ বিম্বিসারের প্রথম পুত্র "অজাতশত্রু" ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক এবং সকলেই তাঁহার নব ধর্ম্ম মতাবলম্বী ছিলেন। দ্বীপবংশ ও মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "ভগবান বুদ্ধ ও "মহারাজ বিম্বিসার" বয়সে পাঁচ বৎসরের ছোট বড় ছিলেন। তাঁহাদের পিতার রাজত্বকালে মগধ ও কপিলবস্তুর মধ্যে গভীর সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

(১) মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার বিদেহ রাজ্যের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই গর্ভে রাজকুমার অজাতশত্রু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার উপাধি ছিল "বিদেহীপুত্তো"। তিনি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের আট বৎসর পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ ৫৫২ অব্দে দেবদত্তের প্ররোচনায় ও রাজ্যের লালসায় মোহিত হইয়া মহারাজ বিম্বিসারের প্রাণ সংহার করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রু রাজসিংহাসনে অধিরোহণের পর নিজের বিবেক উপস্থিত হইলে তিনি পিতৃহত্যা মহাপাপের অনুশোচনায় ও ভীষণ নরক ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া মৈত্রী করুণাময় ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার অনুশোচনা রূপ এবং মহা প্রায়শ্চিত্তের সুফল বর্ণনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত করেন।

মহারাজ অজাতশত্রু যতদিন জীবিত ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও উন্নতি বিধান করে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র নামক পালি বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, মহারাজ অজাতশত্রু লিচ্ছবি বংশসম্ভূত বা অষ্টকুল ভুক্ত বৃজি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন করাইয়া উক্ত সম্প্রদায়দিগকে বৈশালী হইতে বিতাড়িত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বৃজি জাতি ভারত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে তিব্বত, মাঞ্চুরিয়া, কামস্কাটকা, কোরিয়া, নাদাক্ নেপাল, মাঙ্গোলিয়া প্রভৃতি রাজ্যে গমন পূর্ব্বক আশ্রয় স্থাপন করেন। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ সালে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর রাজগৃহের বেভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তনালী গুহার

(১) জগজ্জ্যোতিঃ ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠা।

প্রবেশ দ্বারে মহারাজ অজাতশত্রুর তত্ত্বাবধানে এবং তাঁহার সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম বোধিসত্ত্ব আহূত হয়। এই মহাসঙ্ঘের সম্মিলনীতে পাঁচ সহস্র অর্হৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু সমবেত হন। কাশ্যপ, আনন্দ, উপালি প্রভৃতি বৌদ্ধাচর্য্যগণ ভগবান বুদ্ধের নবধর্ম্মের অনেক গবেষণা পূর্ণ সারতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে, মগধের রাজসিংহাসনে নন্দ এবং শিশুনাগ বংশীয় রাজন্যবর্গ বহুকাল যাবত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। নন্দবংশীয় রাজন্যগণ ৩৩২ এবং শিশুনাগ বংশীয় রাজন্যগণ যথাক্রমে একশত বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু আবার অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, শিশুনাগবংশ খৃঃ পূঃ ২৩৯ হইতে এবং নন্দবংশীয় রাজন্যগণ খৃঃ পূঃ ৩৬১ হইতে রাজত্ব করেন। শিশুনাগবংশীয়—শিশু নাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমবর্দ্ধন, ক্ষত্রৌজস, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, দর্শক, উদয়াশ্ব, নন্দিবর্দ্ধন, মহানন্দি। তাঁহারা ধারাবাহিক রূপে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন।

মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার অঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া, মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং তাঁহার রাজত্ব কালেই মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার হওয়ার পর মগধাধিপতি নামে খ্যাতি লাভ করেন। স্বীয় পুত্র মহারাজ অজাতশত্রুর বত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর তদীয় পুত্র উদয়বর্দ্ধন স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়া মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়বর্দ্ধন বুদ্ধাব্দের চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর তদীয় পুত্র নাগদাস ষড়যন্ত্র করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ৭২ বুদ্ধাব্দে স্বীয় প্রজাবর্গ তাহাকে পিতৃঘাতক বংশধর বলিয়া রাজসিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া "শিশুনাগ" নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন।

বৈশালীর লিচ্ছবী রাজন্যগণ সমবেত হইয়া প্রতিপন্ন করেন :—আমাদের রাজ্য গৌরবের সমস্ত উপকরণ বর্ত্তমান উদ্যমের অভাবে রাজ্যবিহীন হইয়া পরমুখাপেক্ষ। আজ দুর্ব্বল বলিয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছি! অন্যান্য রাজ্যে এত উদ্যম শীলতার কারণ কি? তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে—এ রাজ্যে নর্ত্তকীদিগের অভাবই এইরূপ উদ্যমহীনতার একমাত্র কারণ। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ বংশোদ্ভবা জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কন্যাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করেন! জনৈক লিচ্ছবী বংশীয় রাজা নর্ত্তকীর রূপে মোহিত হইয়া আপন গৃহে আহ্বান করেন। তাঁহারা স্বামী স্ত্রীরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে, নর্ত্তকীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, সদ্যপ্রসূত সন্তানটি একটী পাত্রে রক্ষিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্জ্জন স্থানে রক্ষিত হয়।

কতিপয় নগরবাসী ঐ পাত্রটি দেখিয়া উহার আবরণ উন্মোচন করিলে, সদ্যপ্রসূত একটী সন্তান দেখিতে পান। উক্ত নগরের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ বালককে লালন পালন করিয়া, তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য গুরুর নিকট প্রেরণ করেন। বর্ত্তমানে ঐ বালক শিশুনাগ নামে পরিচিত।

এক সময় মহারাজ অজাতশত্রু "বৈশালী আক্রমণের অভিলাষে "বসস্কার" নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ভগবান বুদ্ধের সমীপে পরামর্শের জন্য প্রেরণ করেন! ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহারাজ অজাতশত্রুর মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদুত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "বৈশালীর রাজন্যগণ রাজধর্ম্ম রক্ষা করেন, তাঁহারাই এই অতুল ঐশ্বর্য্যে চির মহিমায় যোগ্য!" উক্ত ব্রাহ্মণ বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনঃ মহারাজ অজাতশত্রুর নিকট উপনীত হইয়া, ভগবান বুদ্ধের উপদেশের অংশগুলি বিবৃত করেন। মহারাজ অজাতশত্রু ব্রাহ্মণকে বলিলেন, এখন কি করা কর্ত্তব্য? তখন ব্রাহ্মণ উত্তর প্রদান করিলেন "হে মহারাজ? এদেশ হইতে আপনি আমাকে নির্ব্বাসিত করুন।" আমি বৈশালীতে গমন করিয়া, বৈশালীর রাজন্যবর্গের একতা নষ্ট করিব এবং আপনি ঐ সময় মহাসুযোগে আপনার সৈন্যসামন্ত সহ তথায় গমন করিয়া, বৈশালী জয় করিতে সমর্থ হইবেন। তিন বৎসর পরে তাঁহাদের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া (রাজা শিশুনাগ) রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা শিশুনাগ বৈশালীতে অবস্থান করিলেন। তিনি অষ্টাদশবর্ষ রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র "কালাশোক" রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে বৈশালীতে সেনীয় শতের বেরত নামক বৌদ্ধাচার্য্যের সভাপতিত্বে সাত সহস্র অর্হৎ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ সম্মিলন হয়। ১১৮ বুদ্ধাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বদ্ধসেন মহাবংশ বৌদ্ধ সাহিত্যের মতে ও তাঁহার নয় জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৪০ বুদ্ধাব্দে তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চমুখ রাজসিংহাসন লাভ করেন। ক্ষমানন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিয়া উগ্রসেন নাম ধারণ করতঃ উক্ত রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বৈশালী নগরে জনৈক দস্যু দলপতি অবস্থান করিত। এবং তাহার দলস্থ বহুসংখ্যক লোক অন্যত্র গমন করিয়া, দেশবাসীগণের বিষয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। এক সময় কতিপয় বণিকের সম্পত্তি লুণ্ঠনকালে বণিকদিগের ভৃত্য ঐ দস্যুদলে মিলিত হয়! সে কালক্রমে দস্যুদলের নায়কত্ব লাভ করে এবং কুমুনন্দ নামে অভিহিত হয়। তাহারা ক্রমান্বয়ে শক্তিসঞ্চয় করিয়া পরিশেষে রাজা পঞ্চমুখকে হত্যা করিয়া বৈশালীর রাজসিংহাসন অধিকার করে। উগ্রসেন অল্পদিন রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অষ্ট ভ্রাতা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। উক্ত রাজন্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর দানানন্দ ব্রাহ্মণ চাণক্য কর্ত্তৃক নিহত হন। (ধননন্দ অংসং)

মহারাজ অজাতশত্রুর পুত্র উদায়িভদ্র স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়া মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা অনুরুদ্ধক মন্ত নাগদাসক প্রভৃতি রাজন্যবর্গ নিজ নিজ পিতাকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন লাভ করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পাটলিপুত্র ও নালন্দা।

পাটলিপুত্রের বর্ত্তমান ডাক নাম—পাটনা। বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান নগর। ভারত ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ। জগতবাসীর অতীব গৌরবের বিষয় এবং ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠের স্মৃতি এখনও লোকের মনে আনিয়া দেয়। পাটলিপুত্রের পুরাতন নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। রাজোদ্যানে বিবিধ প্রকারের কুসুম বা পুষ্পোদ্যানের বিদ্যমানতা হেতু উহা এই নামে অভিহিত। গ্রীকেরা পাটলিপুত্রকে পালি বোথা নামে বর্ণনা করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণ পাটলিপুত্রকে পালিস টু নামে অভিহিত করেন!

পাটলিপুত্র নামের উৎপত্তি

পাটলিপুত্র ইতিহাসের কতকাংশ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাংয়ের বিবরণ পাঠে পাটলিপুত্র নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত

এক সময় সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বহু সংখ্যক শিষ্য অধ্যয়ন করিত। আচার্য্যের কয়েকজন শিষ্য বনে ভ্রমন কালে, তাঁহাদের মধ্যে জনৈক সঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুবকের বিষণ্ণ চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য তাঁহারা কৃত্রিম বিবাহের আয়োজন করেন। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে কন্যাপক্ষের পিতা মাতা নির্ব্বাচিত করা হয়। পাটলি নামক এক বৃক্ষের নিম্নে যুবকের বিবাহোৎসবের আয়োজন হয়। কন্যার পক্ষের কর্ত্তাগণ, পাটলি বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন! এই রূপে বিবাহোৎসবের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া বরের সমপাঠিগণ গুরু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, বরকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে আহ্বান করেন—বর পাটলি বৃক্ষের শাখা ত্যাগ করিয়া কিছুতেই সম পাঠিদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন না;

সন্ধ্যা-অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জনৈক বৃদ্ধ তাঁহার স্ত্রী কন্যা সমভিব্যাহারে পাটলি বৃক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইলেন। জনৈক বৃদ্ধ তাঁহার কন্যা "অসূঢ়াকে" যুবক ছাত্রটীকে সম্প্রদান করিলেন। এই নবদম্পতি পাটলি বৃক্ষের নিম্নে এক বৎসর কাল অবস্থান করেন। যুবক কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র জন্ম গ্রহন করেন। সেই নির্জ্জন অস্তবাসী বনবাসে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে দৃঢ় সংকল্প করিলে তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর তাহাকে উত্তম গৃহ বাসের প্রতিশ্রুতিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন স্থগিত করাইলেন। অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল। যখন প্রাচীন মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয় তখন দেবগণ কর্ত্তৃক পাটলি বৃক্ষের নামে উক্ত নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইতিহাসে পাটলি পুত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ।

—ক্রমশঃ—

——:*:——

আকাশের নীলে শরত-লক্ষ্মী—

—শ্রীরাধারাণী দত্ত

আজি, বন-ভবনের ঘণ-পবনেরে নবীন-অতিথি ছুঁ'লো কি ?
এবে, শ্রাবণের কালো ধুয়ে—মিঠা-আলো আকাশে শরৎ খুলো কি ?
স্তব্ধ-গগনে সঘন-মাদল,—
বিদায় লয়েছে ব্যাকুল-বাদল,—
—দিক্‌বালা চ'খে সজল কাজল সোণালী-আলোয় ধুলো কি ?
ওগো, বনে বনে বনে মনে মনে মনে প্রাণ কি উঠেছে পুলকি ?

অই, অস্ত-গগনে গোধুলি-লগণে সিঁদুরের হোলি ফুটেছে,
মরি, শত-বরণের বরণোচ্ছ্বাস আকাশ প্লাবিয়া ছুটেছে।
পলকে পলকে লাল, নীল, সোণা,
রূপ বদ'লিয়া করে আনাগোনা,—
—সন্ধ্যা-বধুটি সোণা-তারে বোনা আঁচ্‌লায় সেজে উঠেছে।
দুখে, দিবসের আলো তালী-বন শিরে ব্যথায় রাঙিয়া লুটেছে!

ওগো, কেয়ার গন্ধ ফুরাইয়া এলো শিউলী-ফুলের সুরভি,—
শোন, আলোক-বীণায় পুরিয়া উঠেছে ভৈরবী টোড়ী পূরবী!

উজ্জ্বল মিঠা অলস-দুপুরে
নীল-নভ-রসে আঁখি ওঠে পুরে',
উদাস-চিলের সকরুণ-সুরে রৌদ্রে ফুটিল করবী,—
তাই, মৃণালে কোরক খুলিল নলিনী দুলিল কুমুদ গরবী !

ওঠে, ভিখারী-কণ্ঠে গ্রাম্য সরস আগমনী-সুর মিষ্টি,
পশি' শ্রবণের পথে মর্ম্মমহলে অমিয়া করিছে সৃষ্টি !
ধান্যের ক্ষেতে কমলার হাসি
কৃষাণিয়া-গান রাখালিয়া-বাঁশী
বন-অঙ্গনে ফল-ফুল রাশি করে আনন্দ-বৃষ্টি !
ওগো, আজি চণ্ডীর মণ্ডপ তলে ধাইছে সবার দৃষ্টি ।

আজি, বিরহিনী-বধূ ম্লান-চোখ দু'টি উজলি' তুলেছে আশাতে,
সারা, বরষের ব্যথা ভুলিবে প্রিয়ের আঁখির সপ্রেম-ভাষাতে ।
আকাশের নীলে শরত-লক্ষ্মী
মেলেছে স্বপন-জড়িত অক্ষি,—
কাননে-কাননে ভ্রমরা মক্ষি পাখীরা বৃক্ষে বাসাতে
আজি শুধু সেই-বাণী করে কাণাকাণি অশ্রু ভুলায়ে হাসা'তে !

গোবর্দ্ধন

—শ্রীকপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আসন্ন সন্ধ্যায় তখন মই কাঁধে উড়িয়া পুঙ্গব ছুটে ছুটে কল্‌কাতার তর্‌তরে পিচ ঢালা গলিপথের গ্যাসের আলোগুলো দপ্‌ দপ্‌ জ্বেলে দিয়ে চলেছে।—

দু'ধারে বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের প্রদর্শনী রূপী বিচিত্র অট্টালিকার জানালায় জানালায় শোনা যায়—

খেলার শেষে ধূলোমাখা পা ধুয়ে সুবোধ বালকেরা সন্ধ্যার প্রথম উন্মেষে ইংরাজী পাঠ মুখস্থ কর্‌ছে।—

সুপাত্রে পতনের আশায় বাঙ্গালী বাড়ীর ভবিষ্যৎ পাত্রীরা হারমোনিয়ম সহযোগে মাষ্টারের কাছে তারস্বরে প্রাণ পণে সঙ্গীতালাপন সুরু করেছে।—

আর, দরিদ্র কেরাণী গৃহে ক্ষুৎ-কাতর শিশু শুষ্ক মাতৃস্তনে দুধ না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশ উচ্চ ক্রন্দনে নিবেদন কর্‌ছে—আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে এখনই তাদের ক্লান্ত আঁখি ঘুমে জড়িয়ে এলে, জননীরা নিশ্চিন্তে রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্তা হবেন।—

এমনি এক শুভক্ষণে সওদাগরি অফিসের কেরাণী এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোবর্দ্ধন অকস্মাৎ জন্মগ্রহণ করেছিল—ওই অট্টালিকার শ্রেণীর মাঝে অকস্মাৎ-বিন্যস্ত এক মাটীর দেওয়ালে খোলার কুটীরে।

সেই শুভ মুহূর্ত্তেই হয়ত পাশের অট্টালিকায় গৌর মোহনও জন্মেছিলেন।

অট্টালিকায় ধনীর দুলাল শিশুকে সবাই আদর কর্‌ত, "গৌরমোহন, ও গৌরমোহন!—"

পাশে খোলার কুটীরে সে আদরের ডাক কানে আস্‌ত,—তবে স্পষ্ট নয়। কুটীরের অধিবাসীদের বড় সাধ ওই আদরের নামে নিজেদের শিশুটীকেও ডাকে। অস্পষ্ট শুনে শুনে আন্দাজে তারা নামটী রেখে ফেল্‌লে; ফলে, এ শিশুর নাম করণ হয়ে গেল—"গোবর্দ্ধন!

এই নাম করণ ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে গৌর মোহনের মত ধনী সন্তানের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের জীবন জড়িত হয়নি।

What's in a name!—নামে কি এসে যায়?—এই শাশ্বত বাক্য প্রমাণ করে' গোবর্দ্ধন বড় হ'ল। ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ কর্‌ল, বি-এ পাশ কর্‌ল, এম্‌-এ পড়তে লাগ্‌ল এবং প্রেমে পড়্‌ল।

তখন গোবর্দ্ধনের চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা, বদনে ক্ষৌরকার অবহেলায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি।—

ভালোকথা! বি-এ পাশের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধনের পিতৃবিয়োগ হয়েছিল! পিতৃদেব দেবলোকে যাবার সময় গোবর্দ্ধনের জন্যে রেখে গেলেন, তার বিধবা মাতাকে, বিধবা আশ্রিতা এক সম্পর্কীয়া বৌদিদিকে, লাইফ-ইন্‌সিওরেন্সের কয়শত টাকা আর কোন্ প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষের ভূস্বামীত্বের আভিজাত্য নিদর্শন স্বরূপ একজোড়া জীর্ণ শাল।

ভগবানের সৃষ্ট বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যে জগৎজুড়ে এই মানুষ জাতি মহৎ জাতি, এশিয়া ভূখণ্ডে আর্য্যজাতি এই মানুষ জাতির মধ্যে মহত্তর,—বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ভূস্বামী আভিজাত্যে মহত্তম। বাবা ছিলেন সওদাগরি অফিসের সামান্য কেরাণী, খোলার ঘরে বাস কর্‌তেন—গোবর্দ্ধন ভাব্‌ছিল, তাঁর দেওয়া এই প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরব পতাকা জীর্ণ শাল জোড়া গায়ে দিয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরুবে। বৌদিদি কিন্তু বল্‌লেন, "ও ছেঁড়া জামার উপরে আর শাল গায়ে দেয় না—পাড়ার লোকে হাস্‌বে।"

পাড়ার লোকের উপর গোবর্দ্ধন চটে' গেল—তাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান হীনতা উপলব্ধি করে'। স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে' তারা কিনা পরের গায়ে শাল দেখে হাসে!

গোবর্দ্ধন শালজোড়াটী জীর্ণ কাঠের সিন্দুকে বন্ধ করে' পিতার লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকায় এম্ এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল এবং একটী টিউশানীর জোগাড় করলে।

টিউশানী একটী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীকে!—গোলও বাধালে ওইখানে।

টিউশানী জুটেছিল তার গুণে।—বি এ ডিগ্রী, এম্ এ প'ড়ে, অথচ এ যুবা বয়সেও সাদা সিধা চালচলন, চশমা নিকেল ফ্রেমের, অযত্ন বিন্যস্ত কেশ দাম, বদন মণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সাধরণতঃ এতগুলি গুণের সমন্বয় এক সঙ্গে মিলে না—ছাত্রীর অভিভাবক সোল্লাসে তার আবেদন গ্রাহ্য করলেন। গোবর্দ্ধন কিন্তু গোল বাধিয়ে ফেললে!

ধনীর অট্টালিকায় বিজলী বাতি ঝলকিত পাঠ কক্ষ। সুন্দর রং করা দেয়াল, লম্বা আঁকা-লতাপাতার পাড় বসানো। সুদৃশ্য আলমারির দারুময় ফ্রেম বার্নিশে ঝক্‌ঝকে করা—প্রতিবিম্ব দেখা যায়। টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে' গোবর্দ্ধন ছাত্রীর প্রতীক্ষায় একটু বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

আসবার আগেই সে আজ পেছিয়ে পড়ছিল বৌদিদি সাহস দিয়েছিলেন, "ভয় কি?—চাকরী নিয়েছ ত' যাবেনা কেন? বড়লোকের মেয়ে ত' আর খেয়ে ফেলবে না!"

বড়লোকের মেয়ে যে তার মত পুরুষ মানুষকে খেয়ে ফেলবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত প্রত্যয় হ'লেও, ছাত্রীর প্রতীক্ষায় গোবর্দ্ধন টেবিলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে হেঁটমুখে বসে' বসে' বিচলিত হয়ে পড়ছিল—সুদৃশ্য ঝালর লাগানো কাচাবরণের মধ্যে বিজলী বাতির টেবিল-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে টেবিলের ঝক্‌ঝকে বার্নিশে কিসের সব কালো কালো প্রতিবিম্ব ফেলেছে, বিচলিত হ'য়ে গোবর্দ্ধন তাই দেখতে লাগল।

পঞ্চদশী ছাত্রী ঘরে এলেন,—সন্ধ্যার ফুটন্ত হাস্নুহানার গন্ধের মত মৃদু হাস্য ছড়িয়ে, চরণে ছোট্ট জুতী চটী মেঝেয় আলতো আলতো ঘসড়ে ঘসড়ে, কাঁধে সযত্নে বা অযত্নে রঙিন শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে। আলুলায়িত কুন্তলের সর্পিত হিল্লোলে গোবর্দ্ধন মুখ তুলে চাইতে পারছিল না।

ছাত্রী বোধ হয় গোবর্দ্ধনের বিপদ অনুভব করতে পারলেন—মেয়েরা কেমন যেন পারে—তাই সহাস্যে গোবর্দ্ধনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, "আমি এখন হিষ্ট্রী পড়ব—আপনি হিষ্ট্রী পড়াবেন ত'?" গোবর্দ্ধনের কাণে বীণার ঝঙ্কার বেজে গেল!

ব্যস্, গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে' গেল—প্রথম দর্শনে প্রেম যারা বিশ্বাস করে না, তাদের মুখ চূর্ণ করে' দিয়ে গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে' গেল!

গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে' গেল বটে, কিন্তু নীরব সাধকের মত মনে মনেই তার হৃদয় অধিষ্ঠাত্রীর পূজা করতে লাগল। মুখে কোন দিন কিছু নিবেদন করলে না—শুধু প্রাণ ঢেলে পড়াতে লাগল!

ভবিষ্যতের বিশ্বকবি গোবর্দ্ধনের এ আদর্শ প্রেমের কথা স্মরণ রাখলে রক্ত করবীর বিশুর চেয়েও মহত্তর প্রেমিকের চরিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

একদিন কথায় কথায় হৃদয়-অধিষ্ঠাত্রী বললেন, "গোবর্দ্ধনবাবু, আপনি দাড়ি কামান না কেন?—অশৌচ নাকি? কিন্তু জুতো ত' পায় দেন।—"

ক্ষৌরকারের কর্ত্তব্যহীনতা স্মরণ করে' গোবর্দ্ধন মনে মনে তার উপর ভীষণ চটল। তার মনে হ'ল,—

এ দেশের প্রতিবেশী কর্ত্তব্যহীন—পরের গায়ে শাল দেখে হাসে; দেশের নেতা কর্ত্তব্যহীন—দেশ উদ্ধার করে না; দেশের প্রজা কর্ত্তব্যহীন—ফণ্ডে চাঁদার টাকা দেয় না; দেশের পুলিশ কর্ত্তব্যহীন—কলকাতার পথে পথভ্রান্ত পথিককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পথ দেখিয়ে দেয় না; আর দেশের ক্ষৌরকার কর্ত্তব্যহীন—যথা সময়ে গোবর্দ্ধনকে মনে করে' দেয় না—তার দাড়ি-কামানো নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধন কিন্তু আনন্দিতও হ'য়ে উঠ্‌ল,— তার আকৃতির প্রতি তবে নেত্রপাত হ'য়েছে।

আনন্দিত হ'য়ে ভাব্‌লে, "আহা, কি sincere— সরলতা মাখা!"

গোবর্দ্ধনের ধারণা ছিল সে নিজে বড় sincere—সরল, এবং আর কাকেও সরল মনে হ'লে সে তার প্রতি প্রীতি-মুগ্ধ হ'য়ে যেত।—

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—গোবর্দ্ধন তখন ইস্কুলে। ঘন ঘন কাশীরামদাসের মহাভারত থেকে আবৃত্তি করে' সে সহ-পাঠীদের মাঝে মাঝে উত্যক্ত করে' তুলত, তারা বিরক্ত হ'লে গোবর্দ্ধন sincere গাম্ভীর্য্যে বলত,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্॥

মুখ ভেংচে একজন জবাব দিয়েছিল,

গোবর্দ্ধনের গলা রাসভ—সমান।
যে শোনে সে ডাক ছাড়ে—কর পরিত্রাণ!

গোবর্দ্ধন চটেছিল, অতবড় দলটার বিরুদ্ধে সাহস করে' যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌তে পারে নি, তাই চুপ করে' গিয়েছিল।

রাত্রে শয়নে ক্রোধ উপশম হ'লে কিন্তু তার মনে হ'ল— ঐ সতীর্থটী sincere—সরল! তার কণ্ঠস্বর যে মধুর নয়, কেমন অবলীলাক্রমে তার মুখের উপর বলে' দিলে!

তখন থেকেই গোবর্দ্ধনের মনে sincere প্রীতি জেগে উঠেছিল!

তারপরদিনই গোবর্দ্ধন ইস্কুলে গিয়ে সতীর্থটীকে বলেছিল, "ভাই, তুই খুব sincere!"

সেই সরলতা মুগ্ধ গোবর্দ্ধন আজ ছাত্রীর সরল প্রেমে দ্বিতীয়বার প্রীতি-মুগ্ধ হয়ে গেল। মনে, মনে গদ্‌গদ্ হয়ে অনুভব কর্‌লে—আহা, একে প্রাণ ভরে ভাল বাস্‌বে, প্রাণ ভরে ভাল বাস্‌বে।

গোবর্দ্ধনের জীবন ইতিহাসে তার বিধবা জননীর বিশেষ স্থান নেই। তা'ছাড়া, বৈধব্যশোকে রোগক্লিষ্টা হ'য়ে তিনি প্রায় মরণা-পান্না—গোবর্দ্ধনের অবশ্য আজকাল অত সন্ধান রাখ্‌বার অবসর নেই।

দিন যায়, মাস যায়। গোবর্দ্ধন প্রেম-সায়রে হাবুডুবু খায়। এক সন্ধ্যায় তার জননী ইহলোক ত্যাগ কর্‌লেন, গোবর্দ্ধন তাঁকে চিতায় তুলে দিয়ে এল—তখনও সে প্রেমে মশ্‌গুল, জননীর চিরবিচ্ছেদ সে আদর্শ প্রেমের কাছে বিশেষ স্থান লাভ কর্‌তে পার্‌লে না।

দেখে শুনে তার বৌদিদি একটু বিস্মিতা হ'লেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেন না, "ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না কি?"

আবার দিন যায়, মাস যায়। গোবর্দ্ধন প্রেম-সায়রে হাবুডুবু খায় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ছাত্রী পড়ায়।

তারপরে? তারপরে একদিন গোবর্দ্ধন নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে তার ছাত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়ে এল!—বর বিদ্বান্, সুপুরুষ, বড়লোকের ছেলে।

গোবর্দ্ধন চটল, "নাঃ, তার এত বড় sincere প্রেমের যে প্রতিদান দিতে পার্‌লে না, সে মেয়ে কখনই sincere নয়!—"

'ছুত্তোর' বলে গোবর্দ্ধন এম্ এ পড়া এবং প্রেমে ইস্তফা দিয়ে বৌদিদিকে এসে বল্‌লে, "চল বৌদিদি, কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাই—আমাদের পাড়া গাঁয়ের বাড়ীতে। সেখানে বাড়ীঘরে দু' একটা কুট্‌রীও নিশ্চয় অবশিষ্ট আছে।

কল্‌কাতার লোক কেউ sincere নয়, কল্‌কাতার লোকের কারও কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই!—

পিতার লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকার কয়েক শত তখনও অবশিষ্ট ছিল।

পাণাঢাকা সরসী, আম্রকানন, এবং বেণুবনের পাশ দিয়ে যে মাটীর রাস্তা আষাঢ়ের বর্ষণে পঙ্কসঙ্কুল হয়ে উঠেছে, এক শুভদিনে সেই পথে গোবর্দ্ধন বিয়ে করে এসে তার পল্লীগ্রামের জীর্ণ অভিজাত অট্টালিকায় উঠ্‌ল—শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দশদিক আমোদিত।

আসন্ন যৌবনা শ্যামাঙ্গী এক পল্লীবালা গোবৰ্দ্ধনের গলে কুসুমের মালা দিয়েছিলেন।

গোবৰ্দ্ধনের sincere গম্ভীর মুখে হাসি আজ আর ধরে না!—কেন হাস্‌বে না? প্রাণে যদি sincere আনন্দের sincere হাসি এসে থাকে ত' কেন হাস্‌বে না?

পাড়ার বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা নবোঢ়াকে মধুচক্রে মৌমাছির মত ঘিরে বসেছে—আকুলি বিকুলি সারাদিন গোবৰ্দ্ধন ঘর এবং বাহির, বাহির এবং ঘর ছুটাছুটি কর্‌লে, চেলিঢাকা শ্যামাঙ্গীর যৌবনোজ্জল মুখখানি একবারও দেখ্‌তে পেলে না।

পাড়ার প্রবীনেরা সোৎসাহে সম্বন্ধটা করেছিলেন। গোবৰ্দ্ধনের ধর্ম্মে গভীর আস্থা ছিল, বিবাহলগ্নে শুভদৃষ্টির সময়ে সে বধূর সঙ্গে দুরু দুরু বক্ষে এক মনে শুধু দৃষ্টির বিনিময় করেছিল, এমন কি বধূর দৃষ্টি-যন্ত্র নয়ন দুটী কেমন দেখ্‌তে তা পর্য্যন্ত দেখেনি—দেখে থাক্‌লেও দৃষ্টিবিনিময়ের আধ্যাত্মিকতায় তার মন এতদূর নিমগ্ন ছিল যে সে আয়ত-নয়নদুটীর আয়তন আকৃতি কিছুই মনে রাখ্‌তে পারেনি।

বাসররজনী পল্লীগ্রাম-সুলভ হট্টগোলে কেটেছে। বৃদ্ধা রসিকা কেহ বধূর ঘোমটা খুল্‌তে টানাটানি করেছেন, গোবৰ্দ্ধন সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে, ব্রীড়াবনতা হেঁটমুণ্ডে মাটীতে মিশিয়ে গিয়েছেন!

তারপরে রসিকা বৃদ্ধার অধ্যবসায়ে যদিও বা বধূর মুখাবরণ অপসারিত হ'য়েছে, সে সময়েই রসিকা এক শ্যালিকা পটুহস্তে দুরদৃষ্ট গোবৰ্দ্ধনের কর্ণ মর্দ্দন করেছেন, সন্ধিক্ষণেই বেচারা অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিল।

তার উত্তরীয় প্রান্তে বধূর চেলির আঁচল বাঁধা—পাল্কীতে মধুর সান্নিধ্যটুকু অনুভব কর্‌তে অবশ্য সে পেরেছিল। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে গেলে স্তব্ধ জলাশয়ে শিরশিরে ঢেউ যেমন চক্রাকারে খেলে চলে যায়, তেমনি কোন অননুভূতপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সে সারা দেহে মাঝে মাঝে অনুভব কর্‌ছিল। অবগুণ্ঠিতা বধূ সম্মুখে বসে, চেলির আড়ালে কমনীয় হাতদুটীর অঙ্গুলি গুলি শুধু দেখা যাচ্ছে—গোবৰ্দ্ধনের ইচ্ছে হচ্ছিল একবার একটু খানি ওই অঙ্গুলিগুলির মদিরস্পর্শ অনুভব করে। পাল্কীর জানালার ফাঁক দিয়ে সে বাহিরটা দেখে নিলে, কিন্তু তার হাত উঠ্‌তে উঠ্‌তেও উঠ্‌লনা, গোবৰ্দ্ধন আত্মসংযম কর্‌লে এবং পাল্কীবেহারার 'হেঁইয়ো, হেঁইয়ো' ডাক শুন্‌তে মনোনিবেশ কর্‌লে।

সারাদিন নিরাশ হয়ে কুলুঙ্গির প্রদীপালোকে রাত্রে ফুলশয্যায় গোবৰ্দ্ধন শুয়ে শুয়ে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা কর্‌ছে—এতক্ষণে আশা মিটবে, তার বাঞ্ছিতার অনবগুণ্ঠিতা মুখশ্রী দেখে নয়ন-মন সার্থক কর্‌বে।

বৌদিদি সযত্নে গৃহখানি সজ্জিত করে' দিয়েছেন। প্রাচীন অট্টালিকার জীর্ণগৃহ, গোবৰ্দ্ধন পিতার লাইফ-ইন্‌সিওরেন্সের কয়টী টাকা খরচ করে' একটু চুণকাম করিয়েছে। এ পাশে নবক্রীত তক্তাপোষে পুষ্পশয়নের শুভ্র শয্যা—বেলা, চামেলি, দুচারটী গন্ধপুষ্পের মালায় মধুরতা মাখা; ওপাশে ছোট জল চৌকির উপরে চক্‌চকে করে মাজা খানকয় কাঁসা পিতলের বাসন। দেয়ালে খান দু তিন মলিন ছবি, কিন্তু পরিপাটী করে টাঙানো। এ পাশের দেয়ালে একজোড়া কুলুঙ্গি, একটীতে মৃন্ময়-প্রদীপ আলোক বিকীর্ণ কর্‌ছে।

গোবৰ্দ্ধনের জীবনের শুভ মুহূর্ত্তটী এসে গেল। বৌদিদি দুয়ার ঠেলে বধূকে ঘরে ঢুকিয়ে চলে গেলেন—দেবরের পানে তাকিয়ে মুখে তাঁর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি। গোবৰ্দ্ধনের বুকটা দুরু দুরু করে উঠ্‌ল, সে শয্যায় উঠে বস্‌ল।

বৌদিদি চলে গেলে, বধূ ধীরে ধীরে ধীরে দুয়ার বন্ধ কর্‌লেন—কিন্তু ওকি, গোবৰ্দ্ধন অবাক হয়ে দেখ্‌লে, বন্ধ দুয়ারের দিক থেকে বধূ আর অবগুণ্ঠিত মুখ ফিরান না।

গোবৰ্দ্ধন কি যে করে, ভেবে পাচ্ছিল না—বহুক্ষণ চঞ্চল প্রতীক্ষায় কাটিয়ে তার মনে হ'ল, বধূকে অভ্যর্থনা করে আহ্বান করা উচিত। কিন্তু, কথা বল্‌তে গিয়ে সে আবিষ্কার কর্‌লে, শৈশবে খাদ্যভ্রমে যে একখণ্ড তুলা গিলে গলায় আটকেছিল, আজ এতদিনে সেটা জঠরাভ্যন্তরের

কোন কোণ থেকে পুনর্ব্বার কণ্ঠের স্বরপথ রোধ করেছে। যা' হোক, বহুকষ্টে সে উচ্চারণ করলে, "আসুন!"—

হিতে বিপরীত হ'ল, বধূ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ত ছিলেনই, এখন উন্নত মাথা তাঁর অবনত হয়ে গেল—ঘাড় হেঁট করে তিনি বুঝি দুয়ারের জীর্ণ ইট গুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিসের সন্ধান করতে লাগলেন।

গোবর্দ্ধন আর থাকতে পারলে না, শয্যাত্যাগ করে' উঠে দাঁড়াল। বধূ সম্ভ্রস্তা হ'য়ে উঠলেন—অথবা উল্লসিতা হ'য়ে উঠলেন, ঘোমটার আড়ালে মুখখানি দেখতে পেলে বোঝা যেত। হয়ত বা এখনই গোবর্দ্ধন স্বহস্তে গুণ্ঠন উন্মোচন করে' দিলে উল্লাসের মৃদু হাসি কেমন করে' লুকাবেন, সেই কূলকিনারা-হীন চিন্তায় বিহ্বলা হয়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে পদনখে শক্ত মেঝে খোঁড়বার ব্যর্থ প্রয়াস পেতে লাগলেন।

কিন্তু গোবর্দ্ধন তেমন কিছু করলেনা, সে ধীরে ধীরে গিয়ে একবার কুলুঙ্গিটার কাছে দাঁড়াল,—প্রদীপটা উসকে দিলে; গৃহের অপর প্রান্তে জলচৌকির বাসনগুলোর কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে এল; তারপরে ধীরপদে বধূর কাছে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—শেষে অতিকষ্টে উচ্চারণ করলে, "আসুন না—"

বধূর পরিপাটী অলক্তরাগ-রঞ্জিত সুডৌল চরণ একটু যেন নড়ে উঠল—তারপরেই কিন্তু আবার দুয়ারজোড়া অবলম্বন করে মাটীতে মিশিয়ে যেতে চাইলেন।

পুষ্পিত ব্রততীর মত নবযৌবনভারাক্রান্ত বধূর বস্ত্রান্তরালের দেহখানি আত্মহারা হয়ে ধরা দিতে চাইছিল—গোবর্দ্ধনের অনুভূতি আবছা আবছা যেন অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু দুবার সে "আসুন" বলেছে, কিন্তু সে আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কিছুই পায়নি—sincereমনে তার অভিমানের উদ্রেক হল। অভিমানউচ্ছ্বাসে কাতর হয়ে গোবর্দ্ধন ত্বরিতপদে শয্যায় ফিরে শুয়ে পড়ল। শীঘ্রই তার ক্লান্তদেহের চক্ষু দুটী অবসাদে নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ল—কিছুক্ষণ পরেই সে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগল।

যা' হোক, বৌদিদির অসীম অধ্যবসায়ে পরদিন আর গোবর্দ্ধনের অতটা দুর্দ্দৈব রইল না—শ্যামাঙ্গীর শ্যামল অঙ্গের মাধুরী দেখে ধন্য হ'ল। ক্রমশঃ সে বধূর সঙ্গে পরিচিতও হ'য়ে পড়ল, তবু কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ক্ষুব্ধ—কত সাধলে তবে ঘোম্‌টা খোলে, কত সাধলে তবে একটা কথা বলে, কত সাধলে তবে একটু হাসে!

পুরুষমানুষকে যে স্ত্রীলোকের এত তোষামোদ করতে হয়, গোবর্দ্ধন তা' ভাবতে পারত না।

হিন্দুরমণীর কর্ত্তব্য স্বামীকে পূজা করা, সাধ্যসাধনা করা—অথচ তার বধূরই তোষামোদ করতে হয়।

গোবর্দ্ধন সাধাসাধি না করেও পারে না, কিন্তু বধূর কর্ত্তব্যহীনতা দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়।

কয়েকদিন পরে গোবর্দ্ধন লোকাচার অনুযায়ী বধূকে পিত্রালয়ে রেখে এল। বধূকে পিত্রালয়ে রেখে এসে হঠাৎ সে অনুভব করলে, তার ভিতরে কোথায় একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। শূন্যশয্যায় শুয়ে কড়িকাঠ গুণতে গুণতে সে আবিষ্কার করে ফেললে, এমন কর্ত্তব্য-হীনা বধূকেও সে ভালবেসে ফেলেছে! গোবর্দ্ধনের বড়ই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'তে লাগল।

কালি, কলম এবং কাগজ নিয়ে সে পত্ররচনায় মন দিলে, "আর্য্যে," "ভদ্রে," "প্রিয়ে," "প্রিয়তমা" সম্বোধন করে' অন্যমনস্ক ভাবে তিনচার পৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠি লিখে ফেললে। বড় বড় শুদ্ধভাষা—তা হোক, তারই মধ্যে সত্যি সত্যিই গোবর্দ্ধন প্রাণের উচ্ছ্বাস নিবেদন করে' ফেলেছিল।

তারপর বধূর চিঠি এল—কিন্তু গোবর্দ্ধন বড় নিরাশ হ'ল। চিঠিতে শুধু আঁকাবাঁকা অক্ষরে "শ্রীচরণেষু," "প্রণাম জানিবেন," "প্রণাম জানাবেন" ইত্যাদি। আরও ছিল—"অতবড় চিঠি লিখিবেন না—সবাই লজ্জা দেয়!"

Sincere গোবর্দ্ধন দুঃখিত হ'ল। তার প্রাণের উচ্ছ্বাস নিবেদন করেছিল, সে Sincerity—সরলতা বধূ

বুঝ্‌লেন না। সম্মুখে বধূ লজ্জায় ঘোম্‌টা খোলেন না, অথচ পিত্রালয় থেকে স্বামীকে বড় পত্র লিখতে নিষেধ করে' আদেশ করেন! গোবর্দ্ধন ক্ষুব্ধ হ'ল স্ত্রীর Sincerityর অভাব দেখে। আঁকাবাঁকা লেখায় কোন ভীরুহিয়ার মধুর কম্পন অনুভব করতে পারলে না।

সে আবার "দুত্তোর" বলে' ফেল্‌লে এবং বৌদিদিকে এক আত্মীয়ার বাড়ী রেখে বৈরাগ্য অবলম্বন করলে।

তবে, বৈরাগ্য নিয়ে হিমাচলের পাদমূলে গভীর বনান্তরালে তপস্যায় বস্‌ল না, কল্‌কাতার মেসে এসে চাকুরীর উমেদারীতে মন দিলে। বিবাহে পিতার লাইফ-ইন্সিরিওন্সের অর্থ ফুরিয়ে এসেছিল।

মা

কথা-নাট্য

—শ্রীমন্মথ রায়

[কলিকাতার উপকণ্ঠে একখানি জীর্ণ খোলার ঘর। একটি জানালাও আছে। নীরব নির্জ্জন নিশীথ। ঘরে একটি তৈল প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারই পাশে একখানি তক্তপোষ। তাহাতে গৃহস্বামীর অষ্টমবর্ষীয় পুত্র মাণিক নিদ্রিত। বালকের প্রবল জ্বর হইয়াছে। পার্শ্বে গৃহস্বামী রাইচরণ। রাইচরণ তখনো জাগিয়া রহিয়াছেন এবং প্রদীপের ঐ ক্ষীণালোকেই একখানি কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেছেন। মাণিক ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল এবং ডাকিল—মা!]

মাণিক। মা!

রাইচরণ। কি বাবা! কি চাই?

মাণিক। মা কি আসবে না?

রাইচরণ। [তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া] তোমার জ্বর তো কমে এসেছে বাবা!……আর একটু ঘুমাও…… জ্বর একেবারে ছেড়ে যাবে। বেদানার রস দেব একটু?

মাণিক। [বিরক্ত হইয়া] মা এসেছে কি না তাই বল—

রাইচরণ। সে যে আসতে পারে না বাবা! কতদিন কতবার তোমায় বুঝিয়ে বলেছি!

মাণিক। মা তো মরে নি বাবা! বেঁচেই আছে।… ফটিকও তাই বলছিল, আমি এখন স্বপ্নেও যে তাই দেখলাম!

রাইচরণ। ফটিক?……ফটিক ছোড়া কি আজ আবার এসেছিল?

মাণিক। আসবে না? আমার এই অসুখ, সে না এসে পারে?……তুমি যখন দুপুরে কাজের খোঁজে বেরিয়ে যাও, কেমন করে আমি একলাটি পড়ে থাকি বল!—

রাইচরণ। কিন্তু তার যে স্কুল রয়েছে…স্কুল পালিয়ে বুঝি এখানে এসে আড্ডা দেয়?

মাণিক। তা দেয়। দিতে যে হয়।……নইলে আমার যে ভালো লাগে না!…ও বলে ওরও ভালো লাগে না!……

রাইচরণ। কিন্তু দুপুরে তো ও বাড়ীর মোক্ষদামাসীকে তোমার কাছে রেখেই যাই!

মাণিক। ফটিক এলেই আমি তাকে তাড়িয়ে দি।

বুড়ীর রাত্তির দিন সেই এক কথা! তোর মা মরেছে। তার কথা ভাবতে নেই। ভূত হয়ে আছে কি না, বেশী ভাবলে, বেশী ডাকলে ছুটে এসে তোকে কোলে তুলে নিয়ে যাবে। আমি বলি বেশ তো! তাতে কি বলে জানো?

রাইচরণ। তুমি বড় বকছ বাবা!......একটু ঘুমাও।

মাণিক। বলে কোলে নিয়েই চুমো খেতে গিয়ে রক্ত চুষে খাবে, আদর কর্ত্তে গিয়ে ঘাড় মটকাবে। ওদের ঐ নাকি ভালোবাসা! শুনে আমার এমনি রাগ হয় যে......

রাইচরণ। বুড়ী পাগলি, তাও তো জানিস বাবা!

মাণিক। যদি পাগলিই হবে, তবে আমার কাছে থাকা কেন? ফটিক বলে ওকে পাগলা গারদে পুরতে হবে! ফটিক ওর একটা কথাও বিশ্বাস করে না। মার কথা ফটিক কি বলে জানো বাবা?

রাইচরণ। বটে, ওসব নিয়েও সে আলাপ করে নাকি? ...ধাড়ী ছেলেটা তোর মাথা খাবে দেখছি!

মাণিক। না বাবা। ভারি ভালো ফটিক। বলে মা আমার মরে নি। বেঁচে আছে।

রাইচরণ। [ব্যঙ্গে ও বিরক্তিতে] সে দেখেছে?

মাণিক।—দেখেছে।

রাইচরণ।—বটে!......রসো—

মাণিক। তুমি রাগ কর্‌ছ কেন বাবা? মা বেঁচে আছে শুনে তুমি চটবে কেন?

রাইচরণ। আমি চট্‌ছি এই ফট্‌কে ছোড়ার মিথ্যে কথায়!......ও অমনি সব মিথ্যে কথা বলে তোর এই অসুখের মধ্যে তোর মন খারাপ করে দেয় কেন?

মাণিক। না বাবা, মা বেঁচে আছে শুনলে আমার ভারী ভালো লাগে। আমার হ'চ্ছে হয় শীগ্‌গীর সেরে উঠি। ও আমাকে কি বলেছে জানো?

রাইচরণ। কি বাবা?

মাণিক। আমি সেরে উঠ্‌লেই আমার মাকে আমায় দেখাবে। দেখাবেই দেখাবে। ও নিজে দেখেছে কি না!

রাইচরণ। এ সব মোটে ভালো নয়। মাণিক!...... তুমি ঘুমাও লক্ষীটি আমার! আমি তোমায় হাওয়া করি?......বেদানার রস দি একটু, কি বল?

মাণিক। মার কথা বল বাবা!......আমার সব অসুখ এখনি আরাম হবে।...আচ্ছা বাবা, মা না নাকি দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে এখন?

রাইচরণ। ছিঃ বাবা। ও সব কথা বিশ্বাস করো না। মরা মানুষকে কি কেউ দেখতে পায়?......

মাণিক। আমি দেখেছি—

রাইচরণ। সে কি বাবা?

মাণিক। এই মাত্র! এখনি!

রাইচরণ। সে কি মাণিক?

মাণিক। হাত বাড়িয়ে ধর্ত্তে গেলাম, ঘুম ভেঙে গেল!

রাইচরণ। স্বপ্ন দেখেছিলে—

মাণিক। ভারী, ভারী সুন্দর হয়েছে আমার মা! ......লালপেড়ে সাড়ী পরণে, হাতে দেখলাম সোণার চুড়ী! গলায় জড়োয়া হার! এসব তাকে কবে দিলে বাবা?

রাইচরণ। স্বপ্নে লোকে কত কি দেখে বাবা?

মাণিক। আমিই না হয় দেখলাম স্বপ্ন, আর ফটিক?

রাইচরণ। ফটিক কি দেখেছে কাল যেন আমার সম্মুখে বলে—,দেখবো তার বুকের পাটা—হুঁ।!

মাণিক। আর যদি ফটিকের কথাই সত্যি হয়?

রাইচরণ। মরামানুষের কথা ভাবলেও দোষ। পাপ হয়। মহাভারত তো পড়িসনি? মহাভরতে কি লেখে শোন—

কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান।
মাহাভারতের কথা অমৃত সমান॥''

মাণিক। অমৃত তো মধুর চাইতেও মিষ্টি, তার চাইতে মিষ্টি আমার মার কথা। তুমি না বললে। কর

বাবা একটু হাওয়া। আমি ঘুমুব, ঘুমুলেই মা আসবে আমার কাছে, আমার মাথার পাশে এসে বসবে, তোমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নেবে, হাওয়া কর্ব্বে, শরীর জুড়িয়ে যাবে, চুমু খাবে, আদর কর্ব্বে, তেঁতো ওষুধ দেবে সব জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে…, আমায় ভাত রেঁধে খাওয়াবে, দুধ দেবে বাটি বাটি—, আমি খেতে না চাইলে শাস্তর বলবে, সেই সাতরাজার ধন এক মাণিকের কথা, তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চড়ে একাই চলেছে, কোথায় সেও জানে না, হঠাৎ এসে পড়ল এক রাজপুরীতে…দুয়ার খুলে গেল…হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া…সব ঘুমিয়ে…লোক লস্কর সিপাহি সান্ত্রী, রাজা রাণী সব ঘুমিয়ে…শেষে এক সোণার ঘরে রূপার পালঙ্কে মেঘবরণ চুল কুচবরণ এক রাজকন্যা…সেও ঘুমিয়ে, পাশে ছিল সোণার কাঠি—সোণার কাঠি হাতে নিয়ে রাজপুত্তর যেই রাজকন্যাকে ছুঁ-য়ে-ছে…[বলিতে বলিতে মাণিক ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।]

রাইচরণ। মাণিক—

মাণিক। [ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাইচরণ কোন সাড়া পাইলেন না। তখনি তিনি উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল 'ঘুমিয়েছে ?']

রাইচরণ। [মাণিকের দিকে একবার তাকাইয়া, নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পুনরায় মাণিককে ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। রাইচরণ জানালার বাহিরের আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 'ঘুমিয়েছে।…কিন্তু, তুমি এসেছ কতক্ষণ ?'

আগন্তুক উত্তর করিলেন 'স্বপ্নে যখন ওর মাকে দেখে ও চমকে উঠেছিল—তখন, তখনই তো আমি তোমার জানালার নীচে।…এইবার দুয়ার খোল—আর তো এখানে দাঁড়াতে পারি নে! রাইচরণ বাতি নিবাইয়া দিল এবং দুয়ার খুলিল। আগন্তুক ঘরে আসিলে রাইচরণ দুয়ার বন্ধ করিল।]

আগন্তুক। বাতি নেভালে কেন ?

রাইচরণ। আজ তো নূতন নেবালাম না!…কেন নেভালাম তাও না জানো, না বুঝছ…এমন নয়! আর হাতে তো দেশলাই রয়েছেই—

আগন্তুক। আজ জ্বর ছেড়েছে ?

রাইচরণ। জ্বর আজ কম। কিন্তু…ভুল বকছে খুব!

আগন্তুক। কে যে ভুল বকে, আর কে যে বকে না, তা বলা কঠিন। তুমি ভাবছ ও ভুল বকেছে, ও ভাবছে তুমি ভুল বকছ, না ?

রাইচরণ। কিন্তু এমন করে আর কদিন চলবে ?

আগন্তুক। দোষ কি আমার ?

রাইচরণ। কিন্তু উপায়ই বা কি ?

আগন্তুক। উপায় তোমার হাতেই রয়েছে!

রাইচরণ। সে কি ?

আগন্তুক। উপায় চাও—?

রাইচরণ। পেলে তো বাঁচি!

আগন্তুক। এই অন্ধকারে কোথায় যে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াব, সেই দাঁড়াবার ঠাঁইটুকুও খুঁজে পাই না, দেশলাইটা দাও…না, আমার কাছেও যে রয়েছে!

[দেশলাই ধরাইলেন, কিন্তু রাইচরণ ভীত চমকিত হইয়া তখনি তাহা ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিলেন।]

রাইচরণ। তোমার এতটুকু ভয় নেই ?

আগন্তুক। [অবিচলিত চিত্তে পুনরায় দেশলাই ধরাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই তৈল প্রদীপ জ্বালাইলেন।]

রাইচরণ। সর্ব্বনাশ!

আগন্তুক। [দেখা গেল তিনি এক কৃশাঙ্গী নারী, প্রথম দৃষ্টিতে অপরূপা রূপসীই বটে]। আজ আর সর্ব্বনাশ নয়। সর্ব্বনাশ যাহার তাতো হয়েই গেছে!

রাইচরণ।……কিন্তু ঐ আলো ?

আগন্তুক। আলো জ্বালাতেই আজ আমি এসেছি। তোমাকে বলে দেখেছি তুমি জ্বালাও না, দেশলাই তাই আজ নিজেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি!

রাইচরণ। বাতাসী!

আগন্তুক। বাতাসী না মরেছে?

রাইচরণ। কিন্তু মরাই বুঝি ভালো ছিল।

আগন্তুক।—কার?

রাইচরণ। [নীরব রহিলেন।]

আগন্তুক। বল…কার?

রাইচরণ। [তথাপি নীরব রহিলেন।]

আগন্তুক।—আমার?

[রাইচরণ কোন উত্তর দিলেন না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন।]

আগন্তুক। একদিন সত্যিই তাই মনে করেছিলাম মরাই ভালো ছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে করি না! মনে কর্ত্তেও ঘৃণা হয়। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া]…… কেন মরব? কোন দুঃখে মরব?…না হয় জন্মেই ছিলাম গরীবের ঘরে, কিন্তু, সংসারে বারো আনা তো গরীব, তাতে হয়েছে কি?……গরীবের ঘরে কি সুখ থাকতে নেই? শান্তি থাকতে নেই?……আমি ছিলাম এক গরীবেরই ঘরে গরীব বাপ মায়ের দুঃখের ধন, সে আদর তো আর পেলাম না জীবনে!……বিয়ে হল বটে—

রাইচরণ। বিয়ের কথা আর কেন আজ?

আগন্তুক। হঁা, সে কথাতে তোমার লজ্জা পাবার কারণ আছে। আলো না হয় আবার নিবিয়েই দি— [দীপ নির্ব্বাপণ।] তোমার সকল লজ্জা ঢেকে গেল।…… কিন্তু, আমার কথা আলোতেই বলবার কথা।……তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে হলো, মনে হল গরীবের এই আঁধার জীবনে, আলো! শুধুই আলো! কি তার রূপ! কি তার রঙ!…আয়নাতে যখন মুখ দেখতাম মনে হতো আমি আরো সুন্দর হয়েছি! সত্যিই তাই হয়েছিলাম, না?

রাইচরণ। [নীরব রহিলেন।]

আগন্তুক। তুমি না হয় নাই বলেছিলে, আজো না হয় নাই বললে!……কিন্তু, বলবার লোকের তো অভাব ছিল না! সে তো তুমি সবই জানতে!……মুসলমান পাড়ার সেই নবাবরা তো ছিলেন, তারা শুধু আমাকে চিঠি পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি, তোমাকেও তো নোটের তাড়া সেধে ছিলেন! আর কিছু না হোক, তাঁরা যে গুণগ্রাহী ছিলেন, অন্ততঃ খাঁটি জহুরীর মতো যে আমাকে চিনে বের করে-ছিলেন, এতেই আমি তাদের তারিফ করেছি ঢের!

রাইচরণ। মাণিক জেগে উঠবে………

আগন্তুক।—না, উঠবে না……আর যদি ওঠেই, সে তাতে খুশীই হবে!……কিন্তু, তুমি অত অখুশী হচ্ছ কেন?

রাইচরণ। তুমি কি মদও ধরেছ?

আগন্তুক। ইচ্ছে হয় ধরি, শুধু ভুলে যেতে যে আমি ঐ মাণিকের মা!

রাইচরণ।—ভালো কথা।…ভুলে যাওয়া ভালো কথা… তাই যাও বাতাসী! বাতাসী!

বাতাসী। কি বললে?

রাইচরণ। মাণিককে ভুলে যাও—

বাতাসী। বলতে পারলে?

রাইচরণ। না বলে উপায় কি?……তোমাকে যে কোন উপায়েই আর আমার সংসারে ফিরে উপায় নেই—!

বাতাসী। কেই বা ফিরে যেতে চায় তোমার ঐ পচা সংসারে?……চাই না, আমি চাই না, কোনদিনই চাই নি!

রাইচরণ। রাগ করো না বাতাসী!

বাতাসী।……রাগ নয়।…ঘৃণা……আমি তোমার ঐ জঘন্য সমাজ ঘৃণা করি, তোমার ঐ স্বার্থপর সংসার ঘৃণা করি। শুধু তাও নয়। আমি তোমাকেও ঘৃণা করি—

রাইচরণ। আমাকেও?

বাতাসী। হাঁ, তোমাকেও—

রাইচরণ। আমি তো তোমাকে ফিরে নিতে চেয়েই ছিলাম, সমাজ তা মানলো না—

বাতাসী। ফিরে নেবার কথা হচ্ছে না।……তুমি মর্লে না কেন?……যখন তারা আমাকে রাত্রে এই ঘর থেকেই, ঐ খাটের ওপর থেকেই, তোমারি বুক হতে ছিনিয়ে

নিয়ে গেল, তুমি তাদের একটা রিভলভারের ভয়ে কাঁপতে লাগলে,·····মর্ত্তে পার্লেনা?···রিভলভার তুচ্ছ করে, মরদের মতো, মানুষের মতো, তাদের উপর, সেই কাপুরুষ গুলোর উপর, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পর্ত্তে পারলে না? ···না হয় গুলি খেতে, না হয় ঐ প্রাণ যেতই···কিন্তু, তবু আমি বুঝতুম, যে, হাঁ, আমার স্বামী·· আমাকে বাঁচাতে গিয়ে, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, আহত হয়েছে, না হয় প্রাণই দিয়েছে। দেহে মনে তাতে যে বল পেতাম, তাতে একবার দেখে নিতাম কে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তা পারলাম কই?···তোমারি তো দোসর আমি!

রাইচরণ। সমস্ত ব্যাপারটা এমনি হঠাৎ ঘটে গেল, যে আমি যখন সব বুঝতে পারলাম, তখন তুমি আর ঘরে নেই—

বাতাসী। বাঃ···তারপর?

রাইচরণ। ছুটে মার ঘরে গেলাম। মাকে ডেকে তুললাম। সব বললাম! মার কাছে মাণিক ঘুমিয়েছিল। মা সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, বললেন, মাণিক বড় হয়ে যখন মার কথা জিজ্ঞাস কর্ব্বে তখন কি বলব!

বাতাসী। বাঃ!

রাইচরণ। আমি লাঠী নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলাম—

বাতাসী। সেও আমি জানি—হাতের লাঠী হাতেই রয়ে গেল, কিন্তু তোমার বুকফাটা কান্না শোনা গেল খুব! ওরা হেসে বলল বেচারী গান গাইছে! আমারো গান গাইতে ইচ্ছে হল, কিন্তু, আমার মুখ কাপড় চেপে বন্ধ করে রেখেছিল! হাঁ, তারপর—···পুলিশে এজাহার দিলে, না?

রাইচরণ। দিতে হয়, তাই দিলাম—

বাতাসী। ভালই করেছিলে। ওতে এক দারোগা বাবুকেও চিনলাম। বেশী কিছু হ'লনা—দারোগা গিন্নীর জন্ম শুধু চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল পড়ল, অমন সোয়ামীর কবলে পড়ে বেচারী কোন রাত্রে বা মরেই যায়!···দারোগা বাবুর কি সখ হল, আমার বাতাসী নাম বদলে, নাম রাখলেন ময়না বিবি।

রাইচরণ। জানি, জানি বাতাসী জানি, তোমার উপর দিয়ে যত অত্যাচার বয়ে গেছে সবই জানি। কিন্তু, আমি·· তোমার অক্ষম স্বামী আমি, তার কোন প্রতীকারই করতে পারলাম না—

বাতাসী। কেন গো! তুমি তো আমায় মুক্তি দিয়েছ! তোমার বাতাসী তো মরেই গেল!...জলে ডুবে, না?

রাইচরণ।—সে শুধু মাণিকের কাছে। মা মাণিককে তাই বললেন। কিন্তু পাড়ায় সেই যে কানাকানি চলেছিল, আজো তা বন্ধ হয় নি।

বাতাসী। তোমার পাড়াপড়সীরা বেঁচে থাকুন, বাতাসীতো নরকেই গেছে, কিন্তু ময়নাবিবির কুশল তাতে বাড়ছে বই কমছে না।......আমার নতুন বাবুটি এবার একখানা "বেবি অষ্টিন" কিনে দিচ্ছেন আমায়, মাণিক ভালো হলে, তুমি একদিন যেয়ো, হাওয়া খেয়ে এসো—

রাইচরণ। আমার ইচ্ছে হচ্ছে গলায় দড়ি দিয়ে আমি মরি!

বাতাসী।—আমার প্রেমে?

রাইচরণ। শোন বাতাসী। তুমি আমার এখানে রাত্রে লুকিয়ে এসে মাণিককে দেখে যাও, আমি তাতে বাঁধা দিই নি।......দেইনি শুধু এই জন্য, যে, আমি বুঝেছি, আমরা তোমার ওপর সুবিচার কর্ত্তে পারি নি··· সেই গুণ্ডাগুলো তোমার উপর যতটা না অত্যাচার করেছিল, আমরা, আমি আর সমাজের লোকেরা, তোমার ওপর তার চাইতে বেশী অত্যাচার করেছি!···তুমি দুর্ব্বল নারী মাত্র, অতগুলো লোকে জোর করে তোমায় তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার নির্যাতন করেছে, স্বামী আমি, আমি বাধা দিতে পার্লাম না, সমাজও কোন বাধা দিতে পার্ল না!......অথচ সমাজের চোখে তুমিই হলে দোষী, শাস্তিও হল তোমারি। সমাজের শাসনে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাকে পরিত্যাগ কর্ত্তে হল।......

গরীব আমি, অক্ষম আমি, সমাজের ঐ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদ করা দূরে থাক, সমাজের ভয়ে আজো আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনে—

বাতাসী।—এই গরীবানার কথা, এই অক্ষমতার কথা বিয়ে কর্‌বার সময় তো মনে ছিল না……তখন তো খুব স্ফূর্ত্তি দেখেছিলাম!……এই মেয়ে মানুষটির যৌবন লুটতে তোমার অক্ষমতা কি গরীবানা তো কোনদিনই বুঝি নি!

রাইচরণ। আমাকে রাগাতে পার্ব্বে না বাতাসী।… কিন্তু, তুমি যে সুরে তোমার ঐ ঝগড়া বাঁধছ, তাতে মাণিকের ঘুম ভাঙ্‌তে পার্ব্বে!……আজ তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি……আর তুমি এখানে এসো না—

বাতাসী। আর তো আসবো না!……আজই শেষ এলাম।……আর কোন বক্তব্য আছে?

রাইচরণ।—আছে।

বাতাসী। কি সম্বন্ধে?

রাইচরণ। তোমারি সম্বন্ধে

বাতাসী। কি?

রাইচরণ। বলে কোন লাভ হবে না, জানি। আর, বলবার অধিকার আছে কি না তাও জানিনে!

বাতাসী। তবে না হয় নাই বললে!

রাইচরণ। [ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন] না, তবু বলব। যখন তুমি আমার ছিলে, আমার কাছে ছিলে, ক্ষণেক্ষণে ঐ কথাটি কতবার বলেছি। তোমায় সম্মুখে পেয়ে আজো তা না বলে পারছি নে! জানি বাতাসী, আজ তুমি সুখেই আছ, রাজরাণীর সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করছ, তবু, ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে, তোমার শরীর তো কোন দিনই ভালো ছিল না—

বাতাসী। মনে রেখো আমি আর সে বাতাসী নই,— পিপাসার জল খেতে পাই নে, খেতে হয় বেদানার সরবৎ!—

রাইচরণ……কিন্তু…কিন্তু…রাত্রিদিন ব্যভিচারের ঐ অত্যাচার!

বাতাসী। ব্যভিচার? ব্যভিচার কাকে বলছ?… ও তোমাদের মনের বিকার!

রাইচরণ। বাতাসী!

বাতাসী। নতুন বাবুটি খুব পণ্ডিত লোক। তিনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। একই শরীরের এক যায়গায় একজন আদর কর্লে, এই ধর গালেই চুমো খেলে যদি জাত না যায়, তবে……আর একজন সেই যায়গায়……যাক্ সে কথা!

[ক্ষণকাল গভীর নিস্তব্ধতা]

বাতাসী। [হঠাৎ গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া] কিন্তু ঐ মাণিক! মাণিক!……আমার সব জ্ঞান মিথ্যা হয়ে যায় যখন ঐ মাণিকের কথা ভাবি!……আমার সকল অস্তিত্ব তলিয়ে যায়, যখন মনে হয় আমি ঐ মাণিকের মা!

রাইচরণ। তুমি যাও—! তুমি যাও!

বাতাসী। যাবো না। আমি যাবো না। আমি ঐ মাণিককে চাই!

রাইচরণ। হয় না, হয় না, তা হয় না—

বাতাসী। দাসী! আমি তোমার দাসী! দাসীবৃত্তি কর্ব্ব আমি তোমাদের, আমায় শুধু ওর কাছে থাকতে দাও!

রাইচরণ। তুমি কেঁদো না…কেঁদো না তুমি, ওর ঘুম ভাঙবে, ওর ভুল ভাঙবে… ..

বাতাসী। ভাঙুক ওর ঘুম! ভাঙুক ওর ভুল!… জানুক ও……আমি ওর……আর কেউ নয়, আমি…… ওর মা!……

রাইচরণ। বাতাসী!

বাতাসী। ঘুমুতে পারি নে, আজ এই এক বৎসর আমি ঘুমুতে পারি নে! বাতিটি জ্বালাও, দেখবে আমার চোখ বসে গেছে, আমার হাড় গুণতে পার্ব্বে!

রাইচরণ। বাতাসী! বাতাসী!

বাতাসী। ডাক্তার বলেছে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না!……আমার বাঁচাও! আমায় বাঁচাও!

রাইচরণ। বাতাসী! বাতাসী! কেন তুমি তখনি মরলে না!

বাতাসী। ঐ মাণিক আমায় মর্ত্তে দিল না! ওগো, ঐ মাণিক, ঐ মাণিক!......ঐ মাণিক আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে,......মর্ত্তে দেয় নি,......আর আমি মর্ত্তেও পার্ব্ব না!

রাইচরণ। ঐ দেখ...মাণিক বুঝি জাগল!

মাণিক। [জাগিয়া] মা! মা!

রাইচরণ। [নিম্নস্বরে, বাতাসীকে] তুমি যাও! তুমি পালাও!

মাণিক। একটু জল দাও মা!

বাতাসী। কোথায় জল? কোথায়?

রাইচরণ। যাও—পালাও—এখনি আলো জ্বালতে হবে, [মাণিককে] আলো জ্বেলেই জল দিচ্ছি বাবা!

মাণিক। তুমি দেবে কেন? আমার মা যে পুকুরের তল...সেই পাতালপুরী থেকে উঠে এসেছে...এখনই যে আমার পাশে বসেছিল...জল চাইতেই যে জল আনতে গেল,...এখনো ফেরে নি?

বাতাসী। মাণিক! ওরে আমার মাণিক! [দেশলাই ধরাইয়া দীপ জ্বালাইয়াই] এই যে জল—

মাণিক। কে তুমি? কে তুমি?

রাইচরণ। [বিষম বিরক্তিতে, বাতাসীকে] কে তুমি? বল এইবার কে তুমি!

বাতাসী। [অবিচলিত চিত্তে, মাণিকের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথাটি নিজের কোলে তুলিয়া নিলেন, সস্নেহে জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরিলেন—মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাণিক জল খাইয়া বাতাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—]

—বল দেখি কে আমি?

মাণিক। আমার মা! আমার মা!

রাইচরণ। [বাতাসীকে] ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যৎ!

মাণিক। তুমি তবে ফিরে এসেছ মা!......কেমন করে আমায় ছেড়ে ছিলি মা!......মা! মা! মা!

বাতাসী। ওরে!......ওরে!

[আর কথা কহিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

রাইচরণ। [বাতাসীকে] বল......বল তুমি ওর মা। যা হবার হয় হোক্......[ছুটিয়া মাণিকের মুখের উপর পড়িয়া] ওরে! তোর মা!......ফিরে এসেছে! [কাঁদিয়া ফেলিলেন] যেতে দিস্‌নে, ছেড়ে দিসনে...তবে ও আর বাঁচবে না!

বাতাসী। না বাবা, এখানে থাকলেই আমি আর বাঁচবো না। আমার ঘর সেই পাতাল পুরীতে। জলে ডুবে মরেছি কিনা—সেখানেই থাকতে হয়।......ওপরে উঠ্‌লেই আমার দম আটকে আসে, এই ঘরের নিঃশ্বাস আরো সইতে পারি নে, আমি চললুম, তুমি ঘুমাও, লক্ষ্মী আমার! ঘুমাও!

[কথাগুলি বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে মাণিকের মাথাটি কোল হইতে নামাইয়া রাখিলেন। কথা বলা শেষ হইলে মাণিককে চুম্বন করিলেন।]

মাণিক। [মাকে ধরিতে হাত বাড়াইয়া] মা! মা!

বাতাসী। ঘুমুলেই স্বপ্নে আমার দেখা পাবে! [দীপ নিভাইয়া দিলেন।]

মাণিক। মা! মা! [আকুলস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।]

রাইচরণ। বাতাসী! বাতাসী!

[বাহির হইতে বাতাসীর স্বর ভাসিয়া আসিল "এ-সংসারের বাতাস বাতাসী সইবে না। ওকে বল ঘুমুলেই স্বপ্নে আমাকে পাবে।]

মাণিক। বাবা! মা কি তবে আবার চলে গেল?

রাইচরণ। [স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।]

মাণিক। ডাকো...মাকে ডাকো—

রাইচরণ। [তথাপি নীরব।]

মাণিক। মা! মা!......আলো জ্বালাও বাবা!......

রাইচরণ। [আলো জ্বালাইলেন।]

মাণিক। কই? মা কই?

রাইচরণ। ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে বাবা! ......আবার ঘুমাও, ঘুমুলেই স্বপ্নে তাকে পাবে!

গজল-গান

পিলু—কাহার্‌বা

—নজরুল ইসলাম্‌

গহীন রাতে—
ঘুম কে এলে ভাঙাতে।
ফুল-হার পরায়ে গলে
দিলে জল নয়ন-পাতে ॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপণে
ছুঁইলে সে বেদনাতে ॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালেনা আঁখি
নিশি আর নাহি বাকী
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ॥

কেন এ কুহেলি ঠেলে
দখিনা বাতাস এলে,
কবি তুই হৃদয় মেলে
ছিলি কি এরি আশাতে ॥

এই গানের স্বরলিপি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে—

তীর্থ-পথ

আহান বয়ার

—শ্রীঅরিন্দম বসু

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

জীবনের সে এক সবচেয়ে শোচনীয় অধ্যায়। দুইজন ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার্থী ছেলে আসিয়া তাকে পরীক্ষা করিতে সুরু করিল। অতি প্রথমে কিন্তু তার মনে হইয়াছিল—লজ্জায় সে হয়তো মরিয়া যাইবে। পরমুহূর্ত্তে দুঃসহ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তীব্র কণ্ঠে শুধু বলিল—'তোমরা একজনেই কি এরজন্য আসতে পারতেনা?'

প্রত্যুত্তরে শ্লেষেরসুরে একজন উত্তর দিল—'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে আমাদের—আমরা এখানে শিক্ষার্থী মাত্র।......কিন্তু তোমাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি কোন রকম পরিশ্রম করনি।'

সে কিন্তু কিছুই বলিলনা, ইহারা যে তাকে একটি পথ-চারিণী রমণী স্থির করিয়াছে—এই কথাই শুধু তার মনে হইল।

ক্রমাগত পনেরোটি ঘণ্টা ব্যাপিয়া সে কি দুঃসহ বেদনা! প্রতি মুহূর্ত্তে তারা একবার করিয়া দেখিয়া যাইতেছিল;—কিন্তু কি করিবে, সে যে তখন একান্ত নিরুপায়! তার কণ্ঠে শুধু ক্ষীণ আর্ত্তনাদ—মা, মাগো—

মাথার উপরে বিচিত্র ছাদ-আস্তরণ,—তারই পানে মাঝে মাঝে তার বেদনাতুর দৃষ্টিটুকু অনিমেষ হইয়া পড়িতেছিল। চারিদিকে তীব্র গ্যাসের আলো—আর তারই উৎকট গন্ধে সমস্ত ঘরখানি তখন পরিপূর্ণ।

সায়াহ্ন-শেষে দুটি ছাত্রী আসিয়া দেখা দিল,—সে-রজনীর দায়ীত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত। তারাও কিন্তু তাকে পরীক্ষা করিল। অতঃপর আসিল আরও দুজন মেয়ে—সকলেই শিক্ষার্থী। ইহাতেও কিন্তু শেষ হইলনা—একদলের পর আর একদল—এম্‌নিই অনেক......ছাত্র ও ছাত্রিতে ঘর খানি নিমিষে ভরিয়া উঠিল।

সে যেন মানুষেরও বাহিরে;—তাদের কাছে শুধুই একটা শিক্ষা-বস্তু। তাকে লইয়া খেয়াল-খুসী নাড়াচাড়া সুরু হইল,—দুঃসহ বেদনায় তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ভ্রূক্ষেপ করিবার মত কিছু যেন নাই।

সে একটুখানি প্রতিবাদও করিতে পারিলনা,—তেমনই নিথর হইয়া রহিল। সে কি বিভীষিকা!

সেই রাত্রে আর একটি আসন্ন প্রসবা-স্ত্রীলোকও সেই কক্ষে আসিল। তার একঘণ্টা পরে আবার আরও এক জন! পাশাপাশি পর্দ্দান্তরালে তিনটি নারী—প্রত্যেকের কণ্ঠেই শুধু আর্ত্তনাদ।

পাশের ঐ স্ত্রীলোক দুটির ক্রন্দন তাকে যেন আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

রজনীর শেষ ভাগে সহকারী চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠান হয়। তিনিও আসিয়া তাকে পরীক্ষা করিলেন। তারপর রাত্রির দায়ীত্ব-ভারার্পিত শিক্ষার্থীদের ডাকিয়া তার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ক্ষণপরেই কিন্তু আবার ফিরিয়া আসেন! সঙ্গে একটি যন্ত্র,—তার কাছে গিয়া সস্মিত মুখে বলিলেন—'আমার মনে হয় এখন শেষ করাই ভালো।'—ডাক্তার তখনই কাজ সুরু করিলেন। আশে পাশের ছেলে মেয়েরাও উৎসুকনয়নে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল।

তারপরই সে সংজ্ঞাহারা হইয়া যায়।

জ্ঞানোন্মেষের অনতিপরে তার মনে কিইনা অপূর্ব্ব বিস্ময়!—সে যেন নতুন জীবন পাইয়াছে! পাশের স্ত্রীলোক দুটি কিন্তু তখনও রোদ্যমানা।

হঠাৎ নবজাত শিশুটির অস্ফুট ক্রন্দন তার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল—সে যেন কোন পরীর দেশে উড়িয়া চলিয়াছে—সেখানকার আকাশে বাতাসে শুধু স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনি।

আত্মহারা আনন্দে সে মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া উঠিল—'আমাকে দেখতে দাও,—সে কি সুঠাম-সুন্দর হয়েছে?—ওগো, আমাকে একটিবার দেখতে দাও!'

পাশের কর্ত্তব্যরত ছেলেটি বলিল—'তোমার নবজাত পুত্রের জন্ম তোমাকে অভিনন্দন করতে পারি কি?

একটু পরে শিশুটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পোষাকাচ্ছাদনে যখন তার কোলে দেওয়া হইল—তার দুটি চোখে তখন খুসীর অশ্রু-উচ্ছ্বাস।

অতঃপর তার নিজের ঘরখানিতে গিয়া সে যেন হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল—উঃ, কি এ নির্ম্মম সত্য! অতি প্রথমে তার মনে হইল—ইচ্ছাসত্বেও সে বুঝি তার শিশুটিকে শুশ্রূষা করিতে পারিবেনা। এহেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে যথেষ্ট আহারও সে গ্রহণ করিতে পারিতনা। তার সৌভাগ্য সে সাস্থ্য-শোভনা—প্রকৃতিই তার বুকে শিশুর জন্ম যথেষ্ট দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল—তারই দেহকে ক্ষয় করিয়া। যখনই সে ছেলেকে কোলে লইয়া আদর করিত—মনে হইত তার সারা পিঠটি যেন ভাঙ্গিয়া গেছে—দুগ্ধ ক্ষরণে তার জীবনীশক্তি যেন নষ্ট হইয়া গেছে!

শিশুকে সে স্তনদুগ্ধ-পানে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিল।

তারপর কত দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী,—অনাগত ভবিষ্যতের কত আশঙ্কা—অতীতের সহস্র অস্পষ্ট স্মৃতি,—সমস্তই তার মাতৃত্বের সমস্ত আনন্দকে ক্রমশঃ নিংড়াইয়া ফেলিতে লাগিল।

এই শয্যাটিও যেন কত কন্টকাকীর্ণ—এক মুহূর্ত্ত কাটানোও তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। কিন্তু কোথায়ই বা সে ইহার পর যাইবে?

পিছনে উপাধান আশ্রয় করিয়া সে পড়িয়া রহিল। বাহিরে তখন সোণালী সূর্য্যচ্ছটা সারা সহরে ছড়াইয়া গেছে।

মুহূর্ত্তে সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—উঃ, আর একটি-রাতও আমি এখানে কাটাতে পার্ব্বো না,—আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবো।

—ক্রমশঃ—

বন্ধু বরষা এল

শ্রীআক্কেল মণ্ডল

বন্ধু বরষা এল—
দগ্ধ দুনিয়া—আপন জনের স্নিগ্ধ পরশ পেল।
ঝর ঝর ঝর জল ঝরে ঐ আপনার অনুরাগে
দিগবালাদের বুকে বুকে আজি নীরব বিরহ জাগে।
ঝরে জল অবিরল
কাজলা দীঘির কাণায় কাণায় জল আজি টলমল্।
বন্ধু গো কোন্ রাম্‌গিরি মাঝে কোন্ সে যক্ষরাজ!
কাহার বুকেতে কাঁপন তুলেছে আবার বরষা আজ?
বিরহী চোখের জল
বেদনার ভারে ক্ষুব্ধ এ হিয়া আঁখি দুটি ছল ছল্
নত করি নিজ শির—
বিধুর বাদলে বেণুবন কাঁপে উদ্দাম অস্থির!
না জানি কিসের লাগি
কেতকী বধুর ঘোম্‌টা খসিছে উতলা-রজনী জাগি!
কাহার কথাটি, কাণে কাণে তার শুনিতে বাসনা জাগে
নীরব নিথর দাঁড়াইয়া আছে মৌন সে অনুরাগে!
—কাঁপে না একটি পাতা
নীরব ভাষায় মনের মাঝারে চলে কত মালা গাঁথা!
বন্ধু বরষা এল—
দগ্ধ দুনিয়া আবার তাহার সজীবতা ফিরে পেল।
হাজার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আজি আকাশের বুক চিরে
কাহার আর্ত্ত বেদনার ধ্বনি গুমরি গুমরি ফিরে?
ঝরে জল অবিরল
ধারায় ধারায় ধরা তাই আজি থৈ থৈ টলমল্!

প্রবাসের চিঠি

প্রীতি ভাজনেষু—

প্রবাসের সুখ দুঃখ ডাকঘরের চির-অভ্যাগত পিওনের শুভাগমনের উপরই নির্ভর করে। তাই আজ যখন ছুটীর অবসরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মুক্ত বাতায়নের পথ দিয়া অদূরবর্ত্তী গগন স্পর্শী তুষার ধবল হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা আমার প্রবাস প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিতেছিল এবং পরক্ষণেই নীচের সিঁড়ি দিয়া "বাবু সাহেব চিঠি ছ" বলিয়া একটা সরকারী পার্ব্বত্য পিওন ধুপছায়ার খামে মোড়া একখানা চিঠি আমার টেবিলে রাখিয়া সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল, তখন চির-শ্যামল বাঙলা দেশ এবং আমার প্রিয় বন্ধুগণের অকপট প্রীতির স্মৃতিতে অন্তর উথলিয়া উঠিয়াছিল। অনুমানেই বুঝিয়াছিলাম সম্পাদকের চিঠি। পাঠ সমাপানান্তে একে একে তোমাদের কথা, আমার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা এবং সর্ব্বোপরি প্রথম বর্ষ অতিক্রান্তা ধুপছায়ার নির্ভীক চারু চঞ্চল পদ বিক্ষেপের কথা বহুক্ষণ যাবত আমার শূন্য প্রাণে দোলা দিতে লাগিল।—আমার বর্ত্তমান নূতন কর্ম্মজীবনের কথা জানিবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছ। কি লিখিব কিছুই ভাবিয়া পাই না। সপ্তাহকাল পূর্ণ হইলেও বরং লেখার কিছু উপকরণ সংগ্রহ হইত। মাত্র তিন দিন। তবে দীর্ঘ পথের সামান্য অভিজ্ঞতার আভাষ তোমাকে জানাইতে চেষ্টা করিব।

তোমাদের বিদায়বেলার পুণ্য স্মৃতি বুকে করিয়া রেলপথে ব্রিটিশ রাজত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া ২৬শে জ্যৈষ্ঠ যখন বীরগঞ্জের ধর্ম্মশালায় পৌছিয়াছি তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—উপরে থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। সূচিভেদ্য অন্ধকার—সঙ্গে কোন আলো ছিল না। পার্শ্বেই দোকান। ভয় ছিল দোকানদার হয়তো ইংরেজী জানে না এবং আমিও নেপালী ভাষায় তথৈবচ। কিন্তু দোকানে পৌছিয়া আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। একটী মারোয়াড়ী রমণী ভিতরে বসিয়া দৈনিক বিক্রীর স্তুপীকৃত পয়সা গণিয়া গণিয়া একটী মৃৎ পাত্রের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইঙ্গিতে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া একটী মোমবাতী ও দেশলাই কিনিয়া লইলাম, কিন্তু টাকায় change লইতে গিয়া নূতন এক মুস্কিলে পড়িতে হইল। সবই পয়সা এবং গণিয়া দেখিলাম ১২৮ টী। বুঝিলাম আমাদের এক পয়সা নেপালী দুই পয়সার সমান। পয়সা পকেটে ফেলিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। বাতি জ্বালিয়া উপরে উঠিতেই দরওয়ান একটী প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া দিল। একটী তক্তাপোষ ও একটী বেঞ্চ ঘরের আসবাব। ঘরটী বিশেষ সুন্দর না হইলেও আলো ও বাতাসের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আছে। কুলির সাহায্যে বাক্স সুটকেশ প্রভৃতি বেঞ্চের উপর সাজাইয়া বিছানা খুলিয়া তক্তাপোষের উপর শয্যা রচনা করিলাম। কুলিকে বিদায় দিয়া নীচে পাত কূপের জলে মুখ হাত ধুইয়া যখন আপন কক্ষটীতে আসিয়া ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলাইয়া দিয়াছি তখন জঠরে খাণ্ডব দাহ চলিতেছে। carrier এ মাখন ও toasted রুটী যাহা ছিল তাহা বহুপুর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অগত্যা কিছু গরম পুরি ও জিলিপি এবং একবাটী পানীয়ে রাত্রির আহার শেষ করিয়া শয্যায় শয়ন করিতেই একে একে সুদূর গৃহের স্মৃতিতে চোখের পাতা ব্যাথায় তন্দ্রায় ভারি হইয়া উঠিল।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন উষার আলোয় কক্ষটী ভরিয়া গিয়াছে। সুপ্তোত্থিত প্রাণীগণের কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত; কলসী কক্ষে বিচিত্র রঙের পোষাক পরিহিত

আবৃত মস্তকে বিভিন্নবয়সী পার্ব্বত্য রমণীগণ কূপের ধারে ভিড় করিয়া একে একে দড়ির সাহায্যে জল তুলিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। অদূরে একটী অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা স্বীয় নাত্নী অথবা প্রভু কন্যাকে পৃষ্ঠ দেশে বস্ত্রের সাহায্যে ঝুলাইয়া মৃদুপদ-বিক্ষেপে রেল লাইন অতিক্রম করিতেছিল। একদল কুলি ঝাকা পৃষ্ঠে গান করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে আমার সহ যাত্রীরা সাড়ে নয়টার ট্রেণ ধরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। আমিও মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া সুট পরিয়া টেলিফোন আফিসের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। operater নেপালী হইলেও ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতে জানে। phone এ প্রত্যেক ইংরেজী শব্দে দুই পয়সা এবং নেপালী শব্দে এক পয়সা হিসাবে charge দিবার নিয়ম, minimum charge তিন আনা দিতেই হবে, উর্দ্ধ সংখ্যা যত হউক। phon line বীরগঞ্জ হইতে কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে। phone করিয়া কাটমুণ্ড হইতে মহারাজার অনুমতি পত্র (রাহাজানি) বীরগঞ্জের সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারীর Through তে লইয়া কাটমুণ্ড প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। আমাকেও প্রচলিত নিয়মে রাহাজানি (pass fort) জোগাড় করিতে হইয়াছে। কাটমুণ্ডে Foreign Office এ আমার নেপাল যাইবার উদ্দেশ্য, আমার রাজভক্তির গভীরতা, নাম ধাম প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া একটী আবেদনলিপি দিবার পর মহারাজের অনুমতি পত্র আসিতে কিছুদিন বিলম্ব থাকায় আমার কর্ম্মকর্ত্তা phone করিয়া বীরগঞ্জে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার থাকিবার সুবন্দোবস্ত করেন। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ হইলেও এখানে ছাগ মাংস প্রতি কাঁচা সের (৬০ তোলা) দশ পয়সা করিয়া বিক্রী হইয়া থাকে।

১৫ই জুন সন্ধ্যায় আমার অনুমতি পত্র আসিলে Host জেনেরল বিক্রম সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার সহিত দেখা করিয়া পরের দিন রওয়ানা হইবার জন্য সব ঠিক করিয়া রাখিলাম। জেনেরল সাহেবের এক আত্মীয় ও একটী ভৃত্য আমার সঙ্গে যাইবে এবং পথে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমাকে আশ্বাস দিয়া নূতন অতিথির সবিশেষ যত্ন লইবার জন্য আত্মীয়াকে যথাযথ উপদেশ দিলেন।

পরের দিন বেলা সাড়ে নয়টায় নেপাল গভর্ণমেণ্টের ট্রেনে একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে ভীড় ঠেলিয়া আমি ও জেনারেল সাহেবের আত্মীয়া কোন প্রকারে চড়িয়া বসিলাম। মালপত্র লইয়া ভৃত্যটী তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া বসিল। এই রেল পথ মাত্র দুই বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, লাইট রেইলওয়ে। প্রথম শ্রেণীতে একখানি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীতে দুইখানি এবং মাল গাড়ী—সর্ব্বসমেত এই পাঁচখানি কেবিন লইয়া মার্টিন কোম্পানীদ্বারা ট্রেনখানি প্রস্তুত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের পৃথক কোন কেবিন নাই। মহিলাটী বর্ষিয়সী সুতরাং আমার কাছে সরিয়া আসিয়া বসিতে তাহার কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই।

যথা সময়ে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। আমলেকগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলের গতিবিধির সীমা। আমরাও উক্ত ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়াছিলাম। চারটী মাত্র ষ্টেশন। দুইটী ষ্টেশনের পরই বিচিত্র কণ্ঠরবে সমস্ত কক্ষটী মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমি শুধু নির্ব্বাক শ্রোতাই রহিয়া গেলাম। আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী প্রবাসীর মুখচন্দ্র দর্শন লাভ ভাগ্যে জুটে নাই। মনে হইল আমার নির্ব্বাসনের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

বেলা তখন এগারটা। মেঘাবৃত সূর্য্য। শীতপ্রধান দেশে আসিয়াছি একথা বুঝিতে বাকী রহিল না। সুটকেস্ হইতে আলোয়ান বাহির করিয়া বেশ করিয়া গায়ে আঁটিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল মাঠের পানে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। আমাকে নেপালী ভাষায় অভিজ্ঞ মনেকরিয়া সঙ্গিনীটি মাঝে মাঝে দুই একটা কথায় কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন, ইঙ্গিতে বুঝিলাম আমাদের ট্রেন জানি

প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অদূরেই একটী সুবৃহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিলেই দূরবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে আমাদের ষ্টেশন। আমি তাঁহার যে কোন কথায় শুধু সায় দিয়া চলিলাম। খুসী হইয়া পরক্ষণে মহিলাটী কাপড়ের পুটুলি হইতে সযত্ন রক্ষিত তিনটী আম ও দুইটী কলা আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। ভাষা না বুঝিলেও কেহ কোন খাদ্য বস্তু হাতে তুলিয়া দিলে, তাহা খাইতে হইবে অথবা ফেলিয়া দিতে হইবে একথা ভ্রাতৃ বাৎসল্য বলিয়া না বুঝিলেও বিংশশতাব্দীর যুবকের তাহা বুঝিতে এবং অনতিবিলম্বে তাহার সৎব্যবহার করিতে একটুও কষ্ট করিতে হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে আমাদের ট্রেনখানি একটী ভীষণ জঙ্গল পথের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। দেখিলাম আরোহীরা উন্মুখ হইয় বিশাল জঙ্গলের দিকে চাহিয়া আছে। উভয় পার্শ্বে আকাশস্পর্শী ঘন শাল বৃক্ষশ্রেণী ট্রেনের বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রেলপথ ভিন্ন সর্ব্বত্রই নিবিড় বন। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। হিংস্র বন্য-জন্তুর প্রকৃত আবাসস্থানই বটে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাত্রীরা পদব্রজে এই দীর্ঘ শ্বাপদসঙ্কুল আট মাইল পথ অতিক্রম করিত। এই জংসনের নাম সিমারিয়া ফরেষ্ট। আমরা যাই ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বন জঙ্গলও যেন পাল্লা দিয়া সারা জগত ছাইয়া ফেলিতে চাহিল। রেলের দুইধারে বিভিন্ন আকারের প্রস্তর খণ্ড পাহাড়ের গাত্র চ্যুত হইয়া বিচিত্র শিলাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে।

ক্রমশঃ ট্রেণখানি সুদীর্ঘ সিমারিয়া ফরেষ্ট অতিক্রম করিয়া যখন মাঠ প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়াছে তখন রামধনুর মত বক্র কাল কাল প্রকাণ্ড মেঘ দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রকার বিশাল মেঘ মালা বিশেষতঃ এত নিকটে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; তাই কৌতূহল পরবশ হইয়া একাগ্রমনে দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া চলিলাম। যতই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, কাল মেঘগুলি পাহাড়ের মত আকার ধারণ করিতে লাগিল। দেখিলাম তাহার গাত্রে এক প্রকার ধোয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তারপর বারটার সময় ট্রেণ খানি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে যখন আমলেফগঞ্জ আসিয়া থামিল, তখন আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। মেঘ নয়, ওগুলি পাহাড়। প্রথম পাহাড় দর্শনে আমার মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় খেলিয়া গেল। সঙ্গিনীর সঙ্গে ধীরে ধীরে ট্রেণ হইতে নামিয়া চলিলাম।

ভুভাটী ষ্টেশন মাষ্টারকে মালপত্রের রসিদ ফিরাইয়া দিয়া পাহাড় কাটিয়া যে পথ করা হইয়াছে সেই পথে পাহাড়ের অপর সীমায় Bus-Service এর আড্ডায় আমাদের নিয়া চলিল।

আমলেফগঞ্জ হইতে ভীমফেদী নামক স্থান পর্য্যন্ত পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া কোন রকমে ৩০ মাইল পথ প্রস্তুত হইয়াছে। নিঃসম্বল যাহারা, তাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে। গত দুই বৎসর যাবত Bus service এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আমলেফগঞ্জে নেপালী মহিলাটীকে তাঁহার কোন আত্মীয় আসিয়া লইয়া যাইবার কথা ছিল; সে আসিয়া পৌছায় নাই দেখিয়া ভৃত্যের সহিত মহিলাটী সাধারণ বিশ্রামালয়ে একদিন Halt করিতে বাধ্য হইলেন।

বেলা তিনটার সময় Bus ছাড়িবার সময়। তৎপূর্ব্বেই Busএর একখানি টিকিট কিনিয়া জিনিষপত্র ওজন করিয়া Busএ উঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম।

বাঙ্গালী প্রবাসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এইখানে। ভদ্রলোক খুব অমায়িক। পরে শুনিয়াছি আমার অগ্রজ সপরিবারে এখানে এরই বাড়ীতে একদিন অতিথি হইয়াছিলেন। নাম শ্রীকালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, ভবানীপুরে বাড়ী।

যথা সময়ে গাড়ী উঁচু নীচু পাথরের উপর দিয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। আমার সম্মুখবর্ত্তিনী উদ্ভিন্ন যৌবনা একটী রমণী অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ Busএর উদ্দাম গতির ঝাঁকুনি সামলাইতে না পারিয়া আমার উপর বিশ্রী ভাবে টলিয়া পড়ায় আমার মাথার মধ্যে ঠোকাঠুকি হইয়া যায়। গাড়ীর মধ্যে আমাকেই এক মাত্র বাঙ্গালী দেখিয়া এবং আমার অসুবিধার বিষয় অবগত হইয়া কালী

বাবু আপনার পাশে আমাকে ডাকিয়া বসাইলেন। ইনিই গাড়ীর সোফর। পরস্পরে পার্ব্বত্য পথের গল্প করিতে করিতে চলিলাম!

ভীষণ কুটীল পার্ব্বত্য পথ! এতটা বন্ধুর যে প্রতি মুহূর্ত্তেই গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে বলিয়া শঙ্কা হইতে লাগিল; যেন জাহাজে চড়িয়া যাইতেছি। গাড়ীখানি সারা রাস্তা উদ্দাম গতিতে ছুটিতে লাগিল। কখনো বা ৪ ফুট উঁচু হইতে সহসা ধপাস করিয়া jump করিয়া কোন রকমে বেগ সামলাইয়া বাঁচে। সুদক্ষ সোফর না হইলে প্রতিমুহূর্ত্তেই দুর্ঘটনায় যাত্রীসহ অতল ভূগর্ভে বিলীন হইবার সম্ভাবনা।

যে দিকেই দৃষ্টি ফিরাই শুধু পাহাড়। যেন এ রাজ্যে আর কিছু থাকিতে নাই। মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব শোভনা 'চন্দনবর্ণা' ঝর্ণা—যেন পাহাড়ের নিম্ন দিয়া ক্ষুদ্র অগভীর বিরামবিহীন একটি নদী উপত্যকা আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে। পাষাণের স্নেহধারার মত পাহাড়ের বুক চিরিয়া সুন্দরী ঝর্ণা সিন্ধুর ডাকে অস্থির বেগে সাড়া দিতেছে। পাহাড় যেন তাহার বুকের নীড়ে ঝর্ণাকে অশান্ত শিশুর মত ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু তাহার প্রয়াস বৃথা। বিপুল ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণা যেন বলিতে বলিতে চলিয়াছে—

'রং ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চলছি ছুটে—
মত্ত গানের নৃত্যে লুটে।'

গাড়ীখানি যখন একটী অন্ধকার অপরিসর কালো সুড়ঙ্গের (tunnel) মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিল, কোন পাতালপুরীর মরণ পথের যাত্রী বলিয়া আমাদের তখন মনে হইতে লাগিল। টানেল পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই অর্দ্ধ মাইলব্যাপী একটি সুন্দর লালমাটির রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ ভুট্টা ক্ষেত। ভুট্টার স্থানীয় নাম মগাই। গরীব লোকেরা এই মগাই খাইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাংলায় যেমন ধানের ক্ষেত এখানে তেমন মগাই ক্ষেত। এই ক্ষেতের ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর আছে। তাহাতে ক্ষেত্র স্বামীরা আপন আপন ছোট্ট পরিবার সহ বাস করে।

তথাকথিত রেড্ রোড্ অতিক্রম করিয়া একটী আশ্চর্য্য জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পাহাড়ের উপর দিয়া, কোথায়ও বা পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া, দড়ির মত কি একটা জিনিস বরাবর চলিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে দড়ির গায়ে লৌহ পাতে মোড়া বাক্সের মত জিনিস শূন্যে ঝুলিয়া বিশাল পাহাড় পর্ব্বত নিমেষে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ওটা Electric Rope। Swizerland এর পরে নেপালের এই Electric Rope জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই Rope ভীমকেদী হইতে কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার সাহায্যে নির্দ্ধারিত charge দিলে শূন্য পথে মালপত্র সরবরাহ করা হয়। এক বৎসর হইল এখানে এই Rope স্থাপিত হইয়াছে।

ভীমকেদীতে যখন পৌছয়াছি তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। Motor Service এই পর্য্যন্তই। কারণ ইহার পর কাটমুণ্ড পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী বরাবর দৈত্যের মত সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। জিনিষপত্র কুলির পৃষ্ঠে দিয়া কালীবাবুকে নমস্কার করিয়া সাধারণ বিশ্রামাগারে গিয়া কাটমুণ্ড হইতে প্রেরিত conveyanceএর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। কাটমুণ্ড হইতে লোক আসে নাই দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। দুর্গম পথে বর্ষার দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌছান নিতান্ত সহজ নয় বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম। বিশ্রামাগারের চাবি ও চার্জ্জ পুত্রের কাছে রাখিয়া দরওয়ান সাহেব কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত। বালকটীকে হিন্দিতে এবং ২।৪টা অর্দ্ধ নেপালী কথায় আমার রাত্রির আহারের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে জিজ্ঞাসা করিতে, সে আমাকে চিড়ে খাইবার ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় একটী প্রৌঢ়া আসিয়া আমার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিল এবং আমার

আহারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে এবং আমার কোন রূপ অসুবিধা হইবে না বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিল। এই রমণীটী উক্ত বালকের মাতা এবং অনুপস্থিত দরওয়ানের পত্নী। স্নেহশীলা জননীর মত আমার আহারের ও থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া সপুত্র স্বগৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেই আকাশ ভাঙ্গিয়া শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

অবিশ্রান্ত বারি ধারা। অন্যযাত্রী আর ছিল না। আমিই একা। আমার আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গল্প প্রিয় রমণীটী আমার সব পরিচয় জানিয়া এবং মধুর স্বরে আপ্যায়িত করিয়া বর্ষা মাথায় করিয়াই পুত্রের সঙ্গে অদূরবর্ত্তী নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সামান্য আধঘণ্টার পরিচয়ে পাহাড়ী রমণীটীকে পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল। আমিও তন্দ্রার ঘোরে সারা দেহ এলাইয়া দিয়া মুক্ত বাতায়নের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনও বৃষ্টি শেষ হয় নাই।

মেঘ ও পাহাড়ের কালোরূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। সহসা কখন সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছি মনে নাই।

পরের দিন; আহারাদি শেষ করিতে বারটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও কোন conveyance আসিল না দেখিয়া দরওয়ান পুত্র একটী কুলি ডাকিয়া আনিল। আমিও কাল বিলম্ব না করিয়া—অদূরে প্রতীক্ষমানা বালকের মাতার বিদায় স্মৃতি বুকে করিয়া পর্ব্বতের পথে বীর প্রতাপের মত পদ ব্রজে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এখানকার কুলির স্থানীয় নাম ভাড়িয়া। ইহারা কলিকাতার কুলির মত মাথায় করিয়া মাল লইয়া চলে না। ইহাদের প্রত্যেকের নিকট একটী করিয়া লম্বা বেতের ঝুড়ি থাকে। ইহাকে জেলে বলে। এই জেলের মধ্যে এবং উপরে প্রায় দেড়মন মাল বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া দক্ষিণ হস্তে লাঠি ভর করিয়া দুই দিনের দুর্গম পথ অনায়াসে হাটিয়া নিঃশেষ করিতে পারে। আমার ভাড়িয়াটীও নেহাৎ কম বীর নয়।

দুই মাইল বরাবর উঁচু খাড়া পাহাড়। আরোহণ করা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার অভিজ্ঞতা না থাকিলে উপলব্ধি করা কঠিন। অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া যেন সীমাহীন শত 'দার ভাঙ্গা বিল্ডিং' অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। তিল মাত্র অসতর্কতায় অন্ধকার পাতাল গর্ভে নিমজ্জিত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। পশ্চাতে চক্ষু ফিরাইতেও সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ খেলিয়া যায়।

বহু কষ্টে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় 'গড়ি' নামক স্থানে যখন পৌছিলাম তখন বেলা আর নাই। এখানে সরকারী সিপাহীদের বাস। এই স্থানে যাত্রীদের যাবতীয় জিনিস পত্র check করা হয়। কোন নূতন জিনিস Duty না দিয়া নেপালে লইয়া যাইবার উপায় নাই। নূতন জিনিস আমার কাছে কীই বা আর ছিল। আর কিছু না পাইয়া মা ও বোনের দুইখানা বাঁধান ফটো ছিল, তাহার উপর তিন খানা Duty লইয়া আমাকে রসিদ কাটিয়া দিল। ফটোর উপর কিন্তু Duty নয়, কাঁচের উপর। তৃতীয় ফটোখানি শ্রীকৃষ্ণের ছিল বলিয়া তাহার কাঁচের উপর পৃথক কোন Duty না লইয়া ভক্তির চরম নিদর্শন প্রমাণ করিল। ইতিমধ্যে আমার conveyance আসিয়া উপস্থিত। ৪ জন বাহক ও একজন কর্ম্মচারী। দুর্য্যোগ বলিয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতে পারে নাই। নেপালের দ্বিতীয় পথ নাই, তাই পথের মধ্যে দেখা হবে, এ আশা আমারও ছিল। কিন্তু আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। আমার রাহাজানিতে (pass port) বীরগঞ্জের বড় হাকিমের নিজের সাক্ষর নাই বলিয়া উহা অসম্পূর্ণ। সিপাহীরা যেন যমদূত—কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে নারাজ। ভাগ্যিস এই পাহাড়ের উপর মহারাজ টেলিফোন আফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। অগত্যা মহারাজের নিকট আমার বন্দিত্বের কথা ফোন করিয়া জানাইতে হইল। পরের দিন বেলা বারটার সময় আমার মুক্তির হুকুম টেলিফোন যোগে আসে। আমার মধ্যাহ্ন আহার শেষ হইয়াছিল। আমিও তানদামে চড়িয়া বসিলাম। এই তানদামকে এখানে

উলেন কাট বলে। বস্তুত ইহার প্রকৃত নাম উইলিয়াম কার্ট (William cart)। উইলিয়াম নামক কোন ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচলন করেন বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম উলিয়াম কার্ট হইয়াছে। ইজি চেয়ারের মত এক প্রকার গাড়ী। একজনের কোন প্রকারে হেলিয়া অর্দ্ধ-শায়িতের মত অবস্থায় থাকিতে হয়। বংশ দণ্ডের সাহায্যে চার জন বাহক ইহাকে স্কন্ধে করিয়া একমাত্র গিরিপথ দিয়া দুলিতে দুলিতে চলিতে থাকে।

আঠার মাইল গিরিপথ অতিক্রম করিয়া কাটমুণ্ড valley পৌছিবার কথা। সদাশয় নেপাল মহারাজ স্থানে স্থানে সাধারণ বিশ্রামাগার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া পথিকদের রাত্রিপথের একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্ম্মচারীর সহিত আলাপে বুঝিলাম আমাদর নামক বিশ্রামাগারে অন্ধকার রাত্রি যাপন করিতে হইবে এবং আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে রওনা হইয়া বেলা এগারটার সময় কাটমুণ্ড পৌছানা যাইবে।

ক্ষেতের উভয়পার্শ্বে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষ, লতা, জঙ্গল এবং শ্বাপদ সঙ্কুল গিরিপথ অতিক্রম করিতে করিতে একটী মনোরম জল প্রপাতের নিকট যখন পৌছিয়াছি তখন প্রায় সন্ধ্যা। এই জল প্রপাত দৃষ্টি গোচর হইবার বহু পূর্ব্বেই দূর হইতে কোথাও কোন ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝা চলিতেছে এইরূপ মনে হইয়াছিল। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, শব্দ ততই স্পষ্টতর হইয়া কৌতূহল বাড়াইয়া তুলিল।

উলেন কাট হইতে অবতীর্ণ হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া চঞ্চলা ঝর্ণার মঞ্জুল হাসি দর্শনে এবং তাহার বেলোয়ারী আওয়াজ শ্রবনে অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্টের মত রহিলাম। ইতি—

শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।



শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য

ইনি 'ধূপছায়ার' অন্যতম একজন পরিচালক ছিলেন। সম্প্রতি নাকশাল এ (নেপাল) বাজঙ্গ রাজ রাজা দেবীজঙ্গ বাহাদুর সিংহের ব্যবসায় সংক্রান্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়ে চলে গেছেন। প্রবাসী হলেও ইনি 'ধূপছায়ার' সমস্ত রকম উন্নতির জন্য নানাদিক সাহায্যে করে আসছেন। তাঁর এই সহানুভূতিতে আমরা তাঁর কাছে বিশেষ করে কৃতজ্ঞ। প্রথম বর্ষের ধূপছায়ায় এঁর লেখা কালবৈশাখী, বনের পাখী ও সন্ধ্যামণি—এই তিনটি মনোরম গল্প বেরিয়েছিল। আমরা সুরেনবাবুর দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করি।

ঘরে-বাইরে

৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি। আজ পর্য্যন্ত এদেশের কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান থেকে তাঁর জন্মতিথিতে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হয় নি। এবার তাই টাউন হলে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন চলছে। সাহিত্য-প্রিয় বাঙালীর বুকে শরৎচন্দ্রের স্থান যে কতখানি একথা তাঁরাই ভালো জানেন, যাঁরা অন্ততঃ তার একখানা বইও এ পর্য্যন্ত পড়েছেন। আজ বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জন্মতিথিতে বাঙালী তার অন্তরের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে উপযুক্ত অভিনন্দন করবে এইটুকুই শুধু আশা করি।

'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া এখন নিতান্তই অর্থহীন। একটা প্রবাদ আছে—যে চুরি করে, সে কোনদিন ধর্ম্মের কাহিনী শোনে না। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছু মাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন ঐ কদর্য্য মাসিক খানির পরিচালকদের উদ্দেশ্যটি কত বড় হীনতাকে অবলম্বন করে চলেছে! পরের কুৎসা, গ্লানি ছাপার হরফে প্রচার করলে সে কাগজের কাটতি হবারই কথা! আর সেই কাটতির দু'পয়সা দিয়ে যদি তারা তাদের অনেক কিছু খেয়াল চরিতার্থ করতে পারেন তবে মন্দ কি! কিন্তু মুস্কিল হয় তখনই যখন কোন সুরুচিসম্পন্ন সত্যিকারের সাহিত্যিক—সাহিত্য সমালোচনার অজুহাতে ঐ হীন অর্থকরী প্রবৃত্তিকে সাহিত্যের অমর্য্যাদার দিক থেকে কটু-ইঙ্গিত করেন। কাজেই 'সাহিত্য-ব্যবসায়' পড়ে তারা যে আস্ফালন কর্ব্বেন তাতে আর বিচিত্র কি?

'শনিবারের চিঠির' মার্জ্জিত-রুচি শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য 'মণিমুক্তা' perforated করা হয়েছিল—তাঁদের রুচিতে নাকি আঘাত লাগে। বিশেষতঃ 'মণিমুক্তার' জন্য তাঁরা ঐ উঁচুদরের (!!) পত্রিকাখানিকে অন্দর মহলেও নিয়ে যেতে পারেন না। না হয় মানলাম—এ অভিযোগ তাঁদের সত্য।

কিন্তু গত সংখ্যার 'কচ ও দেবযানী' সম্বন্ধে তাঁরা কি করতে চান! ও লেখাটিতো 'মণিমুক্তার' অংশ নয়।—তবে কি ওটা মার্জ্জিত-রুচি শুভাকাঙ্ক্ষীদের রুচি অধিকতর মার্জ্জিত করবার জন্যই লেখা হয়েছে?

সাহিত্যের আসর থেকে যারা দেউলে হয়ে গেছে—তারা যে আজ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠবে তাতে আর নতুনত্ব কি! প্রতিদেশের প্রতি যুগের সাহিত্যেই ঐ সব দেউলে লেখকদের অস্তিত্ব দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও যে দু'চারজন ঐ ধরণের লেখক দেউলে হয়ে পড়েছে—আর তারা যে এখন নিজেদের দেউলে-অবস্থাটিকে গোপন রাখবার জন্য সত্যকারের সাহিত্যিকদেরই অযথা গ্লানি ও কুৎসা সৃষ্টি করে প্রচার করছেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। বেচারীরা অনেক কিছুই চেষ্টা করেছিল—কত কবিতা, কত গল্প! কিন্তু সাহিত্যের কমল-বনে সে কবিতা আর পদ্ম হয়ে ফুটলো না। পুরোণো মাসিকের পচন-ধরা পাতায় পদ্য হয়েই রইল। আর গল্প? সে কথা থাক্।......বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম গল্পলহরীতে' একবছরে প্রায় দেড়শ গল্প বেরিয়েছে!!!... ওরই তো সামিল!

কাজেই অনন্যোপায়—কুৎসা গ্লানির জন্য কাগজ না বার করলেই আর নয়!

এই ধরণের লোকদের সম্বন্ধে—কীটসএর মৃত্যুর পর শেলি 'Adonais' লিখতে গিয়ে বলেছিলেন—এরা Base—unprincipled culminator......It may be

well said that these wretched men know not what they do. They scatter their insults and their slanders without heed as to wheather the poisoned shaft lights on a heart made callous by many blows.………Murderer as you are, you have spoken daggers but used none .

এদের এই 'savage criticism'এ সাহিত্যের যে ক্ষতি হয় সে কথা মানি। আর মানি বলেই সে হিসেবে তারা সাহিত্যের অতি বড় কলঙ্ক।

সওদা

দৃষ্টিভুল—স্বাভাবিক না স্বেচ্ছায় ?

'প্রবাসীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের আজকাল সত্যই বার্দ্ধক্য বশত দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে' এসেছে। তা না ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' 'সিসি লিসি'র ছিনালীর যে বর্ণনা করেছেন তা রামানন্দবাবুর চোখে পড়ত। এবং চোখে পড়লে তিনি অবশ্য এসব ছেলেমেয়ে-বকানো কথা 'প্রবাসী'তে ছাপতেন না।

আর ঐ 'পরভৃতিকা'! ওটা যে সমাজের কত ক্ষতি করছে, তা কি রামানন্দবাবু জানেন না ? আর মৃত 'সঞ্জীবনী'ও ত এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি! এক যুবক কলকাতায় একবার মাত্র দেখেই তার প্রেয়সী যুবতীর উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে ছুটল, জানলায় ও পথে চাওয়াচাওয়ি হল ইত্যাদি কি অভ্যস্ত প্রভাব নয় ? এইসব পড়ে'ই ত সার্কুলার রোডের ছেলেরা বিশেষ কোন বাসের দিকে এমন করে' তাকায় যে একানব্বই নম্বরের সাহিত্যিকেরা—ধর্ম্মজ্ঞানে নয়—অধিকারজ্ঞানেও ক্ষিপ্ত হয়ে' ওঠে! আর রেঙ্গুন! শ্রীকান্ত গিয়েছিল, অপূর্ব্ব গিয়েছিল, 'পরভৃতিকা'র ভৃত্য সুবীরও গেছে! বেচারা সুবীর! নিতান্তই ভৃত্য। অক্ষম খেয়ালের পুতুল!

একঢিলে দুই পাখী।

দ্বিতীয়ভাগ শেষ করে' ছেলেদের পড়ার জন্যে ব্যঞ্জন বর্ণ বহুল ও সর্ব্বস্ব এক রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্যের ওপর সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই কমাস ধরে 'বিচিত্রা'র বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতার কোটেশ্যান সংগ্রহ করতে হলেও এ ব্যঞ্জনবর্ণশিক্ষা সাহায্য করবে।

'প্রগতি' এবার তাঁদের পক্ষে অভিনব ও প্রকাশ্যভাবে খুব কল্পনার দৌড় দেখিয়েছেন। নির্ব্বুদ্ধিতাই যে বিদ্যার লক্ষ্য নয় সে কথা 'প্রগতি'র লেখক ভুলে' গেছেন। বুদ্ধদেব বসুকে হাততালি দিলেই যে তিনি ও 'প্রগতি' বড়ো হয়ে' পড়েন এবং রবীন্দ্রনাথকে যা-তা বল্লেই তিনি তাই হন—এর মিথ্যাত্ব অবশ্য 'প্রগতি'র গতির আবেগের বা intensityর ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে' ভোলাই স্বাভাবিক! কিন্তু এতে বাহাদুরী কি একটুও নেই ? আলবৎ আছে। একহাতে রবীন্দ্রনাথকে ঠেলে আর একহাতে 'প্রগতি'র সম্পাদককে টেনে তোলা! একেই বলে সম্পাদকী!

গ্রহের ফের

'শনিবারের চিঠি'র গম্ভীর প্রবন্ধ 'হাসির কথা' শনির দশায় কথিত। সে পড়ে' লোকেরও হাসিই পায়।

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল 'ভারতবর্ষ'র মেদবহুল গায়ে 'ছি-ছি' করে' থুতু ফেলেন। সেই দেখে কিনা শেষটা 'কালিকলম' এর উপরেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—ছিই! ছিই!—পড়ল। দেখে শুনে আমারও বলি ছিই-ছি!

ব

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

ধূপছায়ার বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,,	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,,	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৮৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,,	...	...	১০৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

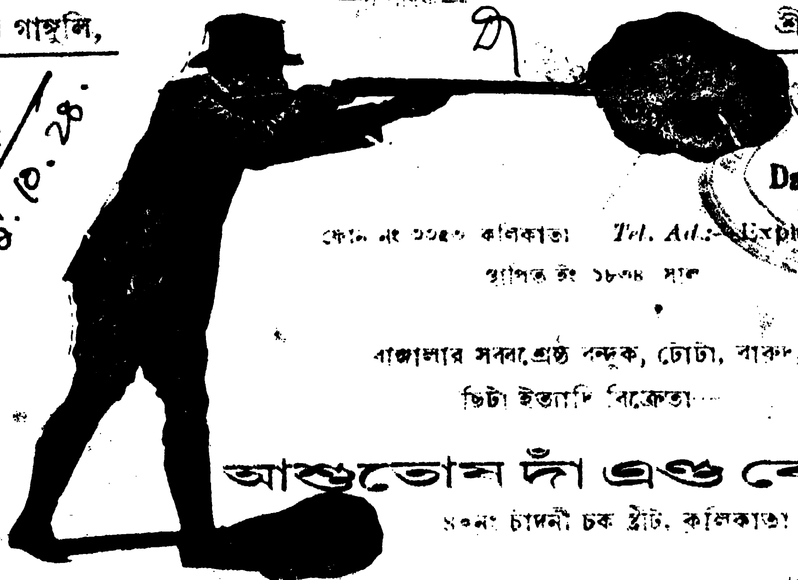
১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায়।



—সম্পাদক—

শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শ্রীঅরিন্দম বসু।



প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

বার্ষিক ৩।৶০ আনা।

ধূপছায়ার বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা			...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয়	,,	পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,,	,,	অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয়	,,	পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,,	,,	অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ	,,	পূর্ণ ,,	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ	,,	পূর্ণ ,,	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা			...	...	৮৲ টাকা
,,	,,	সিকি ,,	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে		অর্দ্ধ ,,	...	...	১০৲ টাকা
,,	,,	সিকি ,,	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা			...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা			...	...	১৬৲ টাকা

কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয় সূচী

বিষয় সুচী

ভ্রম সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীজীবনানন্দ দাশের 'প্রেম' শীর্ষক কবিতার ২৪৭ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনটি "বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ ডানায় কোলাহলে' হইবে। ২৫০ পৃষ্ঠায় ২১শ লাইনটি "সকলের ঘুম আছে,—ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে"—এইরূপ পড়িতে হইবে। সঃ ধূঃ

ধূপছায়া

সম্পাদক—
শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি,
শ্রীঅরিন্দম বসু।
আশ্বিন, ১৩৩৫
দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যালয়—৭৯।২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা



কাঠ খোদাই—শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী



আশ্বিন ১৩৩৫

আধুলি

—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ—১

ক

আগুন লাগ্‌লেও মানুষ তত ব্যস্ত হয় না; গিন্নী এলেন তেম্নি ক'রেই সে দিন;

ব্যাপার কি?

গি। ঐ নতুন বামুনঠাকুরকে তুমি আজই বিদায় ক'রে দেও……

বামুনঠাকুর বিদায়! কঠিন কথা; একালের কোন্ কর্ত্তা তা'না বোঝেন? সবই না হ'লে চ'লে যায় যেমন তেমন ক'রে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি……

কিন্তু গিন্নীর হুঁকে না-করা?……কঠিনতর! তাই অশুভস্য কাল-হরণম্……

বল্লুম, আগে শুনি তোমার সব ব্যাখ্যান্……কি হয়েছে বলত?

গি। আস্‌চি ভাঁড়ারের চাবি বন্ধ ক'রে।

ভাব্‌লুম, ব্যাপার সিরিয়াস্। ভাঁড়ারের চাবি বন্ধ ক'র্‌তে ভুল হওয়া—মানে একটা অসামান্য উত্তেজনা।

ফেরার প্রতীক্ষায় রইলুম; কিন্তু গিন্নী আর ফির্‌লেন না।

আপিসের বেলা।

মাথায় এক খাব্‌লা তেল দিয়ে—দুমিনিটে স্নান, দশ মিনিটে খাওয়া!

পান্ হাতে ক'রে গিন্নীর প্রবেশ; অনেকটা হাসি মুখে!……

বাঁচলুম বাবা!

একটা বামুন ঠাকুর খোঁজা মানে সমুদ্র মন্থন—তার ওপর চাঁপাতলা কি নেবুতলার গলি!

খ

আপিস মুখে। ভিড়ে বাসের মধ্যে গাদাগাদি। চলেছি উল্কা গতিতে।

একজন আধ-বয়সী মোটা লোক; গায়ে একটা মোটা কাল্‌চে রং এর কোট—তার ঘেমো গন্ধে নাক জ্বালা করে—গল্প ফেঁদেচেন:—ইলিশ মাছের সঙ্গে কাঁচ্‌কলার ঝোল; তাঁর গিন্নীর রান্না!

শ্রোতাদের চোখ ডাগর হ'য়ে উঠেছে—যেন সবাই এক এক চুমুক খেয়ে এসেছে!

বুঝলেন কি না মশাই. ওইটুকুই যা সুখ ; বড় লোকের এটুকু নেই ; বেটা বামুনঠাকুরেরা কি রাঁধতে জানে ?

সবাই মাথা নাড়ে ; বাবুর কাঁচাপাকা গোঁফের তলায় বত্রিশ পাটি দন্ত বিকসিত।

বিশেষ ক'রে—ওই বেটা বাঁকুড়ো জেলার—যেমি চোয়াড়,—বোম্বেটে—চোরের অগ্রগণ্যি—তার উপর রাঁধে যা......যার কাজ তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে...... ওর চেয়ে বড় সায়েবের গুঁতো মিষ্টি—বাপস্. সে মাস গেলে মাইনে গুণে দেয়—আর এ ? প্যাঁজ পয়জার দুই !

অপরাধীর মত শুন্‌তে লাগলুম ; উপায় নেই ! আমাদের ও নইলে সংসার ঘষা পয়সার মতই একেবারে অচল !

গ

কাজ সেরে গিন্নীর ফেরার আগেই এক চমক ঘুমিয়ে নিই ;—তারপর সুরু হয় দাম্পত্য !

সে যে কি ! তা কি বুঝিয়ে দিতে হবে ?

গিন্নী সুরু কর্‌লেন, আর পারি নে, খেটে খেটে—দেহ তো গেল......

সয়তান মন লুকিয়ে হাসে ; তা বটেই তো, তা বটেই তো—একটা চাকর, একটা ঝি, একটা বামুন ;—আর মানুষ তো—তুমি, আমি, আর ঐ দুটো ছেলে মেয়ে......

গিন্নী বল্লেন, ঘুমুলে ?

নাঃ ভাব্‌চি।

কি ছাই, এত ভাবনা তোমার ?—একটা হুঁ-হাঁ করেও সাড়া দিতে পার না !

কাপট্য ভিন্ন উপায় নেই ; বল্লুম, তোমার কথাই ভাবচি ; কাল না হয় একবার বিপিন ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে একটা টনিক মনিক নিয়ে আসি......

আঃ আর ঠাট্টা সয় না......কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ! গিন্নী অমন কথায় কথায় রাগ করেন।

আসল কথা ও বাড়ীর হরীশ তার স্ত্রীর একটু নেওটো—আর আমি ?

সেই তো দোষ আমার—একটুও স্ত্রৈন নই !

শেষকালে এলো সেই বামুনঠাকুরের কথা। চোর, রান্না ঘরে একটা শিশি রেখেছে ; তেল চুরি করে ;—তা ছাড়া. সে আরো কত কি !

ভাব্‌লুম, দিন কতক না হয় কাঁচকলা ইলিসের ঝোল, শ্রীহস্তের রান্না ! সেই সুখ বিধাতা কপালে লিখেছেন বুঝি !

বল্লুম, ও বাঁকুড়ো জেলার গুণ্ডা—ওকে বিদেয় ক'রে দিতে হবে—কাল সকালেই......

তারপর ? গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, কাল হাঁড়ী ঠেলচে কে শুনি ?

তাই তো ! সেওত' কথা !

বল্লুম, ক্ষমা ঘেন্না ক'রে ওকেই দুদিন চালিয়ে নেও—আমি দেখি আর একটার সন্ধান !

গিন্নীর মনটা বোধহয় একটু নরম হ'লো, বল্লেন, রামা বলছিলো......

কি ?

তাদের দেশের একজন আছে—নাকি চোর নয়......

হুঁ—রামার মতই সাধু বোধ করি......

রামা গিন্নীর প্রিয় চাকর। তাই তাঁর এ কথা বরদাস্ত হ'লো না—বল্লেন ঐ তো তোমার দোষ, ওকে দুচক্ষে তুমি দেখ্‌তে পারো না......আর যাই হোক রামা তার বাপের জন্মে চোর নয়।

একটা কথা মনে এলো।

বল্লুম, আর যদি দেখিয়ে দিতে পারি রামা চোর তো কি হারবে ?

এক বচ্ছর হাঁড়ি ঠেলবো—এই ব'লে দিচ্চি—যদি এক......

উঠে বসে বল্লুম,—থাক দিব্যি গেল না......কিন্তু বাজি আমি জিতেছি......

গিন্নী রাগ ক'রে শুতে গেলেন।

পরিচ্ছেদ—২

ক

রামার চেহারাটা ধাঙোড়ের মত; বেটার বুদ্ধি মোটা! তার ওপর আবার বাড়িতে কেউ নেই; অতএব চুরি করার দরকার ছিল না বোধ হয় আর।

কিন্তু আমার যে জরুরি দরকার যে রামা চুরি করে। তাই সকালে উঠে ভাব্‌তে লেগে গেলুম। কি করা যায়!

রামার মধ্যে সয়তান নেই? লোভ নেই? অসম্ভব, অসম্ভব!

হয়তো নির্ব্বুদ্ধিতার অন্ধকারে সয়তান তার সুপ্ত; তাকে জাগাতে হবেই!

মনের মধ্যে আমার সয়তান সাড়া দিলে; বল্লে, ভয়কি জাগ্‌বেই—জাগ্‌বেই; রামা আর যাই হোক বুদ্ধদেবও নয়—আর দেবতাও নয়!

খ

রামা তামাক সেজে দিতে এসেছে; বল্লুম, কি গো রামচন্দ্র, খবর কি?

রামা খুসী হয়ে এক কাণ থেকে অন্য কাণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে হেসে বল্লে, এঁগ্‌গে!

সে হাসির সরল ভাষায় দমে গেলাম; গিন্নী লোক চেনেন! রামাকে প্রবৃত্তি-মার্গে আনা শক্ত!

তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

বল্লুম, রামচন্দ্র আজ থেকে তুমি আমার ওপর একটু সুনজর করবে?—আমার ঘরটা আর ঝির হাতে থাক্‌বে না,—তুমিই দুবেলা ঝাঁড় দিয়ে দিও......

মোটা গলায় বেটা বল্লে, মাঠানকে জিগ্‌গেস্ করবো......

রাগে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করে উঠলো—ইস্ বেটার কি আস্‌পর্দ্ধা!

গ

গিন্নী এসে বল্লেন, এ আবার কি ঢং? হঠাৎ রামার ওপর দয়া হলো?

রাতের কথাটা বোধ করি ঘুমের সঙ্গে বেমালুম স'রে পড়েছিল তাঁর মন থেকে।

বল্লুম, দেখ, রামার কাজ কর্ম পরিষ্কার—আমার ঘরটা ওকেই দাওনা ঝাঁট দেবে......

বেশ গো বেশ, তাই হবে। ব'লে গিন্নী চলে গেলেন।

অচিরে ঝাড়ু হাতে রামচন্দ্রের প্রবেশ।

খুসী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। যাবার সময় বল্লুম, ঝেঁটবার সময় তোর মার ঘরের দোরটা বন্ধ ক'রে দিবি।

রামা বীরদর্পে ভীমের গদার মত সেই বিরাট সম্মার্জ্জনী আস্ফালন করতে লাগলো।

ঘ

পরের দিন।

সকালে উঠেই আমার ছোট টেবিল, যাতে ঘড়ি দেশলাই—সিগারেট কেস থাকে—তার এক কোণে একটি আধুলি রেখে দিয়ে সটান গিন্নীর ঘরে গিয়ে তাঁর বিছানায় বসলুম।

গিন্নী ধড়মড় করে উঠে বল্লেন, ইস্ আজ কার মুখ দেখে উঠেছি—কি সৌভাগ্য আমার......তুমি যে এ ঘরে—ভুলেও তো এস না......

বল্লুম, মুখ তো আমারই দেখেছ—আর ভুল নয়—পাঁজি দেখে এলুম, উঠে পড়, আজ আষাঢ়ের সংক্রান্তি—শেষ পর্য্যন্ত আষাঢ়ে কিলিয়ে যাবে......

গিন্নী খুসী—তাহলে বোধ হয় এই নরাধমের ধর্ম্মে মতি-গতি ফিরছে!

বল্লুম, আমার গা ছুঁয়ে বল, একটা কথা কাউকে বলবে না!

গিন্নী মহা খুসী—কি কথা? তাই কি কাউকে বলি? উঠে এসো।

গিন্নীকে বল্লুম, এই আধুলি দেখে রাখ—কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পাবে না।

গিন্নী এক গাল হেসে বল্লেন, বেশ তো—দরকার হলে আমিই নেব......

লক্ষ্মীটি,—আমায় না বলে নিও না......

আচ্ছা গো, আচ্ছা, বলে গিন্নী অকাজের কাজে ছুটলেন।

পরিচ্ছেদ—৩

ক

দিনের পর তিন দিন টেবিলটার কোণায় আধুলিটি যেমন তেমনি রইল।

রামার সয়তান সেদিকে নজর দেয় না। আমার আশারও কিন্তু শেষ নেই! সে যখন ঝাঁট্ দেয় তখন পাশের ঘর থেকে দোরের ফাঁক দিয়ে দেখি।

সে চ'লে গেলে ফিরে এসে ব'সে ভাবি, তবে বুঝি পূর্ব্ব জন্ম সত্যি! মানুষ যা কিছু এ জন্মে করে তা পূর্ব্ব জন্মের ফলে!

রামা বোধকরি ছিল একটা যোগী-ঋষি—হয়তবা কি এক ফোঁটা অপরাধে—তার এই অধোগতি·········তবুও ভাবি,—ধৈর্য্য, ধৈর্য্য,······সবুরে মেওয়া ফল্‌বে!

হাসি আসে; মানুষকে ছোট দেখ্‌তে, পাপী দেখ্‌তে—এই সাধ কেন?

আমি কি করতাম? লজ্জা হয় সে কথা মনে করলেও!

আধুলি—ছোট আধুলি! কিন্তু ওটা যদি আধুলি না হয়ে······

চুপ্ চুপ্—যদি কেউ জান্‌তে পারে!

ভদ্রলোক! চুরি ক'রে জেলে যায়নি কোন ভদ্রলোক?

খ

ঐ, ঐ না? রামা আধুলিটা তুলে দেখ্‌চে? আর কোথায় যাবে? ধরেচে ওষুধ—একদম!

পা টিপে টিপে গিয়ে গিন্নীকে ডেকে নিয়ে এলাম বাথ-রুম থেকে;—দেখ্‌বে এসো, তোমার রামার কীর্ত্তি!

তখনো রামা ঠিক করতে পারেনি আধুলিটা রাখবে কোথায়;—এদিক ওদিক চাইচে!

কেন ট্যাকে নিলেই তো পারে?

পাকা চোর, জানে ধরা পড়লে যায় বামাল; বেটা পাকা চোর; ভিজে বেরাল······

গিন্নীর মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না!

মুখে যাই বলি; আমারো বুকের মধ্যে যেন ব্যথিয়ে উঠ্‌ছে······কেন যেন কোথায় চীৎকার ক'রে বল্‌ছে······রামা চোর,—না তুই······

গ

টেবিল ঢাকা কাপড়ের তলা থেকে আধুলি বার হ'লো।

রামা বল্লে, সে কিচ্ছু জানে না; কিন্তু তার মুখের ভাব, জিভ চট্‌-পটানি দেখে তাকে আর সন্দেহ রইল না।

বামুন-ঠাকুর বলে চাল পড়া নিয়ে আসি······সেই চাল মুখে দিলেই চোরের মুখ থেকে ভক্ ভক্ ক'রে রক্ত বার হবে।

সেই কথা শুনে রামা নিরুদ্দেশ!

যাক্, ভব্‌লুম এক, আর হলো এক!

গিন্নী কিন্তু একেবারে নির্ব্বাক!

আমার বুকে যেন কে ছুঁচ ভোঁকাতে লাগ্‌লো!

পরিচ্ছেদ—৪

ক

গিন্নী বল্লেন, রামাটা চ'লে যাওয়ার পর ঠাকুরটা কিন্তু খুব সাবধান হ'য়েছে;—বাজারের একটা পয়সাও চুরি করে না।

বাঃ বাঃ;—সেই তার তেলের বোতল?

বোতল নয়, শিশি, শিশি······সে এক আধ ফোঁটা বাঁচিয়ে রাখে; বলে, রাতে মেখে শোয়, নীচের তালায় মশা কিনা!

ওকে একটা ছেঁড়া খোঁড়া মশারি দিলে হয় না?

গিন্নী নাক বেঁকিয়ে বল্লেন, মরি, সুখ আর ধরেনা······ওই তো পুরুষের দোষ! ভারি বেতালা!

খ

নাম কি ?

কেষ্ট।

তুমি একে চেন ঠাকুর ?

ঠাকুর হাসে, ঐ যে বল্লুম বাবু, আমাদের বাড়ি ঐ এক গাঁয়ে বল্লেই চলে......

কোন্ জেলা ?

বর্দ্ধমান।

বাঁকড়ো নয় তো ?

ঠাকুর মাথা নাড়ে।

গিন্নীকে বল্লুম, সময় মত ওদের বাড়ির নাম ধাম গুলো টুকে রেখো তো।

চোর টোর তো নয় ?

না বাবু, আমরা কি মেদিনীপুর জেলার যে চুরি করবো—

রামা কোন জেলার ছিল ?

ওই......মেদিনীপুর বোধ করি......

আপিসের বেলা হয়!

গ

গভীর রাত।

গিন্নী। ঘুমোচ্চো......শুনচো......

ধড়মড় করে উঠে বসলুম......কি ? কি ? কি ?

গিন্নী (চুপি চুপি), বড্ড শব্দ হচ্চে—রান্না ঘরটার দিকে......

তাই নাকি ?—কোথায় আমার লাঠিটা ? দোর কোন দিকে ? আলো জ্বালো না......

চুপ্‌, চুপ্‌; চেঁচিও না......দেশলাই পাচ্চি নে।

তবে লাঠিটা দাও......

দোর খুলতে যাই—গিন্নী পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেন, ওগো যেও না মারবে......যাক্‌গে আমার যথাসর্ব্বস্ব......

কই আর তো শব্দ নেই ?

তবে কিছু নয়, তুমি শোও।

পরিচ্ছেদ—৫

ক

ঘুম ভাঙ্গলো।

চাঁচা গলায় ঝি নীচের উঠন থেকে চেঁচিয়ে বলছে—মা উঠুন, সব চুরি হয়ে গেছে......

উঠে দেখি—রান্না ঘরের তালা ভাঙ্গা; ভাঁড়াড়ের জান্‌লার গরাদে নেই;—বারান্দার আন্‌লায় একখানিও কাপড়...... !

চক্ষু চড়ক গাছ !

কেষ্ট আর বামুন ঠাকুর !

হায় রামা !

খ

দাও তো সেই কাগজ খানা যাতে ও বেটাদের নাম ধাম গুলো টুকে রেখেছিলে।

গিন্নী আকাশ থেকে পড়লেন, কোথায় ? তারা তো কিছুই লিখিয়ে দেয় নি !

অ্যাঁ ! বলো কি ? তবে কি বলতে যাবো পুলিশে ?

মনে আছে, কোন জেলায় বাড়ী বলেছিল ? আর গ্রামের নাম ?

বর্দ্ধমান, না ?

না, শেষে বল্লে যে মেদিনীপুর।

ঝি, বল্লে, না বাবু ওরা দুজনেই বীরভূম জেলার নোক !

গ

দারোগা সায়েব বল্লেন, মশাই ওর উপায় হবে না; মিছে বদনাম আপনাদের ! আর আমাদের হবে হায়রানির শেষ ! যদি কোন পাত্তা লাগাতে পারেন খবর দেবেন।

ধুৎ ! চোর ধরে দিলে তবে উনি চুরির আস্কারা করবেন ?—ধেৎ...

পরিচ্ছেদ—৬

ক

ভাদ্র মাস। ইল্‌সে গুঁড়ি!

চলেছি বাজার করতে! চাকর নেই, বামুন নেই; খরচ কমিয়ে—চুরির ক্ষতি পূরণ হচ্চে!

এ বিষয়ে কর্ত্তা-গিন্নীর এক মত।

কিন্তু কে জানতো যে এই বাদলায় ঝিও আসবে না?

চলেছি—এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে!

খ

বাঃ বাঃ—কি ইলিস মাছ!

কত ক'রে গো?

এক টাকা।

বল কি?

যান—ওদিকে যান—ছয় আনায় পাবেন।

উঃ কি জাঁদরেল চেহারা মাগীর।

কিনলুম।

গ

ওগো! শুন্‌চো?

ওগো, এই কলা কার?

বারে! কেউ কথার জবাব দেয় না।

যেমন পেছন ফিরেছি;—মশাই, মশাই……

কটা করে কাঁচা কলা দিচ্চ?

দু পয়সায় একটা।

সব্বোনাশ, বল কি হে?

বল্‌বো আর কি? কি দিন পড়েছে দেখেন না?—

কিছু কম?

এক ছিদেম নয়।

আচ্ছা দাও চারটে!

ঘ

ফির্‌চি।

খুব কাঁচকলা খাওয়াচ্চো ভগবান্……ইলিস মাছ না দিয়ে পুড়িয়ে খেলেই বেশ হয়!

পাশ থেকে দোকানি বলে,—দেখ্‌বেন দেখ্‌বেন মশাই—চিলে মারবে……

সাম্‌লে নিয়ে মনে মনে বলি, মারলে বাঁচি……লেঠা চুকে যায়!

ঙ

কাঁচকলা-ইলিসের ঝোল খেয়ে আর পরজন্মের লোভ রইল না।

ঝোল বলেন, সমুদ্রে যাব—যেন স্বয়ং মা গঙ্গা।

কাঁচকলাটা পাকিয়ে খেলে কি হয়?

ইলিসের নিন্দা করে কোন্……

চ

গলির মোড় ফিরচি—সাম্‌নে ঝুঁকে পড়ে, পেরনাম বাবু……

কেরে?

আমি রামা?

কোত্থেকে আসচিস?

বাড়ি থেকে।

আর সেদিন আফিস যাওয়া হয় না।

রামাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

গিন্নী চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলেন, ও তো চোর!

বলি, ওর হয়ে আমিই মাপ চাইচি—ঘাট হয়েছিল।

—

মাঠের গল্প

—শ্রীজীবনানন্দ দাশ

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ র'য়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে,—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল !
মেঠো চাঁদ,—কাস্তের মত বাঁকা চোখা—
চেয়ে আছে ;—এমনি সে তাকায়েছে কত রাত,—নাই লেখা-জোখা
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে,—ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চ'লে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে,—তুমি কেন তবে
র'য়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !'......
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কত,—
বুড়ো হ'য়ে গেছ তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মত !
ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতবার,—কতবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চ'লে গেছে কবে !—
শস্য ফলিয়া গেছে,—তুমি কেন তবে

র'য়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা !—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি,—খড়-নাড়া মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল !'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল ;
আঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'য়ে আসে
বাঁশ পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা !
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী,—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে',
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে' দেখে'
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রাণের রাতে
সেই পাখী ;—
আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে

প্রথম ফসল ;—
মাঠে মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর,—
কার্ত্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুর !—
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে',
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে, দেখে,
মেঠো চাঁদ আর মাঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রাণের রাতে
এই পাখী !
নদীটির শ্বাসে
সে রাতেও হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা—মরাঘাস—আকাশের তারা,—
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা !
ধান ক্ষেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা !
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ পৃথিবী,—
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ !

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হ'য়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম,—'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি,—আসিবার ইচ্ছা যদি হয় !—
পঁচিশ বছর পরে !'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;

তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা
মাঠে মাঠে ম'রে গেল,—ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নার ধানক্ষেত খুঁজে'
এল-গেল !—চোখ বুজে'
কতবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ !—রহিলাম জেগে'
আমি একা ;—নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়,—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয় !...
তারপর,—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,—
পাতায়—শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে,—চড়ুয়ের ভাঙাবাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখীর ডিমের খোলা—ঠাণ্ডা—কড়্ কড়্ !
শসাফুল,—দু একটা নষ্ট শাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়াজাল,—শুক্‌নো মাকড়্সা
লতায়-পাতায় !—
ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় !
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়,—ইঁদুর—পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠেমাঠে,—ক্ষুদ খুঁটে' ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

কার্ত্তিক, মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ,—
পাহাড়ের মত অই মেঘ
সঙ্গে ল'য়ে আসে
মাঝরাতে কিম্বা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে!
—মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে!
ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মত,—আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়,—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে,—চাঁদ ;—
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হ'য়েছে যা,—তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে,—আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!
নিড়োনো হ'য়েছে মাঠ পৃথিবীর চার দিকে,
শস্যের ক্ষেত চেষে' চেষে'
গেছে চাষা চ'লে ;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হ'লে
অনেক তবুও থাকে বাকী,—
তুমি জান,—এ পৃথিবী আজ জানে তা কি!

নব সাহিত্য-তত্ত্ব

—শ্রী বিষ্ণু দে

আশ্চর্য্য অন্তর্দ্দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যরূপ' রচনা করেন। সাহিত্যের কষ্টিপাথর কি হওয়া উচিত, তাহা এই রচনা পাঠে অতি স্থূলবুদ্ধিও জানিতে পারে।

(শ্রাবণের 'প্রগতি'তে) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এ রচনা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বা ইচ্ছা করিয়া না বুঝিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া স্থানকালপাত্র ভুলিয়া খুব জোরালো ভাষা ব্যবহার করিয়া বসিয়াছেন। দেখিবার ভঙ্গী, শব্দ বিন্যাস, বাক্যরচনা, লিখনভঙ্গী, বিষয় নির্ব্বাচন ও তাহার ব্যবহার ইত্যাদি বহুকথা ব্যবহার করিয়া 'redundant' না হইয়া যে শুধু একটা কথায় রবীন্দ্রনাথ সব বলিয়াছেন তাহা একমাত্র তাঁহারই সুবিপুল বিরাট 'imagination' এরই কার্য্য।

কিন্তু তাহাতেই হইয়াছে বিপদ। 'সাহিত্যরূপ'! কৈ একথা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পাই নাই! খামকা ব্যবহার করিলেই হইল! আর তাও যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাও অধ্যাপকের বক্তৃতার মতো গোছানা, চাঁচাছোলা ভাষায় হইলেও বুঝিতাম। তা না, চমৎকার কবিত্বে, খাঁটী বাংলায়, সরস ভাষায় এমন করিয়া বলিলেন যে তাহা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারা যায় না বা সুবিধা মতো স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উদ্ধৃতও করা যায় না! সত্যই এ রবীন্দ্রনাথের অন্যায়! 'আলবৎ' অন্যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'রূপ' এর অন্বয়াদি না করিয়া দিলেও তাহার সম্বন্ধে অস্পষ্টতা রাখেন নাই। ফরাসী সাহিত্যিকের কাছে রূপই ছিল রচনার সর্ব্বস্ব—তাহার সকল বিশেষত্বসহ রূপই ছিল—শুধু চরম নয়—একমাত্র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ সে-absolute-রূপ-বাদী নন, তিনি রূপের উপর অত জোর দেন নাই। তিনি বলেন নাই যে রূপই রস সাহিত্য তিনি বলিয়াছেন 'রূপের গৌরব রস সাহিত্যে'। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্মবিচার করেন নাই, তিনি করিয়াছেন সাহিত্যের মূল্য বিচার সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন ক'রে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ, সেই ভাবটা যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটাতেই তার কৌলিন্য।' একথা হইতে লেখক যে বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান,—সাহিত্যে বিষয়ের কোন মূল্য নাই, রূপের মূল্যই সাহিত্যের মূল্য, 'রূপ' অর্থ যাহাই হউক; আধুনিকদের সাহিত্যে বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি হইতেছে, কিন্তু তাহা রূপবান হইয়া উঠে নাই। সুতরাং এ সাহিত্যের কোন মূল্যই নাই।'—এ অর্থ কতদূর নীচ মনোভাব হইতে করা সম্ভব তাহা একটা অতি 'গাধা'ও স্পষ্ট দেখিতে পায়। তাই যদি রবীন্দ্রনাথ বলিতেন ত Keats এর কবিতার কয়টা লাইন সম্বন্ধে, 'একে intensity বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে কবিতাটা রূপবান কবিতা। যে ভাবটাকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটা কবিতাকে আকার দেবার উপাদন।'—কথা কয়টা বলিতেন না। ঐ 'তৎসত্ত্বেও' ও 'উপাদান' কথা দুইটাই যে রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ের মূল্য দেন তাহার পরিচয়।

তারপর লেখক সমস্যায় পড়িয়াছেন, 'রূপ বলিতে বোঝায় কি?' ভাবিয়া। 'সাহিত্যে কি দেখিব? Technical form? কাব্য সাহিত্যে metrical

form ?......কাব্যেও কি আমরা বিষয়ের নবত্ব বাদ দিয়া চাহিব শুধু নূতন metrical form ? এবং সেই হিসাবে কি আমরা টমসন্ আকেনসাইড্‌কে পোপ হইতে উচ্চাসন দিব ? যে হেতু ইংরাজী সাহিত্যে Romantic revival-এর সূচনাতে তাঁহারা পোপের চল্‌তি একঘেঁয়ে Heroic couplet বাদ দিয়া চিরনূতন Spenserian stanzaর অবতারণা করেন ?' দেখিবেন ? চোখে যাহা পড়িবে তাহাই দেখিবেন। সকলের দেখিবার শক্তি সমান হয় না। বৈচিত্র্যই দুনিয়ার চাট্‌নী—মন্মথবাবুর দৃষ্টিদোষ আমাদের উপভোগ্য। জার্ম্মান ভাবুক বলিয়াছেন—বিষয়ের নবত্ব নাই—সাহিত্যে চিরপুরাতন বিষয় নূতন রূপে বলা হয়, এই মাত্র। আর 'একঘেঁয়ে'—ও বস্তুটি কি ? পোপের Heroic coupletএর 'একঘেঁয়ে'ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু, পুরাতন কবি Spenser এর form টমসনের সময়েও 'নূতন metrical form' হইল কি করিয়া ?

গোড়ায় যে না বুঝিতে পারা এখানেও সেই না বুঝিতে পারাই লেখকের এত উচ্ছ্বাসের কারণ। পরেও তিনি আবার 'নাটুকেপণা' করিয়াছেন, 'কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ধ্বনিবান শব্দের উপরেই যদি মাইকেলের কাব্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে......তবে হেম বাঁড়ুয্যে ও নবীন সেন বাদ পড়িলেন কেন ? তাঁহারাও ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন; এবং বড় বড় শব্দেরও ত তাঁহাদের অভাব নাই। অবশ্য মাইকেল অপেক্ষা তাঁহাদের শব্দসম্পদ কম; কিন্তু ধ্বনিবান শব্দের উপরেই যদি কাব্যের যথার্থ রূপ নির্ভর করে, তবে 'শনিবারের চিঠি'তে 'রোমন্থক' নামে যে কবিতাটী লেখা হইয়াছে তাহাই কেন রূপশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে না ?' হইলেই হইল। বাড়ীতে বসিয়া মন্মথবাবু যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যে 'রূপ' বলিতে রচনার সমগ্র সবিশেষত্ব formটী বোঝাইতেছেন সেটুকু বুঝিলে মন্মথবাবু একথা বলিতেন না এবং এ বুদ্ধিহীন রসিকতাও করিতেন না,—'দেশী ও বিদেশী যে কোন লেখক সাহিত্যে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাকেই তিনি রূপস্রষ্টা বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে খেয়াল করেন নাই যে রূপ শব্দের যদি বিশিষ্ট কোন অর্থ না থাকে, তাহা হইলে বটতলার লেখকরাও রূপস্রষ্টা, কারণ তাহাদের লেখাও কোন বিশেষ রূপে রূপবান।' রবীন্দ্রনাথের 'খেয়াল' করিবার ক্ষমতা যে কাহারও কাহারও বিরাট কল্পনাশক্তিরও অতীত, তাহা আমরা জানি। সাহিত্যের এমন 'কষ্টিপাথর' তিনি করেন নাই, যাহার দ্বারা বঙ্কিম, মাইকেল, ওয়ার্ডস্বার্থ, হইতে বটতলার লেখকেরাও, আধুনিকেরাও একই সঙ্গে পার হইয়া যান। মন্মথবাবুই স্থানান্তরে বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে শুধু রূপ দিয়া যদি সাহিত্য যাচাই করা হয় তবে আধুনিক অনেক কথা সাহিত্যই সে পরীক্ষা পার হইয়া যায়।' অম্‌নি মন্মথনাথের-দ্বারা-exposed রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা পাড়িয়া ফাঁকি দিয়া গেলেন!—তাই যদি হয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এমন ব্যবস্থা করিয়াই 'রূপ' 'রূপ' করিয়াছেন, যে ব্যবস্থায় বটতলা ও বস্তীর লেখকেরাও 'রূপবান্' হইয়া উঠেন না। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, কাব্যের বিচার 'রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই...... চল্‌বে।' ও দেখিতে দেখিতে হইবে তাঁহাদের মহাকাব্যও 'রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েচে কিনা'। এই কথার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' বিচারে সকলেই যে রূপস্রষ্টা বা creative artist নন তাহা সুস্পষ্ট। এবং তিনি 'দুঃখ করো অবধান' ইত্যাদি আধুনিক-আদর্শ তিনটী লাইনসম্বন্ধে যে বলিয়াছেন 'কথাটা রিপোর্ট করা হ'ল মাত্র, তা রূপ ধর্‌ল না।' ইহা হইতেও সব কিছুই যে ছাপায় থাকিলেই সাহিত্য—হয় না—'সাহিত্যরূপ' ধরিয়া রূপবান হইয়া উঠে না, তাহাও ত দেখিতেছি।

বটতলার বই সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না; লেখক বলিতেছেন 'তাহাদের লেখাও ...রূপবান।' মানিয়া লইলাম—বটতলার লেখকেরও রসসাহিত্যের বিষয়কে

রূপবান করিবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি নিছক রূপসৃষ্টিরই তাগিদে? রবীন্দ্রনাথ, বলিতেছেন 'খাঁটী সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে ব'লেই করেন, সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ'। মন্মথবাবু যদি ইহাতে বলেন যে বটতলার লেখকেরাও সৃষ্টির তাগিদেই বটতলার সাহিত্য রচনা করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতার জন্য মন্মথবাবুর এ কথাও মানিয়া লইব। কিন্তু তাহাতে যে 'রূপের সম্পূর্ণতা' আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশও করিব। বটতলার বই সম্বন্ধে যে 'অস্ফুট কানাঘুষা শোনা যায়', তাহাতে বুঝিয়াছি যে সাহিত্যের রূপ ফোটানোর চেয়ে বিষয়ের রস ফোটানোই (হয়ত সে রসের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে, তথা কোনো অলঙ্কার শাস্ত্রেই উল্লেখ নাই, তবে এক সাহিত্যরসিক তাহার নাম দিয়াছেন 'শৃঙ্গার বিলাস'।) বটতলার লেখকদের উদ্দেশ্য। এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায় যখনি দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশী প্রবল হয়ে' উঠেছে।' এবং 'পাগলামীর মতো অপূর্ব্ব আর কিছুই নেই……সেটা নূতন, কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়—যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিষ বলা যায় না।' ইহার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে মত বেশ বোঝা যায়।

তারপর লেখক বলিতেছেন 'বঙ্কিম চন্দ্রকে লইয়া রবীন্দ্র নাথ আরও বিপদে পড়িয়াছেন।' বিপদে যদি কেহ পড়িয়া থাকেন ত তিনি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। তিনি অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন, '……রবীন্দ্রনাথ আগে সাহিত্যে শুধু রূপ দেখিলেই পাসপোর্ট দিতেন। এখন কিন্তু শুধু রূপে চলিবে না। সেই রূপের পিছনে সত্য থাকা চাই। এবং তাহা যে সে সত্য হইলে চলিবে না, তাহা আনন্দের সত্য হইতে হইবে। এবং শুধু আনন্দে চলিবে না, তাহা সার্ব্ব জনীন (?) হইতে হইবে।……' ইত্যাদি।

রূপেরও যে প্রকারভেদ আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই। ফরাসী সাহিত্যিকের মতো সাহিত্যের প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'বাদী নন। সে কথা তিনি বলেন নাই। এবং 'সর্ব্বজনীন আনন্দের সত্য' কথাটা রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক সাহিত্যের ভয়ে, বিপদ হইতে পলাইবার জন্য বলিয়াছেন, মন্মথবাবুর এ কল্পনা ঠিক নাও হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ মূলে বিদেশী ছিল। অথচ বঙ্কিমের রচনায় বাঙালী আনন্দ পায়। সে কেন? সর্ব্ব দেশের সর্ব্বজাতের বাধা এড়াইয়াও যে আনন্দ দীপ্তি পায় তাহাকেই বলে সর্ব্বজনীন আনন্দ। সেই আনন্দের সত্য —বা সেই সত্যটা, যে সত্যের ইংরেজকেও ও বাঙালীকেও —সর্ব্বজনকে আনন্দ দেবার দুর্লভ শক্তি আছে—বঙ্কিমের মধ্যে তাহা ছিল। এই ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহাতে মন্মথবাবুর না বুঝিবার কি আছে? কথাটী যে কত সত্য তাহা মন্মথবাবুও বোঝেন কারণ গণ্ডীবদ্ধ নিরানন্দ সত্যের যে রূপ, কোনা কোনো আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকের বা বটতলার লেখায় তাহা আছে এবং মন্মথবাবু গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও তাহা সাহিত্যের অমরলোকে স্থান পাইবে না।

এমন কয়েকটী বস্তু আছে সেগুলি সাময়িক প্রয়োজনে খাটে; তাহাদের সময় গেলে তাহাদের লুপ্তি হইতে কেহ জোর করিয়া টানিয়া রাখে না। তাঁবু বস্তুটী সময় বিশেষে খুবই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু স্থাপত্য-শিল্পে তাঁবুপদ্ধতি বলিয়া কিছু নাই। প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প দেশ ছাড়ে; পুরা না ছাড়িলেও পুরা থাকে না—অর্থাৎ মৃতপ্রায় হইয়া যায়। প্রয়োজনটা চিরন্তন নয়, অথচ তাহার তাগিদে সৃষ্ট বস্তু চিরন্তন—অস্বাভাবিক ঘটনা। সাময়িক বস্তুতে সার্থকতা থাকিতে পারে—কিন্তু সম্পুর্ণতা থাকে না। সম্পুর্ণতার দাম্পত্য সম্পর্ক চিরকালের সহিত—অবশ্য আমি বলিতেছি শিল্প সাহিত্যের কথা।

সাময়িক প্রয়োজন বা বিক্ষোভ সাহিত্যের প্রতিকূল; একথা সবাই জানে। রেষ্টোরেশন্ যুগে ইংরেজী সাহিত্যে তাহার প্রমাণ মেলে। কিন্তু সে কথা থাক্। এইখানে

মন্মথবাবু নিতান্তই অবান্তর কথা পাড়িয়া নিতান্তই গায়ে পড়িয়া ঔদ্ধত্য ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কীর রূপ নাই'—একথা রবীন্দ্রনাথ 'উদাহরণে' বা 'ইঙ্গিতে'ও বলেন নাই। তারপর মন্মথ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আধুনিকরা যদি ইঁহাদের নিকট হইতে 'সাহিত্যরূপ' পাইয়া বাংলায় লেখেন, তাহা তাঁহারা উক্ত বিদেশীদের রচনা ভালো না লাগিলে করিয়াছেন কি না? প্রথমত কথাটা 'ঠাকুরঘরে কে?'র জবাবের মতো অনেকটা। দ্বিতীয়ত ইহা হাস্যকর। কারণ রবীন্দ্রনাথ এসব কথা মোটেই বলেন নাই। আধুনিকদের সাহিত্য সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে খনিক ও পানওয়ালী ছাড়া তিনি কিছুই বলেন নাই। ইবসেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কী পানওয়ালী সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন কিনা মন্মথবাবু জানেন, কিন্তু 'লোকে' তাহা জানে না। আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে কিছু বলিলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অভিভাষণ প্রবন্ধটাই অর্থহীন হইত। তিনি প্রবন্ধটা লেখেন ও পাঠ করেন সাধারণ গৃহীত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ একটা ধারণা ও মতামত বলিবার জন্য ও আধুনিকদের রচনারীতি ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্যই। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের এ উচ্ছ্বাস নিতান্তই হাস্যকর ও ঈষৎ সন্দেহকরও বটে।

আর মন্মথবাবু ঐ চারজন বিদেশী রূপস্রষ্টার নাম এমন এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন যে মনে হয় যেন উঁহারা সকলেই একই বস্তু লইয়া একই ছন্দে লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন; এবং যেন বাংলা আধুনিক সাহিত্যে পাশাপাশি ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সত্যিই! তাঁহার 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি!' কিন্তু তিনি কি দেখেন নাই রবীন্দ্রনাথের 'খেয়াল' করিবার ক্ষমতার প্রমাণটী—'অবশ্য ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করিবার প্রতিভা সকলের নেই।' (?) এবং তিনি হয়ত চটিবেন কিন্তু আমার এক এম্‌-এ, পাশ্ অধ্যাপক বন্ধু বলেন যে 'ভালো লাগিলে'ও 'ভালো বোঝা' নাও যাইতে পারে।

আর 'আমরা'র মোহে আবেগের 'intensity'তে লেখক যে আরেকটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা কি সত্য? বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সমান তালে আধুনিক বাংলা সাহিত্য 'বাজারে চলিতেছে'? এই সেদিন 'প্রগতি'র 'মাসিকী'তে দেখিলাম 'প্রগতির' প্রাজ্ঞ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে আধুনিকদের প্রকাশক জুটে না। সে কি বাজারে বেশী কাটতির জন্য?

কিন্তু সে যাক্। বঙ্কিমচন্দ্র ও Romantism লইয়া মন্মথবাবু এইবার খুব পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। 'হিং টিং ছট্' মনে পড়ে। বিচারকের মতো মন্মথবাবু রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের রূপ বলিতে কি রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস form এর কথা বলেন? তাই যদি হয়, তবে ইংরাজী সাহিত্যের পুরাণো একটা কাঠামো বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই কোন একটা সাংঘাতিক রকমের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন নাই।' বঙ্কিম নূতন একটী form ত আনেনেই, অধিকন্তু আরো অনেক কিছুই আনেন এবং তাহার মধ্যে শিল্পচাতুর্য্যও আনেন তবে সেটা ধার করিয়া নয়—সেটা বিধাতার নিকট হইতে আনেন। স্কট অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা'র শিল্প-চাতুর্য্যের ও 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারাম'এর ভাব-মাহাত্ম্যের কাছে দ্বিতীয় স্তরের। আর, একটা ভাষায় একটি নবরূপ প্রবর্ত্তিত করায় সাংঘাতিক কৃতিত্বই আছে—তাহা করিতে সকলে পারে না। তায় আবার বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত করিলেন কি সাফল্যে! বঙ্কিমের কৃতিত্ব আছে, আলবৎ আছে, মন্মথবাবুর 'পাসপোর্ট' বিনাও আছে ও থাকিবে। রিচার্ডসনের যদি থাকে ত বঙ্কিমেরও আছে; কারণ রিচার্ডসনও পুরাণো কাঠামোতেই মূর্ত্তি গড়েন—উপন্যাসের কাঠামোটী রিচার্ডসনের বহুপূর্ব্বেই য়ুরোপে ছিল। এবং বঙ্কিমের কৃতিত্ব আরো বেশীই বলিতে হইবে, কারণ শিল্পী হিসাবে তিনি বাক্যবহুল রিচার্ডসনের ঊর্দ্ধে। তাঁহার সময়ের তাঁহার চেয়েও বড়ো ঔপন্যাসিক কেহ তাঁহার উপন্যাস parody করিতে যান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমকে 'কাঠামো-রচয়িতা' বলেন নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত তাঁহার বঙ্কিম সম্বন্ধে বক্তব্য ছাড়া তিনি বঙ্কিমের সাহিত্যরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, সেই 'ব্যক্তিরূপটী' 'প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষার ভঙ্গীতে, আভাষে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্ব্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে।' বঙ্কিমকে তিনি বলিয়াছেন 'কারিগর', তাঁহার 'সৃষ্টির কাজ' হইতেছে 'রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল'। ইহা হইতে যে কাঠামোই রূপ বা বঙ্কিম কাঠামোরচয়িতা অর্থ হইতে পারে সে শুধু মন্মথবাবুর কল্পনা ও আবেগের জমাটপ্রায় প্রগাঢ়তার জন্যই। কাঠামোটাই যদি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কষ্টিপাথর করিতেন ত সুবিধা হইত অবশ্য। শক্তিসাপেক্ষ ভেদাভেদ থাকিত না।

মন্মথবাবু এবার আর একটী সাংঘাতিক প্রশ্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'বোকা বানাইতে' গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোণার যুগে সোণাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতর বিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় তার রূপটাই দেখি'। শিল্পরসিকের সঙ্গে যাঁহারা একদিনও কথা কহিয়াছেন, শিল্পের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র আলাপ আছে তাঁহারা এ কথার সত্যতা জানেন। কিন্তু মন্মথবাবু খুব বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করিয়াছেন 'স্বর্ণপাত্রের বর্ণছটা কি তার রূপেরই গৌরব নয়?' 'স্বর্ণ' কিছুরই শিল্পের কাছে স্বর্ণ বলিয়া মূল্য নাই—তাহার বর্ণছটার জন্যও নয়, তাহার ওজনের গুরুত্বের জন্যও নয়। যেহেতু রসসৃষ্টিতে (বা রূপসৃষ্টিতে) বিশেষ করিয়া বিষয়েরই গৌরব বলিয়া কিছুই নাই। মন্মথবাবুর এ প্রশ্ন অজ্ঞতাপ্রসূত। তারপর তিনি বলিতেছেন, 'শুধু শিল্পের দিক হইতে যে সাহিত্য-বিচার চলে না তাহা পোপের দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়। তাঁহার মতো নিপুণ শিল্পী ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে কয়টী আছে? কিন্তু তবু লোকে তাঁহাকে কবি বলিতে চায় না কেন?' তার কারণ মন্মথবাবু জানেন না দেখিতেছি। তার কারণ সত্যকার শিল্প রচনায় থাকিলে তাহা সাহিত্যই হয়। তবে Craftsmanshipকে যদি মন্মথবাবু শিল্প বলেন ত সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু 'লোকে বলিতে চায়' রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও ইংরেজী অল্পস্বল্প 'বুঝেন' এবং তিনি 'শিল্প' কথার ইংরেজী Craftsmanship করেন না, করেন art। এবং মন্মথ বাবু যে বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও মন্মথবাবুর সঙ্গে 'পোপকে 'কবি' বলেন না, তাহা মিথ্যা কথা। রবীন্দ্রনাথ সে কথা মোটেই বলেন নাই।

এইখানে পুনর্ব্বার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ প্রকাশ করিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পোপের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহার 'রসধারার প্রবাহ ছিল না।' বলিলেন কেন? তিনি তাহা বলিবার পূর্ব্বে মন্মথবাবুর মতটা জানিয়া 'emotion' ছিলনা বলেন নাই কেন? '......রসসাহিত্যে যে রসটাই চরম, সেকথা একটা গাধাও মানিয়া লইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।' তারপর পোপে আসিয়া যখন দেখিলেন 'রূপে' আর কুলায় না, তখন রূপ ছাড়িয়া রস ধরিলেন।' খাসা বিনীত ভাষা সন্দেহ নাই কিন্তু প্রলাপ মাত্র। পোপে আসিয়া 'রূপে' না কুলানোর কথাই ওঠে না যে ছাই! হিং টিং ছট' মনে পড়ে!... ..রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, রূপটাই চরম।' অর্থাৎ 'কি লেখা হইল' অপেক্ষা 'কেমন করিয়া লিখিত'—রসসাহিত্যের রসজ্ঞের ইহাই দ্রষ্টব্য। এবং 'রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।' আগে 'রসসাহিত্য' হওয়া চাই, তারপর তাহার 'রূপ।' আগে পিতা তারপর তাহার পিতৃত্ব। যদি রসসাহিত্যেই না হইল, যদি তাহাতে 'রসধারার প্রবাহ'ই না রহিল ও 'রূপটুপ ছাইমাথা মুণ্ডুর কোন কথা' আসে কোথা হইতে? আপন কল্পনা ও প্রগাঢ়ভাবে বোধশক্তি হীন মন্মথবাবু নিজেই খেয়াল না করিয়া (বা খেয়াল করিয়াই?) পোপে রূপ আনিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আনেন নাই। এবং মন্মথবাবু ও তাঁহার চেলারা মানিবেন কি না

জান না কিন্তু 'লোকে বলিতে চায়' যে কোনো কিছু ব্যবহার না করিয়াই তাহাতে 'না কুলানো'র কথা 'গাধা'র কথা।

মন্মথবাবুর পরের বুদ্ধিসূচক প্রশ্ন হইতেছে, 'বিষয়কেও কি আমরা রূপ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না?' স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। তবে ঘরের ভিতর বসিয়া। আর শুধু তাই কেন! ইব্‌সেনকে হামসুনের চেলা, টুর্গেনিভ্‌কে গর্কীর চেলা এবং সর্ব্বোপরি নিজেকে রবীন্দ্রনাথের মাষ্টারও 'কল্পনা করিতে' পারেন। মন্মথবাবুর বিশ্বব্যাপী (!) চেলার দল তাঁহার এইসব কথায় হয়ত হাততালি দিয়াছেন—কি গভীর প্রশ্ন! কি sincere emotion! কি intensity! কি imagination! কি অদ্ভুত কল্পনাশক্তি! কিন্তু 'আসল কথা হইতেছে' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাহা হউক কিছু বলিলেই তাহা যুক্তি হইয়া উঠে না এবং তাহাতে বক্তার বড়োত্ব মোটেই বৃদ্ধি পায় না।

এইরূপই অর্থহীন ও petulant শিশুর মতো কথা হইয়াছে, 'পোপের কাব্যসমস্যায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক কিছুই বলেন নাই।' ইত্যাদি। প্রমথবাবু বলিয়াছেন যে আমাদের কালচার য়ুরোপের ছাড়া কাপড় নিয়ে। মন্মথবাবু তাহার একটী প্রমাণ। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার বলিতেছেন, 'The greater jars of the conflict over the question "Was Pope a poet?" have mostly ceased.' লেখকের কি দূর দৃষ্টি! 'mostly ceased'! পোপের দেশে থামিয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে থামে নাই। কিন্তু 'পোপের কাব্যসমস্যা'র সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। কাজেই তাহার সমাধান করাও রবীন্দ্রনাথের কথা নয়। সাহিত্যে নবরূপ কেমন করিয়া আসে, তাহাই বলিতে গিয়া তিনি পোপের নাম করেন। 'পোপের কাব্যসমস্যা' আনিয়াছেন মন্মথবাবুই। বাস্তবিক কিছু বলিবার কথা তাঁহারই। তিনি অবশ্য তাহা বলিতে পারেন নাই তবে দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথকে অর্থহীন ঠাট্টা করিতে গিয়াছেন বটে। এবং 'রস বলিতে নির্দ্দিষ্ট কিছুই বুঝেন নাই।' বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছেন। (হায় রবীন্দ্রনাথ! থার্ডক্লাসে বিদ্যা শেষ করিয়া শেষটা এই বয়সে বাংলাও ইংরেজীর মাষ্টার রাখিতে হইবে! আর তাও—সে কথা থাক্।)

তারপর মন্মথবাবু দোষ ধরিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে একটা জিনিষ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; তাহা এই যে কাব্যবিচারে তিনি imagination, emotion ইহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই।' মহা অপরাধ করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথের তাহার জন্য মন্মথবাবুর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত! Pater ও ত তাঁহার 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে 'imagination, emotion ইহাদের' কোনো 'উল্লেখ করেন নাই'। সেও কি 'চাপা' দিবার জন্য নাকি? Pater এর কবিতায়ও! 'imagination emotion ইহারা' ছিল না বলিয়া নাকি? Pater ও 'চাপা' দেন সেই কারণেই? কিন্তু শ্রদ্ধা ও সংযম এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ইহাকেই বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় মন্মথবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি 'imagination ও intensity নাই বলিয়াই সে কথাচাপা দেন, একথা উচ্চারণ করিতে যে অশিক্ষিত ভদ্রতায়ও বাধে। তাও যখন 'চাপা' দেওয়ার কথা উঠেই না; কারণ রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ববাবুর কথার উত্তরে emotion লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করেন। এবং imagination এর কথা তিনি বলেন নাই যেহেতু তাঁহার বলিবার দরকার হয় নাই যেহেতু তিনি কাব্য সম্বন্ধে পাঠ্য পুস্তকের নোট লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাহা লেখেন সাহিত্য সভায় আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে। শুধু 'imagination' নয়, বা 'emotion' নয়, রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, মিল, শব্দ, বাক্য ইত্যাদিও 'চাপা দেন'। সেও কি ওসব বস্তু তাঁহার রচনায় নাই বলিয়া নাকি? এ সম্বন্ধে বাজারে কোনো 'অস্ফুট কাণাঘুষা শোনা যায়' নাকি?

রবীন্দ্রনাথের পিঠ চাপড়াইয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ... বলেন, 'Imagination এর কথা ছাড়িয়া দিলাম; ...

একটী মহাকবি ছাড়া খুব কম কবিরই সত্যিকার imagination আছে।' সেই ভালো কথা। মন্মথবাবু imaginationএর কথা ছাড়িয়াই দিন। ও বস্তুতে তাঁহার সুবিধা হইবে না। আর ঐ 'দুই একটী মহাকবি'ও যখন সকলের কাছে সহজবোধ্য নন! 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কেহ কোনোদিন imagination এর বড়াই করে না।' করে না? 'আল্‌বৎ' করে। মহাকবিরই imagination থাকে—তাহা হইলে Romain Rolland, Maeterlinck, Yeats হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পর্য্যন্ত সে বড়াই করি। এবং মন্মথবাবু 'আল্‌বৎ না' বলিয়া ধমক দিলেও করিব। কিন্তু মন্মথবাবুর ঐ দুটী মহাকবি কে? একটী ত দেখিতেছি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যিনি সেদিন 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক 'তরুণের লজ্জা' লিখিলেন। আর একটী কে?

কিন্তু মস্তিষ্কের চৈতন্য থাকিলে 'pure poetic pleasure' এর জন্য যে 'মরীচিকা'র খোঁজে যাইতে হয় না তাহা 'মরীচিকা'র কবি ও তাঁহার 'মিতা ও বন্ধু'ও মন্মথবাবুকে বলিয়া দিতে পারেন। 'মরীচিকা'র আমি ভক্ত। যতীন্দ্রনাথ, বিশেষ উঁচুদরের না হইলেও যে বিশেষ রূপটী বাংলা সাহিত্যে আনিয়াছেন তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাই প্রথমটা 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। Pure poetic pleasure যতীন্দ্রনাথের কবিতায়! সোনার পাথর বাটী!

আজও তাই ভাবিতেছি। সামনের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' চলিতেছে। মৃদুস্বর—তাহাই শুনিতেছি আর ভাবিতেছি কিসের অভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছাড়িয়া যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'pure poetic pleasure' খুঁজিতে যায়। বর্ষার এই মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকাইয়া 'সোনার তরী' গুঞ্জন করিতেছি। হাতের পাশে বিপুল 'কাব্যগ্রন্থাবলী' রহিয়াছে, ভাবিতেছি সে কি নিদারুণ imagination ও emotion এর intensity যাহাতে মানুষ প্রলাপ বকে?

চেরাপুঞ্জি, মেঘ, ধান দেওয়া ও গোবিসাহারা—এই লইয়া তিনটী লাইন তুলিয়া রবীন্দ্রনাথের বিচারক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি কোন দিনই এমন তিনটী বিরাট সুদূর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে একটী ভাবের অভিব্যক্তিতে একত্রিত করিতে পারে নাই।' পারে নাইই ত! ওসব ধারের ভাব রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তিতে নাইই ত! আর রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে সত্যকার imagination, সে ত fancifulness নয়! বা সে ভূগোলবৃত্তান্তের লেখকের 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি' ও নয়! কিন্তু দিব্য চলিতেছিল 'imagination ও emotion' লইয়া। তাহা ছাড়িয়া মন্মথবাবু 'হঠাৎ এখানে' 'ভাবের অভিব্যক্তি 'প্রয়োগ করিয়া বসিলেন কেন?' আর ঐ 'pure poetic pleasure'ই বা খামকা আসিল কেন? কল্পনাতে 'যখন দেখিলেন আর কুলায় না তখন' কল্পনা 'ছাড়িয়া' pure poetic pleasure ও 'ভাবের অভিব্যক্তি' ত 'ধরিলেন।' কিন্তু ও বস্তুটী কি? শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাবের অভিব্যক্তি' ত? তাহা হইলে অবশ্য মানিয়া লইতেছি এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হারিয়া গিয়াছেন।

তারপর ঐ 'divine inspiration'! ও কথা আবার কেন? ও কথা লইয়া একবার অনেক কিছুই হইয়া গিয়াছে! আবার মন্মথবাবুর সে কথা কেন! তবে ঈষৎ আশ্চর্য্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মতো গুণী সাহিত্যিক ও সাহিত্যজ্ঞও বলিয়াছেন যে কালের বিচারে কেহই টিঁকিবেন না—শুধু—মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসুও নন—শুধু—নিতান্তই শুধু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত। মন্মথবাবু ত জানেন সুচিন্তিত 'প্রগতি'র পাতায় প্রমথবাবুকে খুবই সুখ্যাতি করা হয়। সেই পিতৃতুল্য প্রমথবাবুর কথা নিশ্চয়ই শ্রোতব্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ অমর কবি একথা মানিতেই হইবে। না মানিলে 'আমরা'র পিতৃতুল্য প্রমথবাবুকে ও 'প্রগতি'কে না মানা হয়। এবং একথা না মানিলে, প্রমথবাবু সব চেয়ে রাগ করেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি আবার তাঁহারও পিতৃতুল্য! মন্মথবাবু

তাহাকে বলিবেন যে তাহাতে তাঁহার বা 'আমরা' সম্পর্কে বাধে না। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে তাহাতে প্রমথবাবুকে অপমানিত করার চেষ্টা হয় এবং সে চেষ্টা 'শনিবারের চিঠি'ই করেন। এখন, যে কবি চিরকালের কবি তিনি কেমন করিয়া নামমাত্র ভাবরস লইয়া ও কল্পনা বিনাই (বিধাতার আশীর্ব্বাদ ত নাইই) চিরকালের কবি হইতে পারেন তাহাই বিচার্য্য। কিন্তু এ বিচার আধুনিক 'হিং টিং ছট্'। কাজেই এ বিচার, প্রথমতঃ রবীন্দ্রভক্ত, দ্বিতীয়ত সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির করা ঠিক হইবে না। মন্মথবাবুই এ বিচার করিবেন।

যাহা হউক, মন্মথবাবু আমাদের যে সান্ত্বনা দিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে। তিনি বলিতেছেন, 'যাহা হউক, এরকম divine লাইন্ রবীন্দ্রনাথে নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। খুব কম কবিরই আছে। যতীন্দ্রনাথও এই রকম লাইন্ ঝুড়ি ঝুড়ি লেখেন নাই।' কথাটা সত্য কিন্তু সান্ত্বনা নয়। কারণ আমরা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের তথা সাহিত্যের ভক্তেরা এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ করিয়া কাঁদি নাই। এই ত আমাদের গর্ব্ব, আমাদের আনন্দ যে 'এই রকম divine লাইন্ রবীন্দ্রনাথে নাই।' রবীন্দ্রনাথ যে সত্যকার কবি, তিনি ত divine দেবী চন্দ্রমার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কবিতা লেখেন না! আর যতীন্দ্রনাথেও যে এই divine বস্তু 'ঝুড়ি ঝুড়ি' নাই তাহাও সত্য এবং তাহাও আমাদের গর্ব্ব। যতীন্দ্রনাথ যদি ঐ রকম লাইন্ 'ঝুড়ি ঝুড়ি' লিখিতেন তাহা হইলে সে ঝুড়ি বহিতে আমরা রাজি হইতাম না। কারণ ও ঝুড়ির বেতের ফাঁক দিয়া জল গড়াইয়া জামা ভিজাইয়া দেয়। এবং সে জল sentimentalismএর অশ্রুজল ও সে বেত imagination নয়—fancy. কিন্তু ভাগ্যিস্ ঐ বেয়াড়া বস্তুটা—ঐ 'divine inspiration' এ মর্ত্ত্য-লোকে বেশি আসে না! আসিলে আরো অনেক কিছুই ত হইত, কিন্তু খবরের কাগজ যে খোলা যাইত না! কাহার স্কন্ধে স্বর্গ হইতে অপ্সরা নামিয়াছে ও তিনি কি করিয়াছেন শুধু এই দেখিতাম। আর একটা ভয়ানক কিছুও হইত—divine প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় আধুনিক সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইত।

আর একটী মহাসত্য মন্মথবাবু বলিয়াছেন, 'যারা কাব্য পড়ে, তারা জানে সত্যিকার imagination কত দুর্লভ। তাই তারা তাহাকে কাব্যচর্চ্চার শ্রেষ্ঠফল জানিয়াও তাহার জন্য হাহুতাশ করে না।' কথাটা সত্য। আমরা—রবি-ভক্তেরা তাই সব কবির মধ্যে imagination খুঁজি না। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই আমরা খাঁটী fancyর চমৎকার খেলাতেই মুগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ Keatsএর কবিতার emotional স্থানটুকু তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলেনা। এ, রুগ্নচিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে—'। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ইহাতে বলিতেছেন, 'কেন চলে না? আল্‌বৎ বলা চলে।' কিন্তু মন্মথবাবুর অবগতির জন্য বলিতেছি যে 'আলবৎ' ত সামান্য কথা, আস্তিন গুটাইলেও রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। Keatsএর রচনায় যে decadenceএর পূর্ব্বাভাস আছে, তাহা যাহারা কাব্য পড়ে ও বোঝে, তাহারা জানে। এবং decadence যে রুগ্নচিত্ততা তাহাও তাহারা জানে। 'ইন্‌টেন্‌স্‌লি feel করিতে' গেলে যে চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্য ও সতেজতা চাই, তাহা রুগ্নচিত্ততার বিরোধী। ধানের ক্ষেত থেকে বরগা করিবার কাঠ চাওয়াও ইহার চেয়ে কম হাস্যকর। Sentiment ও setementalismযে একবস্তু নয় তাহা কি মন্মথবাবু জানেন না? রুগ্নচিত্তের intensely feel করিবার ক্ষমতা নাই, এত একটা গাধাও মানিয়া লয়!

অতঃপর লেখক প্রশ্ন করিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ মরামানুষের দেহ লইয়া ঘাটাঘাঁটি করিতে রাজি আছেন কি না?' Intensity ও Imaginationএর কাব্যে স্থান বিচারে 'দেহলইয়া ঘাঁটাঘাঁটি'র কথা মন্মথবাবু কেন বলেন, তাহা যাঁহারা 'দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি' করেন ও মনস্তত্ত্বও বোঝেন, তাঁহারাই স্থির করিবেন। কিন্তু মন্মথ-

বাবু বলিতে পারিবেন নিশ্চয়ই 'দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি' বস্তুটা কি? রবীন্দ্রনাথ রাজি আছেন কি না, তাহা তিনিই বুঝিবেন। তবে রবীন্দ্রনাথ 'মরামানুষের দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে রাজি আছেন কি না' তাহাই 'আসল কথা' নয়। আসলকথা হইতেছে ইনটেন্সিটি সাহিত্যের একটা অঙ্গ কি তাহাই সাহিত্য? সে আলোচনা পরে করিতেছি। উপস্থিত মন্মথবাবুর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, মরামানুষের রূপও শিল্পে যথেষ্ট আদর পায়। লেখক হয়ত জানেন না যে ক্রুশ-বিদ্ধ একটা মরামানুষের দেহ যুগে যুগে য়ুরোপ নামক মহাদেশে অনেক কবি ও বহু-বহু মহাশিল্পীকে রূপসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। Poe ও Baudelaireএর রচনায় ঐ তথাকথিত 'প্রাণের তেজ ও বেগ' না থাকায় কি তাঁহারা মোহিতলাল বা বুদ্ধদেববসুর পাশে স্থানই পান না, নাকি? 'Salome' ও 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন রচনা, তাহা কি সাহিত্য নয়? Wildeএর 'Sphinx' কবিতাও 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-শূন্য ত, তাহাও কি সাহিত্যে স্থান পায় না? Swinburneএর 'Poems and Ballads' কবিতাগ্রন্থও ত 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন, তাহা ত তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য। মন্মথবাবু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'সুন্দরী রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া কে কবে তৃপ্তি পাইয়াছে?' 'সুন্দরী রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া' করা যে আইন থাকিতে বিশেষ সুবিধার নয়, মন্মথবাবু তাহা জানেন না, বা emotionএর intensityতে মানেন না হয়ত। কিন্তু ঐ 'তৃপ্তি'টার সংজ্ঞা কি? এবং তাহার সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক কি? মন্মথবাবু কি জানেন না, সত্যকার আর্টিষ্ট্ যিনি, তা তিনি সাহিত্যিক বা চিত্রকর যাহাই হউন কেন, তাঁহার কাছে 'সুন্দরী রমণী,' 'প্রাণহীন দেহ,' 'নাড়াচাড়া' ও 'তৃপ্তি' বলিয়া কোনো কথাই নাই? মোনা লিসাকে দেখিতে ভালো নয়। Wattsএর শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট্ সব কয়টাই 'অরমণী' পুরুষের। শতশিল্পীর চিত্র 'Pieta' ও 'Crucifixion' ত 'প্রাণহীন দেহে'র ছবি। 'ডোরিয়ান গ্রে' 'রমণী'হীন রসসাহিত্য। 'In Memoriam' 'Adonais' 'Lycidas' মৃত পুরুষ লইয়া কাব্য। শিল্পের শ্রেষ্ঠ দুটী বিকাশমূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি ও প্রজ্ঞাপারমিতামূর্ত্তিও ত 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন। 'সুন্দরী রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া' 'তৃপ্তি' বাস্তব জীবনে পাওয়া যায় না, ইহাই যদি মন্মথবাবু 'ইঙ্গিতে' বলিয়া থাকেন, ত তাহার আলোচনা তিনিই করিবেন। তবে আসল কথা হইতেছে জীবনে intensity থাকিলেই তাহা সাহিত্যের মধ্যে আসন পায় না। কাব্যে দেহ লইয়া—তা সে প্রাণবন্ত বা প্রাণহীন রমণী বা পুরুষ, যাহারই হউক না কেন—নাড়াচাড়া করিবার কোনো দরকার নাই। কাব্যটা শুধুই ত intensity নয়। শুধুই ত তাহা 'শৃঙ্গারবিলাস' নয়।

মন্মথবাবু তারপর নিজের পাণ্ডিত্যে নিজেই তলাইয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডস্বার্থের 'bald style তাঁর রূপ নয়, সে রূপে আমরা মুগ্ধ হই না! কিন্তু তাঁর সাদা কথায় যে simple, sincere, intense emotion প্রকাশ পায়, তাহাই আমাদের হৃদয়ে তোলপাড় তোলে।' Bald style বলিতে বুঝায় সাদাসিধা ষ্টাইল্—অর্থাৎ যে রচনায় সাদা কথায় সরলভাবে রসটী প্রকাশ হয়। মন্মথবাবু বলিতেছেন ওয়ার্ডস্বার্থের এই সাদা রূপ তাঁহাকে (বা তাঁহাদের) মুগ্ধ করে না। তারপরই বলিতেছেন তাহা তাঁহার (বা তাঁহাদের) হৃদয়ে তোলপাড় তোলে।' 'তোলপাড় তোলে'! মুগ্ধ করে না অথচ তোলপাড় তোলে। ইহা যে স্ববিরোধী হইয়া পড়িল! আর ওয়ার্ডস্বার্থ কি Shelley যে 'হৃদয়ে তোলপাড়' তোলেন?

'দুঃখ করো অবধান
দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখো বিদ্যমান।'—এই তিন লাইন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তার রূপ ধরল না।' মন্মথবাবু বলিতেছেন, 'ইহার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না যে রূপ ধরে নাই বলিয়া ইহা কাব্য হয় নাই। ইহারও একটা রূপ আছে বই কি।' থাকিতে

পারে। কিন্তু তাহা 'সাহিত্যরূপ' নয়, এ কথাও বলিতে হইবে বই কি। পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই কাব্যবিচার চলিবে। ইহাতে রূপ সম্পূর্ণ নয় তাই বলিয়াছেন 'রূপ ধর্‌ল না।' কেন ধরিল না সে কথা তিনি বলেন নাই, কবিতাটীর analysis তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, কথাপ্রসঙ্গে একটা উদাহরণ মাত্র তিনি দিলেন। 'emotional exitement' থাকা সত্ত্বেও 'রূপ ধর্‌ল না' একথা তিনি বলেন নাই—যদিও সেকথা বলিলেও কিছু অন্যায় হইত না। 'ফাজ্‌লামী' যদি 'রূপ' পাইতে পারে, ত ফাজ্‌লামীতে ইমোশুন্‌ই বা থাকিবে না কেন? এমন কি অতিমাত্রায় 'emotional excitement' হইলেই অনেক সময়ে ফাজ্‌লামী করিতে হয়,—যুক্তি বলিয়া বস্তুটী ত তখন থাকে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ উদাহরণও মন্মথবাবুকে এখনই দেখাইতে পারি। ফাজ্‌লামীতে ইমোশুন্‌ নাই কেন, তাহার যুক্তি মন্মথবাবু দেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, 'ফাজ্‌লামীকে আমরা ইমোশন বলি না, তাই ইহা কাব্য হয় নাই।' 'তাঁহারা' না বলিলেই যে তাহা দুনিয়ার সকলকেই মানিতে হইবে, ইহা যুক্তি নয়।

এই সূত্রে পোপের সম্বন্ধে আবার মন্মথবাবু বলিতেছেন 'উঁচুদরের ত দূরের কথা, তাঁহার কবিতাকে সত্যিকার কাব্য বলিয়া স্বীকার করিব না।' স্বীকার করিবেন না? নাই করিলেন! তাঁহার স্বীকার অস্বীকারে কিই বা আসিয়া যায়! রোমান্টিক মতবাদ একটা মতবাদই, তাহাই সাহিত্য নয়। পোপ্‌ সম্বন্ধে মন্মথবাবুর উক্তি অনেক সাহিত্যিক একেবারেই মানেন না। অনেকে উহা মতবাদ মাত্র বলেন। সাহিত্য, বিশেষ ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও রসবোধশালী সমালোচক ত পোপের সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন, 'The best plan is to admit that it is poetry—.' মন্মথবাবু ইব্‌সেনকে কিছু খাতির করেন দেখিতেছি—উক্ত বিখ্যাত সমালোচক বলিতেছেন,—'to admire Ibsen and Tolstoi......is to come back a long way towards the position held by Pope and Swift, towards the supposition that the poet is not dazzled by lovely illusions and the mirage of the world, but a grown up person to whom the limits of experience are patent, who desires, above all things, to see mankind steadily and perspicuously.'

আর emotional excitement বিনা লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহারই বা স্থিরতা কি? অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক ত বলেন, মানুষ লেখে দুটী moodএ—একটী চাঞ্চল্য ও আর একটী অবসাদের। 'Emotional exitement,' 'emotional exitement' করিয়া মন্মথবাবু পাগল হইলেন। 'এদিকে খেয়াল করেন নাই' যে 'emotional exeitement' থাকিলেই যদি সাহিত্য হয়, তাহা হইলে দেশবিদেশের নিষিদ্ধ লেখকেরাও সাহিত্যিক, কারণ তাঁহাদের লেখাও কোনো বিশেষ ইমোশুনাল এক্‌সাইটমেণ্টে ইনটেন্স্‌। আর শুধু intensity নয়, imagination ও তাঁহাদের প্রচুর। 'বিদ্যাসুন্দর'ই ধরা যাক্—কোথায় কর্ণাট্‌ দেশ, কোথায় বর্দ্ধমান আর কোথায় সুড়ঙ্গ—তিনটী দৃশ্যের একত্রসমাবেশে ভাবের অভিব্যক্তি কি! কি কল্পনা! আর বিহারদৃশ্যে intensity কি! কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণমুগ্ধ প্রমথবাবুও ইহাকে সাহিত্য বলেন না! আশ্চর্য্য! এমন 'emotional exeitement' এমন 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি'! তবু ইহা খারাপ। সত্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিদের খাতির করা 'ঝকমারী'!

মন্মথবাবু বলিতেছেন, 'আসল কথা হইতেছে রূপসৃষ্টি রসসৃষ্টি নয়, কারণ ফাজ্‌লামীকেও রূপ দেওয়া যাইতে পারে, শুধু সত্য কথাকেও রূপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কাব্যে ইহাদের স্থান নাই।' কেন নাই? আলবৎ আছে। ফাজ্‌লামীর রসটীকে সাহিত্যরূপে ফুটাইতে পারিলেই তাহা কাব্য বা সাহিত্যে স্থান পাইবে। প্যারডির স্থান সাহিত্যে বরাবর আছে। এবং প্যারডি ফাজ্‌লামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি হইতে গেলে

মন্মথবাবুর মতে 'বন্দী' বা 'পাপী' হইয়া দেহতত্ত্বের সমস্তায় মাথা গরম করিয়া (আধুনিক সমালোচক ত আধুনিক বাংলাসাহিত্য দেহাত্মবাদের সাহিত্য বলেন!) বা দুঃখবাদের 'মরুশিখা'র চোখ রাঙাইয়া লিখিতে হইতে পারে। কিন্তু এ নবসাহিত্যতত্ত্ব শুধু মন্মথবাবু ও তাঁহার চেলাদেরই জন্য। 'আসলকথা' হইতেছে intensityই সাহিত্য নয়, তাহা—রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাই—অর্থাৎ সাহিত্যের একটা গুণমাত্র। সুন্দরী রমণীর প্রাণবন্ত দেহের রূপ শিল্পে বা সাহিত্যে ফুটাইতে হইলে শুধু intense feeling এর স্থান বক্ষস্থল আঁকিলেই বা তাহার বর্ণনা করিলেই শিল্প বা সাহিত্য হয় না—আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলিতেছি না। ইন্‌টেন্সিটি সাহিত্যরূপের একটা অঙ্গ একথা রবীন্দ্রনাথ বলার পরেও মন্মথবাবুর কাব্যের ভবিষ্যৎ ইমোশ্যন্ বিনা কি হইবে বলিয়া নাটকীয় উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসমাত্র। সে সম্বন্ধে বলিবার বা করিবার কিছুই নাই—বিস্ময় প্রকাশ ও হাস্য ছাড়া। কিন্তু মন্মথবাবু কি জানেন না যে তাঁহার নাটকীয় উচ্ছ্বাসে 'ভবিষ্যৎ' কিছু মাত্র বিচলিত হইবে না?

লেখকের নবসাহিত্যতত্ত্বের যুক্তিহীনতার একটা দিক ত আলোচিত হইল। সে দিক ছাড়িয়া দিলাম। ধরিয়া লইলাম intensityই সাহিত্য বিচারের দাঁড়িপাল্লা। তাহা হইলে কথাটা হইতেছে যে যাহাতে intensity আছে, তাহাই সাহিত্য—তা সে নিষিদ্ধ পুস্তক হইলেও। তা না হয় হউক। কিন্তু তাহা হইলে পরস্পরের পার্থক্য কোথায়? মোহিতলাল প্রভৃতির intensity আছে, দান্তে, সেক্‌স্‌পিয়ার, ভিক্টর হ্যুগো, টুর্গেনিভ্—সংখ্যাতীত লেখকেরও আছে; সুতরাং তাঁহারা সবাই একগোত্রে পড়েন। অর্থাৎ মোহিতলাল প্রভৃতি দান্তে, সেক্‌স্‌পিয়র, হ্যুগো, টুর্গেনিভ্ প্রভৃতির গলা জড়াইয়া গল্প করেন!

কোনো বিশেষ 'emotional excitement' হইতেই 'শনিবারের চিঠি'র 'কচি ও কাঁচা' রচিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সাহিত্যের প্রথমস্তরে পড়ে—কারণ ও রচনায় emotional excitement' একেবারে 'intensity'র জমাট অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আর একটা কথা মন্মথবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, 'কবির হৃদয়ে যদি সত্যি কোন emotional sentement ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা আপনা হইতেই একটা বিশেষ প্রকাশরূপ পাইবে।' একথার সার্থকতা কি? 'বিষয়টা রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে' থাকে তাহ'লেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল।'—রবীন্দ্রনাথের একথা কি এতই কঠিন যে মন্মথবাবু আবার নবতত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন? আর কি নূতন কথা! 'ক্ষুধায়ই মানুষ ভাত খায়'! আর 'কবির হৃদয়ে'—কথাটার অর্থ কি? 'Emotional excitement এ কুলাইল না শেষটা আবার 'কবির হৃদয়ে' ধরিতে হইল। কিন্তু কবিরাও ইমোশ্যনের আঠা বিনা কাব্যরচনা করিয়াছেন; Æschylus এর 'Prometheus Bound' বা Swinburne এর 'Atalanta in Calydon' তাহার প্রমাণ। Goetheর 'Faust' তাহার প্রামাণ। Browningএর 'Paracelsus' 'Sordello' তাহার প্রমাণ। এবং 'কবির হৃদয়ে' ও যে 'emotional exceitement' ঘটিয়া থাকে, 'তাহা যে আপনা হইতেই একটা বিশেষ প্রকাশরূপ' পায় না তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ Verlaine; জীবনে তাঁহার এমন অনেক emotionএ চট্‌চটে দিন গিয়াছে যাহাতে অন্তত intensityর অভাব ছিল না—কিন্তু সাহিত্যে তাহার প্রকাশ একেবারেই হয় নাই। Shakespeareএর বহু-আলোচিত সনেটগুলি কোন emotion হইতে রচিত সে সম্বন্ধে ও সে emotion সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। 'Dorian Gray' লিখিতে তাঁহাকে স্ববর্ণিত emotionএ excited হইতে হইয়াছিল কি না সে প্রশ্ন প্রকাশ্য আদালতে উঠে এবং বিচারক তাহাকে অর্থহীনই বলেন। Dostoievsky Raskolnikff চরিত্র বর্ণনা করিতে নিজেও sincerelyও intensely খুনের emotion feel করিয়াছেন কি না সে প্রশ্ন বুদ্ধিমান কেহ করে না। Arnold Bennettএর একটা বইয়ে মানুষের মৃত্যুকালে সে যে emotion feel করে

sincerely ও intensely, তাহার intense ও sincere প্রকাশ ও বর্ণনা আছে। Bennett কিন্তু এখনও মরেন নাই বা মরিতে বসেন নাই এবং সে বই প্লাঞ্চেটের সাহায্যে লেখা নয়।

আর ইহা শুধু উপন্যাসেই নয়, কাব্যেও ইহা দেখা যায়। এবং মূলত কাব্যও গদ্য সাহিত্য বিশেষ বিভিন্নও নয়। অনেক সাহিত্যজ্ঞ কাব্যকেও subjectiveএর চেয়ে objectiveই বলিতে চান। Swinburne 'Laus Veneris', 'Dolores', 'Les Noyades' ইত্যাদি লিখিতে এসব কবিতার intense emotion sincerely feel করিয়াই লেখেন, তাহা নাও হইতে পারে। 'Laus Veneris'এর emotion, 'Les Noyades'এর emotion উনবিংশ শতাব্দীতে feel করা অসম্ভবই ছিল। Swinburne নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার এই সব কবিতার কাব্যগ্রন্থে 'there are sketches from imagination,' ও তাঁহার মানসীদের বলিয়াছেন 'daughters of dreams and of stories.' Browning 'Ring and the Book' লিখিতে যে Count Guidoর বা 'Fifine at the Fair' লিখিতে Don Juanএর emotionএ নিজেও excited হইয়াছিলেন, তাহা Browningএর জীবন যারা জানে, তারা বিশ্বাস করিবে না। Sophocles যে তাঁহার Oedipus নাট্যকাব্যত্রয় লিখিতে Jocastaর প্রতি Oedipusএর emotionএ excited হন তাহাও ত কেহ বলে না। এবং এই রকম উদাহরণ অজস্র আছে।

বুদ্ধদেব বসু হয়ত intensely feel করিয়াই 'বন্দীর বন্দনা' বা 'পাপী' লেখেন কিন্তু তিনিই ত সকল কবির প্রতিনিধি নন। হৃদয়কেই বল্লভ সকল সকল কবিই করেন না। মনের প্রাধান্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

তারপর যে আলোচনা মন্মথবাবু করিয়াছেন তাহার জবাব ভদ্রলোককে সবিস্তারে দিতে পারে না। প্রথমত তাহা একেবারেই অর্থহীন ও অবান্তর। দ্বিতীয়ত তাহা রবীন্দ্রনাথ —রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে মোহিতলাল ও বুদ্ধদেব বসুর 'তুলনায় সমালোচনা' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' (বৈশাখের 'প্রবাসী') রচনার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র যোগ নাই ও 'রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' নামধারী প্রবন্ধে ইহার সার্থকতাও নাই যখন, তখন তাহার আলোচনাও অনাবশ্যক। এবং মোহিতলালের ও বুদ্ধদেববাবুর আমি ভক্ত পাঠক।

শুধু এইটুকু বলিয়া মন্মথবাবুর নিকট হইতে বিদায় লই— রবীন্দ্রনাথের কবিতা না বুঝিয়া নিকৃষ্ট বলিলেই তাহা নিকৃষ্ট হয় না এবং তাহাতে অপর কেহ বড়ো হয় না। সাদা কথায়ও intensity থাকে ও dramatic tone বা nervous forceই যে intensity of emotion নয়, তাহা যিনি বোঝেন না তাঁহার ত রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বের মহাকবির কাব্যপাঠ ফলহীন হইবেই। মন্মথবাবু হয়ত পড়েন নাই কিন্তু ইহা সত্য যে অতি আবেগে মোহিতলালের সুবিপুল নাটকীয় কবিতার মতো কবিতা অনেকসময়ে অলেখ্য। আবেগের গভীরতায় প্রকৃত কবি প্রশান্তচিত্ত কবির রসাকো রবীন্দ্রনাথের মতোই সোজাসুজি সাদাকথায় প্রকাশ পায় এবং তাহা একেবারে হৃদয়ে গিয়া লাগে। কিন্তু মন্মথবাবু কি পড়েন নাই—'Our personal affinities, likings, and circumstances have great power to sway our estimate of this or that poet's work, and to make us attach more importance to it as poetry than in itself it possesses, because to us it is, or has been of high importance'?

লেখক যদি এখন বলেন Melozzo da Forli Raphaelএর চেয়ে শিল্পী হিসাবে শ্রেষ্ঠ যেহেতু Raphaelএ intensity নাই এবং য়ুরোপের কলাশালাসমূহের ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া কান্নাকাটি করেন, ত তাহাতে এখন আর কেহই আশ্চর্য্য হইবে না। কিন্তু চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভই সাহিত্য নয়। তাহা emotion হইতে পারে কিন্তু তাহাই intensity নয়। যে তত্ত্বে michael Angelo ও Rodinই সর্ব্বস্ব, যাহাতে Phidias ও Praxitelesএর

স্থান নাই, যাহাতে কালিদাসের স্থানে ভবভূতি বসেন, যাহাতে অবনীন্দ্রনাথকে ঢাকিয়া রবিবর্ম্মা শিল্পীশ্রেষ্ঠ গণ্য হন, তাহা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানিতে পারে না—মন্মথবাবু মানিলেও।

সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটী একটী আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে—'সাহিত্য কিনা ?' তাহা নয়, 'সাহিত্যে কি বিচার্য্য ?' তাহাই লইয়া লিখিত ও পঠিত হয়। এবং এ প্রবন্ধের সময়াতীত মূল্য তাহার স্বাতন্ত্র্যে হইলেও, প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথ আলোচনার গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ প্রবন্ধটী পড়েন এবং তাহাতে এমন কথা বলেন নাই যে রূপই রসসাহিত্য, তিনি বলিয়াছেন 'রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।' ইহা না বুঝিতে পারিয়া কেহ যদি আস্ফালন করিয়া থাকেন, ত দুর্ভাগ্য তাঁহারই। কিন্তু মন্মথবাবু তাঁহার প্রলাপপ্রবন্ধের শেষে যে বলিয়াছেন যে এই আধুনিকদের শৃঙ্গাররসটা 'রবীন্দ্রনাথ বা আর কাহারও কাছ হইতে ধার করা নয়।' —কথাটী ভারী সত্য কথা। সত্যই এ আধুনিক শৃঙ্গাররস উল্লেখ যোগ্য অনিষিদ্ধ কোনো কবির কাছ হইতে ধার করা নয়—এমন কি আধুনিক চারইয়ার 'ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কী'র কাছ হইতেও নয়।

সর্ব্বশেষে বিশ্বপূজ্য মহাকবির নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি। অজানিত কোনো দুর্ব্বিনয় যদি প্রকাশ করিয়া থাকি ত তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাহা স্বেচ্ছাকৃত নয়।

স্বদেশী দলের তাঁবেদারী

(কৌতুকনাট্য।)

—শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

—প্রথম দৃশ্য—

[মেশে রতিকান্ত ও ভূপেনের গৃহ। একটা টেবিল ল্যাম্পের সাম্‌নে ভূপেন সংস্কৃত পাঠ অভ্যেস্ করছে—রতিকান্ত উস্‌খুস্ করে' ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

রতিকান্ত। (স্বগতঃ) জীবনের ব্যথা বৃথা আর বইতে পারিনা—দূর ছাই পরীক্ষা—কী হবে পরীক্ষা,—প্রাণের ব্যথার কতটুকু নিবারণ করে এই পরীক্ষা ?

আজ আর ঘুম হবেনা—কালও সারারাত ঘুমোতে পারিনি, "বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখি পাতে !"

হায়রে, আমারই শুধু বঁধুয়া নেই ! (দীর্ঘশ্বাস)

ভূপেন। কি কর্‌ছেন রতিকান্ত বাবু—একটু পড়েন না—অত কাব্য কইর‌্যা কী হইব ?—

রতিকান্ত। আর ভূপেন বাবু, জটীল অঙ্কশাস্ত্রের জ্বালায় কি আর কাব্য ঐশ্বর্য্য উপভোগ করবার সময় আছে—

ভূপেন। আপনাকে অঙ্ক তো কই কর্‌তে দেখিনা—সকল সময় দেখি, হাঁ কইর‌্যা তাকায়ে আছেন। মশয়, অমন কইর‌্যা পরীক্ষা পাশ হয় না। (সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত তুলে নাড়্‌লে)

রতিকান্ত। (তার অঙ্গভঙ্গিতে বিষম বিরক্ত হয়ে) যে আজ্ঞে, আমার তো আর বাঙালের মাথা নয়—এ রত্নের মত উর্ব্বর মস্তিষ্ক।

ভূপেন। বাঙাল একেবারে এমন চাটান চাটাইবে—উর্ব্বর মস্তিষ্ক মস্তক ভাইঙ্গ্যা বাহির হইবে।—পড়্বার লেগ্যে কলকাত্তা আইস্যে কাব্যি কর্ছেন, ভালো কথা কইলাম তো বাঙাল হইলাম।

রতিকান্ত। (তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে) হাঁ পড়্ব বৈকি ভূপেন বাবু—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করে' নিই—আমার একরকম সব preparedই আছে। (স্বগতঃ)—ইস্ গায়ে একটু জোর থাক্ত। (শীর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে দেখিল)

ভূপেন। (আবার পাঠে মনোনিবেশ কর্লে)।

রতিকান্ত। ওর উপর রাগ করে' মন খারাপ করে' কি হবে?—(দীর্ঘশ্বাস)

হায়রে, আমারই শুধু বঁধুয়া নাই!

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—তবে কি এ দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হ'ত? দুর্ব্বল শরীর—ভারী মাথাটা কেমন রাস্তা চল্‌তে ঘাড়টাকে হেঁট করে দেয়—তবুও কষ্ট করে উটমুখো হয়ে চলি; পথের দুধারে বাড়ীগুলোর জানালায় তাকিয়ে এই মাইনাস্ সিক্‌স্ পাওয়ারের চশ্‌মা দিয়ে কত ব্যাকুলভাবে তাকাই—

কই কেউ তো আমায় চকিত চাহনি দিয়ে যায় না! (দীর্ঘশ্বাস)

কালিদাসের কালে মেয়েরা ক্ষীণ কটি ঘিরে' নীবিবন্ধ মেখলা দুলিয়ে দিত; কমনীয় চরণের রমণীয় রাঙা আল্‌তার উপরে মঞ্জীরায় রিনি-ঝিনি-ঝিনি রব তুল্‌ত—তারা চিন্‌ত উদাসী পথিকের সপ্রেম চাহনি। আর আজকাল—(গভীর দীর্ঘশ্বাস) তরুণীরা শুধু শিখেছেন খট্‌খট্ লেডীবুট পায়ে আমাদের দুর্ব্বল বুকের পাঁজরগুলো মট্‌মট্ মাড়াতে—

নাঃ, আমার এ প্রেমিক জীবন ব্যর্থ হ'তে দেওয়া হবে না।

শুনেছি, বিলাতের তরুণরা serenade করে—তাদের হৃদয়ের গোপন পূজাবেদীর দেবীর উদ্দেশে গভীর নিশীথে ঝড়ো হাওয়া বর্ষার করকাপাত অগ্রাহ্য করে' পথে পথে সঙ্গীতের অঞ্জলি দিয়ে বেড়ায়।

আমি আজই serenadeএ বেরোব! (উত্তেজিত ভাবে)

"আমার এঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো,
আমার এঘরে ঘরে—"

ভূপেন। হঃ, রতিকান্ত বাবু, পরীক্ষার পাঠ পড়্বেন তো পড়েন নয় তো চুপচাপ ঘুমান—ওসব টপ্পা আওড়ান কিসের লেগ্যে—আমাগোর disturbe হয়।—

রতিকান্ত। না, না, আমার মাথাটা কেমন গরম বোধ হচ্ছে—

ভূপেন। ক্যান্—আজকি বাটীর পত্রে কোনও দুঃসংবাদ পাইছেন?

রতিকান্ত। (একটু ঘাব্‌ড়ে দিয়ে)। না তা,—আপনারা মনে কর্‌তে পারেন—আমার মন ঢের liberal—প্রসারিত। আমি সংবাদ পেয়ে খুসীই হ'য়েছি!

ভূপেন। সংবাদটা কি শুনি।

রতিকান্ত। এমন কিছু নয়। আমার ভগ্নী শ্রীমতী জগত্তারিণীকে গুণ্ডা ধরে' নিয়ে গিয়েছিল। সে হিন্দু-সমাজে স্থান না পেয়ে মুসলমানী হ'য়েছে।

ভূপেন। আঁঃ, এ সংবাদে আপনি খুসী হইছেন? কন কি মশয়?

রতি। (জয়ের হাসি হেসে) অবশ্য, পুরোণ সংস্কারাচ্ছন্ন মনে একটু বেদনার রেশ লাগ্‌ছিল—কিন্তু আমার liberal মন খুসীই হ'য়ে উঠেছে। কেন হবেনা? হিন্দু-সমাজে জগত্তারিণীর বিয়ের ভাবনা ভেবে বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিল—সে এবার জবানাখাতুম হ'য়ে রোজ রোজ জবাইকরা ফাউলের দো পেঁয়াজী খেতে পাবে—(একটু হাস্‌লে)

ভূপেন। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে)—আরে চুপ যান, চুপ যান্—

রতিকান্ত। (সহাস্যে) হাঁ, liberal মনটা খুসী হ'য়ে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে—আমিও অদূর ভবিষ্যতে ...

ধর্ম্মের আশ্রয় নেব, ফার্সি বয়েৎ লিখ্‌ব—বেহেস্ত্ আস্‌বে হমিনস্ত্ হমিনস্ত্ হমিনস্ত্। ফার্সি বয়েৎ লিখে, ও মার খৈয়ামের পার্শ্বে আসন আসন নেব—আমার হৃদয় সুন্দরীর অধরে দ্রাক্ষারসের স্ফটিক্ পেয়ালা তুলে ধর্‌ব—"দিল পিয়ারা দাড়িম্বাস্ত সাকী আমার!"

ভূপেন। হঃ হইছে। লজ্জার মাথা খাইছেন—এখন ঘুমান।

রতিকান্ত। না, না, পথে একটু ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুরে এসে উত্তেজিত মাথাটা ঠাণ্ডা করি—

ভূপেন। তা' পিতা আপনার যাইতে টাইতে লিখেন নাই?—

রতিকান্ত। লিখেছেন বৈ কি? তিনি ত আর I. A. অবধিও পড়েন নি, logic খানার মুখও দেখেননি। ন্যায়-শাস্ত্র যদি পড়া থাকত, ত' বুঝতেন, আমার এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে পাড়া গাঁয়ে গুণ্ডার মুখে যাওয়া কোনও ন্যায়-শাস্ত্রে বলেনা।

আমি একটু ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুরে আসি।

ভূপেন। হঃ হইছে। এত রাত্রে বাইরে যাইয়া কাম নাই। জানেন, রাত কত হইছে?—একটা বাজ্‌ছে!

রতি। তা হায়রে materialistic ভূপেন! কবি-হৃদয়ের এ গভীর ব্যথার মর্ম্ম তুই বুঝ্‌বি কি? যাই আমার অচেনা অদেখা ভবিষ্যৎ হৃদয় অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্যে পথে পথে কবিতা আবৃত্তির serenade করে' আসি।

"আপনার এখরে আপনার করে"

[সিল্কের চাদর নিয়ে বেরিয়ে গেল]

ভূপেন। এ দেখ্‌ছি পিতার অতি কুপুত্র! আমার তো জান্‌বার বাকি নাই। গরীব পিতা বেচারী পাট-আফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করেন—বেতনের সমস্ত টাকা রতিটারে পাঠায়ে দেন। ভগ্নী জননী সারাদিন খাইট্যা খাইট্যা হয়রাণ! কুপুত্র কলকাত্তায় পড়ার নাম গন্ধ করে না। খালি কাব্যি কর্‌ছেন!

জগত্তারিনীরে আমি বিয়া করুম্। আমার তো একটু ভাল মন্দ দেখা উচিত। তাই তামাসা কইর‍্যা পিতার জবানী ওই চিঠি আমিই লিখি—জগত্তারিণী সত্যিই যদি মুসলমানী হয়্যা যাইত!—অবাক কর্‌ল ভগ্নীর এত বড় অপমানের কথাতেও পাষণ্ডের লজ্জা-সরম হইল না!—যাক্, আমি পাঠ অভ্যাস্ করি—

(দুল্‌তে দুল্‌তে সংস্কৃত পড়্‌তে লাগ্‌ল)

আঃ রত্যেটা এখনও আসে না ক্যান? রাততো দ্যাড়্‌টা বাজ্‌ছে দেখি। পথে বিপদ হ'ল নাকি? বিয়্যার পর জগত্তারিনী তো আমারেই দুষ্‌বে!

(বাহিরে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দরজায় কাছে গেল)

আরে, আরে—এযে দেখি পাহারাওয়ালা ধরছে। ও পাহারাওয়ালা, ও পাহারাওয়ালা ও আমাগোর বাবু ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

[পাহারাওয়ালা রতিকান্তের কাণ ধরে' প্রবেশ কর্‌লে। রতিকান্তের গায়ের পাঞ্জাবী, চোখের চশমা, পায়ের জুতো নেই।]

পাহারাওয়ালা। (হেসে ভূপেনের প্রতি) এত্‌না রাতে এ বেমারীবাবু কাঁহা বেরিয়েছিল—গুণ্ডায় সোব ছিনিয়ে নিলো! (রতিকান্তকে এক ধাক্কা দিয়ে) শালা বাঙালী মাতোয়ারা!

ভূপেন। যাক্, যাক্, যা' হ'বার হইছে—

পাহারাওয়ালা। এ বাবু বুঝি বাউরা আছে? রাতে একেলা ছোড়্‌বে না।

(প্রস্থান)

[বাইরে থেকে শোনা গেল]

"জুড়িদার হো, জুড়িদার!"

ভূপেন। (সহানুভূতি-পূর্ণ স্বরে) রতিকান্তবাবু ব্যাপার কি?

রতিকান্ত। (কাঁদ-কাঁদ স্বরে) ভূপেনবাবু, ও পাহারা-ওয়ালাকে আমি প্রাণভরে' ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদিও "শালা-বাঙালী" বলে' সমস্ত বাঙালী জাতটাকে গালি দেওয়া

বেচারার কুরুচির পরিচায়ক—তবুও, ও না থাক্‌লে আমি মরে' যেতাম। ওঃ, এখনও আমার হাত্‌পা ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপ্‌ছে।—

ভুপেন। কি হইছিল—আপনার চশমা পাঞ্জাবী গেল কই?

রতিকান্ত। ও হো হো—আর বল্‌বেন না ভুপেনবাবু, আমার প্রচুর কান্না পাচ্ছে।

ভুপেন। আরে, আরে, ঘটনাটা কি?

রতি। পিচ্‌ঢালা পথের দু'ধারে মনোরম গ্যাসের আলো গুলো নিরীক্ষণ কর্‌তে কর্‌তে আমি আন্‌মনা চলেছি। এমন সময়—এখনও আমার বিভীষিকার উদয় হয়ে শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে—এমন সময়, কোথা হ'তে এক পশুবল হিংস্র গুণ্ডা এসে উপস্থিত হ'ল!

আমার চশমা নিল—কিছু দেখ্‌তে পাইনা। আমার দেহ নগ্ন করে পাঞ্জাবী নিল—ঠাণ্ডায় আমি থর থর কাঁপি।

শেষে, ছি ছি, লজ্জায় আমার দ্বিধা বিভক্ত ধরিত্রীর অভ্যন্তরে সীতার মত প্রবেশ কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল—ঠিক যেমন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে—common decencyর জ্ঞানহীন গুণ্ডা তেম্‌নি আমার ধুতি—ও হো, হো

(দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

ভাগ্যিস্ এমন সময় ওই দয়ালু পাহারাওয়ালা এলেন।......

ভুপেন। হঃ বুঝ্‌ছি! গুণ্ডার ভয়ে পাবনা যাইতে চান না—আর এখানে? বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখ্‌বেন না—আপনার ভগ্নী জগত্তারিনীর সহিত আমার যে বিয়্যার সব ঠিক্‌ঠাক্, এই পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে, তাইত' আমি ওই পত্র লিখ্‌ছিলাম।—কাব্যি কর্‌লেই হয় না, পল্লীগ্রামে যাইতে ভয় পান, আর এই শরীর নিয়ে কল্‌কাতার পথে বাহির হন।

চলুন, এখন ঘুমান। আমার আরও একটু পড়্‌বার আছে।

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[পশ্চিমে একটী মফঃস্বলের আফিস্—সাহেবের কুট্‌রীর সাম্‌নে মোটা-মোটা অক্ষরে একটা কাগজে লেখা—No Vacancy"—সেটা বড়বাবুর room]

(চাপ্‌রাশীর আস্‌তে একটু দেরী হ'য়েছিল, ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের টুলটাতে বস্‌লে।)

বড়বাবু। ব্রজবাবু, ব্রজবাবু।

চাপ্‌রাশী। (সেলাম করে) ব্রজবাবু এখোনো আসেন নেই।

বড়বাবু। (দেয়ালের ঘড়ীটা দেখে) এখনও আসে নি? তুমহারা ভি দেরী হুয়া—

চাপ্‌রাশী। বাঁট্‌লোহি ফুটা ছিলো, আধার আগুন, নিভে গেলো, তাই ভাত পাকাইতে দেরী হয়ে গেলো—

বড় বাবু। ভাত বন্ধ কর্‌দেও, নেই তো নোক্‌রী বন্ধ কর্‌দেও!

চাপ্‌রাশী। হাঁ হুজুর-

বড়বাবু। দশটা বেজে দশ মিনিট হ'য়ে গেছে এখনও ব্রজবাবুর দেখা নেই। কলকাতার কোন অফিস্ হলে এতক্ষণ আর একজন কাজে বাহাল হয়ে যেত—যেমন মফঃস্বলের আপিস পেয়েছে, আর আমায় ভালো মানুষ বড়বাবু পেয়েছে—

আচ্ছা বোলাও রামকান্তবাবুকো বোলাও—

চাপ্‌রাশী। উনি ভি আসেন নেই—

বাড়বাবু। কেতাথ করেছেন!

গিন্নীর জ্বালায় বাড়ীতে টেঁকা দায়—ভাত বাড়্‌তে বল্‌লে বলেন আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে ঘরে—মুখে ভাত রুচবে? আপিসে পালিয়ে আসি তো বাবুদের টিকির দেখা নেই। (চাপরাশীর প্রতি) হাম কি লোটা কম্বল লেকে ফকির হ'য়ে চলে যায়গা?

চাপরাশী। হাঁ হুজুর!

বড়বাবু। হাঁ হুজুর?—বেটা বেয়ো আমার সাম্‌নে

থেকে। আজ যদি না বড় সায়েবকে বলে' অফিস শুদ্ধ সবাইকে বরখাস্ত করি তো কি বলেছি।

(চাপ্‌রাশী ধীরে ধীরে বাহিরে চলে গেল।)

আমি একলা কাজ করব—সমস্ত আপিস একলা সাম্‌লাবো, কাউকে চাইনা।

দিন রাত্তির খাটব—অমন গিন্নির মুখ দেখতেও বাড়ী যাবোনা।

এইখেনে না খেয়ে চেয়ারে বসে' শুকোব—গিন্নি যদি নিজে এসেও পায়ে ধরে, এক লা—জোরে পা ছুঁড়্‌ব!

"চাইনা তোমার হাতের পিণ্ডি সেদ্ধ খেতে! দূর হও আমার সাম্‌নে থেকে, আমার বড় সায়েব বেঁচে থাকুক।" কেঁদে চোখের জলে পায়ের ধুলো ধুইয়ে দিলেও বাড়ী যাবনা—"কেন? ঝাঁটা মারবে না!—নথ নাড়্‌বে না!"

[ধীরে ধীরে বৃদ্ধ রামকান্তবাবু ও পশ্চাতে ছোক্‌রা ব্রজবাবুর প্রবেশ। বড়বাবু গোঁজ হয়ে গম্ভীর ভাবে বস্‌লেন, রামকান্ত টেবিলের কাছে এসে খাতাপত্র খুঁজে রেজেষ্টরী পেলেন না]

রামকান্ত। রেজেষ্টরী বইটা তো দেখতে পাচ্ছিনা—

বড়বাবু। না, সেটা আর আজ্‌কে দেখ্‌তে পাওয়া যাবেনা। কটা বেজেছে দেখেছেন!

রামকান্ত। আজ্ঞে গিন্নি—

বড়বাবু। (টেবিলে হাতে চাপড়ে) না, গিন্নি-ফিন্নি এখানে চলবে না। আমি দেখ্‌তে চাই, গিন্নি বড় না বড় সায়েব বড়—

ব্রজ। (ফিক্‌করে হেসে ফেললে। জনান্তিকে বললে) বুঝেছেন তো রামকান্ত বাবু।— আজ বড়গিন্নি—

রামকান্ত। এই চুপ্‌ কর্‌। (বড়বাবুর প্রতি) আজ্ঞে গিন্নি বেলা ন'টার সময় বল্‌লে, মেজো মেয়েটার পেটের অসুখ— হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে না দিলে কিছুতে ভাত বেড়ে দেবেনা। তাই গিন্নির কথাশুনে—

বড়বাবু। তা' বেশ তো গিন্নির কথাশুনুন গে'। আমি দেখ্‌তে চাই—গিন্নির টান বেশী, না বড় সাহেবের টান বেশী।

ব্রজ। (মুচ্‌কি হেসে জনান্তিকে) বড় সাহেবের টান?

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ

খনে নাকে দড়ি, খনেকে চাঁদ!

কিন্তু গিন্নির— আমরি মরি!

বড়বাবু। (হঠাৎ ব্রজকে) ওহে ছোক্‌রা— বিড় বিড় করে' কি বক্‌ছ? বলি কাজকর্ম করবার মতলব আছে!

ব্রজ। (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে হাঁ—

বড়বাবু। তবে এতো দেরী করে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে—

ব্রজ। আজ্ঞে, সই করব—

বড়বাবু। আমার মুণ্ডু কর্‌বে—

ব্রজ। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে না!

বড়বাবু। (ধীরে ধীরে রেজেষ্টরী বার করে)—সই করবে ত রেজেষ্টরী চাইতে কি হয়েছে?—

ব্রজ। আজ্ঞে রামকান্তবাবু তো—

বড়বাবু। রামকান্তবাবু চাইছেন তো তোমার মুখে কি হয়েছে চাইতে?—

(ইতিমধ্যে রামকান্তবাবু তাড়াতাড়ি খাতা নিয়ে সই কর্‌তে উদ্যত হলেন)

বড়বাবু। টাইমটা ঠিক লিখে দেবেন, দশটা বেজে কুড়ি মিনিট।

ব্রজ। যে আজ্ঞে—

[রামকান্তবাবু ও ব্রজবাবু সই করে' প্রস্থানোদ্যত হ'লেন]

বড়বাবু। হাঁ দেখুন রামকান্তবাবু, ব্রজর না হয় ছোক্‌রা বয়েস—আপনার কি আর এ বুড়ো বয়সে গিন্নীর আঁচল-ধরা হওয়া ভালো দেখায়? ও জাতটা, বুঝ্‌লেন কিনা, বেজায় বেইমান। যত ওদের আঁচল-ধরা হ'বেন, তত ওরা নথ-নাড়া দেবে—তার চেয়ে আপিসে এসে' কাজ

করলে বড় সায়েবের মন পাওয়া যায়—নথ-নাড়াও খেতে হয় না।

রামকান্ত। (একগাল হেসে ফেলে) আজ্ঞে, সে আমি ঠিক করে ফেলেছি—সেবার ছোটমেয়েটার নিমোনিয়ায় গিন্নীর নথ-জোড়া বাঁধা দিয়ে ডাক্তারের ভিজিট দিয়েছি,—মেয়েটাও বাঁচলো না, গিন্নীর নথ শুধ্‌রোনোও হ'ল না। গিন্নীর নথ নেই, আমায় নথনাড়াও খেতে হয় না। (হো—হো—হাসি)

বড়বাবু। হাঁ, তা আমি বলিকি, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আমরা বুড়োর দল আপিসে কাজ কর্‌ব।—সন্ধ্যেয় আড্ডায় গিয়ে চাল কয়েক দাবা খেল্‌ব—একেবারে ঘুম পেলে বাড়ী গিয়ে ঘুমুবো গিন্নীদের আর তোয়াক্কা রাখ্‌ব না

রামকান্ত। হেঁ, হেঁ, হেঁ (হাসি)

ব্রজ। (জনান্তিকে)

"রাধে—এবার রাখব না তোর মান।
বড়সায়েব চন্দ্রাবলী কুঞ্জে হবে নিশা অবসান!"

(রামকান্ত ও ব্রজর প্রস্থান।)

বড়বাবু। চাপরাশী, চাপরাশী!

(চাপরাশীর দ্রুত প্রবেশ)

চাপরাশী। হুজোর!

বড়বাবু। বড় সায়েব আনে সে, এই সব কাগজপত্তর সই করে' লেয়াও—

(চাপরাশী ত্বরিৎ হস্তে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চল্‌ল)

[ধীরে ধীরে রতিকান্তের প্রবেশ—উস্কখুস্ক চেহারা, দুয়ারের কাছে চাপরাশীকে দেখে থতমত খেয়ে তাকেই সেলাম করে' ফেললে]

চাপরাশী। (সেলামে হাস্তমুখে)—কি চাই বাবুর?

রতিকান্ত। (ঢোঁট চেটে) চাক্‌রী।

চাপরাশী। নোক্‌রী এখানে কাঁহা—দেখ্‌ছেন না—(দেয়ালে No-vacancy দেখিয়ে দিলে)

রতি। (সজলচক্ষে) কিন্তু চাক্‌রী না পেলে আমি মরে যাব।—

চাপরাশী। (নরমসুরে) ই-তো কলকাত্তার হাফিস্ না আছে বাবু—এখানে নোক্‌রী খালি পড়ে না। তা, ওই বড়বাবু আছেন, উনিকে বলুন।

(চাপরাশীর প্রস্থান)

[রতিকান্ত ধীরে ধীরে গিয়ে বড়বাবুর কাছে দাঁড়াল, বড়বাবুকে নমস্কার জানালে, তিনি টেবিলে হাতখানা একটু তুলে প্রতি নমস্কার কর্‌লেন, কিন্তু তার দিকে না দেখে কাজই ক'রে চল্‌লেন]

রতি। (ঢোঁক গিলে) বড়বাবু।

বড়। কি চাই?

রতি। আমায় একটা চাক্‌রী দিন।

বড়। চাক্‌রী ফাক্‌রী এখানে নেই বাপু—দেখ্‌তে পাচ্ছ না? (অঙ্গুলি সঙ্কেতে No-Vecancy দেখালেন)

রতি। আমি কল্‌কাতা থেকে এতদূরে পশ্চিমে চলে এসেছি—চাক্‌রী না পেলে না খেয়ে মরে যাব।—

বড়বাবু। কল্‌কাতা থেকে চলে' এসেছ? কি করে' এলে?

রতি। আজ্ঞে রেলে চেপে।

বড়বাবু। তা' আমার জানা আছে। পাঁচশ' মাইল পথ কেউ হেঁটে আসে না, রেলে চেপেই আসে। আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি, তুমি এলে কেন?

রতি। আজ্ঞে বিবাগী হ'য়ে—

বড় বাবু। (অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে) বিবাগী হ'য়ে!—(কি যেন বুঝ্‌তে পার্‌লেন)—ও, তোমার বুঝি বিয়ে হ'য়ে গেছে? বউটা বুঝি—

রতি। (সকাতরে) আজও আমার বিয়ে হয়নি—বউ নেই।

বড় বাবু। (পরমাশ্চর্য্যে) বউ নেই? তবে বিবাগী হ'তে গেলে কেন?

রতি। কল্‌কাতায় মেশে থেকে বি-এ পড়্‌তাম, অঙ্কটা

বেজায় শক্ত, আমার কিছুতেই আসে না। আর examiner রাও তারী strict—এবার examineএ fail হ'য়ে গেলাম। মেসে আমার রুমমেট ভূপেন, আমার ভগ্নীপতি, বাবাকে বলে, আমি নাকি পড়া শুনা করিনি। শুধু—(ঢোঁক গিলে)। বাবা তাই রাগ করে' বল্লেন, "তোমার মুখ দেখ্তে চাই না।" আর আমিও তাই রাগ করে, বিবাগী হ'য়ে গেলাম।

বড় বাবু। বিবাগী হ'য়েছ, বেশ করেছ। তা' আমার কাছে কেন? আমি তো আর মোহন্ত নই!

রতি। আমায় একটা চাক্‌রী দিন—

বড় বাবু। চাক্‌রী কি আমি তৈরী কর্‌ব?—তুমি তো বি-এ অবধি পড়েছ—পশ্চিমে কি কাজকর্ম মেলে? চাক্‌রী কল্‌কাতায় খুঁজ্‌তে হয়।—(একটু ভেবে) সাধু-সন্ন্যেসী-গুরু জোটেনি?—তুমি এখানে কোথায় উঠেছ?

রতি। আজ্ঞে, কোথাও উঠিনি, আপনার কাছেই এসেছি—

বড় বাবু। বে—শ!

রতি। (স্বগতঃ) এ বড় বাবুর হৃদয়টা অতি কোমল। গোড়াতেই আমার বউ এর খবর নিলেন। নিশ্চয়ই প্রেমিক লোক! আহা! আহা!

ওগো বড়বাবু গো বড়বাবু, আমিও একজন দরদী ব্যক্তি—তোমার মর্ম্ম কথা আমি বুঝিছি। প্রিয়া-সুখে ধন্য তুমি—দাঁড়াও, তোমার প্রেয়সীর নামে বন্দনা-গীতি তৈরী কর্‌ব।

(প্রকাশ্যে) আমায় তা' হ'লে একটা কাজ দেবেন তো?—

বড় বাবু। (কাগজ পত্র উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) দাঁড়াও, দেখি—typist? তা তো দরকার নেই—Despatcher? রামকান্তবাবু একলাই পারে, Cashier? Cashই বা কত ত' আবার assistant—

রতি। (উৎফুল্ল হ'য়ে) হাঁ বড়বাবু জুটিয়ে দিন! আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি প্রেমিক লোক!

(বড়বাবু 'প্রেমিক' শুনে, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে তাকালেন।)

রতি। আমি সাধারণ মানুষ নয়—আপনার গৃহিণীর নামে এমন ছন্দোবদ্ধ বন্দনা গীতি রচনা করে' দেব—

বড়বাবু। গিন্নীর নাম ক'র না বল্‌ছি।—

রতি। বুঝেছি, বুঝেছি। আপনার গৃহিণীর অন্তর বুঝি আপনার মতই সুন্দর? আপনার কাছে বুঝি আপনার চেয়েও সুন্দর? তাই গৃহিণীর সে শ্রদ্ধেয় নামের উচ্চারণে অশ্রদ্ধা কর্‌তে মানা কর্‌ছেন? আপনার গৃহিণী—

বড় বাবু। ফের আমার সাম্‌নে গিন্নীর নাম—কোথাকার পাজি ছোক্‌রা হে—গিন্নীর নাম আমার সাম্‌নে ক'রনা বল্‌ছি। চাপ্‌রাশী, চাপ্‌রাশী, এই উল্লুকো হিঁয়া সে নিকাল দেও—

[রতিকান্ত সভয়ে পলাইল]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[ঘসেটীমলের আপিস ঘর—রতিকান্ত কাণে কলম গুঁজে জাবদা খাতায় হিসেব দেখ্‌ছে। তক্তাপোষে একটা তাওয়া দেওয়া গড়গড়া]

রতিকান্ত। বাপ্‌! বিবাগী হ'য়ে শেষকালে ঘসেটীমলের মুহুরি! ধন্যবাদ ঘসেটীমল ধন্য তোমায়, তাঁবেদারি কর্‌তে পেয়ে এই বিদেশ বিভুঁয়ে প্রাণটা এ যাত্রা বেঁচে গেল।—ভাগ্যিস্ হিন্দিটা একটু জানা ছিল! উঃ, হিসেবের কি ফর্দ্দ, ইট, সুর্‌কী, গরুর খোরাক, কুকুরের খোরাক, দই, গুড়, আলু, গরম-মশলা। শুধু নেই মাছ আর মাংস।

এই হচ্ছে জীবন কাব্য।

মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি গুলো সূক্ষ্মতর হ'য়ে মিলিয়ে যেতে চলেছে—এই কাঠের শক্ত তক্তাপোষে রাত্রে শুয়ে ছার-পোকা আর মশার কামড়। বাড়ীতে মা বিছানার চারিদিকে মশারি গুঁজে দিতেন,—বৈরাগ্যে এসে মশার উপদ্রবটা বড্ডই কষ্টকর।

[ঘসেটীমলের প্রবেশ—চৌকস্কা চেহারা, ভুঁড়িদার, চেয়ারে বসে, গড়গড়ার নলটা হাতে নিলে]

ঘসেটী। ক্যা বাবু, কাম ঠিক ঠিক করূছে তো ?

রতি। (ধড়্ফড়্ করে উঠে) কী হুজুর—

ঘসেটী। —লে যাও বহি—

রতিকান্ত। (একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে—ধীরে ধীরে খাতার পাতা উল্‌টে সাম্‌নে ধর্‌লে)

ঘসেটী। হাঁ—এক রূপেয়া সাড়ে বারো আনা ইটা, চুণ, সুরথি—পাঞ্চ হাজার, ছওশ' নিরানব্বো রূপেয়া এক আনা দো-পাই।

দহি গরম মশলা—সাড়ে পাঁচ পাই

কুত্তা কা খানা—চার রূপেয়া

গৌ কা খানা—তিন রূপেয়া

কৌয়া খিলানা—গ্যার পইসা

এ বাবু, একী কর্‌ছে—গৌ আওর কৌয়া কা নাম কুকুর সে আগে লিখ্‌তে হোয়—গরু হইল মা ভগবতী, কুত্তা হইল জানোয়ার—সমঝ্‌ছে।

রতি। 'হুঁ'

ঘসেটী। (পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে একটা পাতায় থাম্‌লে)

এ কী কর্‌ছে বাবু, এ কি লিখ্‌ছে ?

(রতিকান্ত মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌ল)

এতো বাঙ্গলা হরফ্‌ সমঝ্‌ আস্‌ছে ?—ক্যা বাবু চুপ ক্যা ? পঢ়ে দেও—

রতি। ও বাংলায় ভালো ভালো হিসেব গুলো লিখেছি—

ঘসেটী। আচ্ছা, পড়কে শুনাও—

রতি। (একটু ভেবে)

রতিকান্ত

ট্রেণে চড়ে চলন্ত

হেথা এসে দিলে ক্ষান্ত—

আজ তার প্রাণান্ত

বেয়াড়া দেখি ঘসেটীমলের

টাকা পয়সার হিসেব অত্যন্ত—

ঘসেটী। ক্যা, ক্যা—রূপেয়া পয়সা অন্তমে ক্যা ?

রতি। রূপিয়া পয়সা অন্তমে সদ্‌গতি দেতা হায়।

ঘসেটী। তুমি বেবুঝ আছে—বুদ্ধি কিছু না আছে। অন্তমে রূপেয়া সদ্‌গতি ক্যা দেগা ? সদ্‌গতি দেনে বালা মহাদেওজী হাঁয়—

(সুর করে')

শঙ্কর ভোলানাথ

শঙ্কর ভোলানাথ

শঙ্কর ভোলানাথ—

বাঙ্গালী লোক সব কিরিস্তান হায়—মছ্‌লি খাতা হায় —আণ্ডা খাতা হায়—থু—থু—আর ভজন পূজন কুছ না কর্‌তা হায়—

আচ্ছা, বাঙ্গ্‌লামে হিসাব ঔর নই লিখো—হমারা হিসাব হিন্দী মে চাই—

তুম্‌হারা তন্‌খা তো ঠিক নহি হুয়া—মাহিনা কত লিবে ?

রতি। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) বাবা! বাঁচা গেল—ভুলে দই বড়ার দই আর গরম মশলার হিসেব লিখ্‌তে কবিতা ফেলেছি, সে পাতাই খুলে ফেলেছে! (প্রকাশ্যে) যো আপ দিজিয়ে গা। আমার শুধু চাট্টিখানি খেলেই চলে গা।

ঘসেটী। আচ্ছা, হমারা হিঁয়া রহড়্‌কা ডাল, রোটি আওর দহিবড়া খাওগে—আওর, এক পয়সা কা পাণ, এক পয়সা কা সিগ্‌রেট আর জুতি সিলেনাকে, কাপ্‌ড়া ধোনেকা সাবুন সবসেকে রোজ দেজা আধা পয়সা—টৌটল আড়াই পয়সা—

একতিশ রোজমে মাহিনা—জোড়ো কত হ'ল ?—

রতি। (স্বগতঃ) বাবা! আড়াই পয়সা into thirtyone মুখে মুখে গুণ করা শক্ত!

ঘসেটী। ক্যা—কেতনা হুয়া ? একত্তিক দুনা বাষট্টি সাড়ে পন্দ্র আনা। আওর একতিশ আধেলা সাড়ে পন্দ্র আধেলা—হ'লনা ? আচ্ছা, পূরা করুদেগা, এক রূপেয়া

ঘসেটী। হাঁ! আমার ধরম শালা আছে, দেশ-দেশের সন্ন্যাসী সাধু ব্রাহ্মণ সেথা বিশ্রাম করেন। তাঁদের সেবার জন্তে আমার সদাবরত্ খোলা আছে, সাধু সন্ত্ আনেসে চিঠি দেও—দেখো যেন কেউ ভূখা ফেরেনা। হামি স্নান ক'রতে যাচ্ছি—

(সুরে) "শঙ্কর—ভোলানাথ,
শঙ্কর—ভোলানাথ,
শঙ্কর—ভোলানাথ।"

(গমনোদ্যত)

(আবার ফিরে)

হাঁ, ঔর এক কাম আছে—হামি যেদিন দেহাদে, ক্ষেতি গেরস্থিতে ধান, গেঁহু আন্তে যাব—তুমি আমার মহাদেওজীর মন্দিরে যাবে—ফুল-চন্দন চড়হাইবে—সমঝ্ছে—

রতি। হুঁ।—

ঘসেটী। (সুরে) "শঙ্কর—ভোলানাথ
শঙ্কর—ভোলানাথ

(প্রস্থান)

রতি। "কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কতঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই"

এ ঘসেটীমল তো বড় মজার লোক দেখ্ছি। একদিকে আধপয়সার হিসেব করে, অন্তদিকে সন্ন্যেসীদের থাক্বার জন্তে অট্টালিকা ধর্মশালা ক'রে দিয়েছে! আবার সদাব্রত করে' ঘি আটা খাওয়ায়।

এ বড় হৃদয়বান্ লোক, এ নিশ্চয়ই প্রেমিক—ওহো, হো, বুঝেছি, বুঝেছি, এবুঝি কোন চির-বিরহী?

"গলে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গলে দোলে তার বিরহব্যথার মালা।"

(বাইরে দেখে)—ও কারা?

(দুজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

[১ম সন্ন্যাসী মোটা দীর্ঘ, ২য় বেঁটে রোয়ান]

১ম সন্ন্যাসী। জিতা রহো দাতারাম!

রতি। (করজোড়ে) চিঠ্ঠি চাইত?

১ম। হাঁ——

ঘিউ — আধা পৌয়া
চিনি — এক ছটাক
আটা — তিন পৌয়া

[রতিকান্ত লিখ্লে]

২য়। মেরা লিখ্খো—

গৌকা দুধ — পাঁচ পৌয়া
চূড়া — আধাসের
চিনি — আড়াই পৌয়া।

[রতিকান্ত লিখ্লে]

১ম। জিতা রহো দাতারাম।

[১ম ও ২য় সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। ইস্—এতো বড় মজার চাক্রী দেখ্ছি। শুধু দুধ, ঘি, আটা লেখো আর দাতারাম বনে' যাও!

ওগো আমার অচেনা অদেখা হৃদয় অধিষ্ঠাত্রী, তোমায় আমায় মিলন হ'লে, যদি এম্নি ধারা এক একখানা চিরকুট্ জুটত!—হাঁ, আমি আর একটী জিনিস চাইতাম—স্ফটিক পেয়ালাভরা এক চুমুক দ্রাক্ষারস, তোমার দাড়িম্বাভ অধরে তুলে ধর্তাম—

(অনেক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

তৃতীয় সন্ন্যাসী। জিতা রহো ভকতরাম!

রতি। (একটু বিরক্ত ভাবে)

আজ্ঞে আপনার ভক্তরাম এখন শঙ্কর ভোলানাথের নাম করে' স্নান করুছেন। কি সেবা হবে?

৩য় সন্ন্যাসী। আজ মেরা উপবাস হায়—খালি তিন পাও দুধ, চিনি, আওর দু' দর্জন কেলা!

রতি। বেশ—(লিখলে)

(তৃতীয় সন্ন্যাসীর চিঠি নিয়ে প্রস্থান)

(চতুর্থ সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

৪র্থ সন্ন্যাসী। জয় হো রে সেবক!

রতি। বেশ বাবা বেশ! আপনা থেকেই ভক্ত সেবক বনে' গেলাম—আপনার কি চাই?—

৪র্থ সন্ন্যাসী। গুড় — এক পোয়া

সাতু — পাঁচ পোয়া

ঘিউ — এক ছটাক

[রতিকান্ত লিখলে]

৪র্থ সন্ন্যাসী। (চিঠি নিয়ে)—শির লেয়াও?

রতি। অ্যাঃ শির? আমার মাথা! কেন বাবা?

৪র্থ। চরণ-মৃত্তিকা দে দেগা—

রতি। না বাপু, আমার ও শ্রীচরণ মৃত্তিকায় দরকার নেই—আমি ঢের liberal.

৪র্থ। (সহাস্যে) আচ্ছা আচ্ছা, জিতা রহ সেবক—

[৪র্থ সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। ও বাবা আরও আস্‌ছে যে—নাগো ঘসেঠী মল, এ চাক্‌রী বজায় রাখা তো শক্ত! রাত্তিরে মশা ছারপোকার কামড়, আর দিনে আটা ছাতু গুড়—প্রাণের সূক্ষ্ম অনুভূতি যে লোপ পেয়ে যাবে! জীবন কাব্যের দফায় দফায় সেবক ভক্ত দাতারাম হ'তে হবে?

[পঞ্চম সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

৫ম সন্ন্যাসী। সেবা হোষায়—পুন্ করুনে বালে—

রতি। আটা? ছাতু? না চিঁড়ে?

৫ম। চাওল দেদে—অন্ন খায় গা।

চাওল—তিনপোয়া

ডাল—আধাসের

ঘিউ—একপাও—

[চিঠিনিয়ে ৫ম সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। নাঃ, এইবেলা খাতাপত্র গুটিয়ে দোরটা বন্ধ করি—দেখি ঘোটকীটার চানার ব্যবস্থা, যা চিঁ চিঁ ডাক ছাড়ছে!—

[প্রস্থান]

—চতুর্থ দৃশ্য—

(বড়বাবুর বাড়ী। বড়বাবুর গৃহিনী কাসুন্দির হাঁড়িতে নেক্‌ড়া জড়াচ্ছিলেন)

বড়গিন্নী। না বাপু, আমি আর পারিনা। মেয়ের ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার হাড়মাস কালী হ'য়ে গেল — শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল। মিন্সেকে কিচ্ছু বলবার জো নেই!— দু'কথা বল্‌তে গেলেই অম্‌নি বড় সাহেবের কাছে চলে যাবেন, পোড়ার মুখো বড় সায়েব কি যাদুই যে করেছে।

খুকি, ও খুকি— না বাপু, আমি আর পারিনা। কি যে বই নিয়ে গিল্‌ছেন—তারচেয়ে বড়ী দিতে শেখ্, কাসুন্দি সাম্‌লাতে শেখ— খুকি ও খুকি—

খুকি। (অন্যত্র থেকে) এই যে, যাই মা—

বড়গিন্নি। কি হচ্ছে বাপু তোর? তারচেয়ে—

খুকি। (দৌড়ে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে)— খুব একখানা ভাল বই পড়্‌ছিলাম, তুমি শুন্‌বে?

বড়গিন্নি। না বাপু আমার এখন রামায়ন মহাভারত শোন্‌বার সময় নেই — আমি বলি কি, ও সব পড়া ছেড়ে যদি এই কাসুন্দি কর্‌তে শিখ্‌তিস্— তানা বড়বাবু বাবা— আদুরে মেয়ে পাঠশালে পড়ে' বিবি হবে—

খুকি। (হাতপেতে) আমায় একটু কাসুন্দি দাও না মা—

বড়গিন্নি। ওমা কি হবে গো? কাসুন্দি কি যখন তখন খেতে আছে? এতো আর ছড়া তেঁতুল, গুঁড় আঁব কি তেল-আঁব নয়,—আর মোরব্বাও নয়—এযে কাসুন্দি—

খুকি। কাসুন্দি ত' কি হয়েছে? আচার ত'। তুমি দেবেনা তাই বল—(একটু অভিমান)

বড়গিন্নী। কাসুন্দি আবার আচার হল? আচার ত' গেল তেল আঁব, ছড়া তেঁতুল,— কাসুন্দি ত' কাসুন্দি। এসবও শিখ্‌লিনে, তবে আর কি পড়্‌ছিস্?

ইলিশ মাছের পেটে বামুণে পৈতে, জ্যোঠির ল্যাজ।—

চাঁদের ভেতর চরকা বুড়ী, ছাঁচতলায় পেঁচো,—তোদের মত বেলায় আমরা সব জান্‌তুম।—

কর্ত্তাকে অত বলি, বড়বাবু, বাড়ীতে ওই একটা মেয়ে বই আর ছেলেপুলে নেই, ওকে আমি সব শেখাই— তা' না মেয়ে ইস্কুলে পড়ুক—কি ছাই পড়্‌ছিস্‌?—

খুকি। (হাতের বই দেখিয়ে) এখানা? এখানা তো বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই—কেমন সব কবিতা, (একটু ভেবে)—'শোলোক' আছে—

বড়গিন্নী। 'শোলোক' আছে? কই পড় দেখি শুনি—

(কন্যার প্রতি সাহঙ্কারে তাকালে)

খুকি। "সে যে কাছে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী—"

বড়গিন্নী। (স্বগতঃ গালে হাত দিয়ে)—

ওমা কি হবে গো?—মেয়ে এই সব 'কাছে এসে বসা' পড়তে শিখেছে—কর্ত্তাকে যত বলি! সারাদিন বড় সায়েবের কাছে কাটিয়ে সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বল্‌লে বলেন, খুকী এখনও ছেলে মানুষ,—ওর বিয়ে দিয়ে কি হবে!

খুকি। "এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে
সে যে, স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিনী।

কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!"

বড়গিন্নী। ষাট্‌ ষাট্‌! হতভাগিনী হ'তে যাবি কেন? হতভাগা হোক তোর শত্তুররা—ষাট্‌ ষাট্‌!

আমি আজই দেখছি—নিজে যদি তোর পাত্তর ঠিক না করে' বাড়ী ফেরে তো জল গ্রহণ করবনা। এই খেনে আত্মঘাতী হ'য়ে মরব।—

খুকি। কি যে তুমি ছাই বল মাথামুণ্ডু—এসব কবিতা তুমি কিছু বোঝ না—আমারই ঝকমারি!

(ক্রোধে বই বন্ধ করলে)

গিন্নী। না বাপু আমার ওসব শোলোক বুঝে দরকার নেই।—ঝাঁটা গাছটা দিয়ে উঠোনটা একটু ঝাঁড়্‌ দাও দেখি, আমি কাসুন্দির হাঁড়ি কটা তুলে ফেলি।

(খুকি গোঁজ হ'য়ে বসে রইল)

গিন্নী। না বাপু, মেয়ের আবার রাগ হ'ল। আমারই ঘাট হয়েছে। কিন্তু কাজকর্ম্ম তো শিখ্‌তে হবে, শ্বশুরবাড়ীতে কুট্‌না কোটা, পাণ সাজা এগুলোও ত' করতে হবে? বলে মেয়ে মানুষ হ'ল সংসারের লক্ষ্মী!

(খুকি উঠে ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাঁট্‌ দিতে লাগ্‌ল)

গিন্নী। থাম বাপু, একটু আস্তে—আমি কাসুন্দির হাঁড়ি গুলো তুলে' ফেলি।—বড়বাবুর আপিস থেকে আসবার সময় হ'ল—বামুণঠাকুর এখনও এলনা, তুই ইষ্টোভ্‌টা জ্বেলেদিবি, চায়ের জল চড়াব। ওসব কলকব্জা আমি ধরাতে পারি না!

(খুকি থাম্‌ল)

খুকি। (হেসে ফেলে)—এত সব জানো, আর ষ্টোভ্‌ ধরাতে শিখ্‌তে পার না?—

গিন্নী। হ্যাঁ—আমি আবার বুড়ো বয়সে ওই সব শিখ্‌তে যাব। আমি বড়বাবুর পরিবার, আমার ওসবে দরকার কি? ওসব শিখ্‌লে লোকে বলবে কি?—হ্যাঁ, হতুম হেঁজি পেঁজি!

নে, মা নে, ঝাঁট্‌টা দিতে শেখ্‌দেখি।

(হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে প্রস্থান)

খুকি। (ঝাঁট্‌ দিতে লাগ্‌ল আর অন্যমনস্ক হয়ে আবৃত্তি ক'রতে লাগ্‌ল)—

"আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা।" ইত্যাদি বারবার।

[রতিকান্তের আবদা খাতা পত্র নিয়ে প্রবেশ]

রতি। "কেন রে বিধাতা কঠিন হেন—
চারি ধারে মোর পাষাণ কেন ?"—

খুকি। (চমকে লজ্জায় থমকে দাঁড়াল)—বাঃ—

রতি। হেঁ, হে আমি অন্যমনস্ক ভাবে উঠোনে ঢুকে পড়েছি—দরজাটা খোলা ছিল কিনা, আর আপনি কবিতা পড়্ছিলেন—

খুকি। আপনি কে ?—

রতি। আমি রতিকান্ত—ঘসেটীমলের কাছ থেকে এসেছি।—

খুকি। মাকে ডেকে দিচ্ছি—

(গমনোদ্যত)

রতি। আমি সুদের হিসাব দেব—আপনাকে দিলেই হবে—ও, আপনার লজ্জা কর্ছে বুঝি ? তা' বেশ তো পেছন ফিরে দাঁড়ান, না হয় আমি পেছন ফিরে দাঁড়াই—

(ফলে উভয়েই পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল)

রতি। (খাতার ভিতর থেকে কাগজ বার করে')

এই—এমাসে ইটের তিনশ' টাকার সুদ হ'য়েছে সাত টাকা তিন পয়সা। এই নিন্ এই কাগজ খানা বড়বাবুকে দেবেন। (কাঁধের উপর দিয়ে কাগজখানা পেছনে তুলে ধর্লে) বড়বাবুকেই দিয়ে যেতে পার্তুম্ কিন্তু তাঁর কাছে—কারণ তাঁর কাছে—হেঁ, হেঁ বুঝ্লেন কি না—(ফিরে তাকাল)

(খুকি ঝাঁটা ফেলে দৌড়ে পালাল)

রতি। বাঃ—চলে গেল !

কি সুন্দর দামিনীর মত চলে গেল, কিন্তু কিচ্ছু ত' বলে গেল না ! ঘসেটীমলের কাগজ খানাও দেওয়া হ'লনা।

ওকি আর আস্বেনা ? এসে কি আর এখানটা ঝাঁট্ দেবেনা ?

বড়গিন্নী। (ভেতরথেকে) আজ মেড়ো বুঝি নিজে আসেনি—একজন বাঙ্গালী পাঠিয়েছে ?—[বড়গিন্নীর ও খুকির প্রবেশ]

বড়গিন্নী। তুমি বাছা ঘসেটীমলের কাছে থেকে এয়েছ ? তুমি ত' বাঙ্গালীর ছেলে দেখ্ছি, মেড়োর কাছে কেন ?—

রতি। আজ্ঞে আমি তার কাছে চাক্রী করি—আপনাদের কাছে তাগাদায় এসেছি।—

বড়গিন্নী। ওমা, তুমি মেড়োর কাছে চাক্‌রী কর ? কেন, তুমি লেখাপড়া জাননা ?

রতি। (আস্তে আস্তে বসে পড়্ল)—আজ্ঞে আমি বি,এ, অবধি পড়েছি—

বড়গিন্নী। আহা, মাটীতে বস্‌ছ কেন ?—ওরে ও খুকি একটা আসন এনে দে। বাঙ্গালীর ছেলে মাটীতে বস্‌তে আছে, হাঁ, হ'ত মেড়ো ত'—

(খুকি আসন নিয়ে পেতে দিলে তারপরে মায়ের আঁচলধরে দাঁড়ালে)

রতি। (স্বগতঃ) যাক্, আবার তা' হ'লে দেখা হ'ল ! ওগো জন্ম জন্ম যেন তোমায় আমি দেখ্তে পাই।

খুকি। (স্বগতঃ) এমন রাগ কর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, খালি আমায় জ্যাব্ জ্যাব্ করে' দেখ্ছে, আমি যেন চিড়িয়াখানা !—

বড়গিন্নী। তা' তুমি বি-এ অবধি পড়েছ—সে তো অনেক পড়া। আপিসে চাক্‌রী কর্‌তে পারনা—আমাদের কর্ত্তাই ত' হ'ল বড়বাবু।

রতি। আমি প্রথম দিন এসেই ত' আপিসে গিয়েছিলুম, মা। কিন্তু, চাক্‌রী হ'ল না মা।

বড়গিন্নী। (স্বগতঃ) আহা, ছেলেটী বেশ, কী মিষ্টি মা-মা করে।

(প্রকাশ্যে) তা', তুমি এদেশে এলে কেন ? তুমি কাদের ছেলে ?

রতি। আমি বিবাগী হ'য়ে এদেশে চলে এসেছিলুম মা—তারপর পেটের জ্বালায় মাড়োয়ারীর তাঁবেদার হ'য়েছি !

বড়গিন্নী। বিবাগী হ'য়েছিলে ? বাছারে !

রতি। হাঁ, মা। আমি বি-এ পাশ কর্‌তে পারিনি।

বাবা বললেন, আমার মুখ দেখবেন না, তাই আমি বিবাগী হ'য়ে গেলাম!

বড়গিন্নী। ষাট্, ষাট্! পুরুষ মানুষ কিনা, তাই এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে বকেছে!

খুকি। (স্বগতঃ) ওমা সন্ন্যেসী হ'য়েছিল বুঝি—বড্ড কষ্ট পেয়েছে ত'! দেখে আমার এমন মায়া হচ্ছে। না, ওর উপর রাগ কর্‌বনা—দেখুকগে, ড্যাব্ ড্যাব্ করে'!

রতি। (কাগজ বার করে')—এই হিসেবটা—

বড়গিন্নী। বড়বাবু এলেন বলে', একটু বসনা। আমি তাঁকে বল্‌ব এখন, তোমায় আপিসে ঢুকিয়ে নেবেন!—

রতি। বড়বাবু এক্ষুনি আস্‌বেন নাকি?—তবে আমি যাই মা। তাঁর সঙ্গে—তাঁর—বড়বাবুর আপিসে এখন চাকরী খালি নেই মা!—

বড়গিন্নী। ইস্—খালি নেই বৈকি—খালি হ'তেই হবে। আমি তোমায় চাকরী দেওয়াবই!—রোসনা—বড়বাবু এল বলে'!

রতি। (চঞ্চল হ'য়ে)—না মা আমি এখন যাই—অনেক কাজ। সুদের টাকাটা রেখে দেবেন, কাল এসে নিয়ে যাব।

(প্রস্থান)

বড়গিন্নী। ছেলেটা বেশ, না রে খুকি? দেখ্‌লে মায়া হয়।—মেড়োর কাছে চাকরী কর্‌ছে! তবে আমাদের কর্ত্তা বড়বাবু রয়েছেন কি ক'র্‌তে। আসুক আজ—বাড়ীতে—

খুকি। ওইযে বাবা আস্‌ছেন!—বাবা, বাবা!

(নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটতে ছুটতে বাবাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌তে গেল)

(বড়গিন্নীও এগিয়ে গেলেন)

—পঞ্চম দৃশ্য

[ঘসেটী মলের অফিস—ঘসেটী মল ও ভূপেন]

ঘসেটী। হামি রতিকান্তকে ছাড়্‌বেনা—এ পাগলা বাবু আছে—হামি পাগ্‌লা মেড়ুয়া আছে। প্লেগে হামার ছেলিয়া মেইয়া লেড়্‌কীবাচ্ছা সোব মরে গেলো! হামি রতিকান্তকে হমার ছেলিয়া কর্‌বে—

ভূপেন। হঃ—তা' ক্যামনে হইব? উহার গর্ভধারিণী আজ দশ দিন অনাহারে রইছেন—উহার ভগ্নীরে আমি বিয়া করুম্। সে অবধি কাঁন্‌ছে! আমি কত তাশ খুইর‍্যা খুইর‍্যা উহারে পাইছি—ছাড়ুম ক্যান্?

ঘসেটী। নেহি নেহি—রতিকান্ত হামার ছেলিয়া হ'য়ে গেছে, উটাকে তুমি নিয়ে যাইলে হমি মরে যাবে! হমার বাড়ী মোকাম জমি জিরাত ইষ্টেট্ ব্যাঙ্কের সোর রূপেয়া উনির নামে লিখে দিয়েছে—এই দেখো।

(দলিল দেখাইল)

ভূপেন। আরে, আরে—এযে সত্যি দেখি! আঁঃ—রতিটার কপাল বড় ভালো। কাব্যি কইর‍্যা কইর‍্যা লাখ্‌টাকা পাইয়ে গেল!—আর আমি এত সংস্কৃত পড়্‌লাম, পরীক্ষা পাশ কর্‌লাম! আহা, হা যদি fail কইর‍্যা আমিও বিবাগী হইতাম রে! যাক্ কবি লোকের বরাত চিরকালটাই ভালো! ভালোই হইছে!

কিন্তু ঘসেটীমল যে রতিরে ছাড়্‌বেনা কয়? তা ক্যাম্‌নে হয়? আমি যে জগত্তারিণীর কাছে পণ কর্‌ছি নিশ্চয় রতিরে বাড়ী ফিরাইব!

ঘসেটী। বোল ভূপেন বাবু, তুমি কি আমার জান্ লিবে?

ভূপেন। কিন্তু আমি যে উহারে বাড়ী নিয়ে যাইবই, নইলে উহার মা মারা যাবে, ভগ্নী কাঁইন্দ্যা রোগা হইয়া যাইবে—

ঘসেটী। (ঘাড়নেড়ে) লেকিন্ হমি ন ছোড়্‌বে, হমি ন ছোড়্‌বে, হমার সাধুর জন্তে চিঠি কে লিখ্‌বে, এ গড়্‌গড়া কে লিয়ে যাবে? হমার সোব লোক মরে গেলো, এটাকে ভি তুমি ছিনিয়ে লিবে? না, না ভূপেন বাবু—

ভূপেন। হঃ—এত বড় মুস্কিল হইল দেখি।

হঃ—আমি সমঝায়ে দিই। লক্ষটাকা বাড়ী ষ্টেট্

দিবেন দিয়া স্থান, কিন্তু এ কেমন পাগলের মত কথা কন? উহার পিতা মাতা ভগ্নী উহার অদর্শনে বড় কষ্টে আছেন। আপনি দেখি রতিকান্তের কাব্যির চেয়ে বেশী পাগলামি করেন।

(রতিকান্তের প্রবেশ)

রতিকান্ত। আরে, ভূপেন কোথা থেকে এলে!

ভূপেন। হঃ, আমুম্ না? এমন কইর‍্যা বিবাগী হ'য়্যা মা বোন্‌রে কাঁদাইতে আছে?

রতি। বিবাগী আরে কোথায় হ'য়েছি? কিন্তু এবার ভাই সত্যি সত্যি বিবাগী হ'ব।

ভূপেন। ক্যান্? তোমার তো আর ভাবনা নাই। ঘসেটীমল বাবু তোমায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়্যা দিছেন।

রতি। কি হবে ভাই সম্পত্তিতে? কি হ'বে ভাই টাকায়? (দীর্ঘশ্বাস) মায়ের জন্যে বাবার জন্যে জগত্তারিণীর জন্যে মন কেমন কর্‌ছে বটে কিন্তু আমার বিবাগী হওয়া ছাড়া উপায় নেই!

ভূপেন। ক্যান্? এতো টাকা পাইছ, একবার শুধু মা-বাবার সহিত দেখা কইর‍্যা হেথায় গ্যাঁট্ হইয়া বস্‌বে—তারপর বইস্যা বইস্যা কাব্যি কর্‌বে—কেমন সুন্দরী রূপবতী কন্যা বিবাহ কর্‌বে—তোদের কবি মাইন্‌ষের তাই জোর বরাত—তুই দ্রাড়িম্বাভ অধরে দ্রাক্ষারস না কি কইতিস্ না?

রতি। সে কথা ভুলে যাও—ওসব স্বপ্নের কথা! এখানে বড়বাবুর কন্যা খুকিকে যদি বিয়ে করতে পেতুম ত' কিছু চাইতাম না—

ভূপেন। আরে, তুমি এত টাকার মালিক আর এম্‌নি সাধাসিধা মেইয়্যা বিয়া করবে? দ্রাড়িম্বাভ অধর—

রতি। ডালিমের মত অধর কেন? খুকুরাণী তার চেয়ে সুন্দর। প্রথম যেদিন তাকে দেখেছিলাম—ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি কর্‌ছিলেন, আমায় দেখে লজ্জায় দামিনীর মত পালালেন—আহা, হা!

ভূপেন। তা' বেশ তো তুই উহারেই বিয়া কর্, এত টাকার মালিক, ভাব্‌না কি!

রতি। কিন্তু ভাই বড়বাবুর সাম্‌নে যেতে আমার ভয় করে। বিবাগী হ'য়ে পেটের জ্বালায় আপিসে চাক্‌রী খুঁজতে গিয়েছিলাম, তারপরে বড়বাবুকে বড় হৃদয়বান্ লোক মনে হ'ল, তাই কাব্যিক উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলে' ফেলেছিলাম। "আপনি প্রেমিক"! বড়বাবু ক্রোধান্বিত হ'য়ে গেলেন, সেই অবধি আমি তাঁর সামনে যাইনা।

ভূপেন। হঃ, এই কথা! আমি ঠিক কইর‍্যা দিই—আমার মাথায় এক বুদ্ধি আস্‌ছে!

ঘসেটীমলবাবু, রতিকান্তের এখানে থাকাও হইতে পারে, যদি আপনি এক কাজ করেন—

ঘসেটী। বলিয়ে বলিয়ে—জরুর কর্‌ব—লেকিন রতি কান্তকে লিয়ে যেওনা—

ভূপেন। দেখুন, আপনাদের বড়বাবুর মেইয়্যা খুকির সঙ্গে রতিকান্তের বিবাহ দিয়া দ্যান—ক্যামন, পারবেন না।

ঘসেটী। জরুর! জরুর! এ আর কি শক্ত কাম আছে? আমি তাঁর বেটার টাকা লইবে না—তিনি জরুর আমার ছেলিয়ার সঙ্গে মেইয়্যার বিয়া দিবেন। আমি এখনই তাঁর কাছে যাই—

(গমনোদ্যত)

(বড়বাবুর প্রবেশ)

আরে আরে বড়বাবুর এসে গিলেন? হামি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।—

বড়বাবু। তা'—হাঁ,—দেখুন ঘসেটীমলবাবু,—আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাদের গিন্নী—বুঝলেন কিনা—আপনার কাছে বুঝি রতি কান্ত বলে' একটী বাঙ্গালী ছোকরা কাজ করে?—

গিন্নী বল্‌লেন, তাকে আমার আপিসে ঢুকিয়ে নিতে।—আর আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে—গিন্নী নিজে এসেছেন, বাইরে গাড়ীতে খুকি আর তিনি আছেন—বুঝলেন কিনা—

ভূপেন। হঃ—আপনার আপিসে আর রতিকান্তের ঢোক্‌বার লাগবেনা—সে এখন ঘসেটীমলের সম্পত্তির মালিক।

বড়বাবু। অ্যাঁ তাই নাকি। তবে তো, তবে তো—গিন্নী এসেছেন তাকে জামাই করবেন বলে'—তবে তো, তবে তো—

(রতিকান্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল)

ভূপেন। তা' বেশতো, ত' বেশতো!—কই কোথায় তিনি?—

(ভূপেন বাইরে গেল।)

ঘসেটী। হামি তো ওই জন্তই আপনার বাড়ী যাচ্ছিলাম—হামার ছেলিয়া রতিকান্ত তো খুকিকেই বিয়া ক'রতে চায়—তাই ত' আমি আশীর্ব্বাদ করতে যাচ্ছিলাম।—

বড়বাবু। অাঁ তাই নাকি! তাই নাকি!—তবে তো সব ভালোই হ'ল।

(বড়গিন্নী, খুকি ও ভূপেনের প্রবেশ)

ঘসেটী। (বড়গিন্নীর প্রতি) আইয়ে মাইজী, আইয়ে। বড় যে আমায় 'মেড়ো, মেড়ো' বোলেন—আজ মেড়ুয়ার ছেলিয়ার সঙ্গে খুকির বিয়া দিবে?

বড়গিন্নী। (সাহাস্যে) তা' মেড়োকে মেড়ো বল্‌ব না তো কি সাহেব বলব—হ'লই বা লাখ্‌পতি! তবু মেড়ো তো—আমি বড়বাবুর পরিবার—মেড়োকে মেড়োই বলি—

ঘসেটী। হাঃ, হা, হা, হা—

ভূপেন। তা' বড়বাবু আপনি রতিকান্তকে আশীর্ব্বাদ করুন, আর ঘসেটীমলবাবু আপনিই খুকিকে আশীর্ব্বাদ করুন—

বড়গিন্নী। রতিকান্তকে আমিও আজই আশীর্ব্বাদ করব…আহা, কেমন আমায় মা-মা করে—

(বড়বাবু আর বড়গিন্নী রতিকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলেন)

(ঘসেটীমল খুকির মাথায় হাত দিয়ে)

ঘসেটী। ক্যা খুব্‌সুরৎ—বোর্‌ পছন্দ্‌ হইল।

খুকি। ধ্যেৎ!

ঘসেটী। আচ্ছা আচ্ছা,

শঙ্কর, ভোলানাথ
শঙ্কর, ভোলানাথ,
শঙ্কর, ভোলানাথ

(যবনিকা)

পাটলিপুত্র

—শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

পাটলিপুত্র নগরে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার কল্পে বহির্গত হইয়া নালন্দা হইতে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পাটলি অধিবাসিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ফল পুষ্প ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রাদির দ্বারা বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের পূজা অর্চ্চনা করেন। ভগবান বুদ্ধের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারাদি শেষ হইলে সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ ও শীলের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতা মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

পালি বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাটলিপুত্রের উল্লেখ।

পাটলিপুত্রের কুক্কুটারাম বিহারে, নারদ নামক জনৈক ভিক্ষু বাস করিতেন। তৎকালে মন্ত নামক এক রাজার রাণী ভদ্রার মৃত্যু হয়। রাজা রাণীর মৃত্যু শোকে অধীর হইয়া পড়েন। রাজা তাঁহার অর্থসচিবকে রাণীর মৃত দেহ যাহাতে দীর্ঘকাল দেখিতে পান এই উদ্দেশ্যে তৈল-পাত্রে ডুবাইয়া রাখিতে আদেশ করেন। অর্থসচিব রাজার শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া, তাঁহাকে নারদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা অর্থসচিবের মতানুসারে নারদের নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ রাজার আগমন বার্ত্তার সঠিক সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে পাঁচটী দুর্ল্লভ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। পাঁচটী ধর্ম্মোপদেশের অর্থ এই —বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, জরা, বিনাশ ও রোগের অবিদ্যমানতা। রাজা এই পাঁচটী অমূল্য উপদেশ বিবরভাবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার অর্থ সচিবকে রাণীর মৃতদেহ সৎকারের আদেশ দেন। সেই সময় হইতেই রাজা কর্ত্তব্যে মনোযোগ করিলেন।

পাটলিপুত্রে কুক্কুটারাম বিহারে ভদ্র নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভদ্র নামক জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু পাটলিপুত্রে কুক্কুটারাম বিহারে অবস্থান করিতেন। "জনৈক ভিক্ষু" মহাথেরো আনন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মহাথেরো আনন্দ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি পুনরায় অব্রহ্মচর্য্য এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে "বৌদ্ধাচার্য্য আনন্দ" জনৈক ভিক্ষুকে তাঁহার প্রশ্নের সঠিক উত্তর সহজ সরল ভাবে প্রদান করিলেন।

চাণক্যের বাল্যজীবনী।

পণ্ডিত চাণক্য তক্ষশিলা বাসী ছিলেন। বাল্যজীবনে তাঁহার পিতৃ বিয়োগের পর তাঁহার মাতার যত্নে তিনি শিক্ষা লাভ করেন! তিনি বাল্যজীবনেই আপন বিদ্যা চর্চ্চার অসামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, তিনি রাজা বা রাজসম্মানে বিভূষিত হইবেন, কিন্তু তাঁহার মাতার অনুরোধে তাঁহার কুকুর দন্ত ভাঙ্গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি কখনও রাজা হইবার আশা করিবেন না। রাজা দানানন্দের রাজত্বকালে পণ্ডিত চাণক্য পাটলিপুত্রে উপনীত হন। ক্রমে রাজপুত্র 'পণ্ডপন্তে'র সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি রাজকুমারকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে প্ররোচন দেন। তিনি রাজকুমার পণ্ডপন্তের জন্য একজন রাজপ্রতিনিধি খুঁজিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করেন। এক সময় মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যগণ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, রাণী গর্ভাবস্থায় পাটলিপুত্র নগরে পলায়ন করেন। উক্ত নগরে উপনীত হইয়া কিছুদিন পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান প্রসব হয়। সদ্যপ্রসূত সন্তান একটী মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপিত হইয়া গোগৃহের পার্শ্বে রক্ষিত হয়। গোরক্ষক বালকটিকে পাইয়া লালনপালন করতঃ আপন বালকগণের সহিত শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার জনৈক শিকারী বন্ধু দুগ্ধ-পোষ্য সন্তানকে অত্যন্ত ভালবাসিত। ঐ শিকারী উক্ত সন্তানটিকে তাহার হস্তে প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর সন্তানটী শিকারীর হস্তে ন্যস্ত হয়। পণ্ডিত চাণক্য এই সন্তানের অদ্ভুত দৈবশক্তি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া শিকারীর নিকট হইতে তাহাকে নিজ আবাসে লইয়া আসেন। তিনি তাহাকে পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত অনেক প্রকার বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ বালকই পরে চন্দ্রগুপ্ত নামে অভিহিত হন।

পরে মৌর্য্যবংশীয় রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সমগ্র জম্বুদ্বীপের নরপতি ছিলেন। খৃঃ পূর্ব্ব ৩২১—২৯৭ সালের মধ্যে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মগধ সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোষালী এবং সুবর্ণগিরি। মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্ব-কালে গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গম স্থলে পাটলিপুত্র নগরে মগধের প্রাচীন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মগধের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গা, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে চম্পানদী এবং পশ্চিমে হিরণ্যবতী ও সোণানদ ছিল। প্রাচীনকালে মগধ অতি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। মৌর্য্য-বংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় হইতে দশ জন রাজা ১৩৭ বৎসর রাজকার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। উক্ত বংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথ পরে মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৩২০ সালে মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মেসিডেনীয় বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আগমন করেন ৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

গুপ্তবংশের রাজত্ব।

শিশুনাগ বংশের পরবর্ত্তী রাজা "মহানন্দী" মগধের রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রাজা মহানন্দীর প্রথমা রাণী শূদ্রাণীর গর্ভে নন্দ বা মহাপদ্ম নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই পরে "রাজকুমার নন্দ" নামে রাজ সিংহাসনে আরোহন করিয়া স্বীয় ক্ষমতা বলে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজণ্যগণের উচ্ছেদ সাধন করেন। মগধাধিপতি মহারাজ মহাপদ্মের আট পুত্র ধারাবাহিকরূপে মগধের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

কুটনীতি বিশারদ পণ্ডিত চাণক্যের নাম ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি সুকৌশলে মহারাজ নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়া মহারাজ মহাপদ্মের স্ত্রী মুরা নামে এক শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্র "চন্দ্রগুপ্তকে" মহাপদ্মের রাজ সিংহাসন প্রদান করেন।

১। মগধের রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠাতা মৌর্য্য বংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার রাজধানী প্রাচীন মধ্য ভারতে সরযূ নদের সঙ্গমস্থলে পাটলীপুত্র নগরে অবস্থিত ছিল। উক্ত নগর সমৃদ্ধশালী প্রদেশ বলিয়া দেশ বিখ্যাত। মগধের রাজ প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বিদেশীয় রাজণ্যগণ ও পরিব্রাজক প্রমুখ ব্যক্তিরা দর্শন করিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। অন্যান্য বিদেশীয় দেশ পর্য্যটকগণ ভারত ভ্রমণে আসিয়া পাটলীপুত্র নগরের প্রাচীন রাজধানীতে গমন করিতেন। তাঁহারা পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইয়া উক্ত রাজপ্রাসাদের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী ও প্রাচ্যশিল্পের কারুকার্য্য পরিদর্শন করিয়া পাটলিপুত্রের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংসা করিতেন।

মৌর্য্য বংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে আরোহন করিয়া চব্বিশ বৎসরকাল রাজত্ব ও রাজ্য শাসন করেন। তিনি তাঁহার রাজপ্রাসাদে ময়ুর সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, ভাগীরথী ও শোনবারি বিধৌত পঞ্চশত সপ্তাতিচূড়া-সমন্বিতা ও চতুষষ্টি তোরণ বিশিষ্ট তাহার রাজধানী ছিল।

তাঁহার রাজ্যের শাসনকার্য্য দর্শন করিয়া অন্যান্য বিদেশীয় রাজণ্যগণ মুগ্ধ হইতেন। পাটলিপুত্র নগরের সুবৃহৎ দুর্গ সংরক্ষিত, প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও মনমুগ্ধকর ছিল। পাটলিপুত্র নগরের লোক সংখ্যা চারি লক্ষ। আবার কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে তাঁহার সমর বিভাগের জন্য ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং ত্রিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য, আট হাজার হস্তী প্রভৃতি উহাদের যাবতীয় খরচা রাজপ্রাসাদ হইতে নির্ব্বাহ হইত। সে সময়ে যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা ছয় লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত" তাঁহার এই সুশিক্ষিত সৈন্যের দ্বারা বিপক্ষের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, প্রাচীন মধ্য ভারতে গঙ্গার পুত্র সরযু নদের সঙ্গমস্থলে পাটলি নামক স্থানে স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহারাজার সমর বিভাগের জন্য তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত ছিল। সৈন্যদের বাসগৃহ রসদ ও জল-যুদ্ধের জন্য রণতরি যানবাহনের জন্য অশ্ব, পদাতিক সৈন্য, হস্তী এবং মহারাজার সমর বিভাগ সুচারুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের রাজ্য শাসনের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে মধ্য ভারতে নগর বা গ্রাম অধিক সংখ্যা ছিল না। তথাপি নগরের ন্যায় অন্যান্য গ্রামগুলি অতি সমৃদ্ধিশালী মনোরম স্থান ছিল। তখনকার দিনে দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না। এবং গ্রামের চতুর্দ্দিকে শস্য, গম শাকসব্জি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য জমিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। উহাতেই দেশের জন সাধারণেরা সংসারিক ধর্ম্ম ও স্ত্রী পুত্র পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

—ক্রমশঃ—

১। Vincent Smith, পৃঃ ১২। বঙ্গানুবাদ শ্রীচারুচন্দ্র বসু। অশোক উপক্রমণিকা ১৩ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-সমালোচনা"

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনা নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই পুরাণো প্রবন্ধ লইয়া ঘাঁটাঘাটি করার দরকার ছিলনা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেলারা তাহা লইয়া এতটা হৈচৈ করে যে প্রবন্ধটিকে যাচাই করিয়া দেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সংসারে gods সৃষ্টির ইহাই হইতেছে অসুবিধা। তাঁহারা মানুষের মনকে, বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; যাহাই বলেন, লোকে তাহাই অভ্রান্ত আপ্তবাক্য ভাবিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে, ভাবিয়া দেখিতেও পাপ মনে করে। ফলে, সংসারে যদিওবা দুই একটি দেবতা লাভ হয়, আর সব মানুষগুলি অধিকাংশই ভেড়া বনিয়া যায়। মোটের উপর খুব বেশী কিছু লাভ হয়না।

প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্য-সমালোচনা' হইলেও সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশী কিছু বলেন নাই। তাঁহার মূল বিষয় ইহতেছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ নির্ণয় করা। কিন্তু মূল বিষয় ইহা হইলেও প্রবন্ধটির প্রায় অর্দ্ধেকই বিভিন্ন উক্তিতে পরিপূর্ণ, যেমন একযায়গায় তিনি দুঃখ করিয়াছেন যে তাঁহার কথা কখনও যথাযথ রিপোর্ট হয়না। (যদিও এই দুঃখ করার অধিকার তাঁহার আছে কি না সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারি, কারণ তিনি নিজেও রিপোর্ট যথাযথ দেননা; ইচ্ছামত বাদ দেন এবং সুবিধামত জোড়াও দেন।) আর একযায়গায় আধুনিকদের লেখার বিরুদ্ধে যে তর্ক উঠিয়াছে সেই তর্কে তাঁর কি স্থান সেই কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"বর্ত্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না হোক আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করিনে। লোকমতের কি মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মত বয়স হয়েছে।" (যদিও এই কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে-লোকমতের উপর রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাকে তিনি আজ ঘৃণা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন, সেই লোকমত যদি বিগ্রহের তলা হইতে সরিয়া যায়, তবে ঠাকুরটি কি মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইবে না?) আর একযায়গায় তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনে শ্রদ্ধার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন, এবং এই শ্রদ্ধার কি কি গুণ সেই কথা বলিতে যাইয়া একটি কথা বলিয়াছেন। লিখিয়াছেন, —"যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেচে। বড় বড় যুদ্ধে যে সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁহারা হারতে হারতেও বলেছেন অমরা জিতেছি, কখনও হারকে স্বীকার করতে চাননি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হ'তে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু যে হেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়।" (তাই যদি হয় তবে আমিও বলি যে, যেহেতু আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, এবং সত্যিই করি, আর কাহাকেও করি বা নাই করি, সেইহেতু যাঁহাদের বিরুদ্ধে এই তর্কযুদ্ধ, তাহাতে আমি সেনাপতি, সুধীজনের কাছে হারিয়া যাইতেছি বলিয়া মনে হইলেও, হারি বা নাই হারি, সেই হারের ভিতর দিয়াই সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করিয়া যাইব। এক যায়গায় রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্বভারতীর সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে সেখানে সকলেই নিজের নিজের মত ব্যক্ত করিবেন, এবং সকলের আলোচনার ফলে সাহিত্যের চিরন্তন নীতিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবেন। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ

হইলেও যে attitude লইয়া তিনি সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির কার্য্যে লাগিয়াছিলেন তাহা একটু অদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন,—"আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন, এমত সেকেলে, পুরোণো, তাহ'লে সেটাকে 'অনিবার্য্য' ব'লে মেনে নিতে রাজি আছি। যে মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন, করুন।" অর্থাৎ আমার যা মত তা যাহাই হউক না কেন, এই সভার বিচারে তার একটুও যায় আসেনা। কিন্তু আপনাদের মত?—হাঁ, তাহা আমার মতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবেন বই কি? প্রবন্ধটিতে এই রূপ নানা কথা আছে, কিন্তু, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে রূপকে বড় করিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, রূপের গৌরব রূপসাহিত্যে।" বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি আবার বিষয়কেই বড় করিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন, "আমাদের নব সাহিত্যের গোড়াতেই যে মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি তার লক্ষ্য মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়, তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।" তাঁর পূর্ব্বের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয়, রূপসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় সাহিত্যের লক্ষ্য হইতেছে পূজা করা, অর্ঘ্য দেওয়া, মন্দির রচনা করা, দেবতার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের মনের ভিতর যে সব বেদনা, যে সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাইনা বলে বাইরে প্রকাশ করতে পারিনা, পূজা দিতে পারিনা, অর্ঘ্য দিতে পারিনা। আমাদের সে সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করিতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন, আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমাদের পূজা সেখানে দেই। বড় বড় জাতি সাহিত্যে বড় বড় পূজার জন্য আমাদের অবকাশ রচনা ক'রে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ ক'রে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে।" ইহাই যদি সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ হয় তবে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য প্রভৃতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য; কারণ উহাতে তিনি আমাদের জন্য অঞ্জলি আনিয়াছেন, মাল্য সাজাইয়াছেন নৈবেদ্য তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক উপরের কোটেশন গুলি পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রতিবাদ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে রূপ ও বিষয় সম্বন্ধে উল্টা কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর আসল কথাটি হইতেছে এই যে,—'রূপ'হীন বিষয়ের সাহিত্যে কোন মূল্য না থাকিলেও যে সে বিষয়কে 'রূপ'বান করিয়া তুলিলেই সাহিত্যে তাহার স্থান ঘটে না, মানুষ যাহাকে "চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে" শুধু তাহাকেই "চিরকালের ভাষায়" প্রকাশ করা উচিত। কথাটা শুনিতে অনেকের কাছেই ভাল লাগিবে। অনেকেই হয়তো বলিবে ইহা হইতে মহৎ ও গভীরতর সাহিত্যিক নীতি আর কি হইতে পারে? কিন্তু মহৎই হউক আর গভীরই হউক, ইহা যে কোন সাহিত্যিক নীতি নয় সে সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ আছে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান প্রবন্ধে রূপ লইয়া কোন কথা তুলেন নাই, ধরিয়া লইয়াছেন যে লেখকরা সকলেই সমান রূপদক্ষ,—ইচ্ছামত নিজেদের বিষয়কে রূপ দিতে পারেন। রূপ উঠাইয়া দিলে তর্কের বিষয় থাকে 'বিষয়'। কি কি বিষয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ ইহার কি উত্তর দেন আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এবং প্রশ্নটি যদি সঙ্গত হয়, তবে তাঁর উত্তরটিও নেহাত অসঙ্গত নয়। কিন্তু কথা হইতেছে, এই প্রশ্ন কেন? কি কি বিষয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে? অদ্ভুত প্রশ্ন বটে! সাহিত্য কি কতগুলি বিষয়ের সমাবেশ যেখানে তাহারা রঙচঙে কাপড় পরিয়া দেখা দেয়? কিংবা বড়লাটের দরবার যেখানে শুধু কতগুলি নাম করা হোমড়া

চোমরা লোকই ঢুকিতে পারে এবং ঢোকার আগে জমকালো দরবারী পোষাক পরিয়া নিতে হয়?

রবীন্দ্রনাথের চেলারা অবশ্য বলিবেন, না না, তা নয়, সাহিত্য হইতেছে কোন মন্দির যেখানে শুধু দেবতাই ঢুকিতে পারে। কিন্তু এমন সাহিত্যের কোন একটি নাম কেহ বলিবেন কি? রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, রামায়ণ। কিন্তু রামায়ণে রাম যদি বা দেবতা, রাবণ কোন দেবতা? কৈকেয়ী, মন্থরা কোন দেবী? সিন্ধু কোন দেব শিশু? অহল্যার কি দরকার? সহস্রাক্ষের কি প্রয়োজন? আমরা যদি মন্দিরে শুধু পূজাই করি, ইহাদিগকে কি করি? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোন মহৎ চরিত্র, কোন পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন কিছু যাতে মানব জীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব।" বাল্মীকি ঠিক কি অনুভব করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিলেন নিশ্চয়ই রামায়ণ পড়িয়া। কিন্তু রামায়ণ কি শুধু মহৎ চরিত্রেই পরিপূর্ণ? শুধু মানব জীবনের তথাকথিত পরম অনুভূতিগুলিই কি সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে? আর কিছুই নয়? যদি মহৎ চরিত্র ও পরম অনুভূতি প্রকাশ করার জন্যই বাল্মীকি ছন্দ পাইয়াছিলেন, তবে কেন তিনি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করাইলেন? বনে বনে ফলমূল ভক্ষণ এবং উর্দ্ধমুখে অনবরত পরম কিছুর ধ্যান,—ইহা হইলেই তো মহৎ চরিত্র ও পরম অনুভূতির একটা পরম কিছু প্রকাশ হইত। কিন্তু এমন যে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী বিশ্বামিত্র তাহারও যে দুই একটা রম্ভা বা মেনকা দেখিয়া ধ্যান ভাঙিয়া যায়,—মানুষের এই দৈন্য কেন বাল্মীকি প্রকাশ করিলেন? কেন তার এই লজ্জা তিনি সঙ্গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায়ো লুকাইয়া রাখিলেন না? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সংসার ধর্ম্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েচেন যাকে তারা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজনের কাছে ব্যক্ত করিবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন।" তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের লজ্জা, তথা সমস্ত মানুষের এই লজ্জা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজনের কাছে ব্যক্ত করা যায়? না গেলে বাল্মীকি ব্যাসদেবেরা করিলেন কেন? তাঁরা আদিগুরু, তাঁরা কি আর ভুল করিতে পারেন? কিংবা তাঁরা সত্যিই ভুল করিয়াছেন? তাহা হইলে সেটা কিসের ভুল? একটা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন সেই ভুল, কিংবা একটা গোপনীয় সত্যকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই ভুল? যাহা হউক, এ সব প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই, কারণ রবীন্দ্রনাথ কখনই স্বীকার করিবেন না যে আদিকবিরা ভুল করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তাই মনে করি, অন্ততঃ এই বিষয়ে! কিন্তু কাহারও ভুল হইয়াছে, নইলে এসব প্রশ্ন উঠিল কি করিয়া? রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষের দৈন্য প্রচার, লজ্জা ঘোষণা প্রভৃতি আদি কবিদের লক্ষ্য ছিল না এবং কোন সত্যিকার সাহিত্যিকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়; অথচ আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা এসবও বাদ দেন নাই। তাহা হইলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল? আদি কবিরাই সত্যিকার কবি নন কিংবা রবীন্দ্রনাথই সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সাময়িক ভুল নীতি প্রচার করিতেছেন? ভুল করিতেছেন যে সত্যিকার সাহিত্যের লক্ষ্য পূজা নয়, মন্দির রচনাও নয়, দেবতার প্রতিষ্ঠাও নয়, মানুষের দৈন্য প্রচারও নয়, লজ্জা ঘোষণাও নয় আবার মাহাত্ম্যপ্রচারও নয়; আর কিছু। সেই কিছু কি তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড় ছবি এঁকেচেন এবং তাতে মানুষকে বড় ক'রে দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েচে।" কথাটা শুনিতে সত্য এবং নিরীহ বলিয়া মনে হয় এবং বাস্তবিক ইহাতে সত্যও আছে; কিন্তু যেহেতু ইহা হইতে সাহিত্য বিষয়ক কোন নীতি সংগ্রহ করিতে গেলে তাহা সাহিত্যিক দুর্নীতি হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে, এবং বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের হাতে ইহা তাহাই হইয়া পড়িয়াছে, সেই হেতু এই ধরণের কথাগুলি একটু যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। কথাটার প্রথম অংশ সকলেই খুব সহজেই মানিয়া লইবে,—"সে-

কালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড় ছবি এঁকে-ছেন।' নিশ্চয়ই আঁকিয়াছেন; এবং ইহাও আমরা মানিয়া লইতে পারি যে তখনকার মানুষ সেই ছবি দেখিয়া নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাইয়াছে। কিন্তু "তাতে মানুষকে বড় ক'রে দেখে"—একথাটির অর্থ? ইহার অর্থ কি এই যে তখনকার মানুষ খুব ছোট ছিল কিন্তু পটে নিজেদের খুব বড় ছবি দেখিয়া তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল? অনেকেই বলিবেন,—তা কেন? তখনকার প্রকাণ্ড বীরত্বদৃপ্ত, প্রাণসম্পদপূর্ণ মানুষগুলোর ভালবাসা, হিংসা ঈর্ষা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, ভোগ, ত্যাগ ইত্যাদি সবই ছিল বড়। কবি সেই সব বড় জিনিষই বড় করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে সেকালের কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথাটি কি ইহাই দাঁড়ায় না যে—সেকালের কবি প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড় ছবি আঁকিয়াছেন এবং তাতে মানুষকে 'সত্য' ক'রে দেখে আনন্দ পেয়েছে? যদি সেকালের কবি মানুষ যত বড় ছিল না তাহার চেয়েও বড় করিয়া আঁকিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে তাঁহারা মিথ্যা আঁকিয়াছেন, সেই মিথ্যা দেখিয়া লোকে যদি উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তবে সে সাহিত্য কি foolদের Paradise নয়? কিন্তু মিথ্যা আঁকিয়াছেন এ কথা ভাবার কোন দরকারই নাই। মানুষকে বড় করিয়া আঁকিতে হইলে, তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইলে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ না করিলেও হইত, তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য ইন্দ্রিয় বিলাস না দেখাইলেও চলিত; কিন্তু তবুও যে আদি কবিরা তাহা দেখাইতে ছাড়িলেন না কেন তাহা আমরা পরে দেখিব।

রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিয়াছেন, "অনেক সময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং বাইরের নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য সেটা মানুষের সভ্যতার অতি পরিণতি, তাতে বিকৃতি আসে এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েচি। অবসাদের সময় কলুষটাই প্রবল হ'য়ে উঠে। আমাদের দেহ প্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত ক'রে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে মুহূর্ত্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্ব্বল হয় তখনই সেগুলি প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়।" রবীন্দ্রনাথের এসব কথা অকাট্য। বায়লজি এবং ব্যাক্টিরিয়লজির দিক হইতে ইহা অতীব সত্য কথা। কিন্তু সাহিত্যপ্রসঙ্গে ইহাদের কি অর্থ? বাঙ্গালীরা যে আজকাল নানারূপ অসুখে ভুগিতেছে, কলেরা বসন্ত যক্ষ্মা ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় হইতেছে, এবং ইহার কারণ যে আমাদের জীর্ণ, রুগ্ন শরীর, যাহা রোগের বীজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠিতেছে না, সেকথা বলিলে রোগের প্রকোপ কিছু কমিতেও হয়তো পারে কিন্তু তাহা হইতে সাহিত্যের কি নীতি সংগ্রহ হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ হয় তো বলিবেন,—ভুল বুঝলে, আমি একটি উপমার সাহায্যে বলতে গিয়েছিলাম যে দৈহিক অবসাদে যেমন রোগের বীজগুলি প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়, তেমনি মানসিক অবসাদে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি গুলিই জেগে ওঠে। বাঙ্গালীর জীবনে এই অবসাদ এসেচে, তাই পথে ঘাটে যত সব দুর্নীতির ছড়াছড়ি দেখছি। ধরিয়া লইলাম, তাই দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের কি আসিয়া গেল? কেহ বলিবেন, সাহিত্যেও সেই দুর্নীতি ঢুকিল। আমি বলিব, তাহাতেই বা কি হইল? জীবনে যদি দুর্নীতি ঢুকিতে পারে, সাহিত্যে ঢুকিবে সে আর আশ্চর্য্য কি? সেই কেহ হয়ত আবার বলিবেন, আশ্চর্য্য কিছুই নয় কিন্তু সাহিত্য নষ্ট হইল। আমি বলিব, মোটেই হইল না, সে সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্যিক লিখিয়া থাকেন। সত্যিকার সাহিত্যিক কাহাকে বলে তাহা আমরা কিছুক্ষণের জন্য আবার চাপা দিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে ধরিয়া লইয়াছেন বাঙ্গালী জীবনে একটা অবসাদ আসিয়াছে, হঠাৎ সেই অবসাদ আসার কি কারণ? কিছুপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের সময়ে এই অবসাদটি ছিল না, হঠাৎ তার পরবর্ত্তী জীবনে ইহা আসিয়া পড়িল কেন? বয়সের হিসাবেই অবসাদ আসা

নিয়ম, কিন্তু এ অবসাদ তো রবীন্দ্রনাথের আসে নাই, আসিয়া পড়িয়াছে বাঙ্গালীর তরুণ জীবনে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলার কারণ? কেহ হয়তো বলিবেন,—কারণ সহজেই অনুমেয়; অত্যধিক ইবসেন শ' হামসুন ইত্যাদি পঠন। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। ইবসেন শ' প্রভৃতি পড়িয়া যদি লোকের মানসিক অবসাদ না ঘটে তবে কী পড়িয়া ঘটিবে? মাথা থাকিলেই তবে মাথার ব্যথা হয়। যে ইবসেন শ'র সাহিত্য একটা তীব্র মানসিকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে যদি মানসিক অবসাদ না আসে তবে আর কিপড়িয়া আসিবে? আর ইহাও একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, —এই রবীন্দ্রনাথের মুখে অবসাদের কথা। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় তিনি যেন বেগবান যৌবনের অধীর আগ্রহ ও অদম্য শক্তিচাঞ্চল্য দেখিয়া মনে মনে দুঃখ পাইতেছেন ও বলিতেছেন,—কি অবসন্ন ওদের মন? নইলে কি ওরা এত কথা বলে, এত আস্ফালন করে? দীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া জীবনের যেসব সিদ্ধান্ত তিনি কুড়াইছেন, তাহা দিতে গেলেও তাহারা যখন নিতে চায়না, তখন আর তাঁর দুঃখের অবধি থাকেনা। সুদীর্ঘ বৎসর ধরিয়া যখন কেহ স্বীয় জ্ঞান গরিমা লইয়া যৌবনের বেগ প্রতিহত করিতে যায়, তার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে চায় এবং তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া যখন অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, তখন সেই অশ্রুবর্ষণের মত ট্রাজিকমেডি পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাই হউক সাহিত্য প্রসঙ্গে এসব অবান্তর কথা। কিন্তু যে কথার উত্তরে ইহা বলিতে হইয়াছিল, তাহাও ছিল অপ্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ কলুষ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যটি ইংরাজী সাহিত্যের নজির দেখাইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরাজী সাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হ'য়েই, নির্লজ্জ হ'য়েই আপনাকে প্রকাশ ক'রেছিল।......তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে, মনে হয়তো হয়েছিল এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে এ জিনিষটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্গ।" কথাটা সত্য কিন্তু আরও একটু বিশদ করিয়া বলিয়া লওয়া দরকার। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পরে ইংরাজী সাহিত্যে কতগুলি বদলোক নাটক লিখিতে আরম্ভ করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা যেমন কোন নীতির বালাই রাখে নাই, সাহিত্যেও তারা তেমনি হুবহু আঁকিয়া গিয়াছে। তাদের ছিল যাকে বলে court life; তারা ছিল কথায় পাকা, ফুসলামি, জুয়াচুরী ধাপ্পাবাজিতে ওস্তাদ। নিজেদের জীবনের কাহিনী সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়া তাহারা আত্মপ্রসাদ পাইয়াছে, বন্ধুদের কাছে বাহবা পাইয়াছে। তাদের প্রতিভা ছিল। Brilliant dialogue এবং Witএ তাদের রচনা সত্যই সরল ও সজীব হইয়া উঠিত। সেজন্য শুধু তখনকার বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পাইবে কেন, এখনকার সেরা লোকদের কাছেও সম্মান পাইতে বাধ্য। যাহা হউক এসব সত্য কথা মানিয়া লইলেও ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ হয়? সিদ্ধান্তটি কি এই যে তখনকার সাহিত্যে যদি এই কলুষটি না থাকিত তাহা হইলেই তাহা অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া পড়িত, এবং যেহেতু উহা রহিয়াছে সেইহেতু উহা অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে? নৈতিক কলুষ বা যদিও না থাকে তাহা হইলেই সে সাহিত্যের কি হানি হয় তাহার নিদর্শনও ইংরাজী সাহিত্যে আছে। কিছুদিন পরে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জেরেমি কলিয়ারের কশাঘাতে নৈতিক কলুষটি ইংরাজী নাটক ছাড়িয়া পলায়ন করে। তারপর হইতে সুনীতির নাট্যকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আগে ছিল নাস্তিক পাপীর উল্লাস এখন হইল ধার্ম্মিকের জয়। আগে ধার্ম্মিকের গ্লানি দেখিয়া লোকে হাসিত এখন কাঁদিতে লাগিল। প্রায় সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া এই চোখের জল পড়িতে লাগিল এবং ধর্ম্ম, নীতি ও মনুষ্যত্বের নাট্যকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা করিয়া কি উৎকৃষ্ট নাটক সৃষ্টি হইল? শেরিডান, গোল্ডস্মিথের নাম করিতে হয় কিন্তু তাহাদের যে কৃতিত্ব তাতো প্রায় সবই সেই পূর্ব্বের যুগের কংগ্রীভ, উইচার্লি, ভ্যানব্রু প্রভৃতির নাটক হইতে কোথাও ধার করা, কোথাও

ওলটপালট করা, কোথাও বা অনুকরণ করা! শেরিডান, গোল্ডস্মিথকে যেজন্য প্রশংসা করিতে হয় সেজন্য তো তাহাদিগকে আরও বেশী প্রশংসা করিতে হয়? তবে কংগ্রীভ ইত্যাদির চাইতে ইহারা সামাজিক নীতিকে অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। কিন্তু তাই বলিয়াই কি ইহাদের প্রহসনগুলি উচ্চশ্রেণীর নাটকে পরিণত হইল? অথচ এলিজাবেথের যুগে তো নীতির কোন কঠিন বাঁধন ছিলনা, সেযুগে উৎকৃষ্ট নাটক সৃষ্টি সম্ভব হইল কি করিয়া? আসল কথা হইতেছে সামাজিক নীতিই হউক কিংবা মানুষের চরিত্রের চিরন্তন নীতিগুলিই হউক, তাহাদিগকে জীবনে মানিয়া লওয়া এবং বাছিয়া বাছিয়া সাহিত্যে ফুটাইয়া তোলার সঙ্গে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির কোন সম্বন্ধই নাই। ইংরাজী সাহিত্যে পর পর দুইটি যুগে নীতিকে উড়াইয়া দিয়াও কেহ উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই আবার নীতিকে মানিয়া লইয়াও পারে নাই। অথচ যে বিষয়দৃষ্টি হইতেছে সাহিত্যসৃষ্টির প্রাণ, সেই জিনিষটি ছিল বলিয়াই, রীতি বা নীতি সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়াও এলিজাবেথের যুগে লোকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে! এই বিস্ময় দৃষ্টির অর্থ আমরা পরে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ফরাশী বিপ্লবের সময়ে ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন, প্রচলিত সমাজ-নীতি, প্রচলিত ধর্ম্ম-নীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন।" সুতরাং তাহাদের কাব্যের জাহান্নমে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোথায় গেল? রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল।" অদ্ভুত কাণ্ড! ইহার কারণ? রবীন্দ্রনাথ কারণ দেখাইয়াছেন,—"মানুষের মনকে কর্ম্মকে মোহমুক্ত ক'রে পূর্ণতা দান করার জন্যে তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহা স্বীকার করিলেন কি করিয়া? প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্ম্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করিয়াও সাহিত্যে তবে লোকে নিস্কৃতি পাইতে পারে? এবং সে আঘাতের অর্থ মানুষের মনকে মোহমুক্ত করাও হইতে পারে? বায়রণের মত লম্পট, শেলীর মত অস্থিরচিত্ত প্রেমিকও তবে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে? তবে ইবসেন শ'ই বা কি দোষ করিল? পুরোণো প্রেমের পাঁচালি প্রভৃতি যে সব মোহ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল সেই সব মোহই তো তাঁহারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন! জীবনের খাঁজে খাঁজে সে-সব মিথ্যা ভরাভর্ত্তি হইয়া ছিল তাহাই তো তাঁহারা উঠাইয়া ফেলিয়া সেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বায়রণ শেলী প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের ইংরাজ কবিরা যদি মানুষের মনকে মোহমুক্ত করিয়া পূর্ণতা দান করিতে পারেন, তবে সে হিসাবে কি ইহারা আরও বেশী বিশ্বাসভাজন, আরও বেশী শ্রদ্ধাস্পদ নন? অন্ততঃ ইহাদের বিরুদ্ধে তো এ অভিযোগ আনা যাইতে পারেনা যে ব্যক্তিগত জীবনে সমাজের বিরুদ্ধে ইহারা যে পাপ করিয়াছিলেন, আত্মদোষ স্খালনের জন্য সেই পাপ সমাজেরই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া সমাজের উপরেই চাপাইয়া চলিয়াছেন। আরও একটি কথা। শেলী বায়রণ হয়তো অনেকস্থলেই মোহ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সত্য-সন্ধান দিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। বায়রণের কথা ছাড়িয়া দিলাম, তার প্রায় সবই ছিল কপটাচার। কিন্তু শেলীও শুধু যে সত্য-সন্ধান দিতে পারেন নাই, তাই নয়; এক একটি মোহ ঘুচাইয়া তিনি সেইস্থানে আর একটি মোহ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁর Prometheus unbound ভাবিয়া মিলেনিয়ামের সে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, প্রেমের যে বিশ্বজয়ী চালাকি দেখিয়াছেন, তাহা তথাকথিত আইডিয়ালিষ্ট্‌দের কাছে বাহবা পাইলেও একটা মিথ্যা মোহ বই আর কিছুই নয়। এ হিসাবে ইবসেন শ'র সাহিত্যের ইউটিলিটি অনেক বেশী। ইহারা মোহ ঘুচাইয়াছেন, কিন্তু একটা নূতন মোহ আনিয়া মানুষের মনকে পঙ্গু করেন নাই। মোহ মুক্ত উজ্জ্বল সত্যকে অনাবৃতই রাখিয়া গিয়াছেন। যে উজ্জ্বল্যে যাহাদের

চোখের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের মন ও কর্ম্ম দুইই সহজ হইয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক আমরা ইউটিলিটি দেখিয়া সাহিত্য বিচার করিতেছি না। ইবসেন শ'র নাটকে মানুষের মনের অনেক মোহ কাটে, শুধু এই জন্যই যে তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাও বলিতেছিনা; আবার বায়রণ শেলীর কাব্যে মনের মোহ ঘুচেনা বরং নূতন মোহে মন আচ্ছন্ন হইয়া আসে, সুতরাং তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে তাহাও বলিতেছিনা। বলিতেছি শুধু এই যে,—রবীন্দ্রনাথ যে মিথ্যা কল্পিত গুণের জন্য বায়রণ শেলী প্রভৃতি ফরাশীবিপ্লবের ইংরাজ কবিদের প্রশংসা করিয়াছেন, সে গুণের জন্য ইবসেন শ' অনেক বেশী প্রশংসার্হ। আরও একটি কথা এখানে বলিয়া নেওয়া ভাল। কাব্য-সাহিত্য বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভুত। ইহার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য অনেক বিষয়ে নাট্য ও কথা-সাহিত্য হইতে ভিন্ন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাহিত্য বলিতে আমারা শুধু নাট্য ও কথাসাহিত্যই বুঝিব।

যাহা হউক ইউটিলিটি দিয়া সে-সাহিত্য বিচার করা উচিত নয় সেই কথাই এখন দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পড়িয়া কিন্তু মনে হয় যে সামাজিক বা নৈতিক বা জাতীয় উন্নতিবিষয়ক কিছু প্রত্যক্ষ লাভ ছাড়া সাহিত্যের যেন কোন মূল্যই নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরুক ক'রে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি' তা হ'লেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব।" (সুতরাং যে সাহিত্যে যুদ্ধের কোন সাজ-সরঞ্জাম পাওয়া যায় না, কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয় সে বিষয়ে কোন কথা নাই, কোন ইঙ্গিত নাই, সে-সাহিত্য সাহিত্য নয়।) আর এক যায়গায় লিখিয়াছেন,—"যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য্য পাব। যে আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড় শক্তি পেয়েচে, তাকে অবিশ্বাস ক'রে যদি বলি সেটা পুরোণো ফ্যাসন, এখন তার সময় গেছে, তাহলে আমাদের মৃত্যু।" (সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের যে-সব ইংরাজকবি মানুষের মনকে কর্ম্মকে মোহমুক্ত করিয়াছে সেই মহাসংযমী শেলী বায়রণের কাব্য এখ আমাদের পড়া উচিত। সকলেই ডনজুয়ান্ পড়ুন। সেখানে রুষ-তুরস্কের অনেক যুদ্ধের কথা আছে।) আর এক যায়গায় লিখিয়াছেন, "সে সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হ'তে পারতো যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েচে তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। (সুতরাং সে বিষ নষ্ট করিতে হইবে, যেহেতু সমাজের কাছে তিরস্কৃত হইলে, তাহাকে যে সব কিছুর কাছেই তিরস্কৃত হইতে হইবে, বিষতুল্য পরিত্যাজ্য হইতে হইবে, সেবিষয়ে তো নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত।) আর এক যায়গায় লিখিয়াছেন, "মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে সংযমের ভিতর দিয়েই করেন।" (তবে কি আমরা মনে করিব যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতেছে ত্যাগ ও সংযমের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা বা ওইরকম কিছু করা।)

রবীন্দ্রনাথের উপরের মতগুলি শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন, কারণ, শুনিতে পাই এসব মত নাকি তাঁর আগে ছিলনা। অধুনা তাঁর এই সব মত সৃষ্ট হইয়াছে। সে যাহাই হউক, এ-সব মতের উত্তরে একটি প্রশ্ন আছে,—কিছুপূর্ব্বে তাঁর 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হইলে, সন্দীপের মুখে সীতা ও রাবণ সম্বন্ধে কি একটা কথা শুনিয়া তৎকালীন সমাজ নাকি অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন; তখন কি সমাজের কাছে তিরস্কৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁর নিজের মনের মধ্যে ঘোরতর বিষ-সঞ্চার হইয়াছে! তখন তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন,? আর্ট বা সাহিত্য সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছিলেন? তখন যাহাই বলুন এখন যে

কি বলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তিনি বলেন,—"বর্ব্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি।" এই প্রকাশের যে কি সার্থকতা তাহাও তিনি বলিয়াছেন, "অনেক সময় অতি সভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হইতে বর্ব্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে।" অর্থাৎ 'কাজে' লাগাটাই হইতেছে সাহিত্যের চরম সার্থকতা। যাহা 'কাজে' লাগেনা, যাহাদ্বারা মানুষকে ভাল ভাল নীতির কথা শুনান যায়না, দেশ উদ্ধার করা যায় না, পরিত্যক্ত পল্লীর জঙ্গল কাটা যায় না, যুদ্ধ করা যায় না, তাহা কিছুতেই সাহিত্য নয়। সাহিত্যের অতীব মহান আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই আদর্শটিকেই আরও মহান করিয়া রবীন্দ্রনাথ আর এক যায়গায় লিখিয়াছেন,—"সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্ম আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হ'য়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই—তাকে সংসার যাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর ক'রে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা মহৎ থাকে এবং এই আকার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায় ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক্, তার বিনাশ নাই।" রবীন্দ্রনাথের আগের কথা শুনিয়া যদিও বা সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিত, একথার পর আর কোন সন্দেহ থাকিতেই পারেনা। সংসার যাত্রায় জীবনের মধ্যে আগে যে ফাঁকটুকু ছিল, এখন তাহা এই অভিনব সাহিত্য দ্বারা বুজিয়া গেল। মানবের জীবন একটি পরিপূর্ণতা পাইল। মানুষ এখন আকাশে উড়িতে পারিবে, মাছের মত জলে সাঁতার কাটিতে পারিবে, চন্দ্রলোকে বিহার করিতে পারিবে, একডুবে প্রশান্ত মহাসাগর পারি দিতে পারিবে, আরও কত কি পারিবে। ইহাই কি সাহিত্যের আদর্শ? কিন্তু এ আদর্শের একটা অসুবিধা এই হয় যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সে বহুমূল্য কৌটোর কথা বলিয়াছেন তাহাতে শুধু জুলভার্ণের বইগুলি এবং বাংলাভাষার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কতকগুলি বইই রাখিয়া দিতে হয়, শেক্‌স্‌পীয়রকে সেই বহুমূল্য কৌটার মধ্যে রাখা যায় না।

কেন যে যায় না তাহা শেক্‌স্‌পীয়ার নিজেই বলিয়াছেন। হ্যাম্‌লেটের মুখ দিয়া তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন,—The purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is, to hold as 'twere, the mirror up to nature; to show virtue her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the time his form and pressure. নাট্যাভিনয়ের যে উদ্দেশ্য নাট্যরচনারও সেই উদ্দেশ্য। শেক্‌স্‌পীয়ারের সমস্ত নাটকই যখন এই উদ্দেশ্য লইয়া রচিত এবং তাহার উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে ইহাও যখন লোকে স্বীকার করে, তখন শেক্‌স্‌পীয়ার যে রবীন্দ্রনাথের বহুমূল্য কৌটার মধ্যে স্থান পান না তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের এই বহুমূল্য কৌটাটি নিয়ে আর আমরা নাড়াচাড়া করিব না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। তিনি চান এই বিশ্বজীবন যে কেমন করিয়া চলিতেছে তাহারই একটা প্রতিচ্ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে। অনেকেই বলিবেন, কি লাভ? ইহা তো আমরা চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি, পুরাণো জিনিষ আর নূতন করিয়া কি দেখাইবে? তিনি বলিবেন,—না, ঠিক দেখ নাই, জীবনের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছ, চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার সময় পাও নাই। পাইলেও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ নাই, নিজের উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত ছিলে। যদি দেখিতে তবে আমার মতই মুগ্ধ হইতে, বিস্মিত হইতে এবং ছুটিয়া যাইতে সেই দৃশ্য আর কাহাকেও দেখাইতে; আমারই মত নাটক বা নভেলে সেই দৃশ্য আঁকিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতে। যদি কেহ বলেন,—তোমারই মত মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি নিয়া আমিও এই বিশ্বের

জীবন প্রবাহ দেখিয়াছি, তাহা হইলে শেক্‌স্‌পীয়ারের বেশী কিছু বলিবার থাকে না। তিনি শুধু বলিবেন,—তোমার কাছে আমার সাহিত্যের মূল্য খুব বেশী কিছু নাই, তবুও তুমি যখন জীবনকে সত্যি করিয়াই দেখিয়াছ, তখন আমার এই ছবিখানি এতই নিখুঁত হইয়াছে যে ইহা তাহার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় দেখিয়া তুমি আর এক ধরণের বিস্ময়ানন্দ লাভ করিবে। পথে চলিতে চলিতে তুমি যদি কাহারও মুখে দূরবাসী তোমার প্রিয় কাহারও গলার শব্দ শুনিতে পাও, তবে কি তুমি বিস্ময়ানন্দে চমকিয়া উঠিবে না? তোমার ছোট ছেলে যখন পাদ্রী সাহেবের বাংলা উচ্চারণ অনুকরণ করিতে থাকে তখন কি তুমি হাসিয়া উঠ না? আমার উদ্দেশ্য যদি তোমার কাছে অবান্তরও হয়, আমার আর্টের এই পরোক্ষ ফল নিশ্চয়ই তুমি উপভোগ করিবে।

শেক্‌স্‌পীয়ার সাহিত্যের যে আদর্শের কথা বলেন সে আদর্শ অনুসারে সাহিত্যিকের কাছে জীবনটা ভাল কি মন্দ, ইহার কি রাখিব কি বাদ দিব, জীবনকে বড় করিয়া আঁকিব কি ছোট করিয়া আঁকিব, সাধু আঁকিব কি অসাধু আঁকিব, এসব প্রশ্নের কোন অর্থ ই থাকে না। তাঁর একমাত্র কথা, জীবন যা ঠিক তাই আঁকিব। এই পৃথিবীতে কেহ ধূলি কুড়াইতেছে, কেহ সোণা কুড়াইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে; তিনি বলেন ইহাই হইতেছে মানুষের জীবন, ইহা ছাড়িয়া আমি একপা এদিকও যাইতে পারি না, ওদিকও যাইতে পারি না। আমি নিজে হয়তো ধূলির চাইতে সোণা ভালবাসি, কাঁদার চাইতে হাসিতে ভালবাসি, কিন্তু তাই বলিয়া আমি যদি শুধু সে সোণাই আঁকি, হাসিই আঁকি, তাহা হইলেই কি যাহারা ধূলি কুড়াইতেছে তাহাদের হাতের ধূলি সোণা হইয়া যাইবে, যাহারা কাঁদিতেছে তাহাদের চোখের জল মুখের হাসিতে পরিণত হইবে? যাঁহারা জীবনের খণ্ডিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সাহিত্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া সান্ত্বনা পাইতে চায় তাহাদিগকে মূর্খ ছাড়া আর কি বলিব? তাহাদের সাহিত্যকে foolsদের Paradise ছাড়া আর কি বলা যায়?

যাহা হউক পৃথিবীতে এরকম মূর্খ অনেক আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যিকার সাহিত্যিক সেজন্য আপশোষ করে না; তাঁর মাথায় এ চিন্তাও কোনদিন ঢুকে না যে পৃথিবীর এই সব মূর্খ লোকগুলিকে উড়াইয়া দিয়া তিনি পৃথিবীটাকে শুধু বুদ্ধিমান লোকের বসতি বলিয়াই দেখাইবেন। এই সব মূর্খ লোকের মূল্য সত্যিকার হিসাবে তাঁর কাছে এক ছটাকও কম নয়। তিনি জানেন পৃথিবীর কতগুলি লোক এই ধরণের। তারা জীবনের ব্যর্থতা সহ্য করিতে পারে না, ভুলিতে চায়, কোনরূপ ঢাকিয়া রাখিতে চায়। মরুভূমিতে যদি জল না পায় তবে মরীচিকার পিছনে ছুটে। এই সংসারে কত লোক আর তারা কত কি ই না ভাবে—ইহাতেই তো তাঁর বিস্ময়। এখানে শিশুরা চাঁদের জন্য হাত বাড়ায়, যৌবনে কিসের আগ্রহে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আকাশে উড়ে; স্বপ্ন দেখে, ভাঙ্গিয়া যায়; ভালবাসে, ভুলিয়া যায়; আর বৃদ্ধরা তাহাদের জীবন যাত্রায় যে সব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সাহিত্য নামক বস্তু বিশেষে বা একটি বহুমূল্য কৌটায় রত্নের মত সযত্নে রাখিয়া দিতে চায়। এই যে মানুষের অদ্ভুত বিচিত্র জীবন, ইহা ছাড়িয়া সাহিত্যিক কোন মিথ্যা কল্পলোকের পিছনে ছুটিবে?

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মানব জীবনকে বড় করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড় শক্তি।" কিন্তু কথা হইতেছে, এই বড় করিয়া দেখিয়া কি লাভ? জীবনটা কি এতই তুচ্ছ যে আরও বড় করিয়া না দেখিলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না? ব্রাউনিংএর একটা কথা মনে পড়ে, This world's has no blot for us, nor blank; it means intensely and means good. আর একটি কথা। এই যে বিশ্বের অনন্ত জীবন প্রবাহ ইহা কি এতই আমাদের চোখের ভুয়ো যে ইহাকে বড় করিয়া দেখিলেই বড় হইয়া গেল, ছোট করিয়া দেখিলেই ছোট হইয়া গেল? আর বড় করিয়া দেখাই বা কাহাকে বলে? যাহা আছে তাহা যদি তাহা না হইয়া আর কিছু হইয়া পড়ে তাহা হইলেই কি তাহা বড় হইয়া যাইবে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ফলে গাছের

ফলটি যদি ঠিক vertically নীচে না পড়িয়া একটু obliquely পড়ে কিংবা সোজা নীচে না পড়িয়া উর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে তাহাহইলেই কি পৃথিবীটা অধিকতর বাস যোগ্য হইয়া পড়িবে, বিশ্বজীবনটা বড় বলিয়া প্রমাণিত হইবে? মানবজীবনে যদি দৈহিক কামনাটা নাই থাকিত সবই যদি স্পিরিচুয়াল হইয়া যাইত তাহা হইলেই যে মানবজীবনটা বড় হইয়া পড়িত ইহারই বা কি মানে আছে?

যাহা হউক মানে কিছু না থাকিলেও একথা ঠিক যে পৃথিবীতে অনেক লোক আছেন যাঁরা জীবনটা যেভাবে চলিতেছে সেভাবে না চলিয়া অন্যভাবে চলিলে ভাল হইত মনে করেন; তাই চাঁদের দিকে হাত বাড়াইলেই যদিও চাঁদ ছুটিয়া আসেনা তবুও তাঁরা হাত বাড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অনেক লাভ হয়; তাঁরা চাঁদ না পাইলেও রাস্তায় রাস্তায় ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক লাইট আনিয়া দেন। ইহারা উৎকর্ষপন্থী। ইহারা বলেন,—মানবজীবনের প্রকৃতিটা একবারে উল্টাইয়া দিলে তার কিছু মানে হয়না বটে, কিন্তু যে প্রকৃতি নিয়া ইহা চলিতেছে তাহার মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, এইসব অসম্পূর্ণতা দূর করিতে পারিলে বা পূর্ণ করিলে, দৈহিক, নৈতিক মানসিক প্রভৃতি নানা স্বচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া জীবনটা বেশ সহজ সুসহ হইয়া আসে। ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়া অসন্তোষ দূর হয় না, মানুষের আকাঙ্ক্ষা থামেনা। আর যদিও বা থামিত তাহা হইলেই সে মানুষের জীবন একটা উঁচু-দরের অবস্থা প্রাপ্ত হইত তাহাও বলা যায় না। আসল কথা হইতেছে, জীবনের প্রতি মানুষের অসন্তোষ, জীবনেরই একটা fact। মানুষ উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষা, নূতন নূতন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিরন্তর ব্যগ্র। একটা হইলে আর একটা চায়। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে সাহিত্যিকও মুক্ত নন। তিনিও হয়তো তাঁর ব্যবহারিক জীবনে ক্যাণ্ডল্ লাইট হইতে ইলেক্ট্রিক লাইট বেশী ভাল বাসেন, এবং ইলেকট্রিক লাইট হইলে গ্যাস্ লাইটের জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কিন্তু যেহেতু ঢাকা সহরে গ্যাস্‌লাইট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাই বলিয়াই যে তিনি তাঁর খণ্ডিত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য জীবন ভরিয়া সাহিত্যে গ্যাস লাইটের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রাকাশ করিয়া যাইবেন তাহার কি মানে আছে? অবশ্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা যদি প্রচণ্ড প্রকাশ পায় এবং তাহা অন্যান্য ঢাকাবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত হয় তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা সহরে গ্যাস্‌লাইট হইতেও পারে। কিন্তু গ্যাসলাইট হইলে, তারপরে যে তিনি আবার নূতন আর কোন লাইটের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিবেন না তার কি নিশ্চয়তা আছে? হয় তো তখন বলিবেন,—রেডিয়াম হইতে প্রস্তুত নূতন ধরণের লাইট চাই; কিংবা যদি খেয়াল হয়, বলিয়া বসিবেন, বহুদিন কূপী জ্বালাই না, এখন হইতে কূপীই জ্বালাইব। তখন কি সাহিত্যিক আবার রেডিয়াম লাইট বা কূপীর জন্যই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকিবেন? রবীন্দ্রনাথ জীবনের খণ্ডিত আকঙ্ক্ষা গুলিকে সাহিত্যের বহু মূল্য কৌটোয় রাখিয়া দিতে চান; কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার যেখানে কোন সীমাও নাই স্থিরতাও নাই, —আজ সে আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটিতেছে, পঞ্চাশ বছর পরে তাহা ছাড়িয়া কাহার পিছনে ছুটিবে কিছুই বলিতে পারে না, আজ যে ব্যর্থতার হাহাকার করিতেছে কাল সেই ব্যর্থতার দিকেই মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিবে কিনা কিছুই জানেনা—তখন সেই সব আকাঙ্ক্ষা দিয়াই যদি সাহিত্য ভরিয়া রাখি, তাহা হইলে কি রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বহুমূল্য কৌটা বলিতেছেন, তাহা আজকের বহুমূল্য কৌটো হইলেও কালকের Lumber roomএ পরিণত হইবে না? আর মানুষের নৈতিক আকাঙ্ক্ষারই বা কি স্থিরতা আছে? আজ পৃথিবীর চারিদিকে নাস্তিক পাপীর উল্লাস দেখিয়া ভীত হইয়া হয়তো ভাবিতেছি, কবে এই পৃথিবীর পাপের ভার কমিবে, কবে এখনকার লোকগুলো ভদ্র হইবে, বিনীত হইবে, সাধু হইবে, ধার্ম্মিক হইবে

কিন্তু কালই যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার চারিদিকে ভীড় করিয়া মিষ্টি হাসি হাসিতে থাকে এবং আস্তে আস্তে কথা বলিতে থাকে, তবে সে বিরক্ত হইয়া তাহাদের গালে চটাচট্ চড় মারিতে থাকিবেনা তাহারই বা কি স্থিরতা আছে? অথচ নাস্তিক পাপী বলিয়া যাহাদিগকে এককথায় উড়াইয়া দিতেছি, মাঝে মাঝে তাহাদের দিকে তাকাইয়া কি বিস্ময়েই না অবাক হইয়া যাইতে হয়। আকণ্ঠ পাপে ডুবিয়া থাকিয়াও যখন উঠিয়া আসে, আশ্চর্য্য, একটু দাগও লাগে নাই। কি প্রাণখোলা উজ্জ্বল তাহাদের মুখের হাসি। অথচ চিরজীবন ভরিয়াই যে পবিত্র রহিয়া গেল, কোথা হইতে কি দাগ লাগিল, সে দাগ আর উঠিতে চায় না। জীবনের এই অদ্ভুত বিচিত্রতা ছাড়িয়া কে একঘেয়ে শুভ্রবাসের ধ্যান করিবে?

যাহা হউক নূতন করিয়া জীবনের মূল্য কষা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এবং ইহাই আমাদের কথা যে সাহিত্যকারও যেন মূল্য কষিতে না বসেন। ভুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। আজ তিনি জীবনের মূল্য কষিয়া কাহাকেও মানুষের লজ্জা, কাহাকেও দৈন্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আর কাহাকেও হয়তো মাহাত্ম্য বলিয়া প্রচার করিয়া গেলেন। কিন্তু একশত বৎসর পরে তখনকার মানুষ যে শ্লেট মুছিয়া নূতন করিয়া মূল্য কষিতে বসিবে না এবং আগের এষ্টিমেট ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নূতন এষ্টিমেট্ খাড়া করিবে না, তাহাই বা কে জানে? একশত বৎসর পরে সে মাহাত্ম্য মুছিয়া যাওয়ার ঘোরতর আশঙ্কা আছে তাহাকেই চরম ভাবিয়া প্রচার করিয়া সাহিত্যের কি সার্থকতা? রবীন্দ্রনাথ অভিমান করিয়া বলিয়াছেন,—"আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি তা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ উল্টা রকমের ব্যাপার হবে এ রকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন।" কিন্তু বলার কোন দরকারই নাই। আমরা কি দেখিতে পাই না যে আগেকার লোকে এতদিন যা ভাবিয়া আসিয়াছে আজকালকার লোকে ঠিক তাই ভাবে না। দেহ, প্রেম, ভূত ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উল্টা না ভাবিলেও, একটু অন্য রকমের ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে? এ সম্বন্ধে যদি কেহ কোন প্রমাণ চান তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রমাণ। ইহাতে যে সব কথা বলা হইতেছে তাহা কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়? ✓

আদর্শবাদী সাহিত্যের ইহাই হইতেছে অসুবিধা। ভবিষ্যতে সে আদর্শ অগ্রাহ্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিবেন,—তুমি মানুষের চিরন্তন আশঙ্কাগুলির কথা ভুলিয়া যাইতেছ। মানুষের অস্থির চঞ্চল আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তো আমি সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটায় রাখিয়া দিতে বলিতেছি না, চিরন্তন ধ্রুব আকাঙ্ক্ষাগুলির কথাই বলিতেছি। কিন্তু মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা কোন্ গুলি? রবীন্দ্রনাথ উৎকর্ষ কামনার কথা বলিয়াছেন কিন্তু ইহাতে কি ধ্রুব কিছু বুঝা যায়? উৎকর্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়তো মানুষের মনে চিরন্তন কিন্তু উৎকর্ষের আদর্শটি তো যুগে যুগে লোকে লোকে ভিন্ন দেখা গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আদর্শের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর লোক হাসিয়া উঠিয়াছে। একটি আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িতেছে যাহাকে চিরন্তন ও ধ্রুব দুইই বলা যায়—অমরত্ব। ধরিয়া লইলাম, সকল সাহিত্যিক এই অমরত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাহাদের সাহিত্যে প্রচার করিয়া গেলেন। ফলে কি হইল? ফলের কথা বলিতেছি, কারণ সংসার যাত্রায় কিছু প্রত্যক্ষ ফললাভ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আজকাল কিছুকেই আমল দিবেন না। যাহা হউক আবার ধরিয়া লইলাম যে ফলে সকল মানুষই অমর হইল! অর্থাৎ শিশুরা হাতের কাছে চাঁদ পাইল। কিন্তু যে চাঁদ দূরে থাকিয়া সুন্দর দেখাইত তাহা হাতের কাছে তার পাহাড় জঙ্গলে বোঝাই শরীরটা লইয়া কি বিশ্রী বিদ্ঘুটে দেখাইবে না? তাহা ছাড়া প্রয়োজনীয়তার উপরেই যে সাহিত্যের সার্থকতা, প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই কি সে সাহিত্যের সার্থকতা চলিয়া যায় না? আমি হয়তো মানব জীবনের জন্য একটা অতি মহৎ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি,

ভাবিয়েছি এই পৃথিবীতে মেয়েরা যদি শুকতারা ধরিয়া কপালে টিপ পরিতে পারিত, ছেলেরা যদি চাঁদ লইয়া খেলিতে পারিত, পুরুষরা যদি ধবলগিরির শিখরে বসিয়া তপস্যা করিত তবে মানব জীবন কি গৌরবময়ই না হইত। কিন্তু যেদিন ইহা হইল, সেদিন কি আমারই সাহিত্যের মূল্য সে সাহিত্যে, কখন বিকাল হইবে, কখন চা খাইব ইহারই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হইয়াছে, তাহার চাইতে এক ছটাকও বেশী থাকিবে? কেহ হয়তো বলিবেন, ইহা কোনদিনই হইবে না, মেয়েরা কোনদিনই শুকতারা ধরিয়া কপালে টিপ পরিতে পারিবে না। কিন্তু যাহা কোনদিনই হইবে না তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া সংসার যাত্রায় কি লাভ? জীবন যাত্রায় সে সব আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ স্বভাবতঃই খণ্ডিত হইতে বাধ্য, সেই সব কল্পিত আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটায় ভরিলে, চিরজীবন যিশুখৃষ্ট যিশুখৃষ্ট করিয়া সাহিত্যের পাতা বোঝাই করিলে, মানব জীবন কি এমন ধন্য হইয়া যাইবে?—বিশেষতঃ যেখানে সকল মানুষই যিশুখৃষ্ট হইলে তাহাদের মূল্য এখনকার একটা গাঁজাখোরের চাইতে এক কড়াও বেশী হইবে না। বাস্তবিক আদর্শ বাদীদের হাত হইতে যদি যিশুখৃষ্টের মাহাত্ম্য বজায় রাখিতে হয় তবে পৃথিবীর আর অর্দ্ধেক লোককে শয়তানের জন্য চেঁচাইতে হইবে।

যাহা হউক জীবনের আদর্শের কথা লইয়া আর বেশী ঘাঁটাঘাটি করিব না। এখন কথা হইতেছে, জীবনের যাহাই কেন আদর্শ হউকনা তাহা যে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই প্রচার করিতে হইবে তাহার কি মানে আছে? সকলেই যিশুখৃষ্টের মত চলিলে যদি জীবনযাত্রা বেশ সহজ ও মোলায়েম হইয়া আসে, তবে সেকথা প্রচার করার জন্য তো যথেষ্ট মিশনারী রহিয়াছে; তারাই কেন পুরা উদ্যমে এই কাজটা চালান না? মানুষকে যদি নীতি কথা শুনাইতে হয় তবে সেজন্য তো ব্রাহ্মসমাজই রহিয়াছে, যদি নির্ভীক সত্য কথা বলিতে হয় সেজন্য রামানন্দবাবুই রহিয়াছেন, যদি নৈতিক চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয় সেজন্য তো 'শনিবারের চিঠির' লোকগুলাই রহিয়াছে; দেশোদ্ধারের জন্য দেশভক্ত রহিয়াছে, সমাজ সংস্কারের জন্য সমাজ সংস্কারক রহিয়াছে, জঙ্গল কাটিবার জন্য ভলান্টিয়ার রহিয়াছে। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায় রহিয়াছে। সেই সব উপায় ছাড়িয়া সাহিত্যকে তাহাদের বদলে ব্যবহার করিয়া কি লাভ? বাড়ীর পাশে পুকুরের দিকে চাহিয়া যদি মৎস্য খাওয়ার অভিলাষ হয় তবে সেজন্য সাহিত্য লিখিয়া কি লাভ?—বরং বাঁশঝাড়ে যাইয়া ছিপ কাটিয়া বর্শি ফেলিলেই তো আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির শীঘ্র সম্ভাবনা থাকে? মনে মনে যদি বিলাত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং অর্থাভাবে সে আকাঙ্ক্ষা যদি এতদিন পর্য্যন্ত জীবনে খণ্ডিত হইয়াই থাকে তবে সাহিত্যের পাতায় বিলাতী সুন্দরীদের মুখ আঁকিলেই তো তাড়াতাড়ি আর বিলাত যাওয়া হইবে না বরং সে সময়টা অর্থোপার্জ্জনে ব্যয় করিলে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি কোনদিন বা হইতেও পারে। অথচ, আশ্চর্য্য, প্রয়োজন সিদ্ধির এমন সব উৎকৃষ্ট উপায় থাকিতে লোকে সাহিত্যের উপর জুলুম করে। কেহ হয়তো বলিবেন উপায় থাকিলেও আর একটি উপায় থাকিতে দোষ কি? যদিও পৃথিবীতে মিশনারীরা রহিয়াছে, বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে, তবুও তো জীবনের অনাচার সব দূর হয় নাই, অধর্ম্মের পরাজয় হয় নাই, ধর্ম্মের নিশান উড়ে নাই। যিশুখৃষ্ট জন্মিলেও রামানন্দ বাবু থাকিলেও এখনও জীবনে মিথ্যা আছে, দুর্নীতি আছে এবং এই লজ্জা ও দৈন্য কাটাইয়া মাহাত্ম্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে। সাহিত্যে যদি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তবে কি তাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হইবে না? হইবে। সাহিত্যিকের আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জিত হইয়া যদি বিলাতী সুন্দরীদের মুখ সাহিত্যের পাতায় উঁকি মারে কিংবা বিলাতী জীবন রঙীন হইয়া কল্পনায় ভাসিয়া উঠে তবে বাংলা দেশের যুবকদের বিলাত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়িয়া গেলে যে লোকে বেশী করিয়া বিলাত যাইবে এবং তাহার ফলে জাতীয় উৎকর্ষ সহজে হইয়া উঠিবে

সে কথাও ঠিক। তেমনি মৎস্য খাওয়ার অভিলাষ যদি সাহিত্যে প্রচণ্ড প্রকাশ পায় তবে মাদ্রাজীরা নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য খাইতে আরম্ভ করিবে এবং মৎস্য খাইলে যে তাহাদের শারীরিক উৎকর্ষ লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কেহ যদি বলেন, এই রকম সাহিত্যই আমরা চাই, এই রকম সাহিত্যই লেখা হউক, তবে বলিব, হউক। যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই হউক। জীবনের যত প্রয়োজন সব সিদ্ধি হউক, যত আকাঙ্ক্ষা সব পূর্ণ হউক। মাদ্রাজীর শারীরিক উৎকর্ষ লাভ হউক, বাঙ্গালীর নৈতিক উন্নতি হউক, সমাজ রক্ষা হউক, জাতীয় জীবন ধন্য হউক। এবং এই উদ্দেশ্যের জন্য যত উপায় আছে সব প্রযুক্ত হউক, যত মানুষ আছে সব লাগিয়া পড়ুক।

কিন্তু কথা হইতেছে, এইধরণের সাহিত্য সৃষ্টি কি মানুষের ব্যবহারিক জীবনেরই একটা অঙ্গ নয়? মানুষ যেমন পেট ভরিতে ভাতের যোগাড় করে, তেমনি নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য নীতিপূর্ণ নাটক নভেল লেখে, বাছিয়া বাছিয়া ত্যাগ ও সংযমের সুন্দর সুন্দর ছবি চোখের সম্মুখে ধরে। যেমন বাসের জন্য ঘর বাঁধে, প্ল্যান করে, দালান তোলে তেমনি বিশ্বের জীবন যাত্রাকেও সহজ করিতে এক একটা স্কীম্ করে, ইউটোপিয়া লেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, প্রয়োজনেরও অন্ত নাই, তাই যেমন করিয়া পারে সে প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করে। বড় বড় আকাঙ্ক্ষা যখন একা পূর্ণ করিতে পারেনা তখন সাহিত্যের পাতায় সেই সব আকাঙ্ক্ষা ছড়াইয়া লোকজন যোগাড় করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চেষ্টা করে। এমনই করিয়া জীবন চলিতেছে; একটা বহুদূর অনির্দ্দিষ্ট উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষার পিছনে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে; এবং ইহারই তাগিদে এথিক্‌স্ লিখিতেছে থিয়লজি লিখিতেছে; সোসিয়লজি লিখিতেছে, ইকনমিক্‌স্ লিখিতেছে আরও কত কি লিখিতেছে। এই তাগিদ যখন খুবই বড় হইয়া উঠে তখন মানুষ সাহিত্যকেও সেই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করে। কিন্তু করিলেও মনে রাখা উচিত ইহাও হইতেছে একধরণের সাহিত্যিক prostitution. কারণ সত্যিকার সাহিত্য ব্যবহারিক জীবনের জন্য নয়। ইহা জীবনের সকল প্রয়োজন, সকল আকাঙ্ক্ষার উপরে। ইহা হইতেছে জীবনের দর্পন—জীবন কেমন করিয়া চলিতেছে ইহা শুধু তাহাই দেখায়, কেমন করিয়া চলা উচিত সেবিষয়ে ইহা নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প।

সত্যিকার সাহিত্যিক বলেন,—জীবন ভরিয়া তো নানা কাজই করিয়া আসিতেছি, একবার থামিয়া দেখিয়া নেই এই জীবনটা কি। সাহিত্যিকের মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে জীবনের যে ছবি তখন ধরা পড়ে তাহাই হইতেছে সত্যিকার সাহিত্য। সে সময় তাঁর সকল কাজ ফুরাইয়াছে, সকল প্রয়োজন মিটিয়াছে; তখন তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন আদর্শের মোহ নাই। মোহমুক্ত দৃষ্টি তাঁর জীবনের অনন্ত রহস্য দেখিয়া নূতন করিয়া মুগ্ধ হয়।

সাহিত্যিকের সেই মুগ্ধ দৃষ্টির কাছে জীবনে দৈন্য বলিয়া কিছু নাই, লজ্জা বলিয়া কিছু নাই, আবার মাহাত্ম্য বলিয়াও কিছু নাই। তাঁর কাছে এসবই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, একটাও বড় নয়, একটাও ছোটনয়। ইহরা যা তাই, জীবনে ইহারা আছে, একটাকেও উড়াইয়া দিতে পারেন না। তাই শেক্‌স্‌পীয়র হ্যাম্‌লেট্ আঁকিয়াছেন আবার পাশে পাশে ক্লডিয়াস্, ফর্টিনব্রাস্ লেয়ার্টিস্‌ও আঁকিয়াছেন, অফিলিয়ার পাশে জার্ট্রুড আঁকিয়াছেন। বাস্তবজীবনে তিনি ডেস্‌ডেমনার পাশে ইয়াগো দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ছিলেন, তাই সাহিত্যেও সেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, খণ্ডিত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য সাহিত্যে ইয়াগোকে বাদ দেন নাই। পৃথিবীতে কর্ডেলিয়া খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যে তিনি দুইটি কর্ডেলিয়া আঁকিয়া একটি মোটে গনেরিল বা রীগান আঁকেন নাই। জীবনে তিনি শাইলকের হাতে হয়তো যথেষ্ট লাঞ্ছনা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া শুধু য্যান্টনিয়র মাহাত্ম্য দিয়াই নাটক ভরিয়া রাখেন নাই, শাইলককেও দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন।

জীবনে প্রেম আছে কামনাও আছে, এবং যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে ঐশ্বর্য্য ভাবেন, কামনাকে দৈন্ত ভাবেন তাই বলিয়া তিনি সাহিত্যে দৈন্তকে বাদ দিয়া শুধু আইমোজেন, হারমিয়নই আঁকেন নাই, ক্লিওপেট্রা ক্রেসিডাও আঁকিয়াছেন। সত্যিকার সাহিত্যিক তাই বলেন,—তোমাদের জীবন যা, তোমরা যেমন করিয়া জীবন যাপিতেছ, আমি তেমনই আঁকিব। তোমাদের সঞ্চয় যদি সোণা হয় তবে সোণাই আঁকিব, যদি ধূলা হয় তবে ধূলাই আঁকিব, কিংবা সোণায় ধূলায় মিশান কিছু হয় তবে তাহাই তোমাদের চোখের সম্মুখে ধরিব। জীবনের যে রহস্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, তোমাদের মনেও সেই বিস্ময় জাগাইব, ইহাই আমার অভিলাষ। তোমরা জীবনে হয়তো অনেক কিছুই লুকাও, অনেক কিছুই মুছিয়া ফেলিতে চাও কিন্তু আমি সাহিত্যে কিছুই লুকাইব না, কিছুই মুছিয়া ফেলিব না। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও আমি অস্বীকার করিব না। তোমাদের Pathnutuis কে যথাযথই আঁকিব। কিন্তু সেদিন তার মরুজীবনের মোহ ভাঙ্গিবে, সেদিনকার সেই মোহভাঙ্গা তোমাদের পছন্দ না হইলেও, আমি তাহা লুকাইব না, তাহাও তোমাদের চোখের সম্মুখে ধরিব।

সাহিত্যকারের এই কথাটি যাহারা বুঝে না তাহারাই সাহিত্যিকের কাছে নানারূপ অসঙ্গত আবদার করে। কেহ বলে, এই জিনিষটা বাদ দেও, কেহ বলে এই জিনিষটা জোড়া দেও। কেহ বলে, এই জিনিষটা আমি ভাল বলি না, দুর্নীতি বলি, এবং আমার মত আরও পঞ্চাশ হাজার লোক দুর্নীতি বলে, সুতরাং ইহা সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না; কেহ বলে ওই জিনিষটা আমার খুবই ভাল লাগে এবং আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোকের ভাল লাগে সুতরাং সাহিত্য করিয়া ওই জিনিষটা আমাদের কাছে আনিয়া দাও। ইহারা বুঝে না যে তাহাদের ভাল লাগার জন্য সাহিত্যিকের কিছু যায় আসে না, এমন কি তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দর উপরেও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করে না। তিনি নিজেও হয়তো একটা জিনিষ ভালবাসেন, আর একটা জিনিষ ঘৃণা করেন; তাঁর নিজেরও হয়তো নানা আকাঙ্ক্ষা আছে, নানা আইডিয়া আছে, মানব জীবনের উৎকর্ষের জন্ম নানা স্কীম আছে, এবং ইহার জন্য হয়তো অনেক কিছু ভাবেন, অনেক কিছু করেন। কিন্তু ইহা হইতেছে তাঁর ব্যবহারিক জীবন। সাহিত্যকার হিসাবে তিনি নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়। তিনি তখন কিছুই ভাঙ্গিতে চান না, কিছুই গড়িতে চান না। কিন্তু তিনি না চাইলেও জীবনের ভাঙ্গা গড়া থামে না। সেই ভাঙ্গা গড়া দেখিয়া তাঁর মনে যে বিস্ময় বোধ জাগ্রত হয় তাহাই তিনি সাহিত্য করিয়া আঁকিয়া যান।

এই কথাটি বুঝিতে না পারিয়াই শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন,—সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে ভাঙ্গবার কতটা অধিকার আছে আপনি তাহা বিচার করবেন।" এবং রবীন্দ্রনাথও তৎক্ষণাৎ সোসিয়লজির প্রফেসরের মত বলিতে আরম্ভ করেন,—"সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার যখন পরিবর্ত্তন হয়, সে পরিবর্ত্তন যে কারণেই হোক, (ধর্ম্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তো নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়) তখন একটি কথা ভাববার আছে। ইত্যাদি।" কিন্তু এত কথা বলার কোন দরকারই ছিল না। শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় যদি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আর কাহাকেও করিতেন তবে সহজেই উত্তরটা পাইতেন। প্রথমতঃ সত্যিকার সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙ্গেন না, ভাঙ্গিতে ইচ্ছাও করেন না, যদি কিছু ভাঙ্গা হইয়া থাকে তাহাই শুধু আঁকেন। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বাহিরে, সামাজিক প্রাণী হিসাবে তিনি যদি কোন সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙ্গেন, অর্থাৎ কাহারও বউ চুরী করেন, কিংবা মাথা

কাটেন, তাহা হইলে তাঁহার জেল হইবে, কিংবা অর্থ দণ্ড হইবে, কিংবা ওই রকম কিছু হইবে। এমন সোজা উত্তর থাকিতে কেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন কিংবা মোটেই প্রশ্নটা করিলেন, ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। কেহ হয়তো বলিবেন,—সত্যিকার সাহিত্যিক না ভাঙ্গিলেও ঝুটা সাহিত্যিকরা তো ভাঙ্গিতে চায়, তাহাদের কি করা উচিত? ইহার উত্তরও খুব সোজা। ঝুটারা হয়তো ভাঙ্গিতে চায় কিন্তু সাহিত্যে ভাঙ্গা এক কথা আর সমাজে ভাঙ্গা আর এক কথা; সুতরাং সামাজিক শাস্তি তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তাহারা সাহিত্যিক নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে সেই হেতু তাহারা সাহিত্যিক শাস্তি পাইবে—ব্যর্থ সেই তাহাদের শাস্তি। সভায় বসিয়া গাইতে গাইতে গায়ক যদি তাল কাটিয়া ফেলেন সেজন্য তাঁহার জেল হইতে পারে না, ব্যর্থতা এবং লোকের উপহাসই তাঁর যথেষ্ট শাস্তি। কিন্তু এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। সামাজিক বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিতে চাইলেই শুধু সাহিত্যিক নিয়ম ভাঙ্গা হয় না, গড়িতে চাইলেই ভাঙ্গা হয়। ব্যভিচার প্রচার করিতে যিনি সাহিত্য লেখেন, তিনি যতটা সাহিত্যিক নিয়ম ভাঙ্গেন, যিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আদর্শ প্রচার করিতে সাহিত্য লেখেন তিনিও ততটাই ভাঙ্গেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে—পূজা, মন্দির দেবতা, মাহাত্ম্য, সংযম, ত্যাগ প্রভৃতি নানা কথা বলিয়াছেন, সাহিত্য সম্পর্কে সেই সব কথার কোন মূল্যই নাই।

জনৈক প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন,—কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান, প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান থাকে কি? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বরকে মানি না, ভালবাসা মানিনে, সুতরাং সাহিত্যে আমরা বিশেষ কৌলিন্য লাভ করেছি এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। ঈশ্বরকে মানিনে বা বিশ্বাস করিনে সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়? ভালবাসা মানছিনা, অতএব যারা ভালবাসা মানে তাদের যে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এসব কথা বলে লাভ কি?" রবীন্দ্রনাথের শ্লেষের অর্থ হইতেছে এই যে, ভগবান, প্রেম আর ভূত মানিনা একথা বলার সাহিত্যে কোন স্থান নাই। ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সাহিত্যের পাতায় সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানই কি আছে? ঈশ্বরকে মানি না, একথা বলার সাহিত্যিকত্ব অবশ্যই নাই, কিন্তু ঈশ্বরকে মানি ইহাতেই বা সাহিত্যিকতা কোথায়? ভালবাসা মানিনা একথায় নিশ্চয় কৌলিন্য লাভ কিছুই হইল না, কিন্তু ভালবাসা মানি একথা বলিলেই বা কি বিশেষ কৌলিন্য লাভ হইল? শুধু ঈশ্বর ও ভালবাসা কেন রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কিছু মানিতে পারেন। যেমন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের কি আসিয়া গেল? সাহিত্য আলোচনায় তিনি যদি বলেন, আধুনিকরা ভূত মানেনা, আমি ভূত মানি, তাহাতে সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্ব্বতার প্রমান হয় না। আর, ভগবান, প্রেম ও ভূত মানি না, কোন কোন আধুনিকদের একথা বলায় কিই বা এমন দোষ হইয়াছে? রবীন্দ্রনাথ যদি দেবতা, প্রেম, পূজা মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস গুলি সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে অকপটে বলিয়া ফেলিতে পারেন, তবে দুই একজন আধুনিকও না হয় এক ফাঁকে তাঁদের ব্যক্তিগত অবিশ্বাসগুলিও বলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে এমন কি হইয়াছে? তাঁহারা তো আর বলেন নাই যে শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রেম ভগবান মানেন না। তাঁহারা নিজেদের কথাই বলিয়াছেন। যদি তাহারা বলিতেন, পৃথিবীতে কেহই প্রেম বা ভগবান বা ভূত মানে না, তাহা হইলে অবশ্য দোষ হইত। কারণ ইহা মিথ্যা এবং এই মিথ্যা তাঁহাদের সাহিত্যকে কলুষিত করিত। কিন্তু পৃথিবীর অনেকেই প্রেম ও ভগবান বিশ্বাস করিলেও কেহ কেহ যে আবার করেনা একথা কে অস্বীকার করিবে? পৃথিবীতে ট্যান্যার যে নাই কে বলিবে? কিংবা থাকিলেও যে হেতু পৃথিবীতে

আবার অক্টেভিয়াসও আছে সেইহেতুই যে ট্যানারকে ছোট বলিয়া গণ্য হইতে হইবে তাহারই বা কি মানে আছে? প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে, যেখানে সে যা পেয়েচে তার বেশী দিয়েছে। ঐশ্বর্য্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূল ধনের বাড়া। সেই ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্য্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়।" 'মানুষ যেখানে জয়ী হয়েচে'......ইত্যাদি কথাগুলি শুধু ষ্টাইলের ঐশ্বর্য্য। কারণ ইহা রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবের বাড়া বা উদ্বৃত্ত। ইংরাজীতে এই ঐশ্বর্য্যকে superfluity বলে। দ্বিতীয়তঃ 'কামনায় উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়।' এই স্মার্ট বাক্য দুইটিতে রবীন্দ্রনাথের ষ্টাইলের বিশেষত্ব পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। 'কাহার' উদ্বৃত্ত নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়? যাহাহউক তাঁর কথার অর্থ হইতেছে এই যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে মূল ধনটি হইতেছে কামনা এবং এই কামনার যা বাড়া বা উদ্বৃত্ত তাহাই হইতেছে প্রেম। এবং এই প্রেমকে তিনি ঐশ্বর্য্য বলেন। বলুন। অনেকেই বলে। অনেকদিন হইতেই বলা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ যদি কেহ বলে,—এই যে তোমাদের উদ্‌বৃত্ত যাহাকে তোমরা প্রেম বলিতেছ এবং ঐশ্বর্য্য বলিয়া আদর করিতেছ, ইহা শুধু তোমাদের মনের একটা বিভ্রম, ইহা তোমাদের বুদ্ধির লজ্জা, তোমাদের ঐশ্বর্য্য নয় তোমাদের দৈন্য; ইহা তোমাদের মনকে পঙ্গু করে, কর্ম্মকে আড়ষ্ট করে, ইহা তোমাদিগকে সহজ সবল, স্বাধীন মানুষ হইতে বাধা দেয়; দেহের স্ফোটককে এতদিন দেহের ঐশ্বর্য্য বলিয়া পুরিয়া আসিয়াছ; মনের এই উদ্বৃত্তকে আবর্জ্জনা বলিয়া এখন ফেলিয়া দাও। তাহা হইলে কথাটা শুনিতে অনেকের কাছেই হয়তো বিশ্রী লাগিবে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে দোষ কি? যাহা হউক, প্রেম মানুষের ঐশ্বর্য্যই হউক আর যাহাই হউক, সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে সে তথ্য আবিষ্কার করিয়া কোন লাভই নাই। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এতথ্যের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এ তথ্য আবিষ্কার না করিলেও চলে। কথা হইতেছে সাহিত্যিক, প্রেম সম্বন্ধে জাগতিক ব্যাপারটা ঠিক ঠিক দেখিতেছে কিনা। কেহ যে প্রেমকে ঐশ্বর্য্য ভাবিয়া, কেহ যে ইহাকে অস্বীকার করিয়া নিজ নিজ ভাবে জীবন কাটাইতেছে, এই দেখাতে ভুল না হইলেই হইল। সাহিত্যিক নিজের মত বা বিশ্বাসকে চাপিয়া জীবনের সেই দৃশ্য আঁকেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া একটা অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রেমকে ঐশ্বর্য্য প্রমাণ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "সেই ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে।" কেন, মূলধনকে প্রকাশ করিলে কি দোষ? আর বিশ্ব সাহিত্যে মূলধন কি মোটেই প্রকাশ পায় নাই? সবই কি তথাকথিত ঐশ্বর্য্যে ভরা? হেলেন ক্লিওপেট্রা, ক্রেসিডা প্রভৃতি কি মূলধন হিসাবে প্রকাশ পায় নাই?

যাহা হউক, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া আসিল। আর একটি কথার উত্তর দিয়াই শেষ করিব। আধুনিক সাহিত্যে দরিদ্রদের কথা বাদ পড়ে নাই, এই কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। গরীবিয়ানা, দরিদ্রিয়ানাকে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভঙ্গীমাত্রেরই অসুবিধা এই যে অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়—অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হ'য়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে এইবার গরীবদের লেখা পড়া যাক।" ঠিক। কিন্তু গল্পের জন্য গল্প পড়ার মানে এ নয় যে শুধু রাম লক্ষণের কথাই পড়িব, রাবণের কথা বাদ দিব। কিংবা যতক্ষণ বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেছে ততক্ষণই তাহার কথা শুনিব, যেইমাত্র মেনকা আসিল অমনি বই বন্ধ করিব। গরীবিয়ানা, দরিদ্রিয়ানা একটা ভঙ্গী বটে, কিন্তু ধনীকিয়ানা, অসীমিয়ানা, মাহাত্মিয়ানা, ঋষিয়ানাও সাহিত্যের এক একটা ঢং। যখন সাহিত্যে

পড়িব তখন এই বলিয়া পড়িব না যে এইবার ধনিকদের কথা পড়ি, বা যাহারা বিশ্ব বিশ্ব করে তাহাদের কথা পড়ি, বা কি করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ হইতে পারা যায় তাহার কথাই পড়ি। সাহিত্যের জন্যই যেন সাহিত্য পড়ি।

কালপুরুষের উক্তি—

বাংলা কাব্যসাহিত্যে আজকাল ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজমের বেগ ও আবেগ দুইই চলছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ভঙ্গি ক্লাসিক নয়,—রোমান্টিক্। অন্যদিকে মোহিতলালের কবিতায় ক্লাসিসিজমেরই আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। যে কাব্যকে রোমান্টিক্ বা যে কাব্যকে ক্লাসিক্ বলা হয় তাকে যে পুরোপুরি রোমান্টিক্ বা ক্লাসিক্ হতে হবে তা নয়। রোমান্টিসিজমের ভেতরেও ক্লাসিসিজমের স্বাদ, ও ক্লাসিসিজমের ভেতরেও রোমান্টিসিজমের সাড়া পাওয়া যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে রোমান্টিক্,—যেমন মোহিতলাল বিশেষ করে ক্লাসিক্। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথকে যদি master romanticist বলা হয়, তাহ'লে মোহিতলালকে Confidant classicist বলা যেতে পারে।

রোমান্টিসিজমকে ব্যাপক ভাবে না ধরলে রবীন্দ্রনাথের ভেতর এই রোমান্টিক-অতিরিক্ত আরো অনেক রস বয়ে গেছে,—যেগুলোকে মিষ্টিসিজম্ সিম্বলিজম্ ইত্যাদি বলা যেতে পারে। কাজেই রবীন্দ্রকাব্যকে ধরতে হ'লে বুঝতে হয় সেই সমুদ্রকে যে সমুদ্রের ভেতর আন্দোলনের—রহস্যের শেষ নেই। কিম্বা বুঝতে হয় এ জীবনটাকে যে জীবনকে শেলী 'a dome of many coloured glass' বলেছিলেন।

ক্লাসিসিজমের ভেতর অবধি রয়ে গেছে; মোহিতলালের ভেতর অবধি (limitation) আছে তার চেয়েও বেশী। তবুও মোহিতলাল একজন নিষ্ঠাবান ক্লাসিক কবি।

ক্লাসিসিজম্ কাব্যের উপমা যোগাড় করবার জন্য প্রকৃতির আগুন—বাতাস—সমুদ্র—নক্ষত্র, কিম্বা মানুষের জীবনের—আশা ও নিরাশা, স্বপ্ন ও বস্তুর তৈরী—এই মানুষের জীবনের পথে পথে একে আঘাত করতে প্রায়ই সঙ্কুচিত হয়। ক্লাসিসিজম উপমা খোঁজে প্রধানতঃ পুরাণের থেকে, 'স্ক্রিপ্চারের থেকে, মৃত ভাষা ও মৃত ভাষার ইতিহাসের থেকে, পুরাণো কবিদের কাব্যের পাতা ও পাণ্ডুলিপির থেকে। কবিতা তো উপমা নিয়েই,—উপমা নিজেই তো কবিতা।

রোমান্টিক্ কবি তাঁর উপমার জন্য মুখ্যতঃ তার চার দিককার জীবন ও প্রকৃতির হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন। কিম্বা, শুধু হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে নয়, এসবের মজ্জা ও রক্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে চলেছেন।

রোমান্টিক কবি তাই জীয়ন্ত।

এই হিসেবে পুরোণো গ্রীক কবিরাও জীয়ন্ত ছিলেন।

কিন্তু মরা গ্রীক সাহিত্য ঘেঁটে ঘেঁটে ইয়ুরোপের যে কবিরা তাঁদের কাব্যের চোদ্দআনি উপমার যোগাড় ক'রলেন তাঁদেরও মৃত বলতে ইচ্ছা হয়। যদিও তাঁদের কাব্যে প্রতিফলিত আলোর একটা মন্দ মাধুর্য্য মাঝে মাঝে বেশ ভালো লেগেছে। ক্লাসিসিজমের ভেতর প্রতিফলিত-আলোর এই তাপহীনতা—তৃপ্তি (অতৃপ্তির ভেতরেও)—সংযম ও নিয়মের একটা ধরণ আছে। যে আলো প্রতিফলিত নয় তার উচ্ছ্বাস ও আলোড়নের আতিশয্যে এ সমস্তই ফেঁসে যায়। দেশে দেশে রোমান্টিক কাব্যে যা হয়েছে। জীবন

ও প্রকৃতির অবাধ অগাধ সমুদ্রকে রোমান্টিক কবি সামুদ্রিক সাপের মত আহত ও আলোড়িত করে চলেছেন। কখনো ভোরের—দুপুরের রোদ,—নটকান্-রাঙা পশ্চিমের মেঘ কখনো, নক্ষত্রের আকাশ কখনো সেই সমুদ্রের ছবিকে বদ্‌লে বদ্‌লে দিচ্ছে।

ইংরেজী কাব্যে সেক্সপীয়র ও শেলীর ভেতর এই রোমান্টিসিজম্ চূড়ায় উঠেছে। শেলীর কবিতায় অজস্র উপমার তাই আর অবধি নেই। ম্যাথু আর্ণল্ড শেলীকে তাই 'So incoherent' ব'লেছিলেন। ক্লাসিসিজমের আর্ণল্ড রোমান্টিসিজমের শেলীকে কালে কালে এমনটিই বলবেন। শেলীকে 'So incoherent' বলার আসোল কারণই হচ্ছে এই যে শেলীর কাব্য জীবন্ত উপমার অসহ্য আতিশয্যে অস্থির,—কি যে অস্থির!

মৃত সাহিত্যের 'মিথলজি'র থেকে উপমা ধার ক'রে যাকে কাব্যের অধিকাংশ উপাদান তৈরী করতে হচ্ছে বাস্তবিক জীবনের সামুদ্রিক আলোড়নের তোড়ে প'ড়ে অই জীবনটাকেই তার কাছে incohernt মনে হবে। incoherent মনে হবে অই জীবনের কবিকে, তার কবিতাকে।

সেক্সপীয়রকেও ভোলটেয়ার বল্‌তেন 'an intoxicated barbarian.'

টিউটনের মজ্জাগত মুখর রোমান্টিসিজম্‌কে ক্লাসিসিজমের তাঁবেদার ফরাসী, তুমি কি বুঝবে?

ম্যাথু আর্ণল্ড ক্লাসিসিজমের limitation মেনে নিয়েছিলেন। আমরা বলতে পারি ক্লাসিসিজমের limitation নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। কাজেই শেলী তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিছু আগে আমি বলেছি আর্ণল্ডের শেলীকে এই 'incoherent' বলার আসোল কারণই হচ্ছে এই যে শেলীর কাব্য জীবন্ত উপমার অসহ্য আতিশয্যে অস্থির!

ধরা যাক্ 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতাটি। ধর্‌ছি প্রথম ষ্টাঞ্জা—

"The awful shadow of some unseen power
Floats, though unseen, among us; visiting
This various world with as in coustant wing
As summer winds that creep from flower to flower.
Like moon beams that behind some piny mountain shower
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance
Like hues or harmonies of evening,
Like clouds in starlight widely spread,
Like memory of music fled,
Like ought that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery."

কবিতাটির প্রথম ষ্ট্যাঞ্জার এই বারো লাইনের ভেতরেই কবি দুটো 'as' ও পাঁচটি 'like' ব্যবহার করে' সাতবার প্রায় সাতরকম উপমা দিয়েছেন। অসামান্য কবিত্ব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাই বলে? বারো লাইনের ভেতর সাতটা 'মত' বা মতন' ব্যবহার ক'রে তিনি যে সাতখুন করেছেন আমরা তা মাপ করতে খুবই রাজী আছি। বাস্তবিক কি এ কবিতাকে আর্ণল্ডের সমালোচনার কম্পাশের ফিতে দিয়ে বেঁধে, এর উপমার ভূত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, এর Ariel এর ডানা কেটে ফেলে মরা ক্লাসিসিজমের কোটরের ভেতর Caliban এর মত একে বন্দী করে রাখলে ঠিক হত?

যারা কবিতার ভেতর 'as,' 'like,' 'মত,' বা 'মতনের' সংখ্যা গুণে সাহিত্যে কেরাণীরগিরি করে থাকেন এ প্রশ্নের জবাবে তাদের নিকট থেকে ভাঁড়ামি ও বদরসিকতার 'বারমাস্যা' ও 'centenary ছাড়া বারমাসে কিম্বা শতবর্ষেও আমরা আর কিছু আশা করি না। দু একটী কবিতার খোঁচায় এসব গণ্ডারের যদি নিপাত হয় মন্দ কি? কিন্তু ক্লাসিসিজমের limitation নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখ্‌ছেন ও romantic কাব্যের সমালোচনা করছেন তাঁদের কাছ থেকে সাহিত্যালোচনায় আর একটু বেশী সূক্ষ্মতা ও আর একটু বেশী সতর্কতার আশা করে থাকি।

ঘরে-বাইরে

গত ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা হয়ে গেছে। বাংলা দেশের গৌরবের কথা যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে যা বলেছেন আমরা তার কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করতে চাই। কিছু কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে 'অতি-আধুনিক' বলে যে কয়েকজন তরুণ লেখকের রচনা নিন্দিত হয়ে চলেছে—তার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের এ কয়টী কথা বিশেষ করে অনুধাবন যোগ্য। চিরকালই সাহিত্যে যখন তারুণ্যের প্রকাশ হয়—তখন জন কয়েক তথা কথিত সমালোচক সে-তারুণ্যের নব-প্রভায় সচকিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা মনে করেন—এত দিনকার সাহিত্য বুঝি এবার রসাতলে গেল। সেজন্য তাঁরা সে-তারুণ্যের বিরুদ্ধে যত রকম বিদ্রূপ সমালোচনা, হীন ব্যক্তিগত বক্রোক্তি—তা তো করেনই, তাতেও যখন বিশেষ ফলোদয় হয় না, তখন কোন কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৃদ্ধ সাহিত্যিকদের স্তুতি-সুলভ স্বপক্ষীয় মতামত নজীর স্বরূপ পাঠক সমাজে প্রচার করেন।

এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য এই—

"অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধ-মূল সংস্কার—যে কাব্য উপন্যাসের ভালমন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের উপরেই। কিন্তু এ কি বিজ্ঞান! ইতিহাস? এ কি শুধু কর্ত্তব্য কার্য, শুধুই শিল্প—যে বয়সের দীর্ঘতাই হবে বিচার করবার সব চেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন ভারাক্রান্ত—নিজের জীবন যখন রসহীন, রসের বিচারে যৌবন কি বার বার দারস্থ হবে গিয়ে তারই? * * * তারা জানেনা যে, আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই একই বিধান। সৃষ্টির কালটাই হল যৌবন কাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকাবুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে পড়ে, তার উৎস-মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ ৫৩ বছরে পা দিয়ে এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই।"

আধুনিক নামে অভিহিত পত্রিকায় প্রকাশিত সব মতামতই যে অন্যান্য আধুনিক পত্রিকারও মত—এ ধারণা হয়তো অনেকেরই আছে। কিন্তু ধারণাটি ভুল। মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও—ভুল কিংবা দোষ যখন একের দেখা দেখা দেয় তখন তা নিতান্তই তার একার।

শ্রাবণের 'প্রগতি'তে শ্রীমন্মথ ঘোষ 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরূপ' প্রচার করেছেন। মূল বিষয়ের সহিত একমত হ'লেও লেখকের রচনায় যে-ঔদ্ধত্য ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখিত। তিনি বলেছেন—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে intensity imagination এর অভাব দেখা যায়। আমরা তো ভেবে পাইনে রবীন্দ্র-কাব্যে যদি ইমাজিনেসানের অভাব ঘটে থাকে তো ইমাজিনেসনের বড়াই করা চলে আর কোথায়? লেখকের হয়তো দুর্ভাগ্য যে তিনি স্বপ্ন, তপোভঙ্গ, উর্ব্বশী প্রভৃতি কবিতা পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের ইমাজিনেসানের তুলনায় তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সমস্ত কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিও বরং 'কথার কারসাজি' বলে মনে হয়।

'সাহিত্য-রূপের' প্রতিবাদ স্বরূপ এই সংখ্যায় অন্যত্র শ্রীবিষ্ণু দের 'নব-সাহিত্য তত্ত্ব' প্রকাশিত হল। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদটি মন্মথবাবুর মূল বিষয়ের বিরুদ্ধ না হ'য়ে মোটামুটি একটা attack হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্র প্রীতি ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রীতি এক কথা নয়। রবীন্দ্র প্রীতি নিয়ে অসন্তোষ ও বক্রোক্তি প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু তাতে 'সাহিত্য-রূপের' রূপান্তর প্রতিষ্ঠা হয় না। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে বিষ্ণুবাবু অনেকটা সরে গেছেন—বিশেষতঃ রচনাটি স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক কোটেশ্যন্' জর্জ্জরিত হওয়ায় তিনি যা নতুন করে বলতে চেয়েছেন তার রূপটি সহজ ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি; তবুও মন্মথবাবুর অশ্রদ্ধার অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের যথেষ্ট সার্থকতা আছে বলেই মনে করি।

স্থানাভাব বশতঃ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরদেশী চিঠি' ও শ্রীঅরিন্দম বসুর 'তীর্থ-পথ'—এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস দুটি এ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল না, বলে আমরা পাঠক ও লেখকের নিকটে ত্রুটি স্বীকার করছি।

সত্যকার বড়োদরের মানুষ ও সাহিত্যিক মানব হৃদয়ে যে কি শ্রদ্ধা ও প্রীতি পান, টলষ্টয়-শত-বার্ষিকীতে তার একটা উদাহরণ মেলে। আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে রসিয়ার এই ঋষি সাহিত্যিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গত সংখ্যায় আমরা 'সওদায়' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালিকলমে' প্রকাশিত 'ছিঃ! ছিঃ!' শীর্ষক গল্প সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম, তা গল্পের কদর যাচাই করে নয়। সওদা প্রসঙ্গে আমরা কোনদিনই গল্পের সমালোচনা মূলক বিচার করি না। উক্ত গল্পের শিরোনামা সম্বন্ধেই শুধু ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছিল—তা' ছাড়া আর কিছু নয়।

Printed & Published by Sj. Nripendra nath Banerjee from the Bela Printing Works
14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

ডেনিস মউনির

গোল্ড লিফ নং ১ ব্রাণ্ডি

বিশ বৎসরের পুরাতনের গারাণ্টি



রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে

ও

সুস্থ দেহ সবল করিতে অদ্বিতীয়!!!

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীতে

ডেনিসমউনি

পরীক্ষিত ও সমাদৃত!

সোল এজেন্টস্—এন্, সি, সাহা এণ্ড কোং

কলিকাতা মাদ্রাজ।

প্রগতি

সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

আষাঢ়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে

গত বৎসর প্রগতিতে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নাম

শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীপ্রভু গুহঠাকুরতা	নজরুল ইস্‌লাম
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী
জসীমউদ্দীন	শ্রীযুবনাশ্ব	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শ্রীবুদ্ধদেব বসু	শ্রীজীবনান্দ দাশগুপ্ত	শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

৪৭, পুরাণা পল্টন. রমণা, ঢাকা।

সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষিত

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

বিশুদ্ধ ঘৃতের মিষ্টান্ন ও সরেশ সন্দেশ পাইবার এক মাত্র স্থান।

ও আমিষ খাবারের জন্য মডেল ক্যাবিন

শ্রীমানি মার্কেট, সিমলা, কলিকাতা।

সতীশ কবিরাজের ভুবন বিখ্যাত

শ্বাসারি

৫৭, রাজা নবকৃষ্ণর স্ট্রীট কলিকাতা

—সম্পাদক—

শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি, শ্রীঅরিন্দম বসু।



বার্ষিক ৩৷৵০ আনা।

ধূপছায়ার বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৩০৲ টাকা
দ্বিতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
তৃতীয় ,, পূর্ণ ,,	...	...	৩০৲ টাকা
,, ,, অর্দ্ধ ,,	...	...	১৬৲ টাকা
চতুর্থ ,, পূর্ণ ,,	...	...	৫০৲ টাকা
সাধারণ ,, পূর্ণ ,,	...	...	১৫৲ টাকা
সাধারণ কভারের অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	...	...	৮৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৫৲ টাকা
সূচীর নীচে অর্দ্ধ ,,	...	...	১০৲ টাকা
,, ,, সিকি ,,	...	...	৬৲ টাকা
টাইটেল পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা
আরম্ভের সম্মুখের পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲ টাকা

কার্য্যাধ্যক্ষ—ধূপছায়া।

১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয় সুচী

বিষয় সূচী

ধূপছায়া

সম্পাদক—
শ্রীরেণুভূষণ গাঙ্গুলি,
শ্রীঅরিন্দম বসু।

কার্ত্তিক, ১৩৩৫
দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

কর্ম্মসচিব—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৪ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যালয়—৭১।২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।



স্পর্দ্ধা

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্লথ-প্রাণ দুর্ব্বলের স্পর্দ্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদ-ঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তা'র
কলুষ কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার;
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোক-বঞ্চিত তার অন্তরের কাণায় কাণায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্বুদিয়া,—ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষ-বায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনা-বিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।—প্রাণপণ বলে
মন তার করে কষাঘাত। জীর্ণ মজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রী তলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

মা

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়াই রাণী তাড়াতাড়ি সশব্দ পদক্ষেপে বাড়ী ঢুকিয়া, উপরদিকে চাহিয়া ভাঙা গলায় ডাকিল—"গোপাল—অ গোপাল, গোপলা রে—"

তেতলা হইতে হিন্দুস্থানী ভৃত্য গোপালরাম উত্তর দিল—"যাই মাঈজী।" গোপাল দৌড়িয়া নীচে আসিতেই, রাণী কহিল—"যা শীগ্‌গির করে ট্যাক্সি থেকে বাক্স বিছানাটা নামিয়ে নিগে' আর ড্রাইভারকে এই একটাকা বারো আনা দিবি—"বলিয়া আঁচলের খুঁট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া গোপালের হাতে দিল। গোপাল চলিয়া গেল, রাণী ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল।

বেলা প্রায় নয়টা। মাঘ মাস। আকাশ মেঘলা। জোড়ে বাতাস বহিয়া শীতের প্রতাপ ঘোষণা করিতেছিল। দোতলায় চারিদিকে ঘেরা বারান্দা; বারান্দার সংলগ্ন অনেকগুলি ঘর। কোনওটি তখনও একবারে খিল-আঁটা বন্ধ, কোনওটি আধ ভেজানো, কোনওটি একবারে খোলা। এই সব ঘরের অধিকারিণীদের মধ্যে ২।১জন উঠিয়াছিল, ২।১জন রাণীর গলার আওয়াজে ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া, লেপ কি র‍্যাগ মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিয়া রাণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কোনও কোনও মেয়ে দুয়ার খুলিলই না, তাহাদের উস্কখুস্ক চেহারা, এলোমেলো চুল, শীর্ণ শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ, লাল ফুলো-ফুলো চোখ, চোখের নীচে কালি-ঢালা নিষ্প্রভ চাহনি, কোল-বসা কোণ, শুক্‌নো পানের ছোপে কালো পুরু ঠোঁট, কালো-কালো শির উঠা দাঁত—বীভৎসদর্শনা রমণীগণকে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছিস্ তো তোরা? ওমা, এখনও উঠিস্ নি? দশটা বাজে যে? নীরি কৈ?"

একজন উত্তর দিল—"তাদের দল কাল ফিল্‌ম্ তুলতে পুরী গেছে—"

রাণী জিজ্ঞাসা করিল—"পটলিকে দেখ্‌চি না যে?"

পট্‌লির দিদি কহিল—"সে বাগানে গেছে—"

রাণী পুনরায় সুধাইল—"কিরণ?"

কিরণের পাশের ঘর-বাসিনী কহিল—"আর তার কথা বল' কেন, দিদি সে আজকাল খুব উড়্‌চে। সে বৈকেলে থিয়েটারে যায়, তারপর প্লে করে যে কার সঙ্গে কোন্‌দিন কোথায় উধাও হয়, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। বাড়ী ফেরে দুপুরে—কোনও কোনওদিন ফেরেও না—"

"বটে?—বলিয়া রাণী ত্রিতলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াইল। ওদিকে রাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার কুকুরগুলি হাঁচড় পাঁচড় করিয়া, কেঁউ কেঁউ শব্দে, শিকল ছিঁড়িয়া ফেলে আর কি? রাণী তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"দাঁড়া, দাঁড়া, যাই যাই, চল্‌লাম—এই চল্‌লাম, বাবা আমার, ধন আমার, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার—"

খাঁচায় একটা টিয়া পাখী ছিল, সেও ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছিল।

বিড়ালগুলি ইত্যবসরে পিঠ উঁচু করিয়া, লেজ তুলিয়া, করুণভাবে মেঁউ মেঁউ করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিয়া রাণীর দুইটি পায়ের উপর গা ঘেঁষিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাণী সস্নেহে দুইটি বিড়ালকে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আদর করিয়া নামাইয়া দিয়া, আর দুটিকে তুলিল।

মীনা জিজ্ঞাসা করিল—"যা' হোক্, তুমি যে এলে আমরা বাঁচলাম, দিদি! এমন না বলে' না কয়ে' মাঝে মাঝে হুপ্ করে' কোথায় উধাও হও, দিদি?"

রাণী একটু হাসিল মাত্র, কোনও উত্তর দিল না

ভুলি আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসী ওর বাপের বাড়ী যায় লো, নেমন্তন্ন খেতে। আমাদকে বলে না, পাছে আমরাও ওঁর পেছু নিয়ে গিয়ে সেখানে ভাগ বসাই—বুঝলি সাঁজের বাতি ?"

ভুলির সাঁজের বাতি মীনা কহিল—"সত্যি দিদি, মাঝে মাঝে এমন কোথা যাও, তোমায় বল্‌তে হবে। আগে তো কখনও তোমার এমন দেখি নি ? তুমি এই তিন দিন ছিলেনা, এর মধ্যে দু' দু'টো বায়না এসেছিল, ফেরৎ গেল—ঐ সত্যর কাছে পাঠিয়ে দিলুম, কি করি ?"

রাণী সহজ কণ্ঠে কহিল—"বেশ করেচ'।"

বেঁকি একটু ঠেস্ মারিয়া কহিল—"বাড়ীউলী মায়ের যত বয়েস বাড়্‌চে, তত ছেলেধরা রোগ বাড়্‌চে—দেখ' না চেহারাটা কি হয়েচে ? আচ্ছা বেয়ারাম বাছা তোমার! এই দুর্দ্দান্ত শীত, লোকে ঘর থেকে বারান্দায় দাঁড়াতে পারে না, আর বাড়ী ছেড়ে তুমি কোথায় অমনি চলে গেলে ? আর গেলে—গেলে তো, একেবারে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত গায়েব ? আচ্ছা নেশা বটে বাবা ? একেই বলে বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ !"

রাণী কোনও জবাব না দিয়াই অপ্রসন্ন মুখে উপরে উঠিতে লাগিল। রাণীর পশ্চাতে রমণী তিন জনে পরস্পর চোখ টেপাটেপি করিয়া, মুখে কাপড় গুজিয়া, নিঃশব্দে ইঙ্গিত ইশারায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ঠাট্টামস্করা করিতে লাগিল।

বেঁকি চাপা গলায় কহিল—"বুড়ী এই বয়সে ছোঁড়া ছোঁড়া করে' পাগল হল' যে! আ মরুক—গলায় দড়ি ; মুখ্‌খে আগুন্—মুখ্‌খে আগুন্—"

ভুলি বলিল—"সত্যি ভাই, মিছে নয় ! ঐ মাগীর ভয়ে ছোঁড়ারা এখন এ বাড়ীতে আস্‌তে ভয় করে। যে একবার আসে, সে আর দু'বার এ বাড়ীর মাটি মাড়ায় না। ছোঁড়া দেখেচে কি, ওর নোলায় জল শক্-শক্ করে—কখন নিজের ঘরে নিয়ে যাবে, এই ওর চিন্তে—একি অনাছিষ্টি ভাই, বলত' ? মাইরি ভাই, ও যদি এমন করে, তাহলে আমি এ ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাব—মাইরি যাব'—দেখিস্—"

মীনা বলিল—"আমারও কি ছাই এই সব ভাল লাগে ? তবে কি করি ? বায়না টায়না হলে আমায় সঙ্গে নিয়ে যায়, ওর দৌলতে দু'পয়সা পাই, চটাতেও পারি না। তা ছাড়া এক বছরের আগাম ভাড়া দিয়েছি যে! মন কর্‌লেই বা উঠি কি করে' ?"

বেঁকি কহিল—"মাগীর ঢং দেখে গা জলে যায় ! এদিক সাধ সেজে দিন রাত্তির হরিনাম করা হয়, নিরামিষ খাওয়া হয়, ঠাকুর বামুনের পূজো আচ্ছা দেওয়া হয়, রোজ গঙ্গাস্নানে যাওয়া হয়, আবার সেদিন ঘটা ক'রে মন্তর নিয়ে গুরু করা হল, এক মোট টাকা খরচ ক'রে মন্দির করে ঠাকুর পিত্তিষ্ঠে করা হল, স্বদেশীওয়ালাদিকে পর্য্যন্ত সরফরাজী ক'রে নগদ একশো টাকা চাঁদা দেওয়া হল—কোনো অনুষ্ঠানেরই ক্রুট নেই, দেখ্‌চ তো ?—"

ভুলি বাধা দিয়া কহিল—"তা' ভাই, এ তো আর মিছে কথা নয় ! এ সব তো আমাদেরই স্থাখ্‌তা ! ঐ তো যোগেশ শীল কতদিন ধরে' হাঁটা হাঁটি কর্‌ল, থাক্‌লো তার কাছে ? শীলেরা বাবা, রাজা লোক, মস্ত বড় মানুস ! মাগী নেহাল হয়ে যেতো ; কিন্তু রাজী হল কি ? হল না তো ! এক কথা বল্‌লে—আমি ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচি !"

মীনা কহিল—"তা' ভাই সাঁজের বাতি, সত্যিই তো ! ওর টাকার অভাব কি ? কল্‌কাতায় তিন খানা বাড়ী, হাজার বিশেক টাকার গয়না, কোম্পানির কাগজ তার সুদ আসে,—ওর অভাব কিসের ? তা ছাড়া, এক এক দিনের বায়নাতেই তো মবলগ্ একশো টাকা ! মাসের মধ্যে দশটা বায়না তো লেগেই আছে। বাড়ী ভাড়াই আসে মাসে তিনশো টাকা ! ও কি জন্যে আর পরের এক্তাজারী সইতে যাবে, বল ? এ কি সুখের জীবন, ভাই ? দেখ্‌চ' তো কি কষ্টে রোজগার হচ্ছে ? সময় সময় মনে হয়, লোকের বাড়ী জল তুলে বাসন মেজে খেয়ে, এক খানা খোলার ঘরে, শান্তিতে গিয়ে পড়ে থাকি—"

বেঁকি বাধা দিয়া কহিল—"বেশ তো। আমিও তো তাইই বল্‌চি! সব ছেড়ে ধর্ম্ম কর্ম্মে যদি মনই দিলে তবে আবার ছোঁড়া ডেকে ডেকে ফেরা কি জন্যে? বল্‌ব কি ভাই, সেদিন একটা লোক এসে বল্‌লে যে তাকে খাবার খাইয়ে, টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে, কত সব কি জিজ্ঞেসা-পত্তর করেছিল; তাকে ছাড়্‌তেই চায় না—সে একরকম জোর ক'রে তবে পালিয়ে আসে! আমি তো হেসে বাঁচিনে—"

ভুলি কহিল—"তা' বাড়ীউলির বয়েসই বা এমন কি? এই বড় জোর ৪০।৪২ হবে, কি বল' সাঁজের বাতি?"

মীনা বলিল—"ঐ আর কি? ওর বেশী তো মনে হয় না। কিন্তু ঐ বয়সেও কেমন সুন্দর চেহারা খানা বজায় রেখেচে বল' দেখি, ভাই? সাজ পোষাক করলে, মনে হয় যেন ২৫।৩০ বছরের ছুক্‌রি! নয় কি?"

বেঁকি একটু নরম হইয়া কহিল—"তা বটে। সে পড়ে মরুক্ গে! এখনও মন টুক্‌টাক্ করে মাঝে মাঝে কোথায় যায় তার পাতা লাগাতে পারিস্? কি যে হয়েচে ওর এই বছর দেড়েক হ'তে কেবলি ফুক্‌ফাক্ ক'রে গা-ঢাকা দেয় ব্যাপার খানা কি? খোঁজ নেনা ভাই!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। অপরাহ্ন। ক্ষীণায়মান শীতের শীতল অঞ্চল-প্রান্তখানির স্পর্শ শেষরাত্রে এখনও গায়ে ঠেকে। দিনের বেলায় বেশ গরম। রাজ্যের খড় কুটা ধূলিবালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে এক একটা দম্‌কা হাওয়া মাতালের মত লোকের রুদ্ধ দুয়ার জানালা ঠেলিয়া হাহাকার অট্টহাস্য করিয়া উন্মাদলীলায় ছুটাছুটি করিতেছে। রাণী তাহার নিজের ত্রিতলস্থ কক্ষে তক্তাপোষের উপর উদসীন দৃষ্টিতে খোলা জানালার পাশে বসিয়া, রাস্তার লোক চলাচল দেখিতেছিল।

ঘরের সাজসজ্জা অতি সাধারণ ও সাদাসিধা, মেসের একটি ঘরের মত। জানালার পাশেই চারি টাকা মূল্যের একখানি কেওড়া কাঠের তক্তাপোষ, তাহার উপর একখানি শতরঞ্চির উপর তোষক পাতা, খদ্দরের চাদর ঢাকা বিছানা ও মাথার একটি বালিস। দেওয়ালে অন্নপূর্ণা, সতী দেহ স্কন্ধে শিব, কালীঘাটের কালী, গুরুদেব ও কৃষ্ণ রাধার কয়েক খানি পট; এক কোণে এক খানি ছোট বেঞ্চির উপর লোহার সিন্দুক আল্‌মারি, তাহার পাশে একটা বড় ষ্টীলের বাক্স; অন্য কোণে একটা জলের কুঁজা ও উপুড় করা একটা গ্লাস; তক্তাপোষের নীচে একটা পুঁটুলি ও পুরাতন একটা সুটকেস্। দরজার পাশেই ছোট একটা টেবিল, তাহার উপর টেলিফোন্ ও সরু একখানি বই—এক খানি বটতলার কাশীরাম দাসের মহাভারত একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, একখানি সাধন সঙ্গীত ইত্যাদি।

টেলিফোন্ ডাকিয়া উঠিতেই, রাণীর চমক ভাঙ্গিল। ব্যস্ত হইয়া কলটা ধরিল। কিয়ৎকাল কথা কহিয়া, অপ্রসন্ন মুখে "আচ্ছা" বলিয়া কল নামাইয়া রাখিতেই, মীনা আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ডাক্‌ছিল, দিদি? কোথায় বায়না হল?"

রাণী তাচ্ছল্যভাবে কহিল—"ও ঐ হলুদ পুকুরের রাজ-বাড়ী থেকে। দোলের দিন গান গাইতে হবে—"

মীনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"তা' একাই তুমি যাবে না আর কাউকে সঙ্গে নেবে; দিদি?"

রাণী স্থিরভাবে কহিল—"বায়না আমার একারই বটে। তবে তোকে সঙ্গে নেব'খন্, ভাব্‌চিস্ কেন? একা আমি কোথাও যাই?"

হাবে ভাবে চোখে মুখে মীনার আনন্দ ঠিকরিয়া পড়িল। কহিল—"তা' দিদি, আমি তো তোমার ভরসাই করি! তুমি আমায় একটু ভালবাস', সেজন্যে কত লোকের যে চোখটাটায়, তা' আর কি বলব' তোমায়, দিদি—"

রাণী বাধা দিয়া কহিল—"তা' হলে ঐ ঠিক থাক্‌ল, দোলের দিন সন্ধ্যে বেলা—দোল তো এসেচে, পরশু পূর্ণিমা—পরশু সন্ধ্যেয়, তা' হলে—"

মীনা কহিল—"আচ্ছা দিদি আর বল্‌তে হবে না

আমি ঘর থেকে তোমার ফোনের কথা সব শুনেই তো ছুটে এলাম।"

রাণী থপ্ করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"তারপর মীনা, তোকে আমি যা' বলেছিলাম, তার কি হলো ? কিছু চেষ্ট বেষ্টা কর্‌চিস্, না কেবল ঐ মুখে—"

মীনা অপ্রস্তুত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা দিদি-মণি ? আমার তো—"

রাণী একটু অপ্রসন্ন মুখে হতাশ ভাবে নিজ কপালে দক্ষিণ হাতটি ঠেকাইয়া কহিল—"আ আমার পোড়া কপাল! অত ক'রে তোদের সবাইকে সেদিন বল্লাম না যে লাল মোহন বটব্যাল নামে ২৫।২৬ বছরের কোনও ছেলে তার ডান দিকের গালের নীচে কালো একটা জরুল আছে যদি তোদের ঘরে আসে বা তোদের কোনও বাবুর জানা ঐ নামের কোনও ছোক্‌রা থাকে, তাহ'লে আমায় তার সন্ধান দিতে। বলি নেই ?"

মীনা লজ্জায় মুইয়া পড়িল। আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে ভাঙা ভাঙা ভাষায় কহিল—"দু' একজনকে সুধিয়েছিলাম দিদি, তারা কেউ জানে না; তারপর ভুলে মেরে দিয়েচি—যা হোক্, আর ভুলচি না, আমায় মাপ্ করো—"

রাণী শক্ত ভাবে কহিল—"আচ্ছা দয়া করে' আর যেন ভুলো না। এই সামান্য একটা কাজ, তোদের দিয়ে হয় না ? ছিঃ—"

মীনা সলজ্জভাবে কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি, দিদি, আর কখনও গল্‌তি হবে না, এবারটি আমায় মাফ্ করো—"

রাণী গোপালকে ডাকিয়া কহিল—"রাখাল ওস্তাদকে বলে' আয়, কা'ল সকালে ৯টার সময় যেন আসে। পরশু সন্ধ্যেয় হলুদ পুকুর রাজবাড়ীতে বায়না আছে—"

গোপাল চলিয়া গেল। রাণীর পূর্ণ নাম রজোরাণী। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল এই কলিকাতা সহরে সহরে রাজা হীন রাজ্য করিয়া রাণী নামেই সবিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, রজোটুকু ঝরিয়া পড়িয়াছে। বিগত ৫।৬ বৎসর যাবৎ গণিকা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়ায়। কারণ গুরু বলিয়াছেন, জগতে এমন কোনও পাপ নেই, যাহা হরিনাম কীর্ত্তনে না ক্ষয়িত হয়; এই জন্য তিনি রাণীকে কীর্ত্তন্ গান গাহিয়া দিনাতিপাত করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখন রাণী সহরে সর্ব্বশ্রেষ্ট কীর্ত্তন গায়িকা। শ্রোতারা বলে, রাণী যেমন দরদ দিয়া তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন গায়, এমন নাকি আর কেউই পারে না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। মীনা সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দিদি, এ লাল মোহন বটব্যাল কে ? তাকে এমন করে খুঁজচ কেন ?"

রাণী কোনও উত্তর দিল না, জানালার বাহিরে চাহিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল।

মীনা তদ্রূপ ভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি ? আচ্ছা, কদ্দিন সে আস্‌চে না ? এখন কার বাড়ী যায়, তা' কিছু খোঁজ পেয়েচ ? এটা জান্‌তে পার্‌লে, আমি নিজেই তার ঠিকানা লাগাতুম্, কারও তোয়াক্কা রাখ্‌তুম না—"

রাণী তথাপি নীরব, তাহার বড় বড় টানা দুইটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। চোখে জল টল্ টল্ করিতে লাগিল, একটু নড়িলেই গড়াইয়া পড়িবে।

মীনা ইহা লক্ষ্য না করিয়াছ প্রশ্ন করিয়া চলিল—"সে কি তোমার বাবুর বন্ধু হয়ে আস্‌ত, না সেই তোমার—"

রাণী স্তম্ভিত আকাশ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল—"মীনা, তোরা কি একেবারে গোল্লায় গেছিস্ ? এই ১০।১২ বছরের মধ্যেই তুই এমন পাথর হয়ে পড়েছিস্ ? ধন্যি যা' হোক্ মেয়ে তোরা! নোংরা কথা ছাড়া কি তুই কিছুই ভাব্‌তে পারিস্ না ? ছিঃ ছিঃ—"

মীনা অপ্রস্তুত হইয়া মুখ নীচু করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার কপালে ঘাম ফুটিতে লাগিল। অথচ, রাণীকে চটাইয়া কিছুই বলিতেও পারে না।

বিরক্ত হইয়া রাণী কহিল—"যা খুব হয়েচে তোকে আর আমায় দরদ দেখাতে হবে না। যা, নীচে যা—সন্ধ্যে হয়ে এল।"

মীনা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে নামিয়া গেল।

অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল—"ওঃ বুড়ো বয়সে কি ঢলানটাই না ঢলাচ্ছ? নোংরা হলাম আমরা আর যত সাধু হলেন উনি, কুঁড়োজালি হাতে করে? এ বয়েসে ছোঁড়াদের পেছু পেছু ঘুরতে লজ্জা লাগে না? পোড়া কপাল আর কি? মলেন্—মলেন্ একবারে লাল মোহনের জন্যে—"

কি জানি কেন মীনা এমন ঈর্ষিত হইতেছিল।

রাণী উঠিয়াছিল, আবার বসিল। অবাধ অশ্রুজল আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়া দিল। রাণীর আবার মনে পড়িল সেই পঁচিশ বৎসরের আগেকার কথা।

ব্রাহ্মণ কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী। স্বামীর ঘর। দরিদ্র স্বামীর অতি কষ্টের সংসার; কোনও রকমে আধ-পেটা খাইয়া, ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা রক্ষা করিয়া, হাজার অভাব অনটনের মধ্যেও স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসায় হাসি মুখে দুঃখকে জয় করা সুখ। তারপর তাহার নারীজীবনকে সার্থক করিয়া সুন্দর সুকুমার পুত্রলাভ। রাণীর সেদিন দুঃখেরও যেমন অন্ত ছিলনা, সুখেরও তেমনি সীমা ছিলনা। সে কি সংগ্রাম! কিন্তু হতভাগিনী সে, পরাজয়ই যে তার বিধিলিপি! অকস্মাৎ স্বামী কলেরায় মারা গেলেন, রাণী তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য কি দুরন্ত চেষ্টাই না করিয়াছিল! কিন্তু তিনি বাঁচিলেন না। দরিদ্রের সংসারে বিধবা রাণী শুধু পুত্রের মুখ চাহিয়া দাসীরও অধম খাটিত! দেবরেরা তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত না। কিন্তু খোকার মুখ চাহিয়া সে নীরবে সব সহ্য করিত। তাহার অনবদ্য রূপ-রাশিই যে তাহার জীবনে মহাশত্রু হইবে, তাহা সে যদি এতটুকুও পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিত, তাহা হইলে যে কি করিত, আজ তাহা বলা কঠিন। স্বামীর মৃত্যুর পর, এক বৎসরের মধ্যেই দুইটি দেবরও অগ্রজের অনুসরণ করিল—একজন জলপথে কিনা নদীতে ডুবিয়া, অন্যজন স্থলপথে অর্থাৎ ম্যালেরিয়ায় বহুদিন ভুগিয়া। একাকিনী সুন্দরী যুবতী স্ত্রী—সহায় সম্পত্তি নাই, ঘরে অন্ন বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই,—এমন অমৃত যোগ, জমিদার উপেক্ষা করিলেন না। এক-দিন প্রভাতে রাণী দেখিল, বছর খানেকের শিশু পুত্রটি তাহার ভিটায় পরিত্যক্ত ও সে হরিপুরে বাবুদের জমিদারী কাছাড়ীর একটি ঘরে, ক্লান্ত, অবসন্ন, শায়িত এবং সর্ব্বস্ব অপহৃত! মনে পড়িল, গতরাত্রে সে অনেক কাঁদিয়া ছিল, চেঁচাইয়াছিল, হাত পা, ছুঁড়িয়াছিল, হাতের গোড়ায় যাহা পাইয়াছিল তাই দিয়া অপহারকদিগের দুই একজনকে অল্প স্বল্প জখমও করিয়াছিল, তবু আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। সে একা ১৬।১৭ বৎসরের রমণী, অন্যদিকে ৮।১০জন যোয়ান বাগ্দী ও দুলে। দুই বৎসর কাল সেই অবরোধ। সে সব হারাইতে বাধ্য হইল। মুক্তির জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছিল। তবু মুক্তি পায় নাই! বিধাতার নির্ব্বন্ধ!

পুত্রটি? সে-ও সেই স্মরণীয় রাত্রে কি করিয়া নিহত হয়। রাণীর সবই আস্তে আস্তে গেল। বাবু তাহাকে দুই বৎসর পরে কলিকাতা আনিয়া বনবাস দিয়া গেলেন। রাণী সেই হইতে বনজন্তু হইল। দীর্ঘ বিশ বৎসরের কলিকাতা বাস! বৈচিত্র্যহীন! একই কথা, একই কাজ, একই চিন্তা, একই ধারা! তবে সে অর্থ অনেক রোজগার করিল, সম্পত্তি করিল! নিজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ কখনই করে নাই! কেবলি মনে পড়িয়াছে দরিদ্র সেই স্বামীর সংসার, পুত্রের সেই দুধের অভাবে ভাতের ফেণ খাওয়া!! জমিদারের উপর যে রাগ হইয়াছিল, সেটা তাহার অপমৃত্যুতে শান্ত হইয়াছে। সে নিজের অদৃষ্টকেই এখন দোষ দেয়। কিন্তু দরিদ্র স্বামীর ভালবাসা যদিও সময় সময় ভুলে, পুত্রের মুখ রাণী এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারে নাই। পাখী, কুকুর, বিড়াল পুষিয়া তাহাদিগকে কোলেপিঠে করিয়া সেবা-যত্ন করিয়া আদর সোহাগ করিয়া, পুত্রের মুখ ভুলিতে চাহিয়াছে, কিন্তু ভোলা দূরে থাকুক—সে মুখ যেন আরও দিন দিন স্পষ্টতর হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে!

হঠাৎ মনে হইল পিতৃকুল ও স্বামীর ভিটাটি একবার দেখিয়া আসে! আজ বছর দেড়েক হইল সে গিয়াছিল। পিতামাতার আর সন্তান ছিলনা, তাঁহারা উভয়েই স্বর্গে

গিয়াছেন; স্বামীর ভিটায় একজন বাগ্দী বসবাস জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার বুকে কে যেন বর্শার দ্বারা খোঁচা মারিল! কিন্তু সেই খবর দিল যে মহানন্দ বটব্যালের স্ত্রী ছোট ছেলেটাকে ফেলে একদিন রাত্রে পেটের দায়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করিয়াছে এবং সে সেই ছেলেটাকে ঘোষপাড়ায় তাহার মাতামহের আশ্রয়ে রাখিয়া আসে। সে ছেলে এখন কলিকাতায় থাকে, কোম্পানীর আফিসে কি চাকরী করে। রাণী অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার বেশী আর সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

জীবনে অত্যন্ত কটু হইয়া যখন ধিক্কার ফুটিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে রাণী পুত্রের সংবাদ পাইল। ভাবিয়াছিল, অসদুপায়ে অর্জ্জিত সমস্ত ধনসম্পত্তি সে তীর্থ ধর্ম্ম করিয়া, শেষে কোনও সৎকার্য্যে দান করিয়া মরিবে—কিন্তু এখন আর তাহার সে ইচ্ছা নাই! সে একবার শুধু তাহার পুত্রকে দেখিতে চায়! শুধু চোখের দেখা মাত্র! হয়ত পুত্র তাহাকে জননী বলিয়া স্বীকারও করিবে না, কিন্তু তবু সে তাহার পুত্রকে চায়, একটিবার চায়—কতবড় হইয়াছে, কেমন হইয়াছে, কি বলে—কেমন আছে—দেখিতে চায়! সে তো মরিয়াছে! সে মরিয়াই থাকিবে! পুত্রের জন্যও সে আর বাঁচিবে না, বাঁচিতে চাহেও না—তবু তাহার পুত্রকে—

অজ্ঞাতে রাণীর বক্ষে স্তন্যধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে অব্যক্ত যাতনায় কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় বহিয়া যাইতে লাগিল, জ্ঞান নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হলুদ পুকুর রাজ বাটীর প্রশস্ত আঙিনায় প্রকাণ্ড এক শামিয়ানার নীচে বিপুল জন সমাগম। মণ্ডপের রাস্তার দিকটা কানাত দিয়া ঘেরা, বাকী তিন দিক খোলা। সম্মুখে ও পাশে ত্রিতলে পুরাঙ্গনাগণ গান শুনিবার নামে সমবেত হইয়া নানা আলাপ আলোচনায় কীর্ত্তন গায়িকা দুটির গান অপেক্ষা গহনায় সমালোচনায়, এবং পরস্পরের পারিবারিক সুখ দুঃখের কথায় এমনি মশগুল যে কোলের ছেলেরা কাঁদিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বারান্দায় ছুটাছুটি মারামারি করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে—সে দিকে লক্ষ্যও নাই।

নীচে কিন্তু গান জমিয়া উঠিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছদে সুভূষিত নিমন্ত্রিতগণ গায়িকাদের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া ঘন ঘন বাহবা দিতেছেন; চোপদারেরা অনবরত পান সিগারেট লইয়া সম্মুখে সম্মুখে ঘুরিতেছে; রাজা বাহাদুর এখানে ওখানে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, বসিয়া, সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সভা গম্ গম্ করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে রাণী গান করিতেছিল, ক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম মানসে সে বসিল; মীনা গান আরম্ভ করিল। প্রৌঢ় যোগেশ শীল উঠিয়া গিয়া রাণীর পার্শ্বে বসিয়া নাতি-উচ্চ স্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল; উভয়েই মৃদু মৃদু হাসে, মাথা নাড়ে, আবার চুপ করে। তাহা লক্ষ্য করিয়া এখানে ওখানে মৃদু গুঞ্জন উঠিল। রাণীর চক্ষু দুটি কেবল উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ফিরিতেছিল। কত জন তাহাতে কৃতার্থ জ্ঞান করিল, কেহ কেহ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, কেহ কেহ গায়ের উড়ানী খানা অবার খুলিয়া আবার গায়ে জড়াইল, কেহ একটু কাসিল, কেহ একটু হাসিলও। রাণী হয়ত সব লক্ষ্যও করিল না, কিন্তু অনেকে ইহাতে নিজের মনে মনে বেশ একটু আত্ম প্রসাদ অনুভব করিল।

এমন সময় সভার প্রান্তে "আগুন, আগুন" করিয়া একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবা মাত্র, সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। গান বন্ধ হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে কয়েক জনে মিলিয়া একজন যুবককে লইয়া রাজা বাহাদুরের কাছে আনিয়া বসাইয়া দিল। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে যুবকের পার্শ্বোপবিষ্ট হরিবাবু গান শুনিতে এমনি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার হাতের জলন্ত সিগারেটটি কখন যে পরিয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার খেয়ালই হয় নাই। পরে যখন

জ্বলিয়া উঠে, তখন সকলের হুঁস্ হইল; এবং এই যুবক হাতের থাবা দিয়া যদি আগুন না নিভাইত, তাহা হইলে আজ একটা মহা অনর্থ ঘটিত। কিন্তু উক্ত কার্য্যে যুবকের দক্ষিণ হাতটি বেশ পুড়িয়া গিয়াছে। নির্ব্বাক্ প্রশংসমান্ দৃষ্টিতে সকলে যুবকের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখের পানে, নির্নিমেষে চাহিয়াছিল! কনুইয়ের নীচে হইতে, হাতের সম্মুখাংশটি ঝলসিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা বাহাদুরের হুকুমে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল; ডাক্তারের সঙ্গে দুইজন ভৃত্যও ছুটিল, ঔষধ পত্র আনিতে। রাজা বাহাদুর যুবককে সবিনয় কৃতজ্ঞতায় বহু প্রশংসাবাদ করিতেছেন এমন সময়ে উন্মাদিনীর মত রাণী আসিয়া যুবককে জড়াইয়া ধরিতে গিয়াই সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আবার হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মীনা ও তাহাদের দলস্থ লোকেরা, রাণীর সম্প্রতি উন্মাদ রোগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া, ব্যাপারটি ঢাকিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজা বাহাদুর কহিলেন—"তাই হবে, ও এখানে বসে' অবধি যেমন করে' কেবল এদিক ওদিক চাইছিল, তা'তে এখন তাই মনে হচ্ছে বটে।"

সকলেই একথায় সায় দিল! রাণীকে তাহার লোকেরা টানিয়া সরাইয়া লইয়া গিয়া মাথায় হাওয়া করিয়া, নাক টিপিয়া ধরিয়া, মুখের ভিতর হাত দিয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মীনা দূরে সরিয়া গিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতেছিল।

হাতে ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা শেষ হইতে না হইতে রাণীর জ্ঞান হইল। সে আবার এই দিকে আসে দেখিয়া, রাজা বাহাদুর বিরক্ত হইয়া, রাণীকে একটা ধমক দিলেন। রাণী তাহাতে কর্ণ পাতও করিল না, সজোরে হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবককে বক্ষোবদ্ধ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত কেবল তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল।

লোকে হাসাহাসি টিট্‌কারি করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক রমণীর এ কঠিন বাহুপাশে হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গলদ্ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল, রাণী তবু তাহাকে ছাড়ে না। লোকে কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

রাজা বাহাদুর রাণীকে স্থির হইতে আদেশ করিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব্যাপার, রাণী? আরে তোমার হল কি?"

উন্মত্তের মত রাণী অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে দৃষ্টিতে ও হাবভাবে চাহিল—"রাজা বাহাদুর, এই আমার হারানিধি এই আমার হারানো মানিক এই দেখুন্ ডা'ন গালের নীচে জরুল, আমার চেন্না—আপনার দয়াতেই আজ ফিরে পেলাম, আপনাকে আমার কোটী কোটী প্রণাম—" বলিয়া আবিষ্টের মত রাজা বাহাদুরের পায়ে বারে বারে মাথা ঠেকাইতে লাগিল। সকলেই দেখিল যুবকের মুখটি পর্য্যন্ত অবিকল রাণীর মুখেরই প্রতিকৃতি।

সভা নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্, স্তম্ভিত!

রাণী কহিল—"এই আমার সাগর ছেঁচা ধন, আমার ছেলে!"

সব লোক চমকিয়া উঠিল। রাণী ধীরে ধীরে অকুণ্ঠিত ভাবে তাহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস নিবেদন করিয়া, কহিল—"আজ প্রায় দু'বছর থেকে একেই যে খুঁজ্‌চি, মহারাজ! এই লালুই যে আমার জপমন্ত্র হয়ে আছে, রাজা বাহাদুর।"

লালমোহন স্থির ভাবে নত মস্তকে সব শুনিয়া, রাণীর চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ করিয়া, তাহার কম্পিত দেহখানিকে ধরিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিল—"মা আমার, চল' বাড়ী যাই। তুমি যাই হও, যাই করো—তুমি আমার গর্ভধারিণী মা তো!"

তিলোত্তমা

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমার মনের বাতায়ন হ'তে চকিতে কে সে
চটুল চোখের চাহনি হানিয়া নিমেষে লুকায় মধুর হেসে !
শুধু একখানি সুন্দর মুখ—স্বপন-মাখানো সোণার শশী,
উঁকি দেয় দূর ছিন্ন-মেঘের আড়ালে বসি' !
নিবিড় সে কোন্ বনের ফাঁকে
সুদূর গাঁয়ের নিশীথ-প্রদীপ মাধুরী আঁকে !
থেকে-থেকে-জ্বলা-দুরাশার মত আলেয়া ওকি,
দূর মাঠ-পথে মূঢ়-পথিকের কুহকী-সখি ?
বিজলী-মেয়ে
লুকোচুরি খেলে মনের গগন-আগুন বেয়ে ?

শুধু এইটুকু হাসির আলোক সকৌতুকে
ক্ষণে-ক্ষণে আঁকে সে কোন্ লাবনী আমার মনের দীঘির বুকে !
কেশের গন্ধে বেদনার মত সে যেন কোন্ এক দেশের স্মৃতি
স্মরণে জাগায় ভুলে-যাওয়া কার প্রাণের প্রীতি !
শুধু এইটুকু চোখের চাওয়া
বয়ে আনে কোন্ সাগর-পারের স্নিগ্ধ হাওয়া !
মনে হয় যেন জনমে-জনমে জনম-পারে,
দেখা হয়েছিল শত শত রূপে শতেক বারে !
অতীত প্রিয়া—
বেসেছিনু ভালো আমার সকল হৃদয় দিয়া।

কত না প্রেমের রাঙা-নিবেদন আজিও ফুটে
পাপ্ড়ির মত পেলব দু'খানি মমতা-মাখানো অধর পুটে !
কত বিরহের মেঘ-সমারোহ ছল-ছল-দু'টি নয়ন-তটে !
ঘন কুন্তলে কামনার মত কুহক রটে !
কত জীবনের অশ্রু-হাসি
মায়ার মুকুল মধুতে ভরিছে,—হয় নি বাসি।
সেদিনের মত আজিও তরুণ তনুটি ঘেরি'
ইন্দ্রধনুর চারু-আরুণিম-স্বপন হেরি!
মাধবী লতা !
চির-পুষ্পিতা ! চির-মধুরিমা-বিতর-ব্রতা !

একদা অলস সন্ধ্যায় তারে কহিনু ডাকি'
"কে তুমি রূপসী ! পরালে আমারে অবিনাশী এই সোণার রাখী ?
মনের আড়ালে উঁকি দেবে শুধু ? ব্যগ্র-বাহুর পরশ-ভীতা !
মরু-শিখা সম জ্বলিবে সুদূরে অপরিচিতা ?
ধূলার ধরায় দিবে না দেখা ?
সাগরের চোখে র'বে প্রহেলিকা চন্দ্রলেখা ?
অধর-নিকষে অকসিত র'বে প্রেমের সোণা ?
নিশীথ শয়নে বৃথা হ'বে মোর প্রহর গোণা ?
হে উর্ব্বশী !
এ পুরূরবারে করিবে না কৃপা ঈষৎ হসি' ?"

হাসিল রূপসী ;—সহসা মনের কুঞ্জ-তলে
পুঞ্জে পুঞ্জে পুষ্প-কলিরা আঁখি মেলি চায় কৌতূহলে !
মনে পড়ে যেন অমনি হাসিটি দেখেছিনু কবে বাসর-রাতে
রূপ-পিপাসিত বিমোহিত দু'টি আঁখির পাতে।
"ক্ষমা কর মোরে।" কহিল বালা,
"আমি তব চির বেদনার ছবি অশ্রু-ঢালা !
যুগে যুগে জমা আশাহত যত কামনা তব
মনো-শিলা-গেহে গোপনে গড়েছে এ অভিনব
সোণার সীতা ;
মনের মরুতে মরীচিকা আমি দীপান্বিতা !"

সহসা মেঘের আড়ালে লুকালো সোণার শশী ;
নিবে গেল দীপ দূর বন-পারে ; শীতল সমীর উঠিল শ্বসি' ;
মনের কুঞ্জে ফোটা ফুলগুলি শিশির নিসেকে পড়িল ঝরি।
সহসা মিলালো ছায়াময়ী মায়া সে অপ্সরী !
তবু মনে হয়, যেটুকু তা'র
পেনু পরিচয়, সেই মোর চির অহঙ্কার !
বিরহ আমার হোক্ অক্ষয় ; সে তনু খানি
বাহুর বাহিরে থাক্ চিরদিন ; তবুও জানি—
সে প্রিয়তমা,
আমারি ব্যথার তিলে-তিলে গড়া তিলোত্তমা !

—০—

শরৎ সাহিত্যে নারীর রূপ

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

"সন্তান ধারণের জন্য যে সব লক্ষণ নারীর সব চেয়ে উপযোগী তাই তাহার রূপ। সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাই তার ধর্ম্ম যৌবন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই প্রেম।"

—এই দুইটী কথার মধ্যে শরৎবাবু চির দুর্জ্ঞেয় নারী প্রকৃতির যতখানি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন সুন্দরভাবে এবং মনোরম করিয়া মায়াময়ীদিগের মনের গোপন পরিচয় আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, এমনটী হাজার রকমের মনস্তত্ত্ববিদ মনীষির বক্তৃতা অথবা তাহার ভাষ্য পড়িয়াও হৃদয়ঙ্গম হয় না।

"নারীর বাল্যরূপ মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাকে মাতাল করে না। আবার যে দিন সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যায় তখনও ঠিক তাই।......বিশ্বচরাচরে এর প্রতি অণুপরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করিতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করিবে, কোথায় গেলে কার সঙ্গে মিশিলে, কি করিলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে এই তার অক্লান্ত উদ্যম।......"

রূপের হাটে নারীর সম্বন্ধে শরৎবাবু যখনই কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তখনই দেখি—মনে বুকে অথবা দেহে সন্তানের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা পোষণ করিতেছে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Passion শরৎবাবু তাহাকেও ঘৃণিত বীভৎস অথবা উৎকট কিছুই বলিতে চান না। কোন প্রেমই কোনদিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না। যাকে ভাল বাসা উচিত নয় তাহাকেই ভাল-বাসার নাম লোকে বলিয়াছে—কুৎসিত প্রেম। কিন্তু এই ধারণাটা গোড়াথেকেই ভুল। ভালবাসা পাত্রাপাত্র বিচার করে না। যে সত্যি ভালবাসিতে পারে সে সুন্দরকেও যেমন ভালবাসিতে পারে কুৎসিতকেও তেমনি। আর ভালবাসার প্রকৃত অর্থ হইতেছে—উৎকৃষ্টতর পরিণতির

মধ্যে আপনাকে বিকাশ করিবার লোভ,—এবং নিজের অধিকতর সার্থক হইয়া উঠিবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। শরৎ বাবুর সৃষ্ট নারীমাত্রেরই বুকে এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া জাগিয়া ফুল ফুটাইতে চায়। আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, মোহ নাই, সংসারের সকল কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া দিয়াছে নিজের তৃপ্তির জন্য কিছুই চায় না—এরকম নারীর পরিচয় শরৎবাবুর রূপ-রাজ্যে আমরা কোনও দিন দেখি নাই। হয়তো বা সারা পৃথিবীতেও এরকম কেহ থাকিতে পারে না।

নারীর শক্তিময়ী যৌবন-ধর্ম্মের আভাষটুকুও জাগে নাই, বসন্তের মধুসমীরণ দেহের কুলে-উপকুলে শিহরণ জাগায় নাই,—তাহার এমনি তরুণ কিশোর ছবি শরৎবাবু আঁকিবার চেষ্টা করেন নাই কোনও দিন। কিন্তু একেবারেই আঁকেন নাই একথা বলিলে হয়তো বা মিথ্যা না হয় অত্যুক্তি হইবে। 'নিষ্কৃতি'র নীলাম্বরী এবং 'বৈকুণ্ঠের উইল'এর—হেমাঙ্গিনী,—তো আছেই তাছাড়া 'দর্পচূর্ণে' কমলার কথা বাদ দেওয়া যায় না। তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে ইহারা রঙ্গমঞ্চে নামিয়াছে ইহাদের নিজের কোনও স্বার্থ-সিদ্ধি অথবা সার্থকতার অনুরোধে নয়, ইহাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য গ্রন্থে বর্ণিত অপরাপর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ও অভিব্যক্তির খাতিরে। এই স্বার্থ এবং সার্থকতা ভুলিয়া থাকাটাও যদিই বা মেয়ে কয়টার জীবনের উদ্দেশ্য হইত তা হইলেও বুঝিতাম।—মেয়ের অন্ন প্রাশনের সময় দেওয়া অলঙ্কার সোনার না হইয়া পিতলের বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ইহারই অছিলায় অক্ষম দরিদ্র স্বামীকে অপমান করা যায়, আবার পিতৃগৃহে অবস্থানের সময় সেই স্বামীর কাছেই ফিরিয়া আসিবার জন্য মেয়েকে কাঁদাইয়া ভাইএর কাছে অনুমতি চাহিয়া লওয়াটাও অনেক সহজ হইয়া পড়ে—দর্পিতা ইন্দুর চরিত্রের এই দ্বিবিধ রূপটা ফুটাইয়া তুলিবার সহায়ক বলিয়াই কমলার সৃষ্টি। কমলার নিজের যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকুও নাই। অথচ 'পণ্ডিত মশাই'-এর ছেলে চরণ, এবং কৈলাস-খুড়োর নাতি বিশু—প্রত্যেকেরই সত্ত্বা আছে—প্রত্যেকেই নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। কুসুমের জন্যই চরণের সৃষ্টি সে কথা মানি, কিন্তু তাহার চেয়েও চরণের জীবনের আরও প্রয়োজন আছে। সে আসিয়াছিল আমাদের সামনে সমস্ত শিশুজগতের প্রতিনিধি হইয়া। আমাদের মাঝখানে কেশব এবং বৃন্দাবনের মত মাষ্টার মশাই যাঁরা আছেন চরণ তাঁহাদেরই প্রবুদ্ধ করিয়া বলিয়া গেল,—শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাবে অনাহারে এবং অত্যাচারে বৎসরে বৎসরে যত শিশু মারা যায় তাহাদের বাঁচাইতে হইবে। একটা মানুষ জীবনে যদি পাঁচটা ছেলেকে মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারে, এবং এই পাঁচজনও যদি প্রত্যেকে নূতন পাঁচজন মানুষ গড়িয়া যাইবার ব্রত নেয় এমনি করিয়া সারা দেশের সংস্কার করিয়া তোলাটা সুদূর পরাহত হবে না। তাই তো চরণের মৃত্যুতে বৃন্দাবন বলিতে পারিয়াছিল—সংসারে এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আছে!

আর বিশু?—সে একটী পরিপূর্ণ উচ্ছল আনন্দ মূর্ত্তি। কৈলাস খুড়োর দাবা খেলার মন্ত্রী,—সরযূর প্রাণের অবলম্বন। যেন বিশুর আনন্দ রূপটুকু জগতের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্যই কৈলাস খুড়ো বাঁচিয়া ছিলেন। বিশু চলিয়া গেলে তাঁহার নিজেরও কাজ ফুরাইল! বিশু না থাকিলে সরযূরও বাঁচিবার কোনও সার্থকতা ছিল না। চন্দ্রনাথ এবং সরযূর পুনর্মিলনের হাই-ফেন হিসাবেও বিশুর দাম আছে।

নারীচিত্র আঁকিবার সময় এই চরণ অথবা বিশুর মত কোনও শিশুমেয়ের ছবি শরৎবাবু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিলেন না কেন—একথার কৈফেয়ৎ দেবে কে? রূপ-কবিকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি। যৌবনের আগে নারীর যথার্থ রূপ ফুটিবে না মানিলাম, কিন্তু চরণ অথবা বিশুর সৃষ্টির জন্য শুধু রূপেরই বা প্রয়োজন কি? রূপের হিসাব নিকাশ ছাড়া মানুষের কি বাঁচিবার কোনও হেতু থাকিতে পারে না? শরৎ বাবুর দক্ষ হাতের আঁকা নারীর তেমনই কোনও ছবি দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

সৃষ্টি করিবার বয়স যখন পার হইয়া যায় তখন জাগে সৃষ্ট জিনিষের স্মরণে মোহ এবং স্নেহ। লালসা নয়। নারীর ইহাই—বার্দ্ধক্য। বর্ষীয়সী নারীর এই মাতৃরূপ শরৎবাবু বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, জ্যেঠাইমা ও সিদ্ধেশ্বরীতে। এঁদেরও যথার্থ পরিচয় সন্তান বাৎসল্যে অথবা তাহারই অভাব বেদনায়। কিরণময়ীর শাশুড়ীও তাঁহার সন্তান পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসনে দিবাকরকে প্রথমে অত্যন্ত সমারোহেই অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন!

কিরণময়ীর সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও ছিল, ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু—দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে তাহার অসাধারণ রূপ-ও। কিরণময়ীকে শেষ জীবনে দেখিয়া মনে হইয়াছিল—যেন কোন উগ্র ক্ষুধাতুর শোক মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিরণময়ীর জীবনে আগুনের মত তেজস্বিতা দেখিয়াছি, মরুভূমির উৎক্ষিপ্ত পিপাসাও দেখিয়াছি,—এবং দ্বিবিধ রূপই তাহার অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিরণময়ীর ঈশ্বর আত্মা এবং জগতের সম্বন্ধে ধারণা এবং বিশ্বাসের গভীরতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। আবার কিরণময়ীর রূপটুকুও, যেন প্রকৃতিরূপা নারী মাত্রেরই প্রকৃত যৌবনের স্বধর্ম্ম। কিরণময়ী স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, উপীনকে দেখিবার পর। উপীন আসিবার আগে পর্য্যন্ত সে শুধুই ছটফট করিয়াছে কিন্তু নিজের মন বুঝিতে পারে নাই। উপীন আসিতেই চুম্বকের আকর্ষণের মত তাহার প্রভাবে কিরণময়ী মুগ্ধ হইয়া পড়িল। ভালবাসার পিপাসা এবং ক্ষুধার আস্বাদ কিরণময়ী আগেই অনুভব করিয়াছিল। উপীনের মাঝে কিরণময়ী ভাবিল তাহার শেষ আশ্রয় মিলিয়াছে। হিতাহিত কিছুই না ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু উপীন প্রত্যাখ্যান করিল। সে যেন এক পাষাণের দেবতা, প্রেম বা ক্ষুধা কিছুরই মর্ম্ম বোঝে না। কিরণময়ী আঘাত সহিতে না পারিয়া বর্ম্মায় পলাইল। কিরণময়ী চাহিয়াছিল উপীনকে অবলম্বন করিয়াই নারীজীবনের শেষ পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে। তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল উদ্দাম তাই অক্ষম-ক্ষোভেই না শেষে সে পাগল হইয়া গেল!

সাবিত্রীর বুকেও দুর্নিবার হাহাকার শুনি। কিন্তু অনেক কষ্টেই সে আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং বেদনা সংযত করিতে পারিয়াছিল। তাই তাহার রূপ উদ্দাম নয়, শান্ত। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, কিন্তু তথাপি সে পূর্ণ নিষ্কাম হইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে রসিকতা করিবার মোহ টুকুও তাহার কম ছিল না। সতীশের সহিত প্রায় প্রতি কথার মাঝখানেই সে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া মনের বিরোধটুকু ভুলিতে চাহিত।

সরোজিনীকে দেখিয়াও প্রথমে সতীশের মনে কোনও রকম আকর্ষণ জাগে নাই।

কিন্তু সহসা একদিন সাহেবিয়ানা ছাড়িয়া জুতা মোজার পরিবর্ত্তে পা দুখানি খালি, রেশমের জামা কাপড়ের বদলে শুদ্ধমাত্র সেমিজের উপর একখানি সাদাসিধে লালপেড়ে ধুতি পরা দেখিয়া সরোজিনীকে সতীশের এত ভালো লাগিয়াছিল যে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবেগে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকারই তোমাকে মানিয়েচে, যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটী!—

সেই মুহূর্ত্তটীতে যেন সতীশের চোখে রতিরাণীর কোনও সহচরী আসিয়া অঞ্জন লাগাইয়া দিয়াছিল, এবং ইহারই মায়ায় সহসা সরোজিনীর উচ্ছল যৌবনের বাস্তবিক স্বরূপ টুকু সতীশকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল।

এমনই পরিষ্কার ভাষায় রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখী এবং বিজলীরও রূপের পরিচয় পাইয়াছি। শরৎবাবু কাহারও রূপ বর্ণনা করিবার সময় অভিধান খুলিয়া শব্দগম্ভীর বিশেষণের মারফতে আড়াই পাতা লিখিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই কোনও দিন। অলক্ত-রাগরঞ্জিত চরণ দুখানি অথবা আগুল্ফলম্বিত কেশরাজির সন্ধান কিংবা পরিচয় তাঁহার চিত্রশালায় মেলে না। শুধু নায়কের মুখে দুটী কথা—চমৎকার মানিয়েছে, তাই যথেষ্ট। হয়তো বা সামান্য পরণের কাপড়ে ও মাথার ঈষৎ রুক্ষ এলো চুলে

এমন একটা বিশেষত্ব এবং পারিপাট্য থাকে যাহা দেখিয়াই নরেনের মত অ-কবি এবং অরসিক ডাক্তার মানুষও বিজয়াকে বলিয়া ওঠে—আজ আপনি ঘরে ঢুকতেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে ছবি আঁকতে জানে তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ কি সুন্দর!

আমরাও বলি সত্যিই সুন্দর। এমন স্পষ্ট সোজা কথায় কেমন সুন্দর করিয়াই না শরৎবাবু বিজয়ার রূপটুকু আঁকিলেন। শব্দালঙ্কারের আতিশয্য নাই। শুধু গোটা তিন চার সু-নিপুণ রেখার কারিগরী!

সৌদামিনী আত্মকাহিনী বর্ণনা করিবার সময়ে নিজের পরিচয়চ্ছলে বলিতেছে—বীজমন্ত্রের মত আমার এই নামটার মধ্যেই আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসটাই যেন ব্যক্ত রয়ে গেছে! রূপ? তা আছে মানি!......

ইহার বাড়তি headline আর কি-ই বা দরকার!

শরৎবাবুর সৃষ্ট কোন নারীই কালো কুৎসিত নয়।

অবশ্য এইখানে বলিয়া রাখা দরকার—বাহিরের গায়ের রংটাই সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি বলিয়া ধরিতেছি না।

জ্ঞানদা শ্যামাঙ্গী হইলেও রূপসম্পদে সে গৌরী মাধুরীর তুলনায় কাচের পাশে হীরার মতই উজ্জ্বল। চন্দ্রমুখী রাধারাণী কুসুম অভয়া অন্নদা দিদি—কেহই কুরূপা নয়। শুধু Contrast রাখিবার জন্যই সম্ভবতঃ 'পোড়া কাঠে'র সৃষ্টি। কিন্তু তাহাকে লইয়া ভয় পাইবার কিছু নাই। তাহার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিলে—সে কাহাকেও কিছু বলে না। ছেলেপিলে ঘরসংসার লইয়াই থাকে। পরের কথায় কাণ দেয় না। কাজেই মনের রূপ আঁকিবার জন্য যে রঙ দরকার সেটাকে কালো বলিতে পারিব না কিছুতেই।

শরৎবাবুর গ্রন্থে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্রই অধিক ফুটিয়াছে—এমনি একটা অপবাদ অথবা প্রশংসা শোনা যায়।

কথাটা কিন্তু সর্ব্বাংশে সত্য নয়।

সব্যসাচী, গোকুল, বৃন্দাবন, নরেন,—এমন কি একাদশী বৈরাগীকেও আমরা শ্রদ্ধা করি। ইন্দ্রনাথের তুলনা পাই না। সতীশকে তো নিজেদের মধ্যেই অনুভব করিতে চাই।

তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না, পুরুষের চেয়ে নারীর দোষগুণ বর্ণনা করিবার সময় কোথাও বা শরৎবাবু একটু যেন বেশী করিয়াই সহানুভূতি দেখাইতে চাহিয়াছেন। চন্দ্রনাথের চেয়ে সরযূকেই আমরা বেশী জীবন্ত মনে করি। উপীনের চেয়ে কিরণময়ীকেই শ্রদ্ধা করি। শেখরের চেয়ে ললিতাকে ভালবাসি।

নারীর গুণ এবং মনস্তত্ত্ব হয়তো বা সেই সঙ্গে মনোবিকারও বর্ণনা করিতে শরৎবাবু একেবারে চতুর্ম্মুখ। মেয়েদের হইয়া ওকালতি করিতে ওঁর সমকক্ষ যোগ্য লোক মেলা কঠিন। রাজলক্ষ্মী কিরণময়ী এবং সাবিত্রী শরৎবাবুর বক্তৃতার জোরে সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়েদের চেয়েও এত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে যে আর নাগাল পাওয়া শক্ত। শুধু তা নয়—অনেক সময় বটগাছের প্রশংসা না করিয়া আলোকলতাকেই পূজা করি যেন পথিককে গরমের দিনে ছায়া দেওয়ার মহত্ত্বটা তারই। শেখরের আলমারী এবং শেখরেরই টাকা, তবু চাবিকাঠিটা থাকে ললিতার কাছেই। এবং অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক আসিয়া ললিতার কাছেই হাত পাতিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলে—ললিতা পূর্ব্বজন্মে তার মা ছিল এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছে। শেখরের টাকা আনিয়া দান করিয়া ললিতা নিজে দাতা নাম কিনিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। এ রকম মজা করিয়া বিনা মূলধনে বড়মানুষী দেখানো নারী বলিয়াই ললিতার পক্ষে অশোভন হইল না। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপারটা অদল বদল হইয়া যদি এই রকম দাঁড়াইত, ললিতার নিজের অগাধ ঐশ্বর্য্য, এবং শেখর দরিদ্রের ছেলে, ভিখারী আসিয়া শেখরের কাছেই হাত পাতে এবং শেখর ললিতার অজ্ঞাতে তাহার আলমারী খুলিয়া টাকা আনিয়া তাহাকে দান করে—ইহাতে শেখরের সুনাম বাড়িত কি?

দিবাকর নিজে একটা বিরাট সাইফার—অপদার্থ!

তাহাকে দরকার শুধু কিরণময়ীর সাগর-পাড়ি দিবার সময় সাথী হইয়া কিছু পথ অগ্রসর করিয়া দিতে—তাই রেঙ্গুনে নামিয়াই সে বরখাস্ত হইয়া পড়ে।

অপূর্ব্বকে কেহ কেহ বলেন—বাঙালী পুরুষের type ইহাতে অপূর্ব্বকেই গৌরব করা কিম্বা বাঙালী পুরুষ-মাত্রকেই নরকস্থ করা উদ্দেশ্য—জানিনা। কিন্তু অপূর্ব্বর পাশে ভারতীকে যখন দেখি—সুমিত্রাকে দেখি—এমন কি নবতারাও ওর চেয়ে অনেকাংশে ভালো। অন্ততঃ প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। একমাত্র অপূর্ব্বেরই মনের স্থিরতা এবং সাহস নাই।

অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার পাশে অতুল—সর্ব্বসাধারণের চক্ষে এতদূর নামিয়া গিয়াছে যে দেখিলেই অনুকম্পা জাগে।

অথচ একথাও জানি, সুমিত্রা এবং ভারতীর চেয়ে সব্যসাচী অনেক বড়। বৃন্দাবনের পায়ের কাছে দাঁড়াইতে কুসুমকে রীতিমত বেগ পাইতে হয়, সৌদামিনীর এবং ঘনশ্যামের মাঝখানে আকাশ পাতাল ব্যবধান্। তবু সুমিত্রা ভারতী কুসুম এবং সোদামিনীই আমাদের এবং লেখকেরও সহানুভূতি বেশী করিয়াই আকর্ষণ করে। সব্যসাচীকে বাস্তব মানুষ বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলা উচ্চ আদর্শ-অনুপ্রাণিত কল্পনার সমষ্টি। একদিন শুধু সব্যসাচীর মধ্যে মানুষের উপযোগী কোমল ও করুণ মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলাম, দেবতার আসন হইতে তিনি মাটীর পৃথিবীতে নামিয়া আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—সে সেই দিন, যেদিন অপূর্ব্বর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবার জন্য সুমিত্রা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিল এবং ভারতীও মনের ব্যথা লুকাইয়া প্রকাশ্যে তাহার অনুমোদনও করিয়াছিল। সব্যসাচী সেদিন ভারতীর মর্ম্মবেদনা বুঝিয়াই নিজের কঠোর আদর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবন এবং ঘনশ্যাম বৈষ্ণব মানুষ, অপরে অন্যায় করিলেও কারও প্রতি রাগ দেখাইতে নাই, আবার কুসুম ও সৌদামিনী স্বামীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ কিছু করিলেও তাহারও দাম দিতে হয়তো বা শাস্ত্রের নিয়মেই ওঁদের বারণ লেখা আছে! চরণের মৃত্যুর পরও কুসুমকে বৃন্দাবন চিনিতে পারে নাই। তাই কুসুম তাহারই সঙ্গে উদাসী হইয়া পথে বাহির হইতে চাহিল শুনিয়া তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশ্বাসতো করে নাই বরং প্রথমে বিরক্তই হইয়াছিল।

নীলাম্বরও বৈরাগী মানুষ। আমরা কিন্তু বিরাজ-বৌকেই বড় বলিয়া মানি। ছোটবৌও কারও চেয়ে ছোট নয়।

সাবিত্রীর কথা উঠিতে বিরাজ বলিয়াছেন,—হলেনই বা তিনি দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী কেউ আছে এ কথা আমি মানি না।

গভীর দুঃখ এবং কষ্টের দিনে বিশেষ করিয়া জমিদারের অত্যাচার যখন ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছিল তখনো আত্মরক্ষার খাতিরেও বিরাজ অন্যত্র পলায়ন করিতে চাহে নাই। ছোট বৌ সাবধান করিতে আসিলে বলিল—না! ঘুম ভেঙে উঠে স্বামীর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না।

বিরাজের রূপের মোহে পাগল হইয়া জমিদার দুই বৎসর ধরিয়া নানান রকমে প্রলোভন দেখাইতেছিল। বিরাজকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীলাম্বর কি-ই বা প্রতীকার লইয়াছিল!

নীলাম্বর রোগে জীর্ণ-- ঘরে একপয়সারও সংস্থান নাই। বিরাজ মাটীর ছাঁচ গড়িয়া বিক্রয় করিয়া তাহাকে খাওয়ায়। একদিন সে পথও বন্ধ হইলে রাতদুপুরে আর কিছু না পাইয়া চাঁড়ালের বৌ-এর কাছে চাল ধার করিয়া আনিয়া অভুক্ত স্বামীর ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধন করিতে চাহিয়াছিল।—কিন্তু নীলাম্বর তাহার নৈশভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কটূক্তি করিয়া তাহাকে পানের ডিবা ছুঁড়িয়া মারিল।—বিরাজ আর সহিতে না পারিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

স্বামীর আশ্রয়-তরুতলে বিরাজের যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ষোলকলায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল,—অতঃপর পথের দুর্য্যোগে তা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। বিরাজের একটি

হাত এবং একটী চোখ বিকল হইয়া গেল।--তাহার অত্যুগ্র একাগ্র পতিপ্রেমকে ছাপাইয়া মুহূর্ত্তের ভুলের শাস্তিটাই বড় হইয়া প্রকাশ পাইল।

কিন্তু ইহাকেই কি আমাদের ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্ম বিচার বলিয়াই মানিতে হইবে? কিম্বা হরিমতির কথাতেই—সমস্ত অবিশ্বাস করিয়া গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে করিব? অথবা—

মনস্তত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র গোড়াতেই নারীর রূপের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাকেই সত্য প্রতিপন্ন করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই এই দুর্ঘটনাটী ঘটাইয়াছেন এবং আমাদের বারংবার মনে করাইয়া দিতেছেন—স্বামীর প্রেম যতদিন নারীর রূপও ততদিন!

আমরা

—শ্রীজীবনানন্দ দাশ

যেই ঘুম ভাঙেনাক' কোনোদিন ঘুমাতে ঘুমাতে,—
সব চেয়ে সুখ আর সব চেয়ে শান্তি আছে তাতে!
আমরা সে সব জানি;—তবুও দুচোখ মেলে' জেগে'
আমরা চলিতে আছি আমাদের আকাঙ্খার পিছে,—
নক্ষত্র গ্রহের পিছে নক্ষত্রের ছায়ার মতন
ভাসিয়া চলিতে আছে ঢেউ তুলে' আমাদের মন!
নদীর জলের মত—সিন্ধুর স্রোতের মত বেগে
পৃথিবীর আকাঙ্খার পার খুঁজে' ছুটিয়া চলিছে!

কিম্বা তারে খুঁজে কেউ পেয়েছে কি পৃথিবীর পারে!—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে হৃদয়ের সেই আকাঙ্খারে
আমরা বেসেছি ভালো;—খুঁজে তারে পেয়েছে কি কেউ
পৃথিবীর দিন আর পৃথিবীর রাত্রির আড়ালে!
সকল সাম্রাজ্য ছেড়ে'—সকল নিশান ছেড়ে'
হৃদয়ের আকাঙ্খারে,—আমাদের এই হৃদয়েরে
আমরা বেসেছি ভালো!—থামে যদি সমুদ্রের ঢেউ,—
আমরা যাব না থেমে,—যাব নাক' ডুবে' কোনো কালে!

এই পার—অই পার—কোনো এক পারাপার থেকে
রাত্রিরে ডাকিছে দিন,—দিনেরে যেতেছে রাত্রি ডেকে' !—
আমরা ডেকেছি তারে আলো আঁধারের মত হ'য়ে
আঁধার আলোর খোঁজে ;—আমরাও তাহার পিছনে
ছুটিতে চেয়েছি সব ; আমরাও খুঁজিতেছি তারে
পৃথিবীর পারে গিয়ে, আর ঐ নক্ষত্রের পারে
ডাকিতে চেয়েছি তারে ;—পূবের হাওয়ার মত ব'য়ে
মিশিতে চেয়েছি গিয়ে পশ্চিমের বাতাসের সনে !

পশ্চিম সিন্ধুর মত অন্ধকারে ফুলে' দুলে' উঠে
আমরা চলিতে চাই পূবের সিন্ধুর দিকে ছুটে' !
মনের আশার মত হৃদয়ের নিরাশারে খুঁজে',
আশার আকাশ খুঁজে অন্তরের নিরাশার মত
আমরা ছুটিতে চাই পৃথিবীর পথ ছেড়ে দিয়ে ;—
পিপাসা পিছনে ফেলে তোমারে পিছনে ফেলে প্রিয়ে !—
যদিও সকল ভুলে কার্ত্তিকের মাঠে চোখ বুজে'
ঘুমায়ে অনেক শান্তি, ছুটিতেছি তবু ইতস্ততঃ !

যদিও অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি পথে হেঁটে' হেঁটে',
বারবার জেগে' জেগে' অনেক সময় গেছে কেটে,—
ঘুম ভালো সব চেয়ে,—মৃত্যুর মতন ঘুম ভালো
যদিও সকল শক্তি সার সব ঐশ্বর্য্যের চেয়ে,—
তবুও ঘুমের আগে আকাঙ্খার অধীরতা এসে
আমাদের সকলেরে চুমো দিয়ে গেছে ভালোবেসে !
আকাশে সূর্য্যের আলো আর ঐ নক্ষত্রের আলো
জ্বলিতেছে আমাদের আকাঙ্খার কাছে ছন্দ পেয়ে !

কারণ, শান্তির চেয়ে অস্থিরতা—বেদনা—বিস্ময়,
—আকাঙ্খার পিছে যেই ব্যথা অধীরতা জেগে রয়,—
মৃত্যুর শান্তির চেয়ে আমরা বেসেছি ভালো তারে !
যদিও গিয়েছি চিরে,—পৃথিবীর বুকের মতন
হৃদয় র'য়েছে ভ'রে অন্ধকার গহ্বরে কবরে,—
তবুও র'য়েছি জেগে' রাত্রিদিন জাগিবার পরে !
রাত মুছে যায় দিনে,—দিন ডোবে রাতের আঁধারে ;
—তাদের মতন হ'য়ে ভাসিয়া চলিতে আছে মন !

কোথায় সে জেগে আছে ?—ঘুমায়েছে ?—জেগে আছে সে কি !
তোমরা দেখেছ তারে ? আমরা চকিতে যারে দেখি !
যাহার ঐশ্বর্য্য এই পৃথিবীর রাজ্যের মতন
নয়,—তবু যে খেলেছে মানুষের ইচ্ছা ক্ষুধা ল'য়ে !
যার শক্তি বেশী ঐ নক্ষত্রের প্রভাবের চেয়ে !—
পৃথিবীর মেয়ে সে কি ? নক্ষত্রের ?—তবে কার মেয়ে !
দেখেছি কোথায় তারে !—তারে আমি দেখেছি কখন !
আমরা ঢেউয়ের মত তাহার পিছনে চলি ব'য়ে !

তারে খুঁজে ব্যথা শুধু, তারে খুঁজে শুধু বিহ্বলতা !
আবার ফিরিয়া এসে হে প্রিয়া তুমিও কবে কথা,—
কিন্তু সে কি কোনোদিন তাকিয়েছে আমাদের দিকে ?
পিছনে ফিরেছে সে কি ?—আমরা ছুটেছি তার পিছে !
আমরা ডেকেছি তারে,—শুধু ব্যথা—ব্যথা তারে ডেকে !
তবুও পাখীর মত কাঁটার উপরে বুক রেখে'
আমরা ডেকেছি তারে,—আমাদের কাছে গান শিখে'
দিনের-রাতের ঢেউ জেগে' উঠে তাহারে ডাকিছে !

কোথায় গিয়েছে প্রিয়া ?—কখন পিছনে পড়ে গেলে !
আমরা কাহারে খুঁজে তোমারে ভুলেছি অবহেলে !
পৃথিবীর মাঠে পথে মানুষের মত কাজ ক'রে
যে আরাম, বীজ বুনে'—মানুষের মত শস্য তুলে'
যেই সুখ, ক্লান্ত মানুষের মত আঁধারে ঘুমায়ে
যেই শান্তি, পাতার মতন ফ'লে যেই স্বাদ গায়ে,—
হিমের হাওয়ার বুকে সহজে পাতার মত ঝ'রে
যেই সচ্ছলতা,—সকল—আমরা সকল গেছি ভুলে' !

তবু এই পথ ছেড়ে লাঙল কাস্তে হাতে নিয়ে
আমরা যাব না হেঁটে পৃথিবীর শস্যক্ষেত দিয়ে।
—যদিও নদীর জলে,—যতদিন কেটে যায়,—দেখি—
আরো বেশী—আমাদের মুখ আরো বেশী ম্লান হয় !—
যদিও অনেক ঘুম—আরো ঘুম নেমে আসে চোখে,—
রাতের আঁধারে এই—আর এই তারার আলোকে
নিভিয়া গিয়েছে বাতি পৃথিবীতে,—তবু নিভেছে কি
যে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে রয় !

সে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে জেগে' রয় !—
যদিও পেয়েছে ঘুম, ঘুমের মতন কিছু নয়,—
যদিও সকল সাধ অনুভূতি আস্বাদের চেয়ে
সব পিছে ফেলে রেখে,—সবাই ঘুমেরে ভালোবাসে,—
—কারণ, সবাই শান্তি—মৃত্যুর ঘুমের শান্তি চায়—
পথে হেঁটে' হেঁটে' তবু চলিতেছি,—যা চলিয়া যায়
তারি পিছে পিছে গিয়ে ;—ব্যথা পেয়ে—শুধু ব্যথা পেয়ে
জেগে আছি ;—যদিও আবার ঘুম—চোখে ঘুম আসে !

জ্বলিতেছে সে মশাল অন্ধকারে আমাদের হাতে !
সমুদ্র দাঁড়াতে পারে,—পারি নাক' আমরা দাঁড়াতে !
পৃথিবী ঘুমাতে পারে,—আমাদের চোখে ঘুম নাই !
নক্ষত্র নিভিতে পারে,—আমরা যেতেছি তবু জ্ব'লে !
আমরা বাতাস হ'য়ে চলিতেছি দিকে দিকে ব'য়ে !
সময়ের সাথে সাথে আমরা সময় হ'য়ে হ'য়ে
যতদিন জেগে আছি এমনি জাগিতে শুধু চাই !
আমরা চলিতে চাই আকাশ বাতাস পায়ে দ'লে !



পরদেশী চিঠি

—শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর—

ভাই মিনি,

তোর ২৫ শে তারিখের চিঠি পেয়ে অত্যন্ত সুখী হ'লাম। মাসীমার কাছে শোনা জাপানের গল্প শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে জেনে তোর দুঃখ হচ্ছে কিন্তু কি কর্‌বো বল! আমার ত ইচ্ছে ছিল অনেক কিছু তার কাছে জেনে রাখি, কিন্তু তা আর হলো কৈ? না ভাই, তারা গিয়ে অবধি কোন চিঠি দেন নি, আর চিঠি যে দিবেন না তাত' বলেই গিয়েছেন, কাজেই বৃথা আশা আমি করিও নি। সুষমার চিঠি বোধ হয় তুই দেখেছিস্। খুব ঠাট্টা করেছে না? তাকে বলিস্ যে ভাষা বিন্যাস সবটাই আমার নিজের নয়। মাসীমার একখানি খাতা আছে তাতে জাপান সম্বন্ধে অনেক অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যই তিনি লিখে এনেছেন, বোধহয় ভবিষ্যতে বই লিখবার জন্যে, তাকে অনেক করে বলে ঐ খাতাখানি ধার করে নিয়ে গোড়াথেকে খানিকটা টুকে নিতে পেরেছিলাম বলেই এতটা লিখ্‌তে পার্‌ছি বুঝ্‌লি !

গত বারের চিঠি খানি বড় হয়ে যাওয়ায় তাশিরোদের সঙ্গে মাসীমার সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাওয়ার কথা আর বলা হয় নাই এবার তাই বলি।

মাসীমা বল্‌ছিলেন যে হঙ্গকু থেকে ট্রামে চড়ে সিম্বাসি ষ্টেশনে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টারও বেশী লাগে। সিম্বাসির পরের ষ্টেশনের নামই লিনাগাওয়া, তোকিও হতে ইয়াকোহামার পথে পরে। সিম্বাসি হতে ট্রেন দশ মিনিটও বোধহয় লাগেনি, কাজেই অবিলম্বেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সত্যই ঐ ষ্টেশনটি একেবারেই সমুদ্রের উপর। আর তখনকার সমাগত প্রায় গোধূলির স্নিগ্ধ কিরণে তরঙ্গহীন সমুদ্রের দৃশ্য অতীব মনোরম দেখাইতেছিল। পার

হইতে অনতিদূরে দুই তিনটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ জল হইতে মস্তক সামান্যমাত্র উত্তোলন করিয়া বিরাজিত। তার পরেই দিঙ্‌মণ্ডল-ব্যাপী নীল সমুদ্র অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া গিয়াছে। তখন আর আমরা সেই দৃশ্য উপভোগ না করিয়া অপরাহ্নের অপরিহার্য্য চা পানের জন্য নিকটবর্ত্তী এক রেস্তরাঁতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

চা পানের সময় তখন প্রায় অতীত হইয়াছিল। তথাপি সেই দোকানে আরও একটি জাপানী পরিবার অর্থাৎ বিলাতি পরিচ্ছদ পরিহিত একটি ভদ্রলোক তার স্ত্রী ও তিনটি ছেলে মেয়ে সহ সবে মাত্র চা পানের আয়োজন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া দোকানস্থ সকলেই যে বিস্মিত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঐ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তিনটি এতই তন্ময় হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল যে সুমিষ্ট ওকাশি (কেক্) খাইতেও আর তাদের রুচি ছিল না। পিতা মাতা সন্তানের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়াছিলেন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। মাতার পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিতে বালিকা দুটি অবশেষে অনেকটা সংযত হইল; কিন্তু বালকটি অবুঝ শিশুমাত্র, সেকিছুতেই বাগ মানিল না। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখাইয়া বারে বারেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—এই মহিলাটি কে? এই প্রশ্নটি সে বোধহয় তখনই তার ভগ্নীদের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছিল তাই উত্তরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তার বাল-সুলভ সুমিষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আনো ওন্নাসান্ ওয়া দনাত্তা দেচ্ কা? (এই মহিলাটি কে?)"

"শিশুর পিতামাতা যখন দেখিলেন যে কিছুতেই আর ছেলেকে বাগ মানান গেল না, তখন তারা অতি তাড়াতাড়ি দুই তিন চুমুক্ চা পান করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাওয়ার সময় শিশুর মা আমাদের টেবিলের নিকট আসিয়া তাশিরো গৃহিনীকে বলিলেন যে তার ছেলে মেয়েদের অশিষ্ট ব্যবহারে বিদেশীমহিলাটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন, তিনি ও তার স্বামী সেই জন্য বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত। তার একান্ত অনুরোধ ও বাসনা যেন তাদের হয়ে বিদেশী মহিলাটির নিকট সানুনয় ক্ষমা ভিক্ষা চা'ন।

"ওবাসান যখন তাহাদের হইয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছিলেন তখন বালক বালিকা দিগকে লইয়া তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া আমি আশ্চর্য্য ও ততোধিক কুণ্ঠিত হইলাম। আমার অসুবিধা হইবে মনে করিয়াই না ভদ্র পরিবার তাদের সম্মুখস্থ চা ও পিষ্টকাদি স্পর্শমাত্র করিয়া উঠিয়া গেলেন! অপরের অসুবিধায় কুণ্ঠাবোধ জাপানীদের যে মজ্জাগত তাহা আগেও লক্ষ করিয়াছি, কিন্তু তার এমন স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।

আমরা চা পান শেষ করিয়া উঠিয়া দেখি সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। চায়ের দোকান হইতে বহির হইয়া সমুদ্রের একেবারে ধার দিয়া আমরা দক্ষিণ দিকে চলিলাম। তটভূমি আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে একটি ঠোটের মত বাহির হইয়া গিয়াছে। ঐ স্থানটিতে প্রস্তরেরই আধিক্য, তথাপি কয়েকটি দেব্‌দারু বৃক্ষ সমুদ্রের আস্ফালনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কোলাহল-ক্লান্ত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই যেন সে স্থানে বিরাজমান। ঐ সুন্দর বিশ্রাম স্থানে পৌছিয়া তাশিরোপত্নী বলিলেন যে এই স্থানটি তার বড়ই ভাল লাগে। ইহা যেমনই নির্জ্জন, তেমনই যেন এক আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ—বিশেষতঃ এই সন্ধ্যার ম্লান আলোয়। আমি মুক্ত কণ্ঠে তাহার কথায় সায় দিলাম এবং পাথরের উপরেই সকলে বসিয়া পড়িলাম। অস্তগামী সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমাকাশ সুবর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া নীল-সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যাইতেচিলেন। মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিলাম। পরে চমক্ ভাঙ্গিলে স্থলদেশের দিকে চাহিয়া দেখি, দক্ষিণে ও বামে যে দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, সর্ব্বস্থান বৈদ্যুতিক আলোক শৃঙ্খলে গ্রথিত। সেই সমুদ্র চুম্বিত কোলাহল বর্জ্জিত শান্তিময় কুঞ্জে বসিয়া, অসংখ্য আলোকে প্লাবিত অদূরস্থিত বিশাল রাজধানীকে, যক্ষ পুরীর ন্যায় দেখাইতেছিল। আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে

দুইটি দৃশ্য তাহার মধ্যে কি আশ্চয্য পার্থক্য; একটি সদা-ব্যস্ত কোলাহলময় মানব জীবনের বিকাশ চিত্র, অপরটি প্রকৃতি দেবীর আত্মপরিচয়—কি চমৎকার। আর মানুষ গড়িবার সতর্ক প্রয়াসের যে দৃশ্য চায়ের দোকানে এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, তার সৌন্দর্য্যও ত' কম নয়। আমার একটু অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে জাপানী দম্পতি তাদের ক্রীত চা ও পিষ্টকাদিতে নিজেদের ও প্রিয়তম সন্তানদের অনায়াসে বঞ্চিত করিলেন, কে জানে যে রেস্তরাঁতে যাইয়া চা পানের সৌভাগ্য প্রতি রবিবারেই তাদের ঘটিয়া উঠে কিনা!

আমি মনের ভাব চাপিতে না পারিয়া বলিলাম যে আমার অসুবিধার অমূলক আশঙ্কা করে একটি ভদ্র পরিবার তাদের সম্মুখস্থ চা আদির উপভোগে বঞ্চিত হলেন জেনে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।

তাশিরোপত্নী বলিলেন—হাঁ, তাদের প্রতি সহানুভূতি হয় বটে কিন্তু শিশু যখন কিছুতেই বাগ্ মানলে না তখন উঠে না গিয়ে আর কি করবে বল! শিশুর অশিষ্টতা সত্বেও যদি চা শেষ না হওয়া অবধি তাঁরা বসে থাক্‌তেন, তবে তার অশিষ্টতার প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত নাকি?

আমি—কিন্তু ঐটুকু শিশু শিষ্টতা অশিষ্টতার কি বুঝে?

তিনি—বুঝতে চেষ্টা করলে নিশ্চয় বুঝে। অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত পিতামাতা অতিরিক্ত স্নেহবশে ছেলে মেয়ের অন্যায় আব্দার সহ্য করেন, তাদের অশিষ্টতায়, যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেন, এইরূপ স্নেহপ্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে তাদিগকে মানব সমাজের অযোগ্য করে তৈরী করা, আর তাদের ভবিষ্যতের জন্য বহু কষ্ট সংগ্রহ করে রাখা নয় কি?

আমি—হাঁ, তা বটে, তবে যে অবুঝ শিশু, তাকে বুঝাব কি করে?

তিনি—অন্যায় করতে যেয়ে পুনঃ পুনঃ বাধা পেলে শিশুদেরও বুঝতে বাকি থাকে না যে কোন্ কাজে আত্মীয়-স্বজন তুষ্ট ও কোন্ কাজে রুষ্ট হ'ন।

আমি—দেখুন, আমার ছোট ভাই বোন কিছু নেই কিনা কাজেই শিশুদের বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তবু আমার মনে হয় যে জাপানে সন্তান মানুষ করবার যেমন সুন্দর প্রণালী, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে যে সতর্কতা, যে আন্তরিকতা চেষ্টা দেখ্‌ছি, অন্য কোন জাতির মধ্যে তা আছে কিনা জানি না।

না—এ তোমার ভুল। সন্তান মানুষ কর্‌বার যে প্রণালী আমরা অবলম্বন করেছি তার সবটাই প্রায় পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণ; তবে যে আন্তরিক চেষ্টার কথা বলে সেইটি আমাদের নিজস্ব; হয়ত শুনেছ যে জাপানে পূর্ব্ব-পুরুষদের পূজা করার প্রথা প্রচলিত—তাকে আমরা বলি "বুশিদো"। এই পূজার প্রধান প্রকরণ হচ্ছে নিজের কর্ম্ম ও মহত্ত্ব দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করা, পিতৃপুরুষের মুখ উজ্জ্বল করা। তা শিশুবয়স থেকে যদি ছেলে মেয়েদের নীতি ও শিষ্টাচার না শেখান হয় তবে তারা অভদ্র ও স্বার্থ-পর হয়ে উঠ্‌বে। তা কি তাদের পরিবার, দেশ, কারু পক্ষেই ভাল হবে না পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব বাড়বে? চীনের যে এত দুর্গতি তার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, ছেলে মেয়ের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তারা যেমন উদাসীন, ছেলে মেয়েরাও বড় হয়ে পরিবার ও দেশের গৌরব সম্বন্ধে তেমনি হয়ে ওঠে।

আমি—তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেমেয়ের সুশিক্ষার উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করছে। ভারতেও এক সময়ে এই বিষয়ে খুব সতর্কতা ছিল, এখন আর তেমন নেই।

আমার কথা শুনিয়া তাশিরোসান্ স্ত্রীর দিকে কেমন করিয়া একটু তাকাইলেন, যেন আমার কথায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

তাশিরো পত্নী বলিলেন—হাঁ, ছেলেমেয়ের সুশিক্ষার উপরেই জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে! কেননা সুশিক্ষিত ছেলে মেয়েই ত বড় হয়ে গুণবান্, চরিত্রবান মানুষ হয়। এই সব মানুষই ত তাদের জ্ঞান কর্ম্ম ও নিষ্ঠা দ্বারা জাতির সব অভাব পূর্ণ ক'রে—জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি

ক'রে। গুণ, জ্ঞান ও চরিত্রবান মানুষের যে দেশে যত বেশী সমাবেশ, সে জাত তত বেশী উন্নতিশীল।

আমি—আপনি যে শিক্ষার কথা বলছেন সে শিক্ষা দেওয়াও ত সহজ নয়।

তিনি—হাঁ, গোড়াতে হয়ত কঠিন, তার পরে সহজ। শিক্ষা দিতে হলে আগে শিক্ষা লাভ করতে হয়। কেননা শৈশবে যারা সুশিক্ষায়, উন্নত সংসর্গে বঞ্চিত, পরিণত বয়সে তারা প্রায়ই মানুষ হ'তে পারে না। দেশের চিন্তা, জাতির চিন্তা তাদের মনে এলেও নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে তা উড়ে যায়। জাতীয় কল্যাণকর কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবার সংকল্প মনে এলেও দীর্ঘকাল তারা তা করতে পারে না কারণ মনে বল কম—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কাজেই তাদের দেশপ্রেম যতই প্রবল হউক মানুষ তৈরী করবার তারা যোগ্য নয়। গোড়াতে জাপানে কয়েকটি কেন্দ্রেতে বাছা বাছা লোক সংগ্রহ ক'রে নৈতিক আবহাওয়া ও উন্নত সংসর্গের সৃষ্টি করা হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বালকবালিকাদিগকে মনোনীত ক'রে এই সকল কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কাজ চলতে চলতে ক্রমে কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। ঐ সকল কেন্দ্রেতে শিক্ষিত নরনারী ক্রমে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে প'ড়ে দেশের আবহাওয়া ও জাতির চরিত্র উন্নত করেছে।

আমি—হাঁ, তবে মানুষ তৈরী করাই জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান কাজ!

তিনি—তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে! মানুষ যে পাশ্চাত্য জাতিদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেই না জাপান এতটা অগ্রসর হ'তে পেরেছে! যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতির অভাব মোচন ক'রে জাতিকে সমৃদ্ধিশালী শক্তিসম্পন্ন করবে তা পরিচালন করতে চরিত্রবান একনিষ্ঠ দক্ষ লোক দরকার। হীনপ্রাণ দুর্ব্বল চরিত্র লোক কথনও কোন বড় কাজ করতে পারে না, তাই মানুষ তৈরী করাই আগে দরকার।

তবে কি পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ না ক'রে এসিয়ার পরিত্রাণের উপায় নাই?

তিনি—একে পাশ্চাত্য আদর্শ বলতে চাও বলতে বলতে পার। কিন্তু যা সত্য, ধ্রুব ও জনহিতকর, তা ত' কোন জাতি বিশেষের সম্পত্তি নয়। নানা জাতির সংমিশ্রণে, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগীতায়, জাতিদিগের মধ্যে নিজ নিজ শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবার চেষ্টায়, মানব সভ্যতার যেরূপ উপকার হ'য়েছে, পাশ্চাত্য বলে তাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কেননা, তাহ'লে ইউরোপের সমাজ সংস্কার, প্রজাতন্ত্র শাসন,—তাদের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সকলই আমাদের অনুকরণীয়, এমন কি বাষ্প বিদ্যুৎও আমাদের পরিত্যজ্য, যেহেতু তারাই উহার আবিষ্কারক।

আমি—না আমি তা বলছি না। আমি ভাবছিলাম যে আমাদের দেশে পিতা মাতাকে দেবতার মত ভক্তি করা তাদের আজ্ঞা পালন করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ইউরোপে ত তা নয়।

তিনি—না, পাশ্চাত্য আদর্শ ঠিক তেমন নয়। সন্তান বড় হয়ে আমাকে দেবতার মত ভক্তি করবে, আমার আজ্ঞা অন্যায় ও অসঙ্গত হলেও অন্ধভাবে পালন করবে, ইউরোপ আমেরিকার সুধীব্যক্তিগণ সন্তানকে এমন শিক্ষা দেন না। দেশের নিকট মানুষের যে অশেষ ঋণ তারই কিঞ্চিৎ শোধ হয় দেশকে এক একটি যোগ্য সন্তান উপহার দিয়ে, কিন্তু দেশের নিকট আজীবন অশেষ উপকার পেয়ে তার বিনিময়ে যদি এমন একটি সন্তানও দিয়ে যাই, যা দ্বারা সমাজের কোনও ক্ষতি হয় বা জাতীয় উন্নতির বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন হয়, তবে যে দারুণ দেশদ্রোহিতা করা হবে। কাজেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের গৌরবও যেমন অসাধারণ, তার দায়িত্বও তেমনি গুরুতর। সভ্য সমাজের সুখ সুবিধা ভোগ করেও যারা সন্তানদের সুশিক্ষা না দেন তারা সন্তান ও দেশের নিকট অপরাধী। সন্তান আমার আজ্ঞাবাহি হবে তার চেয়ে বড় আদর্শ এ নয় কি যে সে আমার চেয়ে, আমার

পিতা পিতামহের চেয়ে, জ্ঞানি, গুণী ও যোগ্যতর হবে—অর্থাৎ অতীতের চেয়ে, বর্ত্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত বড় হবে?

সেই সুন্দর সমুদ্র শৈকতে তখনকার অস্তমিত প্রায় সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে বসিয়া এইরূপ অনেক মূল্যবান কথাই সেদিন শুনিলাম। তারপর অন্যান্য কথা উঠিল—হাঁসির কথা, আনন্দের কথা। সর্ব্বশেষে গানের পালা—ওনাখীসান্ একে একে দুইটি গান গাহিল। শুনিলাম সঙ্গীত দু'টিই বুদ্ধদেবের গৌরব গাঁথা, কিন্তু জাপানী সঙ্গীতে অনভ্যস্ত বলিয়া উহার সুর-তাল-মান্ সবই আমার কাছে অতি অদ্ভুত লাগিল। তারপর সকলে আমাকে ধরিয়া বসিলেন একটি ভারতীয় গান গাহিবার জন্য, অমনি "জুড়াইতে চাই কোথা জুড়াই" গানটি আমার মনে আসিল কিন্তু গাইতে আর সাহস হইল না; কারণ জাপানী সঙ্গীত আমার কাছে যদি তেমন ভাল না লাগিয়া থাকে তবে আমার কণ্ঠের ভারতীয় সঙ্গীত যে ইহাদের চিত্ত মুগ্ধ করিবে তাহা মনে করিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল তাই শিনাগাওয়ার শান্তি ও মাধুর্য্যময় কুঞ্জের নিকট বিদায় লইয়া অবশেষে আমরা তোকিওতে ফিরিলাম।

দেখ্‌লি ভাই এ চিঠিও কত বড় হয়ে গেল! যাক্ সুষমাকে বলিস্ অত ঠাট্টা কর্‌লে জাপানের কথা আর আমি কিছুই লিখ্‌বো না। জানিস্ আমি দু'খানি ভাল বই উপহার পেয়েছি! মাসীমারা যে দিন চলে গেলেন তার পর দিনই বাবা আমার জন্য কলিকাতায় দু'খানি ভাল বই এর অর্ডার দিয়েছিলেন, কাল তা পেয়েছি। একখানার নাম "জাপান ভ্রমণ", আর একখানার নাম "Japan," ইংরেজি বইখানিতে অনেক ছবি আছে। আমি এখনও কিছুই পড়তে পারিনি, বাবা বারণ করে দিয়েছেন পরীক্ষার আগে পড়তে। ভালবাসা নিস্। ইতি—

তোর সুধীরা।

(ক্রমশঃ)

পল্‌কা

—শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

একটা ছোট রকমের পাল্‌কী গাড়ী…অনেক দিনের পুরানো—আর দু'টি রোগা ঘোড়া—

এই তো সম্বল।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই গাড়ীখানি আস্তানা থেকে টেনে বের করে…তারপর ঘোড়া দুটিকে জুতে নিয়ে গাঁয়ের উঁচুনীচু লাল পথটি ধ'রে বরাবর ইষ্টিসনের দিকে চলে যায়—

কাঁচা মাটির ওপর শুরকী ফেলা পথ…ক্যাঁচোর্ ক্যাঁচোর্ শব্দ হয়…জল হয়ে গেলে গাড়ীর চাকা আধহাত মাটির নীচে সেঁধিয়ে যায়। কিন্তু নিরীহ প্রাণীদুটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার অবসর পায় না…মাথার উপর চাবুক ঘোরে সোঁ সোঁ—

সেই বেরিয়ে যায়…আর ফেরে দুপুর হেলে গেলে।

তারপর নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া…ঘোড়া দুটোর যত্ননেওয়া—দানা পাণি দেওয়া…এই সব।

প্রতি দিনের এই ইতিহাস—

গ্রামের ভেতর ইতর ভদ্র সবাই তাকে চেনে…খাতির করে।

খাঁটি চরিত্রের ছোকরা বলে…বিশ্বাসও করে।

পাড়ার মেয়েদের অন্য গাড়ীতে পাঠিয়ে সোয়াস্তি হয় না…কিন্তু মক্‌বুলের গাড়ী হ'লে সঙ্গে আর পুরুষ না গেলেও চলে।

ও বুক ফুলিয়ে বলে, কিছু ভেবোনি কর্ত্তা, এই মক্‌বুল মিঞার কলিজায় এক ফোঁটা রক্ত থাক্‌তে যে বেটা মা লক্ষ্মীদের পানে চোখ বেঁকিয়ে ফিরে তাকাবে—তার চোখ দুটোর সঙ্গে সেইখেনেই বোঝা পড়া আছে আমার।

মক্‌বুল নিজেও খুব সাদাসিধা।

কারো আওতায় সে বড় একটা যেতে চায় না।

বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা · দরাজ বুক—

বয়স কুড়ি একুশের বেশী নয়।

বাপ মারা গেছে মোটে এক বছর…মা মরে একবছর আগে…আপনার বল্‌তে এখন এই ঘোড়াদুটি আর গাড়ীখানা—

কিন্তু একলা ব'সে সংসারের গায়ে এতটুকু টোকাও পড়্‌তে দেয়নি সে আজ পর্য্যন্ত……নিজে খেটে খুটে সব ঠিক রেখেছে।

গ্রামের কেউ যদি বলে, আর কত দিন মকবুল? খেটে খেটে একেবারে সারা হয়ে গেলরে…এবার কাজটা সেরে ফ্যাল্—

মক্‌বুলের কর্ম্মক্লান্ত তামাটে মুখখানা মুহূর্ত্তে লাল হয়ে ওঠে—লজ্জিত ভাবে মাথা নীচু করে বলে, হই হচ্ছে।

তারপর একটু থেমে আবার খুব আস্তে বলে, আপনাদের দোয়া—

একটু কথা আছে গোড়ার দিককার।

মক্‌বুল ভিন্‌গাঁয়ের একটি মেয়েকে ভালোবাসে—

নাম তার, সফিয়া।

সফিয়ার বাপের সঙ্গে মক্‌বুলের বাপের দোস্তী ছিল।

ছোটবেলা থেকে সে সফিয়াকে দেখেছে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে…আজ নেহাৎ আচম্‌কাই যেন তারা বড় হয়ে গেছে—

তাই এখন আর দেখাশোনার সুবিধে নেই।

কিন্তু দুই দোস্তে মিলে যা স্থির ক'রে গেছে সেকথা আজো তেম্‌নি পাকাই আছে।

কেবল দু'জনের একজন এই মাঝে সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে—

মকবুল সে আশায় দিন গোণে।

সংসারের খুটিনাটি সব গুছিয়ে রাখে—

আরো কত কি যে ক'রে রাখবে সংসারের জন্য, তা ভেবেও পায় না।

সফিয়া আসবে···শুধু তার একলার সফিয়া···সেকথা ভাবতেও কত আনন্দ—

সেই দিনটিতে তার সকল পরিশ্রম সার্থক হবে···সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুল ফুঠে উঠবে—

গভীর রাতে শূন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে, আর কত দিন···কতদিনে সফিয়ার বুড়ো বাপ তাকে তলব করবে··· তার হাতে নয়নের মণি সফিয়াকে তুলে দিয়ে অশ্রুভরা চোখে গদগদ কণ্ঠে বলবে, তোমায় দিলাম আমার আদরের সোফিকে।···

ছোট্টবেলাকার এতটুকু সোফি আজ কতবড় হয়েছে··· কত সুন্দর হয়েছে! সোফি আসবে—আর তার ঘর আলো হয়ে যাবে···

ওদিকে সফিয়ার মনের অবস্থা কিন্তু ঠিক এই রকম নয়।

প্রায় দু'বছর ধ'রে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়েছে—অবশ্যি বয়সের খাতিরে ও তাদের সামাজিক আবহাওয়ার দোষে। তবে, এক গাঁয়ে থাকলে ঘাটে-পথে ফাঁকে ফাঁকে দু'একবার দেখা হলেও হতে পারতো—

সে সুবিধাও নেই।

এই সুদীর্ঘ দিনের মাঝে সফিয়া একেবারে বদলে গেছে।

তাদের গাঁয়েরই মণিরুদ্দীনের উপর তার টান।

মণির তরুণ যুবক ··সম্প্রতি 'নেকাপড়া' শেষ করে সহর থেকে গাঁয়ে এসেছে—তার চালচলনই আলাদা···

মাথায় জোর করে ঢেউ খেলানো টেরী···পরনের কাপড় ও হাঁটুর নীচে নামে·· মাঝে মাঝে জরীর কাজ করা ফুরফুরে পাঞ্জাবীও গায়ে ওঠে—

এই চাকচিক্যের মাঝেই একদিন হঠাৎ এই গাঁয়ো ছুটুলে মেয়েটির মন খানি বাঁধা পড়ে যায়।

প্রথম কয়েকদিন সে মণিরকে দেখলেই ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়তো।

জল আনতে গিয়ে ঘাটের পথে দুপুর বেলা বাড়ীর পেছনের আম গাছ তলাটায় নেহাত অনাহুত ভাবেই যেন প্রতিদিন মণিরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়······

কোনো রকমে মাথা গুঁজে মুখচোখ লাল করে সফিয়া পাশ কাটিয়ে চলে যায়—

মণির সেদিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হাসে।

পথের মোড় ফিরতে এক ফাঁকে সফিয়া সে হাসিটুকু দেখে নেয়····· সমস্ত অন্তর তার ভ'রে ওঠে।

দিনে দিনে সে ভাব কেটে যায়।

মণিরের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য সে নিজেই এখন ছল খোঁজে।

চলে যেতে যেতে সফিয়া এখন মুখ তুলে মণিরের পানে তাকায়··· ·· কোনোদিন একটু মিষ্টি হাসেও।

মণিরের সঙ্গে এই দৃষ্টি বিনিময়টুকু যেন তার দৈনন্দিন কাজ হ'য়ে উঠেছে।

মকবুলের কথা মনে হ'লে গা জ্বলে যায়······অসভ্য চোয়াড়—

আরো ক'দিন যায়।

দু'জনের মাঝে কথাবার্তাও হয় একটু ফাঁক পেলে······

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেলার শেষে মণির সফিয়াদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলেছে—

মেলায় কেনা সস্তা আতরের গন্ধে সারা গা ভুর্ ভুর্ করে।

সফিয়াদের ঘরের পেছনে এসে সে বার দুই এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থা,ক······

গাঁয়ের পথ নিরালা।

সন্ধ্যার আঁধার বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে—

দূরের কিছু আর চোখে পড়ে না।

মণির আমগাছটায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে...দু'একটা শিস্ দেয়।

একটু পরেই একটি সাদা মূর্ত্তি বাড়ী থেকে নেমে আসে...

মণির এগিয়ে গিয়ে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে জানায়—সে এই দিকেই আছে......

সোফিয়া কাছে এসেই বলে, বারে, বড় খোশ্‌বো বেরিয়েছে। এসেন্ট নাকি—

মণির গুটি কয়েক হরেক রকমের 'এসেন্টের' শিশি ও এক বাক্স সাবান সফিয়ার হাতে তুলে দেয়—

তারপর গাল দু'টি টিপে দিয়ে বলে, মেলায় গেছনু তোর জন্যে কিছু আনতে—

সফিয়া বিশ্বেস করতে পারে না......

বলে, সত্যি? এগুলো স-ব আমার তা হ'লে?

সমস্ত মনটি তার খুশীতে ভ'রে ওঠে।

তা নয় তো কার আবার?......তোকে যে কত ভালবাসি সোফি, মনে থাক্‌বে?—

মনে থাক্‌বে কিনা বলা হয় না—

রুগ্ন বাপের ডাকে তাড়াতাড়ি সফিয়া চলে যায়।

তারপরের দিনই কিন্তু মক্‌বুলের তলব পড়ে—

বুড়ো কমর আলী তারই হাতে সফিয়ার সুখ দুঃখের সকল ভার তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে,—দিন কয়েক পরে শেষ নিঃশ্বাসও।

এই কাজটুকুর জন্যই সে যেন এতদিন বেঁচে ছিল!

সফিয়া আসতেই কিন্তু মক্‌বুলের সহজ জীবনের চলাটা একদিন হঠাৎ ওলোট-পালট হ'য়ে যায়......

দিনের অধিকাংশ সময়ই সে বাড়ীর ভেতর থাকে।

সফিয়াকে চোখের আড়াল করা যেন তার পক্ষে অসম্ভব......সমস্তক্ষণই সে তাকে কাছে নিয়ে বসে থাক্‌তে চায়—

উপবাসী অন্তরকে একদিনেই ভরে' নিতে চায়।

সফিয়া ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দেয়—

তার হাতের কাচের চুড়ির ঠুং ঠুং মিঠে শব্দ মক্‌বুলের মনের ভেতর যেন স্বপন বোনে......

সফিয়ার চলার চঞ্চল ভঙ্গীটির পানে সে একমনে তাকিয়ে থাকে...... তার বুকের রক্ত যেন তালে তালে নেচে ওঠে।

বাইরে থেকে যদি কেউ ডাকে, মক্‌বুল আছিস্? মেয়েরা যে আজ নাইতে যাবে রে, গাড়ীখানা নিয়ে আয়—

মক্‌বুল তাহ'লে ঘরের ভেতর থেকেই উত্তর দেয়—আজ আর বেরোবনি কত্তা, গতরটা ভালো নেই। অন্য গাড়ী দ্যাখো।

এরকম রোজই দু'পাঁচ জন ফিরে যায়।

লোকে বলাবলি করে, বিয়ে ক'রে অবধি মক্‌বুলটা যেন কি রকম হ'য়ে গেচে। বৌ ছেড়ে আর ঘর থেকে বেরোতে চায় না......

কিন্তু মক্‌বুলের কপালে সুখ নেই।

কথায় বলে, যার জন্যে চুরি করা, সে-ই বলে চোর—

তারও সে দশা।

বৌ রেগে বলে, কী দিনরাত মেয়েমানুষের পেছন পেছন আঁচল ধরে থাকা...... দু'চক্ষে দেক্‌তে পারি না বাপু। আমার মুকের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেই তো আর পেট ভর্‌বে না......এদিকে যা ছ্যাল সব তো ফুরিয়ে এলো ব'লে—

মক্‌বুল কোন উত্তর দেয় না।

অর্থহীন আকুল দৃষ্টিতে সফিয়ার মুখের দিক তাকিয়ে থাকে—

সমস্ত বুকটা একটা অব্যক্ত ব্যথায় টন্‌টনিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে সে সেই ঠাঠা-পড়া বন্দরের মাঝেই গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ইষ্টিশানের দিকে……

এতদিন সে মনে মনে যে স্বপ্ন-সৌধ রচনা করেছিল…… বাস্তবতার কঠিন আঘাতে এম্‌নি ক'রে তা একে একে ভেঙে পড়্‌তে থাকে—

রাত্তিরের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মক্‌বুল অনেক কথাই ভাবে……অনেক কথাই সফিয়াকে বল্‌বে ব'লে গুছিয়ে রাখে নিজের মনে মনে—

কিন্তু সংসারের কাজ শেষ ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সফিয়া যখন তার পাশে এসে শোয়, তার সব কথা গুলিয়ে যায়……কি জানি, কি বল্‌তে গিয়ে শেষটা আবার ঝগড়া বাঁধিয়ে বস্‌বে—এই ভয়টাই তার মনে প্রবল হয়ে ওঠে……

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো……

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মক্‌বুল পাশ ফিরে শোয়।

একটু পরেই সফিয়া বেশ নির্বিকার ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে।

মক্‌বুল অন্ধকারে ঘুমন্ত সফিয়ার বুকের উপর আস্তে একখানি হাত রেখে চুপ ক'রে থাকে……যেন তার ধীর শ্বসিত তনুখানির প্রত্যেকটি স্পন্দন নিজের মাঝে অনুভব করতে চায়—

তারপর একসময় সেও ঘুমের রাজ্যে অনুভূতি হারায়…

কোনোদিন গভীর রাতে মক্‌বুলের ঘুম ভেঙে যায়…… বিছানার উপর উঠে বসে……

চাঁদের আলো পশ্চিমের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের মাঝে উঁকি মারে—

পাশের জানলার ঝাঁপটা একটু ঠেলে দিতেই সমস্ত আলো হুড়্‌মুড়্‌ ক'রেই যেন বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে।

ঘুমন্ত সফিয়ার দিকে তাকিয়ে মক্‌বুলের চোখের আর পলক পড়ে না……

সমস্ত দিনের কোলাহলের মাঝে সহজভাবে……এমন নিবিড় ক'রে সে সফিয়াকে দেখ্‌বার আর সুযোগ পায় না, —এতখানি কাছে পাওয়াও তার ঘটে ওঠে না……

দিনের সমস্ত ঝগড়া-ঝাটি আর নেই……মুখের উপর একটু বিরক্তির রেখাও পড়ে না—

সরল সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে ছোট বেলাকার সেই সফিয়ার কথা মক্‌বুলের মনে পড়ে……সে যেন একটা স্বপ্ন!

চাঁদের আলোয় সফিয়ার ঘুমন্ত অগোছাল দেহটির দিকে চেয়ে মুগ্ধ……মুগ্ধ দু'টি আঁখির তারা স্থির হয়ে যায়—

সফিয়া যেন তার কাছে তখন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

কত রাত এম্‌নি ক'রে সে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ভোরের দিকে সফিয়ারই পায়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে……

আবার ভোর হয়……আলো হাসে—

পৃথিবীতে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়।

কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের আঁধার তেম্‌নি গাঢ়… …জমাট্‌—

একদিন কি একটা দরকারী কাজে মক্‌বুলকে সহরে যেতে হয়। সেদিন আর ফিরে আস্‌বার সুবিধে নেই। তাই যাবার বেলা সে সফিয়াকে ডেকে বল্‌লে, আমার আজ আর ফেরা হবে না সোফি, কাজ সেরে টেরেনের সময় থাক্‌বে না। খুব সাবধানে থাকিস্‌—ঘোড়া দুটোকে সময় মত দানাপানি দিস্‌।

সফিয়া আজ ভালো মেয়ের মতো সব কথাই মাথা নেড়ে স্বীকার কর্‌লে। গুটি কয়েক পানের খিলিও তাড়াতাড়ি তৈরী করে মক্‌বুলের পিরাণের পকেটে ফেলে দিলে।

মক্‌বুল বাড়ী থেকে বেরোবার সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলে দিলে, একদিনের বেশী দেরী কোর না যেন। একলা থাক্‌তে আমার ভয় কর্‌বে।

মক্‌বুল অবাক্‌ হ'য়ে খানিকক্ষণ সফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো।……সারা মনখানি আজ তার খুসীতে পরিপূর্ণ।

মকবুলের ফিরে আস্‌তে আরো একদিন বেশী দেরী হয়। যদিও সেই একটি দিনই তার কাছে একটি বছরের সমান ব'লে মনে হয়েছিল।

সফিয়া একলা আছে……একলা থাকতে তার ভয় করবে……। সে কাছে থাকলে নিশ্চয়ই তার ভয় করে না—

সুখের একটুখানি আভাস……একটুখানি তৃপ্তি আপ্‌না থেকেই মনের চারপাশে গুঞ্জন করে ওঠে।

রেলের এতবড় লম্বা রাস্তাটা কোন্ ফাঁক দিয়েই যেন ফুরিয়ে যায়……মকবুল তা জান্‌তেও পারে না! সামান্য একটু রাত্তির থাকতেই সে তারাগ্রামের ছোট্ট ষ্টেসনটিতে এসে পড়ে। সকলের আগে নেমে সেই লাল শুর্‌কীর পথটি ধ'রে চলতে থাকে—রেল গাড়ীর মতোই উড়ে চলে।

রাত্রি-শেষের শীতল হাওয়া নিদ্রিত গাছপালার নিঃশ্বাসের মতো গায়ে এসে লাগে।

বাড়ীতে ঢুকতেই আস্তাবলটা আগে পড়ে।

সেখানে ঘোড়া দুটো মরার মতো পড়ে আছে…কাছে একটা দানাও নেই—

দানাপানি দেবার গামলাটা শুকিয়ে চট্‌চটে হয়ে আছে।

মকবুলকে দেখেই ঘোড়াদুটো মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—পারে না।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই তার মাথা ঘুরে যায়।

কোনে যেখানে তাদের ছোট্ট রান্নাঘর খানা ছিল, সেখানে কেবল কয়েকমুঠি ছাই আর কয়েকটা আধপোড়া খুঁটি খাড়া আছে—

সাহস করে যে কাউকে ডাক দেবে, সে শক্তিও তার যেন নেই।

একটা ঘনায়মান আশঙ্কা ক্রমশঃই তার চারপাশে বরফের মতো জমাট বেঁধে উঠছে—

তবু কোনো মতে তাদের থাকবার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ডাকলে—সোফি, দোর্ খোল্…আমি এসেছি।

কারো সাড়া নেই।

একটা পেচক বিকট সুরে ডেকে ওঠে…

একটুখানি হাওয়া ঝির্‌ঝির্ ক'রে বয়ে যায়—ঘুমে পাওয়া হাওয়া যেন।

এবার সে দুয়ারের মাটির সিঁড়িতে উঠে জোর ক'রে দরজায় ধাক্কা মারে—

কবাট আপ্‌না থেকেই খুলে যায়।

আব্‌ছা আলো-আঁধারে শূন্য ঘরের সমস্তখানি প্রাঙ্গণ দেখা যায়

এক লাফে ঘরে ঢুকেই সে চীৎকার ক'রে ওঠে, সোফি —সোফি—

এমন চীৎকার কোনো সহজ মানুষে করতে পারে না। রেলের বাঁশীর মতোই তীক্ষ্ণ—সমস্ত নিস্তব্ধ গাঁটাকে চিরে দেয়।

চীৎকার শুনে দু'চারজন লোক ছুটে আসে। অনেক ক'রে মকবুলকে থামিয়ে তারা বোঝাতে চেষ্টা করে,—যেদিন সে সহরে চলে যায়, সেদিনই সন্ধ্যার পরে এই অগ্নিকাণ্ড হয়। গাঁয়ের লোক জান্‌তে পেরে ছুটে আসে, কিন্তু সে অনেক পরে……তাতে কোনো ফল হয়নি। খুব সম্ভব রাঁধতে গিয়েই অসাবধানতায় বৌটি মারা গেল—

তারপর সহানুভূতির পালা। বৌটির গুণালোচনা—এই সব।

মকবুলের কাণে কোনো কথা গেল কিনা, কে জানে।—একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না……পাথরের মূর্ত্তির মতো গুম্ হয়ে বসে রইলো।

তারপরেও দিন কাটে……সেই আগেকার মতো।

মকবুল ভেবেছিল—সে এর পরে কিছুতেই বাঁচবে না—

কিন্তু সেও বাঁচে, এবং বেঁচে থাকবার জন্তেই আবার গাড়ী নিয়ে ইষ্টিসনে যায়; যদিও কতকদিন সে কাজকর্ম্ম

একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল ঘরে বসেই থাক্‌তো।—হয়তো ওই রকম করেই সে না-বাঁচার পথে এগিয়ে চল্‌তে চেয়েছিল; কিন্তু পেটের নাড়ীভুড়িগুলোর অস্তিত্ব একদিন হঠাৎই যেন খুব বেশী রকম ঠাওর হতে থাকে এবং এ লক্ষণটাকে সে মরণ-পথের লক্ষণ বলে ধ'রে নিতে পারলেও, সেইটেকে বাঁচিয়ে রাখা আর লোভনীয় মনে কর্‌তে পারেনি।

তাই একদিন গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই দেখে—মক্‌বুলের গাড়ীটি আবার গাঁয়ের উঁচুনীচু লালমাটির ধ'রে ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ ক'রে ইষ্টিসনের দিকে ছুটেছে।

কিন্তু মক্‌বুলকে আর আগের মতো পাওয়া গেলো না।

মুখের হাসি, মনের উদ্যম,—সবার সাথে প্রাণখুলে কথা কওয়া তার একেবারেই চুকে গেছে। হঠাৎ যেন সে ষাট বছরের বুড়ো হয়ে গেছে। দেখ্‌লে মনে হয়, কেউ যেন গলায় দড়ী বেঁধে টেনে তাকে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নিচ্ছে,—সে নিজেও যেন কোন্ খেয়ালীর গাড়ীর ঘোড়া…

মাঝে কয়েকদিন সে গলায় ঘা হয়ে কষ্ট পায়।

শেষে একদিন ঘা শুকিয়ে যায় বটে—সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরও।

এখন চিঁ চিঁ ক'রে কথা কয়।

খেয়ালীর খেয়াল!

অনেকদিন পরের কথা—

একদিন সন্ধ্যাবেলা খুব জোরে জল আসে।

মক্‌বুল যাত্রী নিয়ে ফের্‌বার আশায় তার গাড়ী খানা নিয়ে ষ্টেসনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। জল আস্‌তেই গাড়ীর ভেতর গিয়ে উঠে বস্‌লো।

সে গাড়ীর ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে ঘোড়া দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে জল কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।

অন্ধকারে পথ দেখা যায় না…তার উপর ঝম ঝম্ ক'রে জল হচ্ছে।

মক্‌বুল কোনো মতে গাড়ীখানাকে ছুটিয়ে নিচ্ছিল।

পথের উপরকার বটগাছতলাটার কাছে এসেই ঘোড়া দুটো হঠাৎ একসঙ্গে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

গাড়ীর উপর থেকে মক্‌বুল হাঁকে, হেই-ও হা-টো—

কিন্তু ঘোড়া এক পা-ও নড়ে না।

মক্‌বুল এবার সাম্‌নে তাকিয়ে দেখে—অদূরে বটগাছ তলায় কি একটা সাদা পুট্‌লির মতো দেখা যায়…

সে এবার তার চিঁ চিঁ স্বরে জোর ক'রে হাঁকলে—কে?

জল আর বাতাসের মাতনের মধ্য দিয়ে সে স্বর শোনা গেল কিনা বোঝা যায় না,—কিন্তু পুট্‌লি নড়ে উঠ্‌লো।

মক্‌বুল আবার চীৎকার করলে—

এবার নারী-কণ্ঠে উত্তর এলো—আমাকে হাডিমপুর দিয়ে আস্‌তে পারো কোচ্‌মান? আমি তোমায় একটাকা দোব।

মক্‌বুল গাড়ীখানা কাছে এনে বল্‌লে, আপনি অন্ধকারে এই জলের ভেতর কেন দাঁড়িয়ে আছেন?

স্ত্রীলোকটি বল্‌লে, আমি এ গাঁয়েরই জোনাবালী মৃধার বাড়ী নেমন্তন্নে এসেছিলুম। বেলা পড়্‌তেই তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হই। কিন্তু এখানে আস্‌তেই এত জোরে জল সুরু হয় যে আর এক পা-ও এগোতে পারি না। দুষ্ট ছেলেটা সেই জলের মাঝেই এক দৌড়ে ইষ্টিসনে গিয়ে উঠেছে, আর আমি অনন্যোপায় হয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছি। শীতে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। যদি দয়া ক'রে আমায় পৌঁছে দাও—তাহ'লে তোমাকে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট করে দোব।

মক্‌বুল গাড়ীর উপরকার কোচ্‌বাক্স থেকে পড়ে যেতে-যেতে সাম্‌লে নিলে।

পাঁচ বছর কি খুবই বেশী! এতটুকু সময়ের মধ্যেই কি একজন আর একজনকে এত সহজে ভুলে যেতে পারে?—পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেলেও কি তার ভেতর থেকে জীবনের যে সব চেয়ে নিকটতম, সবচেয়ে প্রিয়তম—তাকে খুঁজে বের করা যায় না?…

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে মক্‌বুল এক মুহূর্ত্তে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্‌লে। মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠ্‌লো...অন্ধকারের মাঝেও যেন জ্বলে উঠ্‌লো সে হাসি—

তারপর বল্‌লে, ওঠো গাড়ীতে। হ্যা—তোমার স্বামীর নাম কি ?—কার বাড়ীতে গাড়ী যাবে ?

মেয়েটি বল্‌লে, মৌলভী মনিরুদ্দীন সাহেবের বাড়ী—

আর কথা নয়।

গাড়ী সেই অশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে সুরু ক'রে—নক্ষত্র বেগে।

কতক্ষণ পরেই গাড়ী থামিয়ে মক্‌বুল বলে, না—মো।

তখনো জোরে জল হচ্ছে। মেয়েটি তাড়াতাড়ি নেমে সামনের প্রকাণ্ড বহির্ব্বাটীতে উঠে দাঁড়ায়...তারপর বলে, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি বাড়ীর ভেতর থেকে ভাড়াটা এনে দিচ্ছি।

মেয়েটি চলে যায়।

ভাড়া নিয়ে যখন সে আবার আসে—তখন মক্‌বুলকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেবল দূর থেকে চাকার একটুখানি অস্পষ্ট ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসে—মরণ পথের যাত্রীর গোঙানীর মতো...

পাটলিপুত্র

—শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া

—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আসিয়া পাটলি পুত্র নগর পরিদর্শন করেন। তখন তিনি মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদ ও শাসন-প্রনালি এবং রাজ্যের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। * অশোকের অনুশাসন সমান্বিত স্তম্ভের চারিটী শীর্ষ বা বোধিকা ও তদুপরিস্থিত পশুমূর্ত্তি আবিস্কৃত। অশোক স্তম্ভের নিম্নে ঘণ্টা। এইরূপ ঘণ্টা পারস্য প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপলিস নামক নগরের ধ্বংসাবশেষের পারস্য ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মিত। পারস্য প্রদেশের স্তম্ভের ঘণ্টা অনুরূপ। কিন্তু মৌর্য্য সম্রাট অশোকের স্তম্ভের ঘণ্টার উপর মঞ্চ এবং মঞ্চের উপর পশু মূর্ত্তি। আবার কোন কোন মঞ্চের গাত্র পশু পক্ষীদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। সুন্দরভাবে পুষ্প লতা শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

১। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পাটলি পুত্র নগরে স্বর্ণ সিংহাসনে আরোহন করিয়া, মগধের রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মৌর্য্য বংশীয় রাজন্যবর্গের অলৌকিক রাজ্যশাসন প্রণালী এবং জনসাধারণের জন্য তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ ও প্রজাবৃন্দের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন

১। Rhys Devid Buddhist India.

* জগজ্জ্যোতিঃ ১১শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২৩৬ পৃষ্ঠা।

এবং পরিব্রাজক চিকিৎসক নিযুক্ত, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও ভৈষজ্যাগার নির্ম্মান সেই মহাত্মাদের চির-মহিমা-কীর্ত্তি-ধ্বজা এই পূণ্যময় ভারতে আজন্মকাল দীপ্যমান করিয়া রাখিবে। বৃজিগণ এক এক সময়ে পর্ব্বত ও গুহা হইতে অবতরণ করিয়া এদেশের নগর ও গ্রামবাসীদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত।

বিদেশীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে * তুরানিয়ান নামে অভিহিত করেন। বৃজি সম্প্রদায়গণ বিপক্ষের দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উত্তর বিহার হস্তগত করে এবং বৈশালীতে তাহার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সম্প্রদায় হইতে মগধ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে মহারাজ অজাত শত্রু খৃঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে গঙ্গাতীরে পাটলি গ্রামে এক নূতন দুর্গ নির্ম্মান করিয়া রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে পাটলি পুত্রকে পাটলি গ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

তৎকালে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ বৌদ্ধ অহং ভিক্ষু সহ পাটলি পুত্র নগর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধদেব উক্ত নগর সম্বন্ধে এক ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যান যোগে অলৌকিক দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে পাটলি পুত্রে অসংখ্য দেবগণ অবস্থান করিতেছেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন, পাটলি পুত্রে।

চৈনিক পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পরিব্রাজকগণ বর্ণনা করিয়াছেন ষ্টর জন্মের পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাজ অশোক পাটলি পুত্র নগরে রাজত্ব করেন। পাটলি পুত্র নগরের মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ ও সভাগৃহ সমুহ দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কথিত আছে যে, অশোক এই সকল নির্ম্মানার্থে দেবতাদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা প্রস্তর স্তুপাকৃতি করিয়া তদ্বারা এমন সুন্দর কারু-কার্য্য খচিত প্রাচীর ও তোরণ নির্ম্মান করেন যে জগতের কোন ভাস্করের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

উক্ত নগরের রাধাস্বামী নামক জনৈক সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পাটলি পুত্রের অধিবাসীগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তিনি সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযান শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার জ্ঞান গরিমা পাটলি পুত্রের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তিনি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দিন দিন ধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের অটল শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাজন হইতে লাগিলেন। এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিরা তাঁহার পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণ ও ধর্ম্ম-যাজক-গণকে কোন প্রকার নির্য্যাতন করিতে সাহসী হইতেন না।

গৃধ্র কুট পর্ব্বত ও ঐ নামের কারণ।

উক্ত পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে ভগবান বুদ্ধ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম সন্নিকটে অন্য একটি গহ্বরে ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মহাথেরা আনন্দ ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। মার ছলনা করিয়া এবং তাঁহার ধ্যান সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য প্রকাণ্ড এক গৃধ্রের রূপ ধারণ করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার আলৌকিক শক্তির দ্বারা, পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া মহাথেরা আনন্দের স্কন্দে হস্ত প্রদর্শনে মারকে পরাভূত করিয়া আনন্দের ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ও ভগবান বুদ্ধের হস্তাপর্ণের চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং এই কারণে উক্ত পর্ব্বত গৃধ্রকুট নামে চির প্রসিদ্ধ।

মৌর্য্য সম্রাট অশোক নির্ম্মিত স্তুপের সন্নিকটে মহাযান সম্প্রদায়ের একটী সুবৃহৎ কারুকার্য্যময় মণিমুক্তা দ্বারা নির্ম্মিত সঙ্ঘারাম ছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের সন্নিকটে হীনযান সম্প্রদায়ের অন্য সঙ্ঘারাম বিদ্যমান ছিল। পালি বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে ছয় সাতশত বৌদ্ধ শ্রমণ ও ধর্ম্ম-যাজকগণ দিবারাত্রি বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদি স্থানীয় জন-সাধারণের সাহায্যে এবং রাজপ্রাসাদ হইতে সংগৃহীত হইত।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ পাটলি পুত্র নগরে উপস্থিত হইয়া দৈত্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন সুন্দর ও সুশোভিত রাজপ্রাসাদের কারুকার্য্য, মণি মুক্তা ও স্থাপত্য কার্য্য ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। পরিব্রাজকগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে কোন মানবের দ্বারা এইরূপ সুকৌশলে ভাস্কর্য্য সম্পাদন হইতে পারিত কি সন্দেহ।

সম্রাট অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্হত্ব লাভ করিয়া গৃধ্র-কুট পর্ব্বতে নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। অশোক সেই নির্জ্জন-বাসী কনিষ্ঠকে রাজসম্মান দিয়া ও রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে তিনি রাজপ্রাসাদে অবস্থানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহন করুন। আমি আপনার অবস্থানের জন্য পাটলি পুত্রের অভ্যন্তরে গৃধ্রকুট পর্ব্বতের ন্যায় একটী দ্বিতীয় গৃধ্রকুট পর্ব্বত নির্ম্মান করাইব। অশোক দৈত্য-গণকে আহ্বান করিয়া এক ঘোষণা বাণী প্রচার করিলেন যে, আগামী দিবস আপনারা আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। দৈত্যগণকে তিনি অনুরোধ করিলেন যে প্রত্যেকের আসনের উপবেশনের জন্য প্রত্যেকে এক একখানি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিবেন। দৈত্যগণ রাজ আদেশে পর দিবস প্রত্যেকে এক একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট আশোক তাঁহাদের প্রস্তরাসনের দ্বারা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক একটী সুন্দর সুবৃহৎ পর্ব্বত নির্ম্মান করাইলেন। এবং নব নির্ম্মিত পর্ব্বতের পাদদেশে ৩৫ফিট দীর্ঘ বাইশ ফিট প্রস্থ ও এগার ফিট উচ্চ একটী প্রস্তরের কক্ষ হইল। পাঁচখানি সুবৃহৎ খণ্ড সংযোগে উহার নির্ম্মান কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

* হিউয়েন সাং খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে জানা যায় গঙ্গার দক্ষিণে ৭০লি বা চৌদ্দ মাইল ব্যবধানে বিস্তৃত একটী পুরাতন নগর ছিল। উক্ত নগরের দৃশ্যাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, নগরটী অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনকালে রাজোদ্যানে অসংখ্য পুষ্পের বিদ্যমানতা হেতু উহা কুসুম পুর নামে অভিহিত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে উহার পাটলি পুত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়।

* তিনি আর বর্ণনা করিয়াছেন যে সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে বিশ লি বা চার মাইল। ভূমি রীতিমত কর্ষিত হয়, এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র জল ও ফল ও ফুল ইত্যাদি পাওয়া যায়। জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতট বাসীরা স্বভাবতঃ কষ্ট-সহিষ্ণু, ক্ষুদ্রাকার ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী; সকলে যত্ন-সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতট রাজ্যে স[illegible]ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম [illegible] হিন্দুধর্ম্ম। উভয় ধর্ম্মের [illegible] বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক [illegible] রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই [illegible] অবস্থিতি করেন। ইঁহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেব মন্দির আছে। ইহার প্রত্যেক দেব মন্দিরে নানা সম্প্রদায়ের লোক সমূহ উপাসনা করে। নিগ্রন্থ নামক [illegible] সন্নাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] অনতিদূরে অশোক নির্ম্মিত বুদ্ধ স্তুপ। এই স্থানে প্রাচীন কালে তথাগত ভগবান বুদ্ধ এক সপ্তাহ দেবগণের হিতার্থে ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমানে রহিয়াছে। বুদ্ধস্তুপের অনতিদূরে একটী সঙ্ঘারামে হরিত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এই মূর্ত্তি আট ফিট উচ্চ। সমতট হইতে নয়শত লি বা একশো আশি-লি-পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত দেশ।

* ভারতী পঞ্চম ভাগ ৫৬১।

,, ৭ ,, ৬৫, ১০৫।

* সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ৬৩৬ হইতে ৬৪৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পরিদর্শন কালে উক্ত নগরের পঞ্চাশটী বৌদ্ধ বিহার এবং দশ সহস্র বৌদ্ধ শ্রমণ ও অর্হৎ ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। মগধের অধিবাসীগণ শান্ত, ধর্ম্মনিষ্ট, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা ভগবান বুদ্ধের নবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। পরিব্রাজক হিউয়েন সাং স্বয়ং মগধাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীতে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। মহারাজার বিনয় ও বদান্যতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন মগধের রাজ সিংহাসনে ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৮ পর্য্যন্ত একছত্র নৃপতিরূপে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্র রাজ শশাঙ্কদেব বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মীর দেশে অবস্থান কালে গোপনে সৈন্য সামন্ত সহ মগধে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য বৌদ্ধ শ্রমণগণের প্রাণ বিনাশ করেন, উক্ত সাম্রাজ্যের যাবতীয় বৌদ্ধ স্তুপ, বিহার, বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া শ্মশানে পরিণত করেন। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ শ্রমণ ও মগধ অধিবাসীগণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিল, তাঁদের রক্ত রাস্তা ঘাটে গঙ্গার জোয়ারের ন্যায় বহিতেছিল। আজ কোথায় সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম? কোথায় সেই রাজা শশাঙ্ক? এই অত্যাচারের সাম্রাজ্য কি চির-স্থায়ী থাকিবার জিনিষ! ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে আজ ভারত পরাধীন! আজ ভারতের ৩৩ কোটি নরনারী পরের পরাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের কুটীলতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক হিন্দুধর্ম্মকেও পঙ্গু করিয়া ছাড়িয়াছে।

—ক্রমশঃ—

কবির বিলাপ

—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তা'দেরি বিরহে বুক দহে আজ—সেইদিন মিছিমিছি,
তোমার মুখেতে চাহিয়া কেবল যা'দের ফিরায়ে দিছি।
তখন কি জানিতাম
আমার এ মহা আত্মত্যাগের কিছু দেবে নাকো দাম?
টুক্ করে' খসে' যা'বে একদিন শুক্‌নো পাতার মত
যদি জানিতাম, রাখিতাম হাতে একজন অন্তত।
পাছে মোরে ভাবো দুশ্চরিত্র কিম্বা অন্য কিছু,
সেই ভয়ে কোনো মেয়ে দেখিলেই করিতাম মাথা নীচু।
অবিশ্যি তুমি ছাড়া,
তব চাহনিতে মোর সারা প্রাণ-মন দিয়েছিলো সাড়া।

তোমার আঁখিতে আঁকা ছিলো মোর অকূল ভবিষ্যৎ,
ঠোঁটের নহেকো, চোখের চুমায় মিটেছিলো মনোরথ।
তবুও অন্-দি-স্লাই
দু' একটা ছোট ছুটা-ছাটা প্রেম হাতে কি রাখিতে নাই?

দু'টো মিঠে কথা খরচই তো শুধু! পেতেও না তুমি টের,
অথচ দুঃসময়ে যে এখন সুবিধে হইত ঢের।
যত অনভিমানিনী রাণী-বাণী-আনিদের কানে-কানে
স্তবগুঞ্জন করিলেই—হ'ত বিনিময় প্রাণে-প্রাণে।
তারপর মুখে মধু ভরে' নিয়ে তোমার সমীপে আসি'
তোমারি মতন কহিতাম, 'শুধু তোমারেই ভালোবাসি।'
কিছুই হ'ত না ক্ষতি,
সবাই জানিত, আমি আসক্ত কেবল তাহারি প্রতি।

উপরন্তু এ লাভ হ'ত মোর, তোমার বিহনে, প্রিয়ে,
কোনোমতে মোর কাটিতো সন্ধ্যে রাণী কি আনিরে নিয়ে।
যদিও একথা ঠিক,
তোমার মতন তা'দের নয়ন করে নাকো ঝিক্‌মিক্।

তোমার মতন মৃদুভাষে কেউ কহিতে জানে না কথা,
তোমার মতন কাহারো আঙুলে নাহিকো চঞ্চলতা।
তবু তাহাদের সাথে তব মিল আছে এক দিক দিয়ে,
তোমার মতন তাহাদেরো আজ হ'য়ে গেছে, হায়, বিয়ে।
এমত অবস্থায়
মনে মনে শুধু আপ্‌শোষ ছাড়া বলো, কি যে করা যায়!

সেদিন ওদের খুসি করে' যদি চলিতাম টায়ে টুয়ে,
তা হ'লে আজিকে সবগুলো দীপ নিবিতো না এক ফুঁয়ে।
যা আসে আসুক দুঃখ কি সুখ ছুটিব তোমারি পিছে
দান্তের মত কেন কহ দেখি?—তুমি কি বিয়াত্রিচে?
যদি তা-ও হও, সই,
তা'তেও কিছুই হ'বে না,—কেননা, আমি তো দান্তে নই!

তখনি গোপনে ওদের কাউকে যদি রাখিতাম হাতে,
জুটে' যেতো তবে নগদ পাওনা তোমারি বিয়ের রাতে।
তাহা হ'লে অন্তত
ভাত থেকে মাছি তাড়াতে সে হাতে পাখা নিয়ে বসিতো তো!
এমন জ্যোছ্না-রাতে
ছাতের উপরে পাটি পেতে সুখে কাটিতো তো তা'র সাথে
তা-ই বা মন্দ কি?
সর্ষে তেল হর্ষে সে নেয়, জোটে নাকো যা'র ঘি॥

আজ ভেবে দেখি, তখন থেকেই সাব্-কন্সাস্ মনে
জানিতাম, তুমি বেশিদিন আর রহিবে না মোর সনে।
তবুও যে কেন তাকাই নি আমি তুমি ছাড়া কারো পানে,
সেই বোকামির কথা ভেবে আজ বুকে বড় শেল হানে
মনে হয়েছিলো, তা'তে হ'বে তব বিষম অমর্য্যাদা,
শেলির শিষ্য হ'য়েও এ-কথা যে ভাবে—সে লোক গাধা!
যাহারা স্বামী স্ত্রী,
তাহাদেরো মাঝে এত কড়াকড়ি নাহিকো শ্যুয়র্লি।
তুমি-আমি (আমি অন্তত) কেন মেনেছিনু এত আইন্?
আমাদের সংশ্রবটা তো শুধু ছিলো প্ল্যাটোনিক্-টাইন্!
যত কথা আর চাওয়া আর ছোঁয়া—সব সারেপ্টিশাস্,
লুকানো ব্যথায় বুক ফেটে যায়, গোপন দীর্ঘশ্বাস।
সব রেখেছিনু ঢেকে
হৃদয়ের ব্যাকুলতা দিয়ে বুঝি বিধাতারো আঁখি থেকে।
তোমার মাঝারে পেয়েছিনু আমি নব-পৃথিবীর দেখা,
আর-কেহ তা'র পথ চেনে নাকো—আমি সেথা ভ্রমি একা
আজ সে ভুবন ফেটে ঝরে' গেছে উল্কাশিও সম,
নামিয়াছে মোর বুকে—সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলো যে তমো।

রাণী বাণী আনি ওদের কাউকে কেন ধরে' রাখি নাই ?
তা হ'লে আজিকে থাকিতো যে মাথা গুঁজিবার মত ঠাঁই।
তাহাদেরি কথা মনে পড়ে আজ, তা'দেরি বিরহে দহি,
হেলায় যা'দের বলে' দিয়েছিনু, "আমি তোমাদের নহি।"
তা'রা দিয়েছিলো ধরা,
মোর পানে চোখ তুলে' ধরেছিলে আশা আতঙ্কে ভরা।

আমি তো তা'দের কিছু দিই নাই, আজ কেন দিব দোষ ?
তুমি মোরে ছেড়ে গেলে যে—তাইতো, এ বড়ই আপশোষ
শুধু সুন্দরী নহ তুমি, প্রিয়ে, অতীব বুদ্ধিমতী,
আমার অভাবে হচ্ছে না তাই তোমার বিশেষ ক্ষতি।
দিয়েছিলে বটে আমাকে প্রাণের পৌনে-পনেরো আনাই,
তবুও হাতের পাঁচ রেখেছিলে—কাজে লেগে গেলো তাই।
যদি মোরে দয়া করে'
বুদ্ধির কিছু ভাগ দিতে—তবে আমি যে যেতাম তরে'।
বুঝিলাম ভালো মত
কাব্যলক্ষ্মী এবং কবির মাঝে যে তফাৎ কত !

খুচ্‌রো প্রেমের সুদ কষে' আজ তুমি হ'লে বড় লোক,
দেউলিয়া হ'য়ে আমি ফিরি পথে ফিরি করে' ফিকে শোক।
তোমার যা হয়, চাঁদিনীতে, নয় নিতান্ত মন্দ সে,
আর আমি কেরোসিনের আলোয় কবিতা বানাই বসে'।
আমি নই বলে' যদি বা কখনো ভেজে তব আঁখি দু'টি,
তবু তব সব অভাবের দাবী মিটেছে তো মোটামুটি !
মন বেয়ে মোর যতই উঠুক্ কবিকল্পনা-লতা,
শুক্‌নো কথায় চিঁড়েও ভেজে না, মন তো দূরের কথা।
ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল
বন্ধুতা খুঁজি,—পিপাসার কালে জলের বদলে বেল।

জোটে কি তা-ও বা ! আমাদের দেশে যত রাণী আর আনি,
নারী বটে সবে, নয় তা'রা কেউ এমিলিয়া ভিভিয়ানি।

এমন কি তাহারাও
নেইকো হাতের কাছে ;—কারো হয় হেন দুরবস্থাও
যত রাণী-আনি এখনো দেখি নি—সেই তাহাদের খোঁজে
আবার বাহির হইব—এমন নাই আর গাস্‌টো যে।
চুপ্ করে' তাই বসে' থাকা ছাড়া নানা পন্থা মোর—
কখন্ যে দিন শেষ হ'বে—আর রাত্রি হইবে ভোর!
দশুই পো'ষের রাতো
কেটে যায়! তবু এ শূন্যতার শেষ হ'বে না তো!
না-হয় চলিয়া গেছ তুমি, প্রিয়ে, কোনো ক্ষোভ নাই মনে,
জানি, শুধু মোরে ভালোবাসিবে গো এবারের এ-জীবনে।
সাহস করিয়া তাই কহি তোমা, এক অনুরোধ আছে,
পাঠিয়ো তোমার ছোট ননদেরে দয়া করে' মোর কাছে।
প্রিয়তম যে তোমার,
আশা করি তা'র করিতে পারিবে এইটুকু উপকার॥

——— ———

সুররসিক

—শ্রীবিষ্ণু দে

দাম্পত্য জীবনকে আমরা বড়ো বেশী প্রাধান্য দিয়েছি। দাম্পত্যজীবনকে আমরা অনেকে ব্রত করে' তুলেছি। তাই দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হলে আমাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়ের বর্ণনা শুনলে মনে হয় মানুষের পৌরুষ থেকে সে মুক্ত, সে জীবনের দিক দিয়ে অবনত। খাবার পরবার ভাবনা নেই, পুরোনো সাবেককেলে হলে'ও জমিদারীর আয় আছে। তাই বংশানুক্রমে সুপ্রিয়েরা জীবন কাটিয়েছে যাকে সাংসারিক বল্‌বে বাজে কাজে, সখের খেলায়। সুপ্রিয়ের প্রপিতামহ ছিলেন কুস্তিগীর পালোয়ান, তাঁর আনন্দ ছিল তাঁর পাইকদের দ্বারা প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করায়। সুপ্রিয়ের পিতামহ জহর সংগ্রহ করে জীবন কাটিয়েছেন আর তার পিতা গাইয়ে' বাজিয়ে' সংগ্রহ করে'। সুপ্রিয়ের দাদার সখ শিকার আর সাহিত্য। আর সুপ্রিয়ের জহর, সাহিত্য ও ছবি ছাড়া আর একটা নেশা আছে—সে হচ্ছে সুর।

সুপ্রিয়ের ছফুট লম্বা শরীরে শক্তি আছে কিন্তু তার শরীর অতি পাত্‌লা—এস্‌রাজের সুরের মতন ক্ষীণ। তার দেশী ছবির মতো সরু সরু আঙুলগুলো এস্‌রাজ ও সেতার—উভয়ের ওপরেই সমান চলে। তার চোখ সাধারণত অপরিসীম অবসাদ ও অবজ্ঞায় অর্দ্ধনিমিলিত। গানের সময় স্তিমিত ও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় স্নিগ্ধ বা দীপ্ত।

বড়োলোকের বাড়ী—ছেলের বিয়ে হলই বলতে হবে, ছেলে বিয়ে কর্‌ল না।

কিন্তু ছেলে খুসীই হল। দেখ্‌তে চমৎকার—রং ফর্সা না হলে'ও চমৎকার। আশ্চর্য্য চোখ। পরিপূর্ণ, যেন হৃদয়ের সুধা উপ্‌ছে পড়ে। মুখের গড়নটা পানের মতো অনেকটা, ভারী মার্জ্জিত ও সুকুমার। আর তনু? তনুলতাই। মেয়েদের পক্ষে ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু সুগঠিত। একেবারে মূর্খ যে তাও নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়া আছে। বুদ্ধিও নেহাৎ স্থূল নয়। রসিকতা রসিকতা বলে' নেবার মতো বুদ্ধিটুকু আছে। আর নেহাৎ শিশুও নয়—বয়েস ষোলো।

সুপ্রিয় খুসীই হল। সুপ্রিয়ের মন ফুলশয্যার রাতের অস্ফুট গুঞ্জনেই বিকিয়ে গেল। দাম্পত্যজীবনের প্রতি আমাদের এতই লোভ। নববধূ, সদাই সে সজ্জিত, চারু-কেশী, ধীরে ধীরে সে কথা বলে, মৃদু পদসঞ্চারে তার চলা, একটুতেই লজ্জা পায়—মোহ এতে বেড়েই যায়। সুপ্রিয়ের দিনগুলো কদিন যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাট্‌ল।

দেখেছ ত, দুর্লভ অর্কিড যেমন আমরা যত্ন করি, তেমনি অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়েরা মানুষ হয় সুকুমার ফুলের মতো, লতার মতো যত্নে লালিত হয়।

সুপ্রিয়ের প্রিয় ছিল সংস্কৃত কাব্য, তাই তাকে বিশেষ করে'ই দাম্পত্যজীবনে মুগ্ধ হতে হয়। এই সংস্কৃত, মার্জ্জিত ফুলটা তারই সংস্কৃত মনের মতো হল।

বিয়ের পর কটা দিন যেমন কাটে সেই রকমেই কেটে গেল। পরিচয় অপরিচয়ের মধুর দ্বন্দ্বে একমাস কাট্‌ল। এবং এ মাধুর্য্যের মোহে সুপ্রিয়ের সুরও চাপা পড়্‌ল।

সুপ্রিয়ের এসময়ের মনোভাব গীতি-কবিতাতেই প্রকাশ হতে' পারে। সে নিয়ে' আমি কিছু বললে তা ন্যাকামি হয়ে পড়বে।

মাসখানেক পরে যখন অর্কিডের তনুমনের নবত্বের মোহ গেল, তখন সুপ্রিয় তার স্ত্রীকে নিয়ে' কলকাতায় এল। শুধু স্ত্রীকেই নিয়ে' এল। হৃদয়ের প্রেম যখন প্রথম

সংসারের দৈনন্দিনতায় নেমে আসে, তখন নাকি তাতেও ভারী মাধুর্য্য থাকে। আর সে মাধুর্য্য নাকি শুধু দুজনের মধ্যেই চলে।

সুপ্রিয়ের স্ত্রী হলেন গৃহিনী। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিও সুপ্রিয়ের মনে মাধুর্য্যের মোহ সঞ্চার করল। ঐ যে না-পারার লজ্জা, ঐ যে পারবার আকাঙ্খা, ও ভারী মিষ্টি। এ সব মিষ্টত্বও মাধুর্য্যও কবির জন্যে। তাই সে থাক্।

সেদিন আকাশ ছিল শরত কালের, চাঁদ ছিল ত্রয়োদশীর। সুপ্রিয় ছাদে খর্ব্বাকৃতি ইজি-চেয়ারটায় শুয়েছিল। আর একটা মিঠে প্রেমের সুর গুঞ্জন করছিল। সে উর্দ্দু প্রেমের গানে সে নিজেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল। —মেয়েদের মধ্যে সত্যিই কবিত্ব নেই, মেয়েরা সাংসারিক। কমলার ভাঁড়ার দেওয়া কি আর শেষ হবে না?

সুপ্রিয় এস্‌রাজটা তুলে' নিয়ে' ধীরে ধীরে বাজাতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যার মায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে সুর ঘুরে' ঘুরে' ফিরতে লাগ্‌ল……

ক্লান্ত হয়ে', সুপ্রিয় ছড় নামাল। কমলা তার কোলে হাত রেখে বল্‌লে, আচ্ছা, তুমি ত খুব ভালো গাও। শোনাবে?

সুপ্রিয় নিমীলিত চোখেই কমলার কোমল হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, ভালো গাই? তোমায় কে বল্‌লে?

কমলা একটু দুলে উঠে' সুপ্রিয়ের হাঁটুর ওপর মুখ রেখে বল্‌লে, বারে! আমি যেন জানিনা! না জানব না? দিদিমণি বলেছেন, তুমি খুব ভালো বাজাও আর গান গাও। শুধু তাই না, তুমি নাকি—না সত্যি! এ তোমার অন্যায়। আমাকে পর্য্যন্ত গান শোনাবে না!

সুপ্রিয় কমলার পেলব গালে টোকা মারিয়া বল্‌লে, না সত্যি! এ অন্যায়!—না? কিন্তু ও কথাটা কি বলোত?

—কি কথা?

—ঐ—শুধু তাই না—

—ওঃ! ঐ কথা! ও কিছু না!

সরসস্বরে, লঘুসুরে সুপ্রিয় বল্‌লে, না সত্যি! এ তোমার অন্যায় আমাকে পর্য্যন্ত সব কথা বল্‌বে না!

পরিপূর্ণ উদ্বেল চোখদুটী মেলে কমলা বল্‌লে, আমি কি তাই বল্‌ছি! তুমি কি ভাবো আমি তোমার কাছে—তুমি রাগ করবে বলে'ই বলিনি—তা না ত আর তোমার কাছে আমার—না, রাগ কোরো না—সে কি ছাই কথা! আমার মনে নেই!

দিদিমণি কি বলেছিলেন সে কথা কমলা বল্‌ল না। কিন্তু তার মাথা গরম হয়ে' উঠ্‌ল। দিদিমণি বলেছিলেন, হেসেই বলেছিলেন—ওর যা সুরের বাই, তাতে ভয় হয়। তোমার মতো বৌও যদি মনে না ধরে সে ঐ সুরের বাই। —কমলার হাতের আঙুলগুলো তার অজান্তে কেঁপে উঠ্‌ল।

কমলা কোমলস্বরে গলায় একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের রেশ এনে বল্‌লে, গাইবে না?

স্নিগ্ধ তারাভরা রাত্রির কালো ছায়ার মোহে আচ্ছন্ন সুপ্রিয় কমলার পানের মতো নিটোল মুখ সরু সরু আঙুল দিয়ে স্নিগ্ধস্পর্শে নিজের মুখের ওপর এনে বল্‌লে, বলো, আমার মুখে মুখ রেখে বলো, আমার কথা রাখবে?

কমলা ক্ষণকাল কিছু জবাব দিলে না। কিছু ভাব্‌তে লাগল, বলে'না এম্‌নিই জবাব দিলেনা! রাত্রির আকাশের তলায় চাঁদের ম্লানশুভ্র আলোয়, টবের জাপানী ফুলের গন্ধে যে ইন্দ্রজাল, তাতে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়ের এ আদর কমলাকে তন্দ্রাবৃত করেছিল।

কমলা বল্‌লে, বলো। বল্‌ছি রাখব।

সুপ্রিয় মরালের গ্রীবার মতো মসৃণ কমলার গলায় এক হাত দিয়ে আর এক হাতে তার চিবুক ধরে' বল্‌লে, আমি বাজাই তুমি গাও—সেই গানটা—সেই ভীমপলশ্রী।

কমলা করুণনয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল। তার চোখে জল এল। কিন্তু সুপ্রিয় তা দেখ্‌তে পেল না।

সুপ্রিয় ছড়ি চালাল। সুর যেন শরৎরাত্রির মেঘের থেকে চাঁদের মতো বেরিয়ে এল।

কমলার গলা থেকে অতি ক্ষীণ বিকৃত স্বর বেরুতে লাগ্‌ল। তাকে গান বলা ঠিক নয়।

সুপ্রিয়ের চোখ কখন আপনিই বিরক্তিতে পাতা মেলে' জ্বলতে লাগ্‌ল। সুপ্রিয় বললে, গলা খোলো কমলা, লজ্জা কি?

কমলার গলা খুল্‌ল না।

সুপ্রিয় বল্‌লে, খোলো, খোলো, চড়ায় উঠ্‌লে থেমে যাও কেন?

কমলা হঠাৎ মুখ তুলে' ব্যাকুলকণ্ঠে বল্‌লে, সত্যি বল্‌ছি, গাইতে পারি না? গলা ওঠে না। সত্যি বলছি—

কমলা চোখের লজ্জায় মুখ নামিয়ে ফেল্‌ল।

সুপ্রিয় হয়ত ঈষৎ বিস্মিতই হয়েছিল। ভুল বুঝে কমলা বল্‌লে, বিশ্বাস করছ না? বেশ! এস্‌রাজ ধরো।

—কি বীভৎস! কী বিশ্রী গলা! যেন কত নেশা কত অত্যাচার করার পর বদরাগী পুরুষমানুষের গলা। যেন কাঁসার ঘণ্টা বাজ্‌ছে! যেন—সুপ্রিয় কাণের সঙ্গে মনও স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।—কী বীভৎস গলা! এই কি তার প্রেয়সীর গলা! তার প্রেয়সীর গানের গলা।

সুপ্রিয় এস্‌রাজ রেখে মুহ্যমান হয়ে শুয়ে পড়ল।

অপ্রতিভ, লাঞ্ছিত, আহত কমলা কখন ধীর নিঃশব্দ পদে নেমে গেল। দিদিমণির কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার খেয়ালও হল না।......

সে রাত্রে কমলা যখন স্বামীর মুখে চুমা দিল, সে চুমা সাড়া পেল না।—

দার্শনিক থাম্‌ল। বল্‌লে, একটা চুরুট দাও ত হে।

ভটচায্‌ তার মন্ত্রমুগ্ধ বোকা বোকা ভাব থেকে জেগে বল্‌লে, তাই বলো। তাই আমাদের সুররসিক আজকাল আসে না! খোঁজ খবরও দেয় না! কিন্তু তারপর?

আর্টিষ্ট তারপর এলব্যামটা রেখে মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে, 'তারপর?'—আবার কি? দাম্পত্য জীবনকে আমরা জীবনের একমাত্র সার্থকতা করে' তুলেছি। তাই দাম্পত্য ব্যর্থ হ'লে—ইত্যাদি।————আরে এ কে! সুররসিক! তুমি!

সুররসিক বা সুপ্রিয় তার গানের গলায় বললে, হ্যাঁ আমিই। নেমন্তন্ন ক'রতে।

পথ-রেখা

—সুবন্ধু

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ইঁদারাটি আমার দো-তলার বসিবার ঘর হইতে স্পষ্টই দেখা যায়। সম্মুখেই কতকগুলি সজিনা-গাছ। ফাল্গুন-দিনের শেষে একটি মৃদু সৌরভে সচকিত হইয়া দেখি গাছগুলির পত্রের ঐশ্বর্য্যকে পরাজিত করিয়া নূতন শাখাগুলি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। ভ্রমর, প্রজাপতি, প্রভৃতি নানাজাতীয় পতঙ্গের গুঞ্জনে স্থানটি মুখর। একটি পল্লবিত শাখার প্রান্ত দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইঁদারাটি বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে।

ছয় শত টাকা খরচ করিয়া এই ইঁদারা। কতক গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। বাকীটা বোর্ডে দরখাস্ত দিয়া সংগ্রহ-করা। গ্রীষ্মের দিনে গ্রামের সব পুকুরগুলিই শুকাইয়া যায়। আশে-পাশে দু'তিন ক্রোশের মধ্যে আর কোন জলাশয় নাই। সেবার ফাল্গুন মাসের প্রথমেই গরুগুলির চেহারা দেখিলে কান্না পাইত। কতকগুলি আয়ত সুগভীর কালো চোখ মেলিয়া ইতর প্রাণীগুলি যেন প্রচুর পরিপুষ্ট শ্যামল দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জানাইত।

জল আর কোথাও নাই। আমার বাড়ীর সম্মুখের ইঁদারাটিতে মাত্র দুই হাত। রামু নাপিত একটি মাপকাঠি রাখিয়াছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যার কিছু আগে দেখিতাম রামু সভয়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া ইঁদারার উপর উঠিত। আর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মাপকাঠির প্রান্তে একটি দড়ি বাঁধিয়া ধীরে ধীরে ইঁদারার মধ্যে নামাইয়া দিত। তারপর সেটিকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া মাটি স্পর্শ করিয়া উপরে টানিয়া তুলিত—ইঁদারার উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কঙ্কালসার হাত দিয়া মাপিয়া লইত—দেখিত দুই হাত মাত্র; মাপ কাঠিটিকে দূরে সরাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি এক কলসী জল কাঁধে লইয়া বাড়ী ফিরিত।

তারপর আসিত রাধু। তারপর বিন্দী, উমা, দাসী, আরও কতজন। গ্রামের মেয়ে সব; কত হাসি কত কথা;—আমার বাড়ীর সম্মুখের অতিব্যস্ত প্রজাপতি-ভ্রমরগুলির মতোই যেন। কাহারও মাথায় ঘোমটা নাই; ময়লা কিংবা আধময়লা সাড়ীগুলি কোমরে জড়ানো। কলসী, বাল্তি, ঘড়া ইত্যাদিতে জল বহিতে বহিতে তাহারা কখনও গান করিত, কখনও পাড়ার নানা-ধরণের গল্প করিত কখনও বা কেবলই হাসি শুনিতে পাইতাম; উচ্ছ্বসিত সরল, অসঙ্কোচ হাসি আমার চিররুগ্ন জীবনের মধ্যে একটি বসন্ত-বায়ু-বিধুর স্বপ্ন-রাত্রির আনন্দ বহিয়া আনিত।

যে ঘরটিতে বসিতাম সেদিন কি মনে হইল—সেই ঘরটিতেই বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। দক্ষিণ দিকের জানালাটি খোলা ছিল; স্নিগ্ধ দক্ষিণার স্পর্শে শীঘ্রই ঘুম আসিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন সবে ভোর হইয়াছে। সেই ভোরের মিঠা হাওয়ায় চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া জানালার কাছে আসিয়া বসিলাম।

অত ভোরেও দুইজনে জল লইতে আসিয়াছে দেখিলাম। ইঁদারার সিমেণ্টের উপর ভোরের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দুইটি মেয়ে;—একজন ইঁদারার উপর বসিয়া আছে, আর একজন দাঁড়াইয়া। ভাবিলাম, গ্রামের মেয়েগুলিও কি কবি হইয়া গেল? ভোরের মাধুর্য্যটি ও ইহারা কেমন উপভোগ করিতেছে! বাড়ীর নাগপাশও ইহারা কেমন ছাড়াইয়া আসিয়াছে!

কিন্তু কতকগুলি অস্পষ্ট টুক্‌রা কথা কানে ভাসিয়া আসিল; আমার সমস্ত চিন্তাকে উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল।

—কেমন দেখ্‌তে হইছিলো রে?

উত্তর নাই।

—বল্‌ না!

—ব'লে আর কি হ'বে—ফিরিয়ে এনে দিতে পারবি?

সঙ্গে সঙ্গে একটু চাপা কান্নার আওয়াজ আসিতেছিল।

—আর কাঁদিস্‌ নে—চ' বাড়ী চ'! ঠাণ্ডায় ব'সে থেকে কি হবে?—সেটাও গেল—তুই-ও যা! আমার আর কি?

তারপর আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। মাথার ভিতর সম্ভব অসম্ভব এমন সব জটিল চিন্তার সূত্রপাত হইল যে চেয়ারে বসিয়া থাকা বিড়ম্বনা মনে করিয়া বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। একটু তন্দ্রামত আসিল; তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলাম রৌদ্র উঠিয়াছে।

সেদিন আর চেয়ার হইতে উঠিলাম না। দুইখানি বিষণ্ণ, অশ্রুম্লান মুখের সন্ধান করিতে লাগিলাম। জানালার ধারে সেদিন আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েগুলি লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হইয়া কোনো কথারই আলোচনা করিল না। একে একে সকলে জল লইয়া চলিয়া গেল; রামুও পূর্ব্বের মত-ই তাহার নিত্যমাপের কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ইঁদারার ধারটি জনশূন্য হইল। তখনও বসিয়া আছি। ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। পথের ধূলি, গ্রামের গোয়ালগুলির ধোঁয়া, আর শীতশেষের একটি অপূর্ব্ব আমেজ আমার মস্তিষ্কের মধ্যে নেশার আবেশ আনিয়া দিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানি ক্রমে নীরব হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও একটি স্পষ্ট সুর কাণে ভাসিয়া আসিল,—

—কাঁদিস্‌ নে; কাঁদিস্‌ নে! চোখে কি তোর বান ডাক্‌লো? অমন সবারই হয়!

চেয়ার হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

প্রবাসের চিঠি

—শ্রীসুরেন ভট্টাচার্য্য।

চিঠিতে করে বিজয়ার আনন্দ-অঞ্জলি এই পাহাড়ের কোলে আমাকে পৌছে দিয়েছ। তোমার চিঠিটা আমার কাছে আজ উৎসবের মতোই ঠেক্‌ছে।

পাহাড়ী মেয়ের মিলন-পর্ব্ব একথায় চিঠিতে জানান অসম্ভব। স্থান বিশেষে তার আবার প্রকার ভেদ দেখা যায়। সে দিন ছিল কি একটা পর্ব্বের দিন। ইচ্ছা হোল বেড়িয়ে আসি এঁকে বেঁকে যাওয়া ঐ অগভীর নদীটার ওপারে। সঙ্গে যাবে কে তা ঠিক হয়ে গেল। ছোট বৌদি, নটন, শৈলদার নবাগত বোন অমিতা, আর আমাদের পুরোণ চাকর আনন্দমণি। গাড়ী এল যখন তখন বেলা দশটা। শৈলদা নিজেই Drive করবেন ঠিক হোল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সহর পেরিয়ে একটা Hanging Bridgeএর কাছে এসে যখন মোটরের গতি পথ শেষ হোল তখন আনন্দমণিকে মোটরে বসিয়ে রেখে আমরা হেঁটেই চল্লাম। পোল পার হয়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল পুরো দুটী ঘণ্টা। বকুলের ঘনছায়া তলে শ্বেত শিলা তলে বসে দেখ্‌ছিলাম ছেলে মেয়েদের দোলন খেলা। বৃদ্ধ বকুল বৃক্ষের বিরাশি ফুট উঁচু ডালে একটা দড়ি ঝোলান রয়েছে। দুজন করে একসঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দোল খাচ্ছে পালা করে। নানা বয়সের ছেলে মেয়েরা চারদিক্‌ ভিড় করে সোৎসাহে দেখ্‌ছে। নর নারীর

স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী এখানে নেই। সাম্য ভাবটা বেশ স্পষ্ট। এরা শাস্ত্রের সঙ্কোচে হাঁপিয়ে উঠে না—তা তারা অফুটন্ত কোরকই হোক আর প্রস্ফুটিত কুসুমই হোক। তাই যখন বালকে বালকে, বালিকাতে বালিকাতে দোলনের পালা শেষ হয়ে একটী ছেলে ও একটী মেয়ে দড়িতে বাঁধা কাষ্ঠাসনে আসীন হয়ে পরস্পরের কটিদেশের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে স্মিত হাস্যে অবিশ্রান্ত দোলে শূন্যপথ আলোড়ন করতে লাগল তখন মনে হোল পৃথিবীর প্রাণভরা পুলক তারা সারা অঙ্গে মেখে নিয়েছে। অঙ্গ সৌষ্ঠবের বিচিত্র নর্ত্তন দুঃখকে যেন ভ্রূকুটী জানাচ্ছে। মেয়েটীর শাড়ির প্রান্ত এসে লেগেছে ছেলেটীর গায়ে। আর তার মৃদু তপ্ত নিঃশ্বাসের লঘু স্পর্শ ছেলেটীর দোলন-ক্লান্ত মুখ খানা রোমাঞ্চিত করে তার অন্তরে বাহিরে কী যেন একটী পুলক-শিহরণ সৃষ্টি কচ্ছে। বাতাসের হিল্লোলে হিল্লোলে ভেসে আসছে পাহাড়ী যুগলের সরল প্রাণের প্রতিধ্বনি। পঞ্চদশীটী শিউলীফুলে তার খোঁপা ঢেকে পুষ্পযুদ্ধে বিজয়িনীর মত সেজে মনে হ'ল যেন তার চির বাঞ্ছিত দোলন সঙ্গীর কণ্ঠ ফুলের মালায় দুলিয়ে দিয়ে চলেছে। মুক্ত কেশ ভার কখন যে পৃষ্ঠোপরি খসে গেছে তার হুঁস থাকার সময় নেই। এদিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সঙ্কোচে এর সাথে আমাদের অমিতার মুখ খানা লাল হয়ে উঠছে। আমরাও প্রকৃতির এই সুন্দর মিলন লীলা পশ্চাতে রেখে অদূরবর্ত্তী পাহাড়ে খোদা একটী নিভৃত মন্দিরের দিকে এগিয়ে চল্লাম। নটনকে একবার বলেছিলাম শৈলদার সঙ্গে একপাক দোল খেতে। সে আমায় মারতে বাকী রেখেছিল। একটী দীপ্ত চক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসী ভিন্ন জীর্ণ মন্দিরটী জন শূন্য। চারিপাশে শ্যামল সঘন শালবন। একটী অস্পষ্ট গানের সুর ভেসে আস্‌ছিল আমাদের দিকে। আমাদেরও কৌতূহল বেড়ে গেল। একটী তরুণী পথিক বনতুলসীর জঙ্গলে আবক্ষ ডুবায়ে অদূরবর্ত্তী একটী যুবকের সঙ্গে মনে হোল Duet গানে যোগ দিয়েছে। তরুণী গানের সুরে যে প্রশ্ন করে, কৃষক যুবক তার অনুরূপ জবাব করে গান গেয়ে। এ যেন কবির পাল্লা। কেউ হার মানার অপমান স্বীকার করতে চায় না। মনে হ'ল প্রেমের প্রলাপ বাণী তারা বকে যাচ্ছে ক্রমাগত। তরুণীর পরাজয় হ'ল। অস্তরবির রক্তিমালোকে যুবকের ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। তরুণীর বরমাল্যে যুবকের বাক্‌-যুদ্ধের প্রকৃত পুরস্কার ঘোষিত হ'ল। আমরাও এই আদি-দম্পতির মিলন-শর্ব্বরীর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন মোটরে চড়ে বসেছি তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

৵ বিজয়ার বুক ভরা ভালবাসা জেনো। ভাল আছি। চিঠি পেয়েই জবাব দিলে সুখী হব। ইতি—

কাটমুণ্ড

২০শে কার্ত্তিক ৩৫।

ঘরে-বাইরে

শারদীয় অবকাশ-অন্তে হেমন্তের এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মিলন প্রভাতে আমরা 'ধূপছায়া'র বন্ধু-বান্ধবী ও পাঠক পাঠিকা-বর্গকে আমাদের প্রাণের প্রীতি-পূত নমস্কার জানাচ্চি।

বন্ধু বান্ধবেরা ব'লে থাকেন, কী কুক্ষণেই বাঙলাদেশে 'আধুনিক সাহিত্য' বা 'নব্য সাহিত্য' কথাটার আমদানী হয়েচে!

এই আধুনিক বা নব্যসাহিত্যকে লক্ষ্য ক'রে, গত কয়েক বছর ধ'রে বাঙলা মাসিক পত্রিকার আসর তরুণ বনাম প্রবীণের প্রবল তর্ক যুদ্ধে দস্তুর মতো সরগরম্ হ'য়ে উঠেচে!

সুযুক্তি বা রসোপলব্ধির ক্ষমতা বেশী থাক্ বা না থাক্— গলাবাজি আছে যথেষ্ট; এবং সেই তুমুল চীৎকার হাটের কলরবকেও অনায়াসে পরাস্ত করেচে।

ভারতীর আরতি-দেউলে এইরূপ দাঙ্গা-সুলভ প্রচণ্ড বচসা অত্যন্ত লজ্জাকর ও দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নেই।

তবু, আমাদের আশান্বিত মনে বার বার এই কথাই জাগে যে, পরম শুভক্ষণেই 'আধুনিক' বা 'নব্য' কথার প্রবর্ত্তন হয়েচে!

বাঙলা সাহিত্যের গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ প্রবাহ অকস্মাৎ আজ অভাবিত বৈচিত্র্যের উচ্ছল তরঙ্গে চঞ্চলিত হ'য়ে উঠেচে —এ কথা অন্ধ ছাড়া আর কে অস্বীকার করবে? মাসিক পত্রিকার পলি মৃত্তিকায় আজ নব নব শ্যামাঙ্কুর দেখা যাচ্চে!

তা ফসলের অঙ্কুর, না আগাছার চারা—পরে যাচাই ক'রে দেখা যাবে, হয় তো সে-সময় এখনও আসে নি।

কিন্তু, ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি যে পূর্ব্বাপেক্ষা আশাতীত রূপে বেড়ে গ্যাচে—এইটাই আনন্দের বিষয়।

বছর পাঁচেক পূর্ব্বে, এই সেদিন পর্য্যন্ত বাঙলা-সাহিত্য অবগুণ্ঠিতা কুল-বধূর মতো বাঙলার অন্তঃপুরেই নির্ব্বাসিত হ'য়ে ছিল।

বাইরেকার মহল্ থেকে তার ডাক কচিৎ আসত বটে, তবে সে ডাক অধিকাংশ স্থলেই অলস অবসর বিনোদনের জন্যই শুধু!

'বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি নে'—এই লজ্জাকর বাঁধা বুলিটাই ছিল তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর গর্ব্ব!

কিন্তু, গত পাঁচটা বছরের মধ্যে সাময়িক-সাহিত্য-জগতে যে প্রবল আলোড়ন সুরু হয়েচে, তা'র ফলে দেশের মানসিক আবহাওয়ার বহু পরিবর্ত্তন ঘ'টে গ্যাচে।

অনাদৃতা উপেক্ষিতা বঙ্গসাহিত্যলক্ষ্মী আজ বাইরের মহলে সাদর অভ্যর্থনা ও স্থায়ী আসন লাভ করেচেন।

আজকাল বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালে, ফুটপাথের ধারে সাজানো বিভিন্ন আকার ও প্রকারের কতো সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার বর্ণ-বিলাস চোখের সুমুখে ফুটে ওঠে! এদের মধ্যে কয়েকটির পরমায়ু নিতান্ত অল্প হ'লেও, অধি-কাংশই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্চে।

এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, বাঙালীর সাহিত্য-প্রিয়তা ও পাঠস্পৃহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গ্যাচে?

শুধু তা'ই নয়—

বাঙলা-সাহিত্যের, বর্ত্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙালী আজকাল,'সরবে' মাথা ঘামাতে সুরু করেচে—এটা কি আশার কথা নয়?

তাই আবার বলি, একটি দুর্লভ শুভক্ষণেই বাঙলা-সাহিত্যের আসরে, নব্য সাহিত্য'কে নিয়ে বাক্য-বিরোধ উপস্থিত হয়েচে। এই তর্ক-ধূলি-জালের আড়াল থেকে একটি উদীয়মান নব-যুগ-সূর্য্যের অরুণাভাস দেখা যাচ্চে—এ কথা আজ সিগারেটের ধোঁয়ার মতো নির্ব্বিচারে উড়িয়ে দেবার জো নেই!

নব্য-সাহিত্য শাশ্বত কালের কষ্টি পাথরে 'নিকষিত হেম' ব'লে প্রমাণিত হয়েচে কি, না, সে জটিলতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া এখন বৃথা।

কিন্তু নব্য সাহিত্যিকদের নব-সৃষ্টির প্রচেষ্টাটুকুই অসঙ্কোচে প্রশংসার দাবী করতে পারে।

'ভারতী' বা পুরোনো 'প্রবাসী'র আমলে যাঁরা সাময়িক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই অন্ততঃ একটি বিশেষ বিষয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারেন না।

সে-বিষয়টি হচ্চে—

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট পথে পা' না বাড়িয়ে নিজ শক্তিবলে নতুন পথের সন্ধান করা।

বেশী দিনের কথা নয়, যখন বাঙলা সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্র-প্রতিভার অপূর্ব্ব অসাধারণ প্রভাব একটা রঙীন কুহেলি-জাল রচনা ক'রেছিল; এবং বহু শক্তিমান সাহিত্যিক সেই কুহেলির মোহে তাঁদের নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে, নিজ নিজ শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু, নব্য সাহিত্য সেই কুহেলি-জালকে ছিন্ন করেচে—

'অতি আধুনিক' আখ্যায় অভিহিত জন কয়েক সাহিত্যিক আজ গতানুগতিক বাঁধা রাস্তা থেকে স'রে গিয়ে, তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার জ্যোতিতে বিভিন্ন সৃষ্টির পথ আবিষ্কার করেছেন।

সাহিত্য-সৃষ্টির এই নবতন প্রচেষ্টাকে যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব'লে বিষম ভুল করচেন, নব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করাই ভ্রম-সংশোধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

বর্ত্তমান যন্ত্র-তান্ত্রিক জগতে নিপীড়িত কলঙ্কিত মনুষ্যত্বের প্রতি নব্য-বাঙলা-সাহিত্যের একটি উদার সমবেদনা-বোধ আছে—এ কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাই, নব-সাহিত্যিকদল জীবনকে আঁকতে ব'সে সমাজ নীতির রক্ত-চক্ষুর ভয়কে অগ্রাহ্য ক'রে জীবনের কোনো গ্লানি, দৈন্য বা দুর্ব্বলতাই ঢেকে রাখেন নি।

জীবনের প্রকৃত পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে উঠেচে—তাঁদের লেখনী-স্পর্শে। কিন্তু, জীবনের সকল কদর্য্যতা ও বিকৃতি ছাপিয়ে একটি সুন্দর সহানুভূতি ও রসানুভূতি পাঠকের অন্তর-লোকের দ্বারে গিয়ে আঘাত করে—এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করি, যখন পড়ি শক্তিমান নব্য-সাহিত্যিকদের রচনা।

রসিক-মনের সেই নিগূঢ় আনন্দ-লোকে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাদানুবাদ স্তব্ধ—সেখানে শুধু রস-আহরণের নিত্য আয়োজন।

সওদা

এঁদো 'আটচালা'র তলায় কে এক বিরূপাক্ষ শর্ম্মা আজকাল বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করচেন—অমুক কাগজ বদ্‌সাহসী, তমুক সম্পাদক কিছু বোঝে না… ‥

সস্তা উপদেশ বিলিয়ে মাতব্বরী ফলান চলে বটে!

অথচ, যে কাগজের কোণে তিনি 'আটচালা' ফেঁদেচেন, সেই কাগজই 'বদ্‌-সাহসের' (বিরূপাক্ষের মতে) নমুনা সর্ব্বাগ্রে দেখিয়েচেন—যথা, 'শ্রাবণঘন গহন মোহে' পাতান-ভাইয়ের ঘরে দিদির নিশীথ-অভিসার, 'চিত্রবহা'য় হস্তিনী-রমণীর কামকেলির চিত্র, নীরদা-অমরের নৈশ সম্মিলন……আরো বহুৎ!

কিন্তু মজা এই যে, 'ধূপছায়ার বেলায় বিরূপাক্ষের অক্ষি যতটা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল, 'কালি-কলমে'র বেলায় ঠিক ততখানিই স্তিমিত হ'য়ে গিয়েছিল—সম্ভবতঃ 'মহাপ্রসাদের' মাহাত্ম্যেই!

'শর্ম্মা'টি নিজের নামকরণ করেচেন বিরূপাক্ষ—যিনি সদাশিব ভোলানাথ। কিন্তু, তাঁর মুখ ভেংচানি দেখে তাঁকে নন্দী-ভৃঙ্গী ঠাহর হয়!

'শনিবারের' রাসভমণ্ডল জীবনানন্দের কবিতার ওপরে বেজায় খাপ্পা! কিন্তু ঈর্ষ্যায় কি হবে! 'গড়ের মাঠের গাধা' কলম ভোঁতা কর্‌লেও কবি ত দূরের কথা—গণ্ডারও হ'তে পারবে না। বেচারী!

'কালি কলমের কবি 'বীণা'তে লেখেন না—প্রত্যেক কবিতার নীচে ও-বিজ্ঞাপনটী জাহির না করে, রেল কোম্পানীর গাড়ীতে গাড়ীতে যারা কেশ তৈল কিংবা দাদের মলম বিক্রী করে, তাদের ক্যানভাসার নিযুক্ত কর্‌লে আরো সুবিধা হবে।

একলার পক্ষে খরচটা যদি বেশীই পড়ে কবি কালিদাসকেও দলে ভিড়াতে পারেন। তিনিও এবার থেকে প্রচার কর্‌তে থাকুন—উজ্জয়িনীতে তাঁর বাড়ী ছিল না এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলার মত আদিরসাত্মক কাব্যও তিনি লেখেন নি!

প্র

সাহিত্য সংবাদ

আকাশগঙ্গা :—রচয়িতা শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা। একখানি কবিতার। কবির ভাষা আছে ছন্দও আয়ত্ব, ভাবেরও বিশেষ অভাব নেই। বইখানি আমাদের ভালোই লেগেছে।

সুখের সন্ধান :—উপন্যাস। দাম দেড়টাকা। লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থকার ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ ভিন্ন এ পুস্তকখানিতে আর কিছুই পাওয়ার আশা নেই।……এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যদি একটী সংসারকেও সুখের সংসার করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে,—একজন লোককেও যদি উন্নত ও সুখী করিতে পারে, তাহা হইলেও আমার সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।" লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা তাঁর সম্পূর্ণ সফলতা কামনা করি।

উত্তরা :—বাঙলার প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে আমাদের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করে গড়ে তোলবার জন্য শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন যে আয়োজন করেছেন, আমরা তার মাধুর্য্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি। উত্তরা মাসিক পত্রিকাখানি আদর্শ হিসাবে বাঙলার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলির কারও চেয়ে হীন নয়। গত আশ্বিন মাসে উত্তরা চতুর্থ বর্ষে পড়েছে। এবারে শুনেছি পত্রিকাখানির

সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য উত্তরোত্তর পরিচালকগণ যত্ন ও চেষ্টার কোনও ত্রুটী রাখবেন না। বার্ষিক দর্শনী পূর্ব্ববৎ। কার্য্যালয়—৪৬ নং ভেলুপুরা, কাশীধাম।

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৮, তারিখে কলিকাতায় শ্রীমদ ভাগবৎগীতার জয়ন্ত্যৎসব হবে। এই প্রদর্শনীতে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সর্ব্বপ্রকার গীতা সংগৃহীত হচ্ছে। উৎসবের সার্থকতা সাধনের জন্য পাঠক সাধারণকে প্রচলিত গীতা সম্বন্ধায় যে কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় গোবিন্দভবন কার্য্যালয় (৩০ নং বাঁশতলা গলি, কলিকাতা) এই ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন এবারে ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ ইন্দোরে হবে স্থির হয়েছে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অঙ্গরূপে প্রবাসী মহিলা সম্মিলনের অধিবেশনও ঐ সঙ্গে হবে।

রচনা প্রতিযোগিতা।

"বাংলার ঐতিহাসিক নাটক", "রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা" (mystecism) "বাংলা পত্রিকার ইতিহাস" "আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সমস্যা"—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য চারিটী স্বর্ণ-গর্ভ রৌপ্য পদক পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি বাংলায় লিখতে হবে এবং ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখের পূর্ব্বে কলিকাতা যদুনাথ সেন লেনস্থিত কুমার লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রিডিং রুমের লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের নিকট পাঠাতে হবে।

র

Printed & Published by Sj, Nripendra nath Banerjee fromthe Beia Printing Works

14, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta.

ডেনিস মউনির

গোল্ড লিফ নং ১ ব্রাণ্ডি

<u>বিশ বৎসরের পুরাতনের গারাণ্টি</u>



রুগ্ন দেহে বল সঞ্চার করিতে

ও

সুস্থ দেহ সবল করিতে অদ্বিতীয়!!!

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীতে

ডেনিসমউনি

পরীক্ষিত ও সমাদৃত!

সোলএজেন্টস্—এন্, সি, সাহা এণ্ড কোং

কলিকাতা মাদ্রাজ।